সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

১১তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১১তম খন্ড

সূরা ইউসুফ
থেকে
সূরা ইবরাহীম

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
হাফেজ শহীদুল্লাহ এফ, বারী

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(১১তম খন্ড সূরা ইউসুফ থেকে সূরাা ইবরাহীম)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি, কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫ ৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ ওয়্যারলেস রেলগেইট মাসজিদ (দোতলা), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮

৮ম সংস্করণ
সফর ১৪৩২, জানুয়ারী ২০১১, পৌষ ১৪১৭

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকা

Bengali Translation of Tafseer
'Fi Zilalil Quran'
Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
11th Volume
(Surah Yusuf to Surah Ibraheem)))

Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London
124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK
Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955
Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 Wireless Rail Gate Masjid (1st Floor), Moghbazar, Dhaka-1217
38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997
1st Edition1998
8th Edition Safar 1432, May 2011
Πριχε Tκ. 200.00
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN- NO-984-8490-03-0

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের গুনাহর ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না–এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি।

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে–কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি।

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না-না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২–এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা– কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'

অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও

ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা ইউসুফ

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এটা একটা মক্কী সূরা। এটা সূরা হূদের পরে নাযিল হয়েছে। সূরা ইউনুস ও সূরা হূদের ভূমিকায় যে চরম সংকটজনক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করেছি, সেই একই পরিস্থিতিতে এই সূরাও নাযিল হয়েছে। রসূল (স.)-এর দুই প্রধান সহায় আবু তালেব ও খাদীজার ইন্তেকালের বছরটি রসূল (স.)-এর জীবনের বিষাদময় বছর হিসাবে চিহ্নিত। সেই বছর থেকে নিয়ে আকাবার প্রথম বায়য়াত ও দ্বিতীয় বায়য়াত পর্যন্ত সময়টাকে বলা যায় এই চরম সংকটজনক পরিস্থিতি, যাকে উপলক্ষ করে সূরা ইউনুস, হূদ ও ইউসুফ নাযিল হয়েছিলো। আকাবার বায়য়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.) ও তার সাথী সাহাবীদের জন্যে মদীনায় হিজরতের ও মক্কার অত্যাচার থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ সুগম করে দেন। সুতরাং সূরা ইউসুফ হচ্ছে ওই চরম সংকটকালে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম। গোটা সূরা ইউসুফই মক্কায় নাযিল হয়েছে। তবে কারো কারো মতে ১, ২, ৩, ৪ ও ৭ নং আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রথম চার আয়াতসহ গোটা সূরা এক সাথে নাযিল হয়েছে এ কথা বলার যৌক্তিকতা প্রথম তিন আয়াতের বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 'আলিফ লাম রা, এ হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ, আমি এ গ্রন্থকে আরবী কোরআন হিসাবে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আমি তোমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করছি তোমার কাছে এই কোরআন ওহী করার মাধ্যমে। ইতিপূর্বে তুমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতে না।' এ তিনটি আয়াত পরবর্তী আয়াতে ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা শুরু করার স্বাভাবিক ভূমিকা। সেই আয়াতটা (৪ নং) হলো, যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে পিতা, আমি এগারোটা নক্ষত্র এবং চাঁদ ও সূর্যকে আমার সামনে সাজদারত দেখেছি।' তারপর সূরা শেষ পর্যন্ত এভাবে অব্যাহত থেকেছে।

সুতরাং 'আমি তোমার কাছে সুন্দরতম কাহিনী বর্ণনা করছি,' .... আল্লাহর এই উক্তি কেসসা নাযিল হবার স্বাভাবিক ভূমিকা বলেই প্রতীয়মান হয়।

এ ছাড়া 'আলিফ লাম-রা' এই বিচ্ছিন্ন আয়াতগুলো, এই অক্ষরগুলো আল্লাহর কেতাবের প্রতীক বলে আখ্যায়িত করা এবং আল্লাহ এই কেতাবকে আরবী কোরআনরূপে নাযিল করেছেন- এ কথা বলাও এ সূরার মক্কী সূরা হওয়ার লক্ষণ। মক্কার মোশরেকরা প্রচার করতো যে, একজন অনারব লোক এসে মোহাম্মদ (স.)-কে কোরআন শিখিয়ে যায়। তাদের এ দাবীর জবাবেই বলা হয়েছে যে, এ কোরআন তো আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এটা একজন অনারবের শেখানো কেতাব হলে তা তো আরবী ভাষায় হতে পারে না। সুতরাং এ কেতাব যখন আরবী ভাষায় লেখা, তখন তা নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর আকারে এসেছে। উপরন্তু তা এমন সব বিষয়বস্তু নিয়ে এসেছে, যা তাঁর একেবারেই অজানা ছিলো।

আরো একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সূরার এই ভূমিকা এর শেষে বর্ণিত উপসংহারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সূরার শেষাংশে একটা আয়াতে বলা হয়েছে যে,

'এগুলো অদৃশ্য জগতের তথ্যাবলী, যা আমি তোমার কাছে ওহীযোগে পাঠাই ...' (আয়াত ১০২)

কাহিনীর ভূমিকা ও উপসংহারের এই গভীর সংযোগ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভূমিকা ও উপসংহার উভয়ই কেসসার সাথে নাযিল হয়েছে।

সপ্তম আয়াত ছাড়া সূরার বক্তব্য আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এটা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য কথা নয় যে, সূরাটা মক্কায় নাযিল হয়েছে। অথচ ৭ম আয়াত মক্কায় নাযিল হয়নি, আবার মদীনায় গিয়ে

ওটাকে নাযিল করে এই সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ ৮ম আয়াতের 'কালু' (অর্থাৎ তারা বললো) শব্দটিতে একটা সর্বনাম রয়েছে, (তারা) যা দ্বারা ইউসুফের ভাইদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, ৭ম ও ৮ম উভয় আয়াত এক সাথে নাযিল হয়েছে এবং তা সূরার একই পর্বের অংশ।

সমগ্র সূরা ইউসুফের বিষয়বস্তু, পটভূমি, বক্তব্য, শিক্ষা সব কিছুই সাক্ষ্য দেয় যে, সূরাটা একটা অখন্ড ও একক সূরা এবং এতে মক্কী সূরার যাবতীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট। উপরন্তু এতে রসূল (স.)-এর জীবনের এই চরম সংকটময় পরিস্থিতির লক্ষণই বিশেষভাবে পরিস্ফুট। কোরায়শদের জাহেলী সমাজে রসূল (স.) যখন আবু তালেব ও খাদীজার মৃত্যুজনিত 'বিষাদময় বছর থেকে শুরু করে চরম নির্যাতন ভোগ করতে থাকেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সহচর মুসলমানরাও নির্যাতন ভোগ করতে থাকেন, ঠিক সেই সময়ই আল্লাহ তাঁর রসূলকে তাঁর মহান ভাই হযরত ইউসুফের কাহিনী শুনান। রসূল (স.) ও মুসলমানরা কোরায়শদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন ভোগ করেন, তার মধ্যে দৈহিক নির্যাতন, নির্বাসন এবং সামাজিক অবরোধও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। হযরত ইবরাহীমের প্রপৌত্র, হযরত এসহাকের পৌত্র ও হযরত ইয়াকুবের পুত্র হযরত ইউসুফও তাঁর ভাইদের পক্ষ থেকে রকমারি যুলুম নির্যাতন ভোগ করেন। ভাইয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কুয়ায় নিক্ষেপের মাধ্যমে তাঁকে ভীত সন্ত্রস্ত করার অপচেষ্টা চালায়, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রীতদাস হয়ে একটা পণ্যদ্রব্যের মতো এক হাত থেকে আর এক হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকেন, তাঁর পিতামাতা বা পরিবার পরিজনের কাছ থেকে সাহায্য ও সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকেন, মিসরের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী এবং অন্য নারীদের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রথমে অশ্লীলতা ও যৌনতার প্ররোচনা দেয়া হয়, পরে ষড়যন্ত্রের জালে ফাঁসানো হয়, কারাযন্ত্রণা ভোগ করানো হয়, তারপর তিনি প্রাচুর্য ও সর্বময় ক্ষমতা হাতে পেয়ে জনগণের খাদ্য ও ভোগ্য দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনের কষ্টকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অবশেষে তিনি মানবিক ভাবাবেগের অগ্নিপরীক্ষায় জর্জরিত হন এবং তাঁর সেই ভাইদেরই মুখোমুখি হন, যারা তাঁকে শুধু কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো তা নয়; বরং তাঁর যাবতীয় দুঃখ দুর্দশার কারণও ছিলো। এসব দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতনে হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু ধৈর্য ধারণই করেননি; বরং এ সবের মধ্য দিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজও চালিয়ে গেছেন। এভাবে এসব কঠিন পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের চরম সাফল্যের স্তরে উপনীত হন। এ স্তরটি ছিলো তাঁর পিতামাতার সাক্ষাত–যা ছিলো তাঁর সূর্য চন্দ্র ও এগারোটা নক্ষত্র কর্তৃক তাঁকে সাজদা করার স্বপ্নের বাস্তব রূপ। এ স্তরে পৌঁছে তিনি আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করেন। এই সর্বশেষ স্তর ও আল্লাহর প্রতি তাঁর এই আত্মসমর্পণের ঘটনা চিত্রিত হয়েছে সূরার ৯৯, ১০০ ও ১০১ নং আয়াতে।

'অতপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো, তখন ইউসুফ তাঁর পিতামাতাকে নিজের কাছে পুনর্বাসিত করলেন.....' সর্বময় ক্ষমতা, প্রাচুর্য ও জনবলের বিপুল সমারোহের মধ্যেও তাঁর সর্বশেষ দোয়া ছিলো, 'আল্লাহ যেন তাঁকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দেন এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' এতো দীর্ঘ দুঃখকষ্ট ভোগ, এমন জাঁকজমকপূর্ণ সাফল্য লাভের পরও এই ছিলো তার একমাত্র দাবী।

সুতরাং হযরত ইউসুফের এই কাহিনী এবং এর উপসংহার বর্ণনার মাধ্যমে এ সূরা যদি রসূল (স.) ও মুসলমানদের তাদের অমানুষিক যুলুমের স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে সান্ত্বনা হিসাবে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বরঞ্চ আমার তো মনে হয়, এ সূরা দ্বারা রসূল (স.)-কে এরূপ একটা আভাসও দেয়া হয়েছে যে, তাঁকে মক্কা থেকে বের করে নিয়ে এমন একটা নতুন জায়গায় পুনর্বাসিত করা হবে, যেখানে বিজয় ও খোদায়ী সাহায্য তার নিত্যসংগী হবে, যেমন হযরত ইউসুফকে মা বাবার কোল থেকে নিয়ে বিস্তর দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয় ও সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করানো হয়। মাতৃভূমি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এই পর্বটা ভীতি ও শংকার মধ্য দিয়ে এবং দৃশ্যত বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকলেও পরিণামের দিক দিয়ে তা ছিলো সাফল্যের সূচনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এভাবেই আমি ইউসুফকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় আসীন করেছি.........' (আয়াত ২১)

হযরত ইউসুফ যে মুহূর্তে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে পদার্পণ করেন, এমনকি যখন তিনি দাস হিসাবে বিক্রি হবার মতো একজন তরুণ মাত্র, তখন থেকেই তার ক্ষমতা লাভের পালা শুরু হয়েছে।

সূরার সর্বশেষ তিনটি আয়াতে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা আমাকে এতো অভিভূত করেছে যা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না, শুধু সামান্য আভাস দিতে পারি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোককেই শুধু ওহী পাঠাতাম.......... রসূলরা যখনই হতাশ হয়ে যেতো এবং ভাবতো যে, তাদের মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখনই তাদের কাছে আমার সাহায্য আসতো...... '

এ আয়াত তিনটায় আল্লাহর নবীরা হযরত ইউসুফের মতো হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে পড়লে আল্লাহ কোন রীতি অবলম্বন করেন তার বর্ণনা রয়েছে। সেই সাথে এই মর্মে ইংগিতও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কঠিন অগ্নিপরীক্ষার পর প্রথমে কিছুটা অপ্রীতিকর পন্থায় তা থেকে উদ্ধার করেন, অতপর তাদের প্রত্যাশিত সাফল্য দান করেন। এ ধরনের সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত মোমেন বান্দারা এ পর্যায়ক্রমিক সাফল্য যথাযথভাবেই উপলব্ধি করে থাকেন।

এই সূরার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে হযরত ইউসুফের কাহিনীটা পূর্ণাংগভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইউসুফের কাহিনী ছাড়া কোরআনে অন্য যতো কাহিনী রয়েছে, তা সাধারণত এক একটা সূরায় আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। ওই সূরার মূল বক্তব্যের সাথে মিল রেখেই কাহিনীর অংশটা নির্বাচন করা হয়েছে। কোনো সূরায় একটা কাহিনী পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করা হলেও তা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন হযরত হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়ায়বের কাহিনী। একমাত্র হযরত ইউসুফের কাহিনীই একই সূরায় পরিপূর্ণভাবে ও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ দিক থেকে সূরা ইউসুফ কোরআনের অন্য সব সূরার তুলনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

এই বিশিষ্টতা কাহিনীর প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল এবং সেই প্রকৃতিকে তা পূর্ণভাবে তুলে ধরেছে। সূরার সূচনা হয়েছে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে এবং সমাপ্তি হয়েছে ওই স্বপ্নের বাস্তব রূপ লাভের মধ্য দিয়ে। এর অংশবিশেষ এই সূরায় এবং অপর অংশ অন্য সূরায় থাকলে তা মানানসই হতো না।

সূরার এই বৈশিষ্ট্য তাকে একটা পরিপূর্ণ বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। কাহিনী বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য সফল হওয়া ও তার উপসংহারে যে শিক্ষা ও মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, সেটা এ সূরার অতিরিক্ত অবদান।

এবার আমি একটু বিশদভাবে আলোচনা করবো এই সূরায় কোরআনের যে বিশিষ্ট বর্ণনাভংগির সাক্ষাত পাওয়া যায়, তাতে কাহিনী বর্ণনার কী চমকপ্রদ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফের কাহিনী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে গল্প বলার ইসলামী রীতি বা বিধান কী, তা সুস্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া যায়। সূরা ইউসুফ এ ক্ষেত্রে একটা অনুকরণীয় আদর্শ তুলে ধরেছে, যা মনস্তাত্ত্বিক, আকীদাগত, প্রশিক্ষণগত ও আন্দোলনগত– সর্বদিক দিয়েই একটা পূর্ণাংগ মডেল। যদিও বিষয়বস্তু ও প্রকাশভংগিতে কোরআন সর্বত্রই এক অভিন্ন, তথাপি সূরা ইউসুফকে দেখে মনে হয়, এটা যেন শৈল্পিক প্রকাশ নৈপুণ্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে নির্ধারিত একটা প্রদর্শনী সূরা।

এই কাহিনীতে হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। তিনিই সূরায় আলোচিত প্রধান ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্বের জীবনের সকল দিক ও কর্মক্ষেত্র, সকল কর্মক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত নীতি ও আচরণ, এই ব্যক্তিত্ব যেসব অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, যথা অভাব ও দৈন্যের পরীক্ষা, প্রাচুর্যের পরীক্ষা, অশ্লীলতা ও যৌনতার প্ররোচনার পরীক্ষা, ক্ষমতাসীন হওয়ার পরীক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও নীতির ব্যাপারে মানবীয় ভাবাবেগের পরীক্ষা– এই সব পরীক্ষায় এ পুণ্যময় ব্যক্তিত্বের সফল উত্তরণ এবং তাঁর একনিষ্ঠ খোদাভক্তি ও খোদাভীতির নিখুঁত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

প্রধান ব্যক্তিত্ব ছাড়াও এ সূরায় আরো কিছু ভিন্ন মানের ও ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে মানবীয় মনস্তত্ত্বের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হযরত ইয়াকুবের পুত্রস্নেহ ও নবীসুলভ সংযমের নমুনা, হিংসুটে, ঈর্ষাকাতর ও কূচক্রী ভাইদের অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়ার পর তাদের বিব্রতবোধ ও ঘাবড়ে যাওয়ার নমুনা, তাদের মধ্যকার একজনের স্বতন্ত্র আচরণের নমুনা, তৎকালীন মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর উৎকট যৌনাবেগ ও পরকীয়া প্রেমের নমুনা, তৎকালীন মিসরীয় পরিবেশে তার এ প্রেমকে বৈধ করার অপপ্রয়াসের এবং সেই রাজকীয় ও উচ্চ শ্রেণীর নারী সমাজের নমুনা পেশ করা হয়েছে। নমুনা পেশ করা হয়েছে তৎকালীন নোংরা সামাজিক পরিবেশের এবং সেকালের মিসরীয় নারীদের অদ্ভুত যুক্তিরও। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ও তার যুবক-ভৃত্য সম্পর্কে ওই নারীদের বক্তব্য, তাদের পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফকে প্ররোচনাদান ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাকে হুমকি প্রদান থেকে ওই অদ্ভুত যুক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া হযরত ইউসুফের কারাবাস থেকেও বুঝা যায়, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে কি ধরনের চক্রান্তের জাল বোনা হয়ে থাকে। এখানে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রের নমুনাও প্রকাশ পেয়েছে, যিনি স্বীয় সমাজের অভিজাত শ্রেণীর অপরাধপ্রবণতা দেখেও না দেখার ভান করেন। কেননা তিনি তাঁর শ্রেণী ও পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত নন। প্রকাশ পেয়েছে স্বয়ং সম্রাটের নৈতিকতার নমুনাও, যিনি ক্ষণেকের জন্যে মহানুভবতার চমক দেখিয়েই অন্তর্হিত হয়ে যান যেমনটি হন আযীয অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী। এভাবে সূরায় বহুসংখ্যক ব্যক্তিত্ব ও বহু সংখ্যক পরিবেশ, বহু সংখ্যক দৃশ্য, তৎপরতা এবং আবেগ অনুভূতিকে পরিপূর্ণ বাস্তবতা ও মানবিকতার পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে।

কাহিনীটা বাস্তবতার মাপকাঠিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ বলে তার শৈল্পিক উপস্থাপনায় ইসলামী রীতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কাহিনীর উপস্থাপনা যে যথার্থই সত্যনিষ্ঠ, মনোমুগ্ধকর ও নিখুঁত বাস্তবতামন্ডিত, তা সন্দেহাতীত। একদিকে এতে মানব চরিত্রের কোনো বাস্তব বক্র দিকই উপেক্ষিত হয়নি আবার অপরদিকে বাস্তবতার নামে পাশ্চাত্যের নোংরা এবং অশ্লীল চিত্রও তুলে ধরা হয়নি।

কাহিনীতে রকমারি মানবিক দুর্বলতা, এমনকি যৌন আবেগের মুহূর্তটাকেও নিখুঁতভাবে চিত্রিত করা হয়েছে বটে। এ ক্ষেত্রে কোন বাস্তব অবস্থা মোটেই বিকৃত করা হয়নি, কিন্তু সুস্থ ও স্বাভাবিক নৈতিক পরিমন্ডল বিষিয়ে তুলতে পারে এমন অশ্লীল বিবরণ দেয়া হয়নি, যাকে বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াতের দৃষ্টিতে 'বাস্তবতা', 'স্বাভাবিকতা' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সত্যের কতো গভীরতা ও কতো শালীন বাস্তবতা থাকলে কেসসা কাহিনী এতো চমকপ্রদ হতে পারে, তা এই সূরায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। ব্যক্তিত্ব ও পরিস্থিতির বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য সত্তেও একটা পূর্ণাংগ অথচ চমকপ্রদ, পরিচ্ছন্ন ও শালীন কাহিনী উপহার দিয়েছে সূরা ইউসুফ।

প্রথমে দেখা যাক হযরত ইউসুফের ভাইদের পরিচিতি কিভাবে এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তারা এতো বেশী হিংসুটে ছিলো যে, ভ্রাতৃহত্যা যে একটা বীভৎস, ঘৃণ্য ও বিরাট অপরাধ, সে ধারণাই তাদের বিবেক থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিলো। উপরন্তু এমন একটা 'আইনগত ছুতো'ও তারা পেয়ে গিয়েছিলো যা তাদের ওই অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। আল্লাহর বিশিষ্ট নবী হযরত ইয়াকুবের ছেলে, হযরত এসহাকের পৌত্র ও হযরত ইবরাহীমের প্রপৌত্র হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে যে ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজ করছিলো এবং তাদের চিন্তায়, আবেগে ও ঐতিহ্যে ওই পরিবেশের যে ছাপ ছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ হত্যাকান্ডটা যাতে যুক্তিসংগত প্রমাণিত হয় এবং এর বীভৎসতা যাতে হালকা হয়, সে জন্যে তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটা যুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলো। তাদের এ পরিচিতি সূরার আয়াত নং ৭ থেকে আয়াত নং ১৮ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।

এরপর কাহিনীর প্রতিটি পর্যায়ে আমরা তাদের মধ্যে এই একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বহাল দেখতে পাই। অনুরূপভাবে তাদের মধ্যকার বিশিষ্ট একজনের আচরণও কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম দেখতে পাই। তিনি তাদের ইউসুফের ভাইকে সাথে করে আনার নির্দেশ দেয়ার পর তারা যখন তাকে নিয়ে এলো, তখন তারা তাঁকে চিনতেই পারলো না। তারা ভাবলো, এ তো হচ্ছেন মিসরের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কাছে তারা কেনান থেকে এসেছে দুর্ভিক্ষের সময় গম কিনতে। এই সময় আল্লাহ হযরত ইউসুফের জন্যে কৌশল তৈরী করলেন তার ভাইকে তাদের কাছ থেকে রেখে দেয়ার। তার পণ্যসম্ভারের মধ্যে রাজার পানপাত্র পাওয়া গেছে এ অজুহাতে তাকে রেখে দেয়া হলো। এই কৌশল দেখে এবং এর পশ্চাতের রহস্য বুঝতে না পেরে তাদের মনে ইউসুফ বিরোধী পুরনো বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠলো। তারা বলে ওঠলো,

'ও যদি চুরি করে থাকে তবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? ইতিপূর্বে ওর ভাই ইউসুফও চুরি করেছিলো।.......' (আয়াত ৭৭)

অনুরূপভাবে তারা যখন তাদের পিতা হযরত ইয়াকুবের মনে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় আঘাত দিলো, তখনও তাদের একই চরিত্র বহাল দেখা গেলো। তারা যখন দেখলো, তাদের পিতা আবারো ইউসুফের জন্যে অধীর হয়ে ওঠেছেন, তখন বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মনোকষ্টের কথা বিবেচনায় আনা তো দূরের কথা, তাদের মনে আগের সেই হিংসা পুনরায় জেগে ওঠলো।

ইয়াকুব (আ.) তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলো এবং বললো, 'হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে। তার চোখ দুটো মর্মযাতনায় সাদা হয়ে গেল এবং সে ছিলো মর্মাহত।' তারা বললো, 'আল্লাহর কসম, অমনি ইউসুফের কথা স্মরণ করতে করতে মরণাপন্ন হয়ে যাবেন, অথবা মরেই যাবেন।' (আয়াত ৮৪ ও ৮৫)

শেষ পর্যায়ে যখন ইউসুফ (আ.) পিতার কাছে নিজের জামা পাঠিয়ে দিলেন এবং সে সময়েও যখন তারা দেখলো, তাদের পিতা ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছেন, তখন ইউসুফের প্রতি পিতার এ গভীর মমত্ববোধ তাদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করে এবং তারা পিতাকে এ জন্যে ভর্ৎসনা না করে ছাড়েনি।

'কাফেলা যখন রওনা হলো, ইয়াকুব বললো, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি ....' (আয়াত ৯৪-৯৫)

এরপর আসে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রসংগ। এ মহিলা ইউসুফের প্রেমে এতো বেশী উতলা হয়ে ওঠে যে, নারীসুলভ লজ্জা, ব্যক্তিগত মর্যাদা, শীর্ষস্থানীয় সামাজিক অবস্থান কিংবা পারিবারিক কেলেংকারি কোনো কিছুরই তোয়াক্কা না করে সব রকমের নারীসুলভ ফন্দি ফিকির ও ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে, যাতে নিজেরও মতলব সিদ্ধ হয় এবং নিজের নির্লজ্জতা সম্পর্কে সমাজের প্রচারণার জবাবও দেয়া যায়। যে ইউসুফ তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাকে সে এমন শাস্তি দেয় যা প্রাণঘাতী হয় না এবং তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী মহিলাদের দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে তাদের সামনে নির্লজ্জের মতো নিজের প্রেমের সাফাই গায়। যা তখনকার মিসরের অভিজাত নারী সমাজে মোটেই দূষণীয় ছিলো না। এই বিশেষ শ্রেণীর মানুষের আচরণ ও এই বিশেষ মুহূর্তের স্বাভাবিক তৎপরতার নিখুঁত এবং বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি কোরআন তার স্বভাবজাত পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা বজায় রেখেছে। কোরআনের এই বর্ণনাভংগি নিসন্দেহে ইসলামী বর্ণনাভংগির শ্রেষ্ঠতম নমুনা। এমনকি সর্বাত্মক উন্মত্ততা ও পাশবিকতা নিয়ে যে মুহূর্তে মানসিক এবং দৈহিক কামনা বাসনার নগ্ন বহিপ্রকাশ ঘটে, সে মুহূর্তটির বর্ণনা দিতে গিয়েও কোরআন শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায় না। শৈল্পিক নৈপুণ্যের নামে দুর্ভাগা আধুনিক সভ্যতা 'স্বাভাবিক বর্ণনা' ও 'বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার' মোড়কে সাহিত্যের যে নোংরা আঁস্তাকুড় রচনা করে, কোরআন তার ধারে কাছেও যায় না। সূরার ২১ নং থেকে ৩৩ নং আয়াত পর্যন্ত লক্ষ্য করুন।

আমরা পুনরায় এই মহিলার সাক্ষাত পাই, যখন ইউসুফ এই মহিলা ও তার বান্ধবীদের ষড়যন্ত্রের ফলে জেলে ঢুকেছেন। জেলে থাকাকালে রাজা একটা স্বপ্ন দেখলেন, ইউসুফের সাথে জেলে অবস্থানকারী তরুণটি স্মরণ করলো, একমাত্র ইউসুফই স্বপ্নের তাবীর জানে, রাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ইউসুফ তার ওপর কলংক লেপনকারী অভিযোগের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আসতে অস্বীকার করলেন। রাজা এ মহিলা ও তার বান্ধবীদের ডাকলেন। মহিলা এলে দেখা গেলো, সময়, বয়স ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার ভেতরেও পরিবর্তন এসেছে এবং দীর্ঘ এক তরফা প্রেম নিবেদনকালে ইউসুফের যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় সে পেয়েছিলো, তার কারণে তার হৃদয়ে ঈমানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

'রাজা বললো, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো....... ' (আয়াত ৫০, ৫১, ৫২ ও ৫৩)

এবার এ সূরায় আলোচিত প্রধান ব্যক্তিত্ব হযরত ইউসুফের প্রসংগে আসা যাক। আল্লাহর এক সৎ ও পুণ্যময় বান্দা ইউসুফ (আ.)। তবে তিনি একজন মানুষও বটে। কোরআন তাঁর মানবীয়তা সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যেও অতিরঞ্জিত কিছু বলেনি। তিনি যদিও এক নবী পরিবারে জন্মেছেন, লালিত পালিত হয়েছেন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছেন, তথাপি একজন মানুষের যতো দুর্বলতা থাকতে পারে, সেসব সহকারেই তিনি এ গুরুতর ঝুঁকিপূর্ণ বিপদের মোকাবিলা করেছেন। মহিলাটি যখন তাঁর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন এক পর্যায়ে তিনিও মানবিক দুর্বলতাবশত তার প্রতি ঝুঁকেছেন, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ তাঁকে অধপতন থেকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেও টের পেয়েছিলেন যে, নারীদের ফন্দি ফিকির, ইসলামবিরোধী পরিবেশ, প্রাসাদ পরিবেশ ও প্রাসাদবাসী নারী সমাজের মোকাবেলা করায় তার দুর্বলতা রয়েছে,

কিন্তু তিনি দৃঢ় ও অবিচল ভূমিকা অবলম্বন করলেন। ব্যক্তিত্বের স্বভাব ও বাস্তবতা সম্পর্কে একটা কথাও বিকৃত করা হয়নি। অথচ এই বর্ণনায় জাহেলী নোংরামিকেও বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। কেননা এটাই একমাত্র নিখুঁত সঠিক বাস্তবতা।

এখন আসুন 'আযীয' অর্থাৎ মিসরের প্রধানমন্ত্রী প্রসংগে। তাঁর ব্যক্তিত্বের সাধারণ ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী, নেতৃত্ব ও পদের দম্ভ, সামাজিক পদমর্যাদা, সমাজের চোখে নিন্দনীয় দোষগুলো লুকানো ও সংরক্ষণের প্রবণতা– এ সবই তার মধ্যে বিদ্যমান। ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে তার এ বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষণীয়।

এবারে দেখা যাক ওই সময়কার মিসরীয় নারী সমাজের অবস্থা কি রূপ ছিলো সেদিকে। এ সমাজেরই একজন বিশিষ্ট রমণী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। তিনি তার ক্রীতদাস ইউসুফের প্রেমে পড়েন এবং তাকে কু-কর্মের প্ররোচনা দেন। সাধারণ নারীরা প্রথমে তার নিন্দায় সোচ্চার হয়, কিন্তু সে নিন্দার আসল কারণ ওই অপকর্মের প্রতি ঘৃণা নয়; বরং মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষা। এরপর আকস্মিকভাবে তারা ইউসুফকে দেখতে পায়। দেখামাত্রই তারা ওই মহিলার প্রেমের প্রতি সমর্থন দিয়ে বসে, যাকে ইতিপূর্বে তারা নিন্দা করতো। এরপর প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী যখন অনুভব করলো, তার নিন্দুকিনীরা সবাই তার পূর্ণ সমর্থক হয়ে গেছে, তখন সে নিজেকে একেবারেই নিরাপদ মনে করে বল্গাহীন হয়ে ওঠলো। কেননা তারা সবাই ওই মহিলার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছিলো। উপরন্তু ইউসুফকে সবাই মিলে বিপথগামী করতে সচেষ্ট হচ্ছিলো। অথচ একটু আগেই তারা তার নৈতিক পবিত্রতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিয়ে তাকে 'মানুষ নয়; বরং সম্মানিত ফেরেশতা' বলে আখ্যায়িত করেছিলো। তারা যে তাকে সম্মিলিতভাবে বিপথগামী করতে চেয়েছিলো তা বুঝা যায় হযরত ইউসুফের এই কথা দ্বারা! তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, ওরা যে দিকে আমাকে ডাকছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার জন্যে ভালো। তুমি যদি ওদের চক্রান্ত নস্যাত করে আমাকে রক্ষা না করো, তবে আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়বো এবং অজ্ঞ লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাবো।' (আয়াত-৩৩)

বস্তুত শুধু প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী একাই হযরত ইউসুফের প্রেমে পড়েনি; বরং গোটা নারী সমাজই পড়েছিলো।

পরবর্তী যে বিষয়টা এই সূরায় লক্ষণীয় তা হলো মিসরের সার্বিক পরিবেশ। ওপরে যে বিষয়গুলো আলোচিত হলো তার মধ্য দিয়ে এবং ইউসুফের নির্দোষিতা প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে কারাদন্ড দেয়ার মধ্য দিয়ে বুঝা যায়, সেখানকার সার্বিক পরিবেশ সৎলোকদের নয় বরং অসৎ লোকদের অনুকূল ছিলো। হযরত ইউসুফকে কারাদন্ড দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো এক অভিজাত নারীর কেলেংকারি এবং তার আলামত ধামাচাপা দেয়া, তাতে ইউসুফের মতো একজন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করে তো করুক! (আয়াত ৩৪)

আমরা যখন ইউসুফের ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করি, তখন কাহিনীর কোনো একটি পর্যায়েও তার ব্যক্তিগত চারিত্রিক মহত্বের একটি বৈশিষ্ট্যও অনুপস্থিত থাকতে দেখি না। সমস্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে এক সৎ বান্দা ও নবী পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর মধ্যে যে উচ্চতর নৈতিক এবং ধর্মীয় গুণবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তা সর্বাবস্থায় বহাল থাকতে দেখা যায়। এমনকি কারাগারের যাতনাময় অন্ধকার কুঠুরীতে বসেও তিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তা সহকারে, অত্যন্ত কোমল ও আকর্ষণীয় ভংগিতে কারাসংগীদের ইসলামের দাওয়াত দিতে ভোলেন না, বিরাজমান পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে হৃদয় জয় করার নিখুঁত কৌশল অবলম্বন করে দৃঢ় ও অনমনীয়ভাবে

দাওয়াত দিতে থাকেন। সেই সাথে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সততা এবং দ্বীনদারীকেও দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেন।

'তাঁর সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন মদ তৈরী করছি।.........' (আয়াত ৩৫-৪১)

এসব সত্তেও তিনি মানুষ। তাঁর ভেতরে মানবীয় দুর্বলতা কিছু না কিছু ছিলো। যেমন তিনি রাজাকে নিজের খবরাখবর জানিয়ে জেল থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা চালান। এ দ্বারা তিনি আশা করেন, রাজা হয়তো সেই কুটিল ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করবেন, যার কারণে তিনি জেলে ঢুকতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ইউসুফ মুক্তি পাবার আশায় আশান্বিত লোকটাকে বললেন, তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো, কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিলো। তাই সে জেলখানায় বেশ কিছুকাল কাটিয়ে দিলো।' (আয়াত-৪২)

এর কয়েক বছর পর আমরা হযরত ইউসুফের ভূমিকা দেখতে পাই। তখন রাজা এক স্বপ্ন দেখেন এবং জ্যোতিষীরা ও ধর্মীয় পুরোহিতরা তার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়। ঠিক তখনই জেলখানার সংগীর ইউসুফের কথা মনে পড়ে যায়। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাঁর এই পুণ্যময় বান্দাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এতোটা উৎকর্ষ দান করেন যে, আল্লাহ তাঁর জন্যে যে ভাগ্য ও পরিণতি নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতে প্রস্তুত হয়ে যান। এমনকি তিনি রাজার স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা দেয়ার পর রাজা যখন তাঁকে মুক্তি দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন, তখন তিনি সেই মুক্তির সুযোগও গ্রহণ করতে রাযি হলেন না। তিনি মুক্তির জন্যে শর্ত দিলেন, আগে তাঁর নামে আরোপিত অভিযোগের তদন্ত করতে হবে এবং তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হবে।

'রাজা বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি, সাতটা মোটা মোটা গাভীকে সাতটা চিকন চিকন গাভী গিলে খেয়ে ফেলছে ....' (আয়াত ৪৩-৫৫)

এই সময় আমরা দেখতে পাই হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত, পরিপক্ক শান্ত, শিষ্ট ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। আর এই পর্যায়েই আমরা দেখতে পাই, তিনি মিসরের সকল ঘটনার একক নায়ক ও মধ্যমণি হয়ে ওঠলেন, আর রাজা, প্রধানমন্ত্রী (আযীয), নারী সমাজ ও বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশ কোথায় যেন ক্রমান্বয়ে উধাও হয়ে যেতে লাগলো। কাহিনীর এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পটভূমি সম্পর্কেই কোরআন বলেছে,

'এইভাবে আমি দেশে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যার ফলে সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছিলো.........' (আয়াত ৫৬-৫৭)

আর এই সময় থেকেই দেখতে পাই, হযরত ইউসুফ নতুন বিচিত্র কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তিনি পূর্ণ দক্ষতা ও পরিপক্কতা, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হন।

আমরা দেখতে পাই, কুয়ায় নিক্ষেপের পর প্রথম বারের মতো হযরত ইউসুফ তাঁর ভাইদের মুখোমুখি হয়েছেন। এ সময় তিনি তাদের তুলনায় সর্বদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাবান, কিন্তু তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও ভাবাবেগে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযমের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাই। (আয়াত ৫৮-৬১)

আরো দেখতে পাই, আল্লাহর শিখানো কৌশল অবলম্বন করে কিভাবে তিনি নিজের ছোট ভাইকে কাছে রেখে দিলেন। এখানেই আমরা দেখতে পাই তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিপক্কতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, গাম্ভীর্য, সংযম ও ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা। (আয়াত ৬৯-৭৯)

এরপর আমরা সেই অবস্থার সাক্ষাত পাই, যখন হযরত ইয়াকুবের সকল দুঃখকষ্টের অবসান ঘটে, আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকল পরীক্ষার সফল পরিসমাপ্তি ঘটান। হযরত ইউসুফ পিতামাতা ও পরিবারের সাথে মিলিত হন। তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত ভাইদের প্রতি সহানুভুতিশীল হন, তাদের কাছে নিজের পরিচয় মৃদু তিরস্কার সহকারে তুলে ধরেন এবং তাদের ক্ষমা করেন। এই পর্যায়ে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের কাছে এরই প্রত্যাশা করা হচ্ছিল এবং এটা ছিলো সঠিক সময়ে সম্পাদিত সঠিক কাজ। (আয়াত ৮৮-৯৩)

সর্বশেষে সেই মহান ও চমকপ্রদ পর্যায়টা ঘনিয়ে আসে, যখন হযরত ইউসুফ তার পিতামাতা ও সকল ভাইয়ের সাথে মিলিত হন এবং তার স্বপ্ন সফল হয়। অথচ তিনি এই গৌরবময় সাফল্যকে উপেক্ষা করে আল্লাহর সাথে একান্ত সংলাপে নিরত হন,

'হে আমার প্রতিপালক,...... আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং সৎলোকদের সাথে যুক্ত করো।' (আয়াত ১০১)

এভাবে হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্বকে একটা পূর্ণাংগ একক ও বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য সূরায়।

এরপর হযরত ইয়াকুবের প্রসংগে আসা যাক। একজন অত্যন্ত স্নেহময় ও পুত্রবৎসল পিতা এবং আল্লাহর এক প্রিয় নবী হিসাবে তাঁর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ইউসুফের স্বপ্নের বিবরণ শুনে তিনি একাধারে আশা ও আতংকে দুলতে থাকেন। তিনি এ স্বপ্নের মধ্যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস যেমন পান, তেমনি শয়তান তাঁর ছেলেদের মনে কোনরকম কু-প্ররোচনা ঢুকিয়ে দিয়ে কোন অঘটন ঘটায় কিনা, সেই ভাবনায়ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। (আয়াত ৪-৬)

অতপর আমরা দেখতে পাই, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছ থেকে তাঁর ছেলেরা অনেক অনুনয় বিনয় করে ইউসুফকে নিয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে ফিরে এসে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনালো।

এ সময় তিনি মানবসুলভ ও নবীসুলভ বাস্তব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। (আয়াত ১১-১৮)

আমরা পুনরায় এ ব্যক্তিত্বকে তাঁর যাবতীয় বাস্তব ও স্বাভাবিক গুণবৈশিষ্ট্য সহকারে দেখতে পাই। এ সময় ছেলেরা পুনরায় তাঁর কাছে আবদার তোলে তাঁর কলিজার আরেক টুকরো অর্থাৎ ইউসুফের সহোদর ছোট ভাইকে তাদের সাথে পাঠানোর জন্যে। কেননা মিসরের প্রধানমন্ত্রী হযরত ইউসুফ তাকে নিয়ে যেতে বলেছেন আরো এক ভাগ বাড়তি গম আমার জন্যে, যা দুর্ভিক্ষের সময় অত্যন্ত জরুরী। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মিসরের এ নয়া প্রধানমন্ত্রী যে তাদেরই ভাই ইউসুফ, তা তারা চিনতেই পারেনি।

'যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেলো তখন বললো, আব্বা, আমাদের গমের একটা অংশ দেয়া হয়নি। কাজেই আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দিন।' .... (আয়াত ৬৩-৬৮)

এরপর হযরত ইয়াকুব যখন তাঁর দ্বিতীয় মর্মবিদারী ঘটনার সম্মুখীন হন, তখনো তাঁকে দেখতে পাই একজন স্নেহশীল পিতা ও একজন আল্লাহ প্রিয় নবী হিসাবে। আল্লাহর শেখানো কৌশল প্রয়োগ করে হযরত ইউসুফ যখন তার ভাইকে রেখে দিলেন, তখন হযরত ইয়াকুবের এক ছেলে তাদের সাথে আর বাড়ী ফিরে যায়নি। এ ছেলে তাদের মধ্যে বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলো। সে ভয় পাচ্ছিলো, পিতার সাথে এক কঠোর অংগীকার করে আসার পর এখন তাঁর সাথে কিভাবে দেখা করবো? হাঁ, পিতা অনুমতি দিলে বা আল্লাহ কোনো ফয়সালা করলে সেটা আলাদা কথা।

'যখন তারা ছোট ভাই সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেলো, তখন তাদের বড়জন বললো, তোমরা কি জানোনা যে আব্বা আমাদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছেন ....?' (আয়াত ৮০-৮৭)

এই প্রবীণ ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ মর্মন্তুদ জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে দেখতে পাই এক অলৌকিক ঘটনা! তিনি ইউসুফের জামায় ইউসুফের ঘ্রাণ পান। এতে ছেলেরা তাঁকে তিরস্কার করলেও তিনি তাতে অবিচল থাকেন এবং তাঁর প্রতিপালকের প্রতি সুধারণায় কিছুমাত্র সন্দেহ সংশয় পোষণ করেন না। (আয়াত ৯৪-৯৮)

বস্তুত এ ছিলো এক অসাধারণ নবীর ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে আবেগ, বাস্তবানুগতা, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাকার যাবতীয় অত্যাবশকীয় বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিলো। কোনো বিকৃতি ও ঘাটতি এতে স্থান পায়নি।

সত্যনিষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ বাস্তবানুগতা শুধু মানুষের ব্যক্তিত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরঞ্চ তা ঘটনা, বর্ণনা, তার সত্যতা ও স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে তা প্রতিফলিত হয় ঘটনার স্থান, কাল ও পরিবেশের মধ্য দিয়েও। এর ফলে প্রতিটা কাজ, কথা ও চিন্তা উপযুক্ত সময়ে এবং প্রত্যাশিতরূপেই সংঘটিত হয়। তার গুরুত্ব, ভূমিকা ও জীবন প্রবাহের প্রকৃতি অনুসারে তা নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যে এ জিনিসগুলো যথাযথভাবে গণ্য হয়ে থাকে, সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

এমনকি এ সূরার কাহিনীতে যৌন আবেগের মুহূর্তগুলো ও তার বিভিন্ন পর্যায় সংক্রান্ত আলোচনাও যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পেয়েছে, কিন্তু তা পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতার সীমার মধ্যেই থেকেছে এবং 'মানুষে'র জন্যে যতোটা প্রয়োজন ততোটা শালীনতার মধ্যেই থেকেছে। মানবীয় বাস্তবতার ব্যাপক সত্যানুগ ও সম্পূরক রূপকে এতে কিছুমাত্র বিকৃত ও ম্লান করা হয়নি, কিন্তু অন্যান্য ঘটনা ও ভূমিকার সাথে যথাযথ সমন্বয় ঘটিয়ে ওই মুহূর্তগুলো তুলে ধরার অর্থ এ নয় যে, যৌনতাকে মানুষের সমগ্র বাস্তবতা, তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ও জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য জাহেলিয়াত আমাদের এটাই বুঝাতে চায় যে, যৌনতাকে মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য হিসাবে তুলে ধরাই প্রকৃত সার্থক ও বস্তুনিষ্ঠ শিল্প।

জাহেলিয়াত শৈল্পিক বস্তুনিষ্ঠতার নামে মানব সত্ত্বাকে বিকৃত করে থাকে। মানুষের সাময়িক যৌন আবেগকে সে এমনভাবে তুলে ধরে যেন ওটাই মানব জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। এভাবে সে একটা বিরাট ও সুগভীর আঁস্তাকুড় তৈরী করে এবং সেই সাথে তাকে শয়তানী ফুল দিয়ে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে।

জাহেলিয়াত এ কাজটা এ জন্যে করে না যে, সে এটাকেই বাস্তব ও সত্য মনে করে এবং এ জন্যেও করে না যে, সে এই বাস্তবতার চিত্র অংকনে নিষ্ঠ। সে এ কাজটা করে শুধু এ জন্যে যে, ইহুদীবাদী সংস্থাগুলো তার কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করে। মানুষকে তারা মনুষ্যত্বহীন নিছক একটা পশু বানিয়ে ফেলতে চায়। যাতে বিশ্ববাসীর সামনে একমাত্র ইহুদীরাই মানবীয় মূল্যবোধ বিবর্জিত জাতি হিসাবে চিহ্নিত না হয়। তারা চায় সমগ্র মানব জাতিই পাশবিকতার আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হোক এবং ওই আঁস্তাকুড়েই তার সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট ও সমস্ত শক্তি নিশেষিত হোক। মানব জাতিকে ধ্বংস করার সবচেয়ে নিশ্চিত অব্যর্থ পন্থা এটাই। এভাবে মানব জাতিকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করার পর তাকে অভিশপ্ত সম্ভাব্য ইহুদী সাম্রাজ্যের সামনে নতজানু করা যাবে বলে তারা আশা করে। এরপর শিল্পকে এই কদর্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহার করে। এর পাশাপাশি তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদসমূহ প্রচার করে ওই একই উদ্দেশ্যে। এসব বৈজ্ঞানিক

মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ডারউইন তত্ত্ব', 'ফ্রয়েড তত্ত্ব', 'মার্কসবাদ' ও 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'। এই সব ক'টা মতবাদই ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সমভাবে কার্যকর।

হযরত ইউসুফের কাহিনী নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এর ঐতিহাসিক অবস্থানকাল চিহ্নিত করে দিয়েছে। সেই ঐতিহাসিক সময়টা চিহ্নিত করার জন্যে কয়েকটা প্রতীকী বক্তব্যের উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি!

ওই সময়টাতে মিসর ফেরাউন নামে সুপরিচিত মিসরীয় রাজপরিবার দ্বারা শাসিত হচ্ছিলো না; বরং এক শ্রেণীর 'পশুপালক' দ্বারা শাসিত হতো এবং হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, এসহাক ও ইয়াকুব তাদেরই কাছাকাছি সময়ে জীবন যাপন করে গেছেন। আল্লাহর এই নবীদের কাছ থেকে এই শাসকরা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা শিক্ষা লাভ করেছিলো। এই শাসকরা যে ফেরাউন ছিলো না তার প্রমাণ হলো, কোরআনে এই শাসকদের ফেরাউনের পরিবর্তে 'মালিক' তথা রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে, অথচ হযরত মূসার আমলের রাজাকে ফেরাউন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে মিসরে হযরত ইউসুফের আগমনের সঠিক সময়কাল কোনটা তা বুঝা যায়। এটা ছিলো ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ রাজপরিবারের মধ্যবর্তী সময়। এ পরিবারগুলো ছিলো রাখাল পরিবার। মিসরীয়রা এদের ঘৃণাবশত 'হাকসুম' বলে আখ্যায়িত করতো। প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় হাকসুম অর্থ হলো 'শূকর' বা 'শূকরের রাখাল।' এ সময়টা প্রায় দেড় শতাব্দীকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

এ সময়টাই ছিলো হযরত ইউসুফের নবুওতের সময়। তিনি ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজ কারাগারে বন্দী থাকাকালেই শুরু করে দিয়েছিলেন। আর এ দ্বীনকে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সর্বাত্মকভাবে তাঁর পিতা-পিতামহদের তথা হযরত ইবরাহীম, এসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেন।

কোরআনে সূরা ইউসুফের ৩৬ থেকে ৪০ নং পর্যন্ত আয়াত ক'টায় তাঁর এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

এ হচ্ছে ইসলামের সুস্পষ্ট, পূর্ণাংগ, নিখুঁত ও সর্বাত্মক রূপ। আল্লাহর নবী রসূলদের সবাই এই ইসলাম নিয়েই এসেছেন। এর মৌলিক আকীদা বিশ্বাস হলো আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত আনুগত্য করা, তাঁর সাথে আর কাউকে মোটেই শরীক না করা। আল্লাহর গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁকে চিনতে হবে। তিনি হচ্ছেন এক, একক ও মহা প্রতাপশালী। এ আয়াত ক'টাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো শাসন ক্ষমতাই নেই। সকল শক্তি ও শাসন ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। মানুষের ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব করার অধিকার নেই। আল্লাহর অকাট্য নির্দেশ, মানুষ যেন তাঁর ছাড়া আর কারো এবাদাত না করে। মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রভুত্ব করা মানুষকে গোলাম বানানোর শামিল, যা এক আল্লাহর এবাদাতের সুস্পষ্ট লংঘন। এবাদাতের অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে কারো শাসন ক্ষমতার আনুগত্য করা ও কারো প্রভুত্ব মেনে নেয়া। এখানে আল্লাহর দ্বীনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এই যে, একমাত্র আল্লাহর হুকুম মানা ও একমাত্র তাঁর এবাদাত করা। বস্তুত হুকুম মানা ও এবাদাত করা সমার্থক। 'আল্লাহ ছাড়া আর কারো আদেশ দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা যেন তাঁর ছাড়া আর কারো এবাদাত না করো। এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক দ্বীন।' বস্তুত এটাই হলো ইসলামের সবচেয়ে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, পূর্ণাংগ ব্যাপক ও সর্বাত্মক রূপ।

এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন মিসরের ক্ষমতার মসনদে আসীন হলেন, তখন তিনি এরূপ ব্যাপক ও সর্বাত্মকভাবে ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। বস্তুত মিসরে তাঁর

হাতেই ইসলামের বিস্তার ঘটে। এ সময় তিনি শধু ক্ষমতার আসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন না; বরং মানুষের জীবন জীবিকা ও দন্ডমুন্ডের কর্তাও ছিলেন। তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার ফলে সঞ্চিত খাদ্যভান্ডার থেকে খাদ্য খরিদ করার জন্যে যেসব প্রতিবেশী দেশ থেকে প্রতিনিধি দল আসতো, সেসব দেশেও ক্রমান্বয়ে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমরা দেখেছি, অন্যান্য দেশের ন্যায় জর্ডানের কেনান থেকে হযরত ইউসুফের ভাইয়েরাও মিসর থেকে খাদ্য কিনতে এসেছিলো। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় সমগ্র এলাকা জুড়ে কী সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো!

কাহিনীতে এ মর্মেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, মেষপালক গোষ্ঠীভুক্ত শাসকরা ইসলামী আকীদা বিশ্বাস দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিলো এবং হযরত ইউসুফের দাওয়াতের পর এই আকীদা বিশ্বাস ব্যাপকতা লাভের কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছিলো।

অন্তত দু'টো জায়গায় আমরা শাসকগোষ্ঠীর ওপর ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের প্রভাবের লক্ষণ দেখতে পাই।

প্রথমটা হলো, হযরত ইউসুফ যখন মহিলাদের সামনে বেরিয়ে এলেন তখন তাদের মুখে আল্লাহ ও ফেরেশতার উল্লেখসহ স্বতস্ফূর্ত বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ঘটে। যেমন,

'তারা বললো, হায় আল্লাহ, এ তো মানুষ নয়! এ তো সম্মানিত এক ফেরেশতা!' (আয়াত-৩১)

অনুরূপভাবে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রী স্বীয় স্ত্রীকে সম্বোধন করে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাতেও এই প্রভাবের লক্ষণ পরিস্ফুট। যেমন,

'ইউসুফ, তুমি এই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাও। আর হে বেগম, তুমি তোমার পাপের জন্যে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তুমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছো।' (আয়াত- ২৯)

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুস্পষ্ট ইংগিতটা প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর কথা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। তার এ কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, সে ইউসুফের আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামও গ্রহণ করেছে। কোরআনে তার যে বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হলো,

'আযীযের (প্রধানমন্ত্রীর) স্ত্রী বললো, এখন সত্য বেরিয়ে পড়েছে। আমিই ওঁকে প্ররোচিত করেছিলাম এবং ওঁ অবশ্যই সত্যবাদী।' .... (আয়াত ৫২-৫৩)

যখন জানা গেলো, তাওহীদবাদী আকীদা বিশ্বাস মিসরের ক্ষমতায় হযরত ইউসুফের আরোহণের আগেই এতটা ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলো, তখন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই থাকে না যে, তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের পর ইসলাম আরো ব্যাপক ও স্থিতিশীল হয়েছিলো। এরপর রাখাল রাজাদের আমলেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছিলো। পরে অষ্টাদশ রাজপরিবারের শাসনামলে যখন ফেরাউনরা পুনরায় ক্ষমতা দখল করলো, তখন তারা তাওহীদী ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিরোধ শুরু করলো। কেননা ফেরাউনদের ক্ষমতার ভিত্তিই ছিলো পৌত্তলিকতা। ওদিকে হযরত ইয়াকুবের বংশধররা (যাদের অপর নাম বনী ইসরাঈল) ততোদিনে মিসরে এক বিরাট জনশক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং তারাই ছিলো একমাত্র ইসলামী জনগোষ্ঠী।

এ থেকে আমরা জানতে পারি, ফেরাউনী শাসনামলে বনী ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত ইয়াকুবের বংশধরদের ওপর নির্যাতনের রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্য কারণ কী ছিলো?

রাজনৈতিক কারণটা হলো এই যে, হযরত ইয়াকুবের বংশধররা রাখাল রাজাদের আমলে কেনান থেকে মিসরে এসে বসতি স্থাপন করে এবং ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাসীন হয়। এরপর যখন মিসরীয়রা রাখাল রাজাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে, তখন তাদের সহযোগী বনী ইসরাঈলকেও বিতাড়িত করে। এর আসল কারণ হলো আকীদা বিশ্বাসের বৈপরীত্য। কেননা একমাত্র

আকীদাগত বৈপরীত্যই অতো বড় পৈশাচিক নির্যাতনের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাখ্যা হতে পারে। কারণ সঠিক তাওহীদী আকীদার বিস্তার ফেরাউনদের রাজত্বের ভিত্তিই ধসিয়ে দিতে সক্ষম। তাওহীদী আকীদাই স্বৈরাচারী খোদাদ্রোহী শাসকদের শাসন ও তাদের প্রভুত্বের আসল শত্রু।

সূরা মোমেনের এক জায়গায় এই মর্মে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ফেরাউন এক পর্যায়ে যখন মূসা (আ.)-কে হত্যা করে তাওহীদী আকীদার মূলোৎপাটন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো, তখন ফেরাউনের বংশধরের মধ্যকার এক ব্যক্তি, যিনি গোপনে ঈমান এনেছিলেন, তিনি হযরত মূসার পক্ষ নিয়ে ফেরাউনের সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ওই সূরায় বলা হয়েছে,

'ফেরাউন বললো, আমি মূসাকে হত্যা করবোই। সে তার খোদাকে ডাকুক। আমার আশংকা, সে তোমাদের ধর্মই পাল্টে দেবে কিংবা দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে দেবে। মূসা বললো, আমি আখেরাতে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। ফেরাউনের বংশধরের মধ্যকার এক ব্যক্তি নিজের ঈমান লুকিয়ে রেখেছিলো। সে বললো, এক ব্যক্তি 'আল্লাহ আমার প্রতিপালক' এই কথাটা বলেছে– 'এ দোষেই কি তোমরা তাকে হত্যা করবে?' .... (সূরা মোমেন, আয়াত ২৬-৩৫)

বস্তুত আসল দ্বন্দ্ব সংঘাতই ছিলো তাওহীদ ও পৌত্তলিকতার মধ্যে। কেননা তাওহীদ এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে না এবং আর কারো সার্বভৌমত্ব মানে না। পক্ষান্তরে পৌত্তলিকতা ছাড়া ফেরাউনী স্বৈরাচার টিকেই থাকতে পারে না।

হযরত ইউসুফ মিসরে যে তাওহীদের মর্মবাণী প্রচার করেছিলেন, সম্ভবত তারই কিছু অসম্পূর্ণ ও বিকৃত রূপের সাথে হযরত মূসার আমলের মিসরীয় সম্রাট ফেরাউন আখনাতুনের পরিচয় ঘটেছিলো। বিশেষত এ কথা যদি সত্য হয় যে, আখনাতুনের মাতা ফেরাউনের বংশোদ্ভূত ছিলো না; বরং এশীয় ছিলো।

যা হোক, হযরত মূসা (আ.)-এর আমল সংক্রান্ত এ আনুষংগিক আলোচনাটুকুর পর আমরা পুনরায় হযরত ইউসুফের কাহিনীতে ফিরে যাচ্ছি। ইতিহাসের যে স্তরটাতে এ ঘটনা ঘটেছিলো এবং ঘটনার বিভিন্ন নায়ক নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছিলো, সেই স্তরটার প্রকৃতি নির্দেশক আলোচনায় আবার ফিরে যাচ্ছি। এই আলোচনায় ফিরে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ ঘটনা শুধু মিসরে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং মিসরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনা সমগ্র যুগের চরিত্রটাই তুলে ধরেছে। স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা এই যুগটা সুস্পষ্টভাবেই চিহ্নিত। অথচ এগুলো কোনো একটা নির্দিষ্ট দেশে বা জাতিতে সীমিত থাকে না। আমরা দেখতে পাই, হযরত ইউসুফের স্বপ্ন ও তার তাবীরে এ বৈশিষ্ট্যটা সুস্পষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যটা সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত হযরত ইউসুফের দুই কারাসংগীর স্বপ্নেও এবং সর্বশেষে স্বয়ং রাজার স্বপ্নেও। স্বপ্নের দর্শক ও শ্রোতা উভয়েই এ বৈশিষ্ট্যটা গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করে, যা গোটা যুগের সামগ্রিক চরিত্র নির্দেশক।

সংক্ষেপে এ কথাটাও বলা দরকার যে, এ কাহিনীতে রয়েছে পর্যাপ্ত শৈল্পিক উপাদান, মানবীয় উপাদান এবং আবেগ ও সক্রিয় তৎপরতা। সূরার বর্ণনাভংগির মধ্য দিয়ে এ উপাদানগুলো প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তদুপরি কোরআনের স্বভাবগত প্রভাবশালী ও তাৎপর্যবহ প্রকাশভংগির বৈশিষ্ট্য তো রয়েছেই, যা প্রত্যেক স্থানেই আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে সুরেলা মূর্ছনার সৃষ্টি করে।

এ কাহিনীতে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন গুণগত মানে পিতৃস্নেহের বহির্প্রকাশ ঘটেছে। হযরত ইয়াকুবের ইউসুফ ও তাঁর সহোদরের প্রতি স্নেহের মধ্য দিয়ে, তাঁর অন্য ছেলেদের প্রতি স্নেহের

মধ্য দিয়ে এবং সমগ্র কাহিনী জুড়ে ইউসুফের সাথে জড়িত ঘটনাবলীতে তাঁর প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পিতৃস্নেহের আকৃতিগত তারতম্য ও পার্থক্য দেখে বৈমাত্রেয় ভাইদের মধ্যে কি বিরোষ বিদ্বেষ ও আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং স্বয়ং ভাইদের মনে আত্মমর্যাদাবোধ ও বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়ায়ও কতো পার্থক্য ঘটে, তা এখানে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পার্থক্যটা এরূপ যে, কেউ কেউ ইউসুফকে গোপনে হত্যা করার প্ররোচনা দেয়, আবার অন্যরা ইউসুফকে শুধু কুয়ায় ফেলে দেয়া যথেষ্ট মনে করে। কোনো বিদেশী কাফেলা তাকে কুড়িয়ে নেয় তো নিক। এভাবে অন্তত খুনের অপরাধ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এ কাহিনীতে ধোঁকাবাজির উপাদানটাও লক্ষণীয়। ইউসুফের সাথে তাঁর ভাইদের এবং ইউসুফের সাথে নিজের স্বামী ও মহিলাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর ধোঁকাবাজি এর আওতাভুক্ত। যৌন আবেগের তাড়না, এই তাড়নার শিকার হয়ে অন্যের রূপে মুগ্ধ হওয়া ও মিলনাকাংখা পোষণ করা এবং অন্য জনের এই তাড়না থেকে আত্মরক্ষা এ কাহিনীর আরেকটা উপাদান। তা ছাড়া অনুতাপ, ক্ষমা ও বিচ্ছিন্ন স্বজনদের পুনর্মিলনজনিত আনন্দও এ কাহিনীর অন্যতম উপাদান। জাহেলী সমাজের শাসক মহলের অবস্থাভেদে এই উপাদানগুলো দৃশ্যমান। তৎকালীন মিসরের গৃহে, কারাগারে, বাজারে, রাজকোষে, ইসরাঈলী সমাজে এবং সে যুগের স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণীতে এ উপাদানগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

কাহিনীটার সূচনা হয়েছে পিতার কাছে ইউসুফের নিজের দেখা স্বপ্ন বর্ণনার মধ্য দিয়ে। পিতা হযরত ইয়াকুব সাবধান করে দিলেন যেন তিনি তাঁর ভাইদের এ স্বপ্নের কথা না জানান। তিনি ইউসুফকে জানালো, তাঁর বিপুল মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটবে। এ স্বপ্নের কথা তাঁর ভাইরা জানলে তাদের মধ্যে হিংসার সৃষ্টি হতে পারে এবং তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে বলে তিনি সতর্ক করে দেন। এরপর কাহিনীর ধারা এমনভাবে চলতে থাকে যে, তা স্বপ্নের তাবীর এবং হযরত ইয়াকুবের প্রত্যাশার বাস্তবায়ন বলেই মনে হতে থাকে। অবশেষে যখন স্বপ্নের তাবীর শেষ হলো, অমনি হযরত ইউসুফের কিসসাকৃত সমাপ্তি ঘটলো, 'প্রাচীন পুস্তকে'র লেখকদের ন্যায় কোরআন আর এ কাহিনী বর্ণনা অব্যাহত রাখেনি। কেননা তার আসল ধর্মীয় উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে সফল হয়েছে।

কাহিনীর স্বভাবজাত শৈল্পিক উপাদান হযরত ইউসুফের কাহিনীতে বিদ্যমান। স্বপ্ন দিয়ে কাহিনীর শুরু হয়েছে। তারপর এর ব্যাখ্যা অজানা থেকে যায়। একটু একটু করে ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় এবং উপসংহারে কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় না নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কাহিনী শেষ করে দেয়া হয়।

কাহিনীটা কয়েকটা পর্বে বিভক্ত। প্রত্যেক পর্বে কিছু দৃশ্য রয়েছে। তবে এক দৃশ্য ও অপর দৃশ্যের মাঝে কিছু শূন্যতা রয়েছে, যা পাঠক আপন চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে পূরণ করতে পারে।

হযরত ইউসুফের কাহিনীর শৈল্পিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর্যায়ে এ পর্যন্ত যেটুকু নিবেদন করেছি, আমরা সেটুকুতেই ক্ষ্যান্ত থাকতে চাই। এর বর্ণনায় ইসলামী ও কোরআনী ভাবধারার যেটুকু স্ফুরণ ঘটেছে, আমরা আপাতত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই। কেননা প্রকৃত শালীন ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে যেটুকু উপাদান প্রয়োজন তা এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।

যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, তা হলো ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে এ কাহিনীর শিক্ষা ও তাৎপর্য। এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো তুলে ধরতে চাই।

এই ভূমিকার শুরুতে আমরা ইংগিত দিয়েছি যে, এ সূরা নাযিল হবার সময়ে মক্কায় ইসলামী আন্দোলন যে কঠিন নির্যাতনের শিকার ছিলো, তার সাথে ইউসুফের কাহিনীর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

রসূল (স.)-এর একজন সম্মানিত ভাই হযরত ইউসুফ যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন, তা তাঁর মতো একজন সম্মানিত নবীর কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। পরিণামে হযরত ইউসুফের মতোই রসূল (স.)-এর ক্ষমতায় অধিষ্ঠান এবং পরাক্রমলাভও খুবই শিক্ষাপ্রদ।

কাহিনীর বিশ্লেষণ প্রসংগে ইসলামের সেই স্পষ্ট, পূর্ণাংগ, সর্বাত্মক ও সূক্ষ্ম রূপটি আমরা তুলে ধরেছি, যা হযরত ইউসুফ তুলে ধরেছিলেন। এ বিষয়টি নিয়ে একটু বিশ্লেষণে যাওয়া আবশ্যক।

ইসলামই সকল নবীর একমাত্র আকীদা ও একমাত্র ধর্ম- একথা সূরার সূচনা থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সকল রসূলের জন্যে ছিলো একই। সকল নবীরই বক্তব্য ছিলো পূর্ণাংগ তাওহীদের সপক্ষে। সবাই একবাক্যে বলেছেন, আল্লাহই মানব জাতির একমাত্র প্রভু, মালিক, মনিব ও আইনদাতা এবং মানুষ একমাত্র আল্লাহরই গোলাম বা দাস। আর সকলের একই রকম বিশ্বাস ছিলো আখেরাতের প্রতি। যারা 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে'র নামে বলে যে, মানব জাতি তাওহীদের বিষয়ে সর্বশেষে পরিচিত হয়েছে এবং এর আগে একাধিক খোদায় বিশ্বাস করতো, তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ন্যায় তাওহীদের জ্ঞানও পর্যায়ক্রমে অর্জন করেছে- এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। এ সব ধ্যান ধারণার মোদ্দাকথা দাঁড়ায়, জ্ঞান বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্মও মানুষের তৈরী।

এ কাহিনী থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, তাওহীদবাদী ধর্মের প্রকৃতিও সকল নবীর আমলে একই রকম ছিলো। অর্থাৎ কোনো নবী এ কথা বলেননি যে, খোদা তো এক, কিন্তু মানুষের জন্যে আইনদাতা ও সার্বভৌম প্রভু এক নয়; বরঞ্চ মানুষের খোদাও এক, তার আইনদাতাও এক অভিন্ন। মানুষের জীবনের সকল ব্যাপারে হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, আর কারো নয়। এ কথা স্বয়ং আল্লাহর আদেশক্রমেই স্থির হয়েছে। তিনিই বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদাত করা তথা হুকুম পালন করা যাবে না। কোরআন এ ক্ষেত্রে এবাদাতের সঠিক মর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছে। এবাদাত হলো এক কথা, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুমদান আর মানুষের পক্ষ থেকে একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন।' এটাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং মানুষ যতোক্ষণ একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন না করবে ততোক্ষণ তাকে আল্লাহর দাস বা গোলাম বলা যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জীবনের কোনো কোনো ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম মানে এবং কোনো কোনো ব্যাপারে মানে না, তাকেও আল্লাহর এবাদাতকারী বলা যাবে না। আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মানলে তাকে একমাত্র 'রব' বা প্রভুও মানতে হবে। আর এর অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহই হুকুমদাতা ও আইনদাতা এবং একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত তথা হুকুম ও আইন পালন করতে হবে। বস্তুত এই শব্দ দু'টো অর্থাৎ এবাদাত ও রবুবিয়াত সমার্থক। যে এবাদাত করলে মানুষ মুসলমান এবং না করলে অমুসলমান হয়ে যায়, তা হলো একমাত্র আল্লাহর হুকুমের অনুগত হওয়া এবং আর কারো অনুগত না হওয়া। যে কোনো যুগে যে কোনো স্থানে মানুষের মুসলমান হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটায় কোরআনের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। ইসলাম সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম পক্ষে এ জ্ঞানটুকু থাকা উচিত, যে ব্যক্তি নিজের জীবনের যে কোন ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম পালন করে সে মুসলমান নয় এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করে না, সে মুসলমান এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে অন্য কোনো বক্তব্য দেয়া ভন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয় এবং এ কাজ একমাত্র তারাই করতে পারে যারা বিরাজমান পরিস্থিতির সামনে নতিস্বীকার করেছে, চাই তা যে কোনো

পরিবেশেই হোক এবং যে কোনো যুগেই হোক। আল্লাহর দ্বীন সুস্পষ্ট। এর বিরুদ্ধে যে বিতর্ক তোলে সে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধেই বিতর্ক তোলে।

এ কাহিনীর আর একটা শিক্ষা এই যে, ঈমান একটা নির্ভেজাল বিশ্বাসের নাম, যা আল্লাহর দুই নিষ্ঠাবান বান্দা ইয়াকুব ও ইউসুফের মনে বদ্ধমূল হয়েছিলো।

হযরত ইউসুফে কেমন একনিষ্ঠ মোমেন ছিলেন, তা তাঁর এ দোয়া থেকে জানা যায়–

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজত্ব দান করেছো এবং আমাকে বিভিন্ন কথার ব্যাখ্যা শিখিয়েছো। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং আমাকে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত করো।' (আয়াত ১০১)

তবে শুধু এ সর্বশেষ অবস্থানই যে তাঁর একমাত্র অবস্থান তা নয়। আসলে এ সূরায় তাঁকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই রকম অবস্থানে দেখা যায়। যেমন এক যুবতী নারীর নগ্ন বিপথগামিতার আহ্বানে তিনি জবাব দেন, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই, তিনি আমার মনিব, আমাকে উত্তম স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। যালেমরা কখনো সুপথ প্রাপ্ত হয় না।' অপর এক পর্যায়ে তিনি নিজের দুর্বলতা ও বিপথগামিতার আশংকা অনুভব করে বলেন,

'হে আমার প্রভু, ওরা আমাকে যে দিকে ডাকছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার জন্যে উত্তম। তুমি যদি ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে না দাও, তবে আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়বো এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।' (আয়াত-৩৩)

অপর এক পর্যায়ে তিনি ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দেয়ার সময় বলেন,

'আমি ইউসুফ এবং এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের ওপর করুণা বর্ষণ করেছেন। যে ব্যক্তি খোদাভীতি ও ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ সেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।'

এ সবই এমন ভূমিকা ও অবস্থান, যার প্রয়োজনীয়তা শুধু মক্কার ইসলামী আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়; বরং সর্বকালের ইসলামী আন্দোলনেরই এর আবশ্যকতা রয়েছে।

পক্ষান্তরে ইয়াকুব (আ.)-এর অন্তরেও আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় সদাজাগ্রত। যখনই তাঁর বিপদ মসিবত তীব্র আকার ধারণ করে তখনই তার মনে তাঁর প্রভুর সেই পরিচয় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং সেই অনুপাতেই তাঁর মন বিনয়ী হয়।

শুরুতেই যখন ইউসুফ তাঁর কাছে নিজের স্বপ্নের বিবরণ দেন তখন তিনি বলেন,

'এভাবেই তোমার প্রভু তোমাকে গ্রহণ করবেন। তোমাকে কথার ব্যাখ্যা শেখাবেন, তোমার ওপর ও ইয়াকুবের বংশধরের ওপর নিজের অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে তোমার দুই পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও এসহাকের ওপর পূর্ণ করেছেন।' (আয়াত ৬)

ইউসুফের ব্যাপারে প্রথম আঘাত খেয়েই তিনি আল্লাহর সাহায্য চেয়ে বলেন,

'বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্যে কোনো চক্রান্ত তৈরী করেছে। অতএব ধৈর্যই সুন্দর। তোমরা যা কিছু বলছো, সে ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্যই কাম্য।' (আয়াত ১৮)

নিজের ছেলেদের যখন তিনি সতর্কতার শিক্ষা দেন এবং একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন, তখনো তিনি ভুলে যান না যে, এই সতর্কতা আল্লাহর যে কোনো পদক্ষেপ থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না; বরং আল্লাহর সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়ে থাকে। এটা হলো কেবল মনের একটা বাসনা, যা আল্লাহ ও তাঁর ফয়সালা থেকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়।'

'ইয়াকুব বললো, হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।' (আয়াত ৬৮)

চরম বার্ধক্য, দুর্বলতা, দুশ্চিন্তার মধ্যে যখন ছেলের ব্যাপারে দ্বিতীয় আঘাত প্রাপ্ত হন তখনো এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর অন্তরে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশার সৃষ্টি হয়নি! তিনি বলেন,

'বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্যে একটা চক্রান্ত প্রস্তুত করেছে। অতএব ধৈর্যই সুন্দর। আশা করি আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন ......' (আয়াত-৮৩)

এরপর আল্লাহর পরিচিতি তাঁর অন্তরে আরো স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ছেলেরা তাঁকে ইউসুফকে নিয়ে অতিমাত্রায় দুর্ভাবনা, কান্নাকাটি ও কাঁদতে কাঁদতে চোখ সাদা করে ফেলতে দেখে তিরস্কার করা সত্তেও তিনি তাদের জানান, তিনি নিজের অন্তরে আল্লাহ সম্পর্কে যে উপলব্ধি অর্জন করেছেন, তা তারা করেনি এবং আল্লাহ সম্পর্কে তিনি যা জানেন তা তারা জানে না। এ কারণে তিনি শুধু আল্লাহর কাছেই নিজের মনের দুঃখ জানান এবং তাঁর রহমতের আশা করেন।

'ইয়াকুব তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলো এবং বললো, হায় আফসোস, ইউসুফের ওপর! ......' (আয়াত ৮৪-৮৭)

এরপর যখন তিনি ইউসুফের ঘ্রাণ পাওয়ার কথা জানালেন, তখনও ছেলেরা তাঁর সাথে তর্ক করতে লাগলো। তিনি আবারো তাদের বললেন, তিনি আল্লাহ সম্পর্কে যা জানেন তা তারা জানে না।

'যখন কাফেলা রওনা হয়ে গেলো তখন তাদের পিতা বললো, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি ...' (আয়াত ৯৪-৯৬)

বস্তুত এ হচ্ছে আল্লাহর পরিচয়ের স্বচ্ছতম স্তর, যা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় বান্দারা ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। এতে মক্কার মুসলিম সংগঠনের দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতনের সময়টার জন্যে খুবই মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। রয়েছে সর্বকালের ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্যে চিরস্থায়ী শিক্ষাও।

সর্বশেষে সুদীর্ঘ কাহিনীর যেখানে সমাপ্তি ঘটেছে, সেখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়েছে।

প্রথম মন্তব্যটাতে সরাসরি জবাব দেয়া হয়েছে রসূল (স.)-এর নিকট নাযিল হওয়া ওহীর প্রতি কোরায়শদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের। এই জবাব দেয়া হয়েছে ওই কাহিনীরই বিভিন্ন দিকের প্রতি ইংগিত দিয়ে, যা সংঘটিত হওয়ার সময় রসূল (স.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

'এ হচ্ছে সেই অদৃশ্য ঘটনাবলীরই অন্যতম, যা আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমেই নাযিল করছি। ইউসুফের ভাইরা যখন ষড়যন্ত্র চক্রান্ত আঁটছিলো, তখন তুমি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না।' (আয়াত-১০২)

সূরার ভূমিকায় ৩ নং আয়াতে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তার সাথে এ মন্তব্যের গভীর মিল রয়েছে। ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'আমি এই কোরআন তোমার কাছে ওহী করার মাধ্যমে তোমাকে সর্বোত্তম কাহিনী শুনাচ্ছি। ইতিপূর্বে তুমি এ কাহিনী জানতে না।'

বস্তুত সূরার ভূমিকায় ও উপসংহারে কৃত মন্তব্যগুলো এ সূরার বক্তব্যকে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করেছে, এর তত্ত্ব ও তথ্যকে প্রাণবন্ত করেছে এবং অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের দাঁতভাংগা জবাব দিতে সাহায্য করেছে।

এতে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপেক্ষা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের গোয়ার্তুমি, একগুঁয়েমি ও বিশ্ব প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনাবলীর প্রতি

তাদের অবজ্ঞা যে সীমাহীন, তাও ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ ঈমান আনার জন্যে প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীই যে কোনো সুস্থ বিবেকের পক্ষে যথেষ্ট। এটা যে কোন দাওয়াত ও প্রমাণ গ্রহণ করার জন্যেও যথেষ্ট। এ ছাড়া তাদেরকে আল্লাহর আকস্মিক আযাবের হুমকিও এখানে বিদ্যমান।

'তুমি প্রত্যাশা করলেও অধিকাংশ লোক মোমেন হবে না। ......' (আয়াত ১০৩-১০৭)

মানুষ যখন আল্লাহর সঠিক দ্বীনের অনুসরণ করে না তখন তার স্বভাব প্রকৃতি সংক্রান্ত নিগূঢ় তত্ত্বের ওপর আনুপাতিক হারেই এগুলো প্রভাবশালী হয়। বিশেষত আল্লাহর এই উক্তিতে মানুষের এ স্বভাবের নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে,

'তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি শেরেক মিশ্রিত ঈমান ছাড়া ঈমান আনে না।' (আয়াত -১০৬)

বস্তুত এ হচ্ছে শেরেক মিশ্রিত ঈমানের অধিকারী অনেকেরই সঠিক চিত্র। তারা তাওহীদের পক্ষে চূড়ান্তভাবে মত স্থির করে না। এরপর আসছে রসূল (স.)-কে অত্যন্ত গভীর ও প্রভাবশালী ভংগিতে দেয়া সত্য এবং ন্যায়ের পথ অবলম্বনের আপসহীন সুস্পষ্ট নির্দেশ।

'বলো, এ হচ্ছে আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। আমি ও আমার অনুসারীরা এ ব্যাপারে নিখুঁত প্রজ্ঞার ওপর আছি। আল্লাহ পবিত্র, আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (আয়াত-১০৮)

এরপর সূরার সর্ব শেষাংশে সমগ্র কোরআনের কেসসা কাহিনীর অভিন্ন শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। এ শিক্ষা এ সূরা ও অন্যান্য সূরায় সমভাবে বিদ্যমান। প্রাথমিকভাবে এ শিক্ষা রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোমেনকে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা, সুসংবাদ ধৈর্য ধারণের উপদেশ ও সতর্কবাণী। ওহী ও রেসালাতের সত্যতাও এতে তুলে ধরা হয়েছে। আর সত্যকে করা হয়েছে সব রকমের কু-সংস্কার ও অলীক কল্পনা থেকে মুক্ত। আল্লাহ বলেন,

'আমি তোমার পূর্বে তো এমন সব ব্যক্তিকেই রসূল করে পাঠিয়েছি যারা জনপদবাসীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো।.........' (আয়াত ১০৯-১১১)

বস্তুত এ হচ্ছে এ সূরার সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।

এবার আরেকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফের কাহিনীটাকে সুন্দর, সত্য ও শৈল্পিক বর্ণনার একটা পূর্ণাংগ নমুনা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে বেশ কিছু সূক্ষ্ম ইংগিতপূর্ণ সমন্বিত কোরআনী বর্ণনাভংগি অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জিনিসগুলোর কিছু বিশ্লেষণ পেশ করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

কোরআনের অন্যান্য সূরার মতো এ সূরাতেও এমন কয়েকটা বক্তব্য বার বার তুলে ধরা হয়েছে যা সূরার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এলেম বা জ্ঞান এবং অজ্ঞতা বা জ্ঞানের স্বল্পতার কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে বেশ কতকগুলো আয়াতে। যেমন,

৬, ২১, ২২, ৪৩, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫২, ৫৫, ৬৮, ৭৩, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৬, ৮৯, ৯৬ ও ১০১ নং আয়াতগুলো লক্ষণীয়।

এ আয়াতগুলো মহাগ্রন্থ কোরআনের কয়েকটা রহস্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়ত এ সূরায় আল্লাহর কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সার্বভৌমত্ব। এটা কখনো বা হযরত ইউসুফের মুখ দিয়ে 'আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাদের ইচ্ছাকৃত আনুগত্য' অর্থে, আবার কখনো বা হযরত ইয়াকুবের মুখ দিয়ে 'অনিচ্ছা সত্তেও আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য' অর্থে উচ্চারিত হয়েছে। এভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উভয় অর্থকে পূর্ণতা দান করা হয়। এটা নেহাত কাকতালীয়ভাবে নয় বরং সুপরিকল্পিতভাবেই উচ্চারিত হয়েছে।

মিসরের শাসকদের প্রভুত্ব যে অযৌক্তিক ও আল্লাহর একত্বের পরিপন্থী, সে কথা বুঝিয়ে বলার উদ্দেশ্যেই ইউসুফ (আ.) বলেন,

'হে আমার কারাসংগীদ্বয়। নানা প্রভু ভালো, না মহাপ্রতাপান্বিত এক আল্লাহই ভালো? .... সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর, তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। এটাই হলো, অটল ও অকাট্য দ্বীন।' (আয়াত ২৯ ও ৩০)

পক্ষান্তরে আল্লাহর ফয়সালা অপ্রতিরোধ্য, এই মর্মে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হযরত ইয়াকুব বলেন,

'হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তবে এ আদেশ দ্বারা আমি তোমাদের আল্লাহর কোনো ফয়সালা থেকে রক্ষা করছি না। সর্বময় শাসনক্ষমতা কেবল আল্লাহর। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করছি এবং তাঁর ওপরই সকলের নির্ভর করা উচিত।' (আয়াত-৬৭)

বস্তুত সার্বভৌমত্ব তথা সর্বময় শাসন ক্ষমতার অর্থের এ পূর্ণতা থেকে বুঝা যায় যে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য না করলে 'দ্বীন' পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। উভয় প্রকারের আনুগত্যই ইসলামী আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংগ। শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক ও অনিচ্ছাকৃত ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য করাই ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং শরীয়তের ইচ্ছাকৃত অংশেও আল্লাহর আনুগত্য করা ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত।

এ সূরার চমকপ্রদ বর্ণনাভংগির আরো একটা আকর্ষণীয় দিক এই যে, হযরত ইউসুফ সূক্ষ্মদর্শিতাকে আল্লাহর একটা গুণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং তা এমন এক জায়গায় করেছেন যেখানে সূক্ষ্মদর্শিতাই যথার্থ মানানসই। যেমন ১০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, '....... নিশ্চয় আমার প্রভু যে বিষয়ে ইচ্ছা করেন সূক্ষ্মদর্শী। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।'

সূরার আরেকটা চমকপ্রদ দিক ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এটি হলো সূরার ভূমিকা ও উপসংহারের বক্তব্যের অপূর্ব মিল এবং উপসংহারে দীর্ঘ শিক্ষামূলক বক্তব্য প্রদান। আর এসব মন্তব্যেরই মূল বক্তব্য প্রায় একই। সূরার শুরু ও শেষে একই বিষয়ে আলোচনা।

সূরার ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনা এখানেই শেষ হলো।

সূরা ইউসুফ

আয়াত ১১১ রুকু ১২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿١﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

تَعْقِلُوْنَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا

الْقُرْاٰنَ ق صلے وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٣﴾ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ

سٰجِدِيْنَ ﴿٤﴾ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ

كَيْدًا ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٥﴾ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আলিফ-লা'ম-রা- । এগুলো (হচ্ছে একটি) সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। ২. নিসন্দেহে আমি একে আরবী কোরআন (হিসেবে) নাযিল করেছি, যেন তোমরা (তা) অনুধাবন করতে পারো। ৩. (হে নবী,) আমি তোমাকে এ কোরআনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি, যা আমি তোমার কাছে ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি, অথচ তার আগ পর্যন্ত তুমি (এ কাহিনী সম্পর্কে) ছিলে সম্পূর্ণ বেখবর লোকদেরই একজন। ৪. (এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা,) যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি এগারোটি তারা, চাঁদ ও সুরুজ, আমি (এদের) আমার প্রতি সাজদাবনত অবস্থায় দেখেছি। ৫. (এ কথা শুনে তার পিতা বললো,) হে আমার স্নেহের পুত্র, তুমি তোমার (এ) স্বপ্নের কথা (কিন্তু) তোমার ভাইদের কাছে বলে দিয়ো না, তারা তোমার বিরুদ্ধে অতপর ষড়যন্ত্র আঁটতে শুরু করবে; (কেননা) শয়তান অবশ্যই মানুষের খোলাখুলি দুশমন, ৬. এমনি করেই তোমার মালিক তোমাকে (নবুওতের জন্যে) মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (-সহ অন্যান্য জ্ঞান) শিক্ষা দেবেন এবং তাঁর নেয়ামত তোমার ওপর ও ইয়াকুবের সন্তানদের ওপর তেমনিভাবেই পূর্ণ করে দেবেন, যেমনিভাবে এর

يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ ۞ إِذْ قَالُوا۟
لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى
ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ
وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ۞ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ
وَأَلْقُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ۞
قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۫نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ
مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِىٓ أَن

আগেও তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর তা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন; নিশ্চয়ই তোমার মালিক সর্বজ্ঞ ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

রুকু ২

৭. অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাইদের (এ কাহিনীর) মাঝে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাদের জন্যে প্রচুর নির্দশন রয়েছে। ৮. (এ কাহিনীটি শুরু হয়েছিলো ইউসুফের ভাইদের দিয়ে,) যখন তারা (একজন আরেকজনকে) বললো, আমাদের পিতার কাছে নিসন্দেহে ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের চাইতে বেশী প্রিয়, যদিও আমরাই হচ্ছি ভারী দল; আসলেই আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন, ৯. (তাই শয়তান তাদের পরামর্শ দিলো,) ইউসুফকে মেরে ফেলো অথবা তাকে কোনো এক (অজানা) জায়গায় (নির্বাসনে) দিয়ে এসো, (এরপর দেখবে) তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে, অতপর তোমরা (আবার) সবাই ভালো মানুষ হয়ে যেয়ো। ১০. (এ সময়) তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, না, ইউসুফকে তোমরা হত্যা করো না, তোমরা যদি সত্যি সত্যিই কিছু একটা করতে চাও তাহলে তাকে হয় তো কোনো গভীর কূপে ফেলে দিয়ে এসো, (আসা যাওয়ার পথে) কোনো যাত্রীদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। ১১. (সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবাই পিতার কাছে এলো এবং) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, এ কি হলো তোমার, তুমি কি ইউসুফের ব্যাপারে (আমাদের ওপর) ভরসা করতে পারছো না, অথচ আমরা নিসন্দেহে সবাই তার শুভাকাংখী! ১২. আগামীকাল তাকে তুমি আমাদের সাথে (জংগলে) যেতে দাও, সে (আমাদের সাথে) ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে, আমরা নিশ্চয়ই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো। ১৩. সে বললো, এটা অবশ্যই আমাকে কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে,

تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ﴿١٣﴾ قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْۤا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَجَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾ قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾ وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى

(তদুপরি) আমি ভয় করছি (এমন তো হবে না যে), বাঘ তাকে এসে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়বে! ১৪. তারা বললো, আমরা একটি ভারী দল (-বদ্ধ শক্তি) হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমরা সত্যিই (অথর্ব ও) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো! ১৫. অতপর (অনেক বলে কয়ে) যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং তারা তাকে এক অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সবাই সিদ্ধান্ত নিলো (এবং তারা তাকে কূপে নিক্ষেপ করেও ফেললো), তখন আমি তাকে ওহী পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম, (একদিন এমন আসবে যেদিন) তুমি অবশ্যই এসব কথা এদের (সবাইকে) বলে দেবে, এরা তো জানেই না (এ ঘটনা কার জন্যে কি পরিণাম বয়ে আনবে)। ১৬. (ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে) রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এলো; ১৭. (অনুযোগের স্বরে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমরা (গিয়েছিলাম জংগলে, সেখানে আমরা দৌড়ের) প্রতিযোগিতা দিচ্ছিলাম, আমরা ইউসুফকে আমাদের মাল সামানার পাশে ছেড়ে গিয়েছিলাম, অতপর একটা নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে, কিন্তু তুমি তো আমাদের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, যতো সত্যবাদীই আমরা হই না কেন! ১৮. তারা তার জামার ওপর মিথ্যা রক্ত (মেখে) নিয়ে এসেছিলো; (তাদের কথা শুনে) সে বললো, 'হ্যাঁ, তোমরা বরং (এটা বলো,) একটা কথা তোমরা মনে মনে ঠিক করে এনেছো (এবং ধরে নিয়েছো তা আমি বিশ্বাস করবো); অতপর (এ অবস্থায়) পূর্ণ ধৈর্য ধারণই (আমার জন্যে ভালো;) তোমরা যে মনগড়া কথা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই (হচ্ছেন আমার) একমাত্র সাহায্যস্থল। ১৯. অতপর (ঘটনা এমন হলো,) একটি (বাণিজ্যিক) কাফেলা (সেখানে) এলো, তারপর তারা একজন পানি সংগ্রাহককে (কুয়ার কাছে) পাঠালো, সে যখন তার

هٰذَا غُلٰمٌ ۖ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ

بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

বালতি (কুয়ায়) নিক্ষেপ করলো, অতপর সে (যখন) বালতি টান দিলো (তখন দেখলো, একটি বালক তাতে বসা); সে তখন (চীৎকার দিয়ে) বললো, ওহে (তোমরা শোনো) সুখবর, এ তো (দেখছি) এক কিশোর বালক; (কাফেলার লোকেরা বাণিজ্যিক পণ্য মনে করে) একে লুকিয়ে নিলো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন যা কিছু এরা তখন করছিলো। ২০. তারা তাকে স্বল্প মূল্যে নির্দিষ্ট কয়েক দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো, (বিনা পুঁজির পণ্য বিধায়) এ ব্যাপারে তারা বেশী প্রত্যাশীও ছিলোনা।

তাফসীর
আয়াত ১-২০

এই অংশটায় রয়েছে ভূমিকা ও কাহিনীর প্রথমাংশ। কাহিনীর এ অংশটায় হযরত ইউসুফের স্বপ্ন দেখা থেকে শুরু করে তার ভাইদের ষড়যন্ত্র ও তার মিসর উপস্থিতি পর্যন্ত মোট ছয়টি দৃশ্য রয়েছে। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো নিয়ে সরাসরি আলোচনা করবো। ইতিপূর্বে সূরার যে ভূমিকা আলোচিত হয়েছে, তারপর আর কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই।

'আলিফ লাম রা', এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ। নিশ্চয় আমি এ গ্রন্থকে আরবী কোরআন আকারে নাযিল করেছি।............' (আয়াত ১-৩)

'আলিফ লাম রা, এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ,' অর্থাৎ এই আরবী বর্ণমালা জনগণের কাছে সুপরিচিত ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত, এই বর্ণমালা দিয়েই সেই আয়াতগুলো রচিত, যা মানুষের সাধ্যাতীত। সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ। এ গ্রন্থকে আল্লাহ একখানা আরবী গ্রন্থের আকারে নাযিল করেছেন এবং তা এই সুপরিচিত আরবী বর্ণমালা দিয়েই লিখিত ও রচিত।

'যেন তোমরা বুঝতে পার।'

অর্থাৎ তোমরা এটা বুঝতে পারো যে, যিনি এই সাধারণ বর্ণমালা দিয়ে এমন অসাধারণ ও অলৌকিক গ্রন্থ রচনা করতে পারেন, তিনি কোনোক্রমেই মানুষ হতে পারেন না। তাই কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে আগত ওহী ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। এখানে মানুষের বিবেক ও বোধশক্তিকে এই দিব্য সত্য ও তার অকাট্য যুক্তি অনুধাবনের আহবান জানানো হয়েছে।

যেহেতু এই সূরার প্রধান আলোচিত বিষয় একটা কাহিনী, তাই কাহিনী আলোচনাকে এই কেতাবের অন্যতম উপাদান হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

'আমি তোমাকে এই কোরআন নাযিল করার মাধ্যমে সর্বোত্তম কাহিনী শুনাচ্ছি।'

অর্থাৎ তোমার কাছে এই কোরআন ওহী করার মাধ্যমে তোমাকে এই কাহিনী শুনাচ্ছি, যা সর্বোত্তম কাহিনী এবং ওহীযোগে প্রেরিত কোরআনের অংশবিশেষ।

'ইতিপূর্বে তুমি অজ্ঞ ছিলে।'

অর্থাৎ তুমি তোমার জাতির অন্যান্য নিরক্ষর অজ্ঞ লোকদেরই একজন ছিলে, যারা কোরআনে বর্ণিত এ জাতীয় বিষয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। কোরআনের এ সব বিষয়ের মধ্যে আলোচ্য পূর্ণাংগ কাহিনীও অন্তর্ভুক্ত।

এটুকু ছিলো কাহিনী শুরুর ভূমিকা।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন

এরপর প্রথম দৃশ্যের অবতারণা করা হচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পাই কিশোর ইউসুফ স্বীয় পিতার কাছে তাঁর স্বপ্ন বর্ণনা করেন। 'যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললো, হে পিতা, আমি দেখলাম এগারোটা নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সাজদা করছে।............ ।' (আয়াত ৪-৬)

হযরত ইউসুফ এ সময় একজন কিশোর ছিলেন। কিন্তু তাঁর বর্ণিত এই স্বপ্ন নিছক কিশোরসুলভ স্বপ্ন নয়। কিশোরসুলভ স্বপ্ন হলে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে নিজের কোলে অথবা সম্মুখে দেখাটাই স্বাভাবিক ছিলো। অথচ হযরত ইউসুফ এগুলোকে সাজদারত দেখেছেন। বুদ্ধিমান প্রাণীরা যেমন ভক্তিভরে সাজদা করে, এটা ঠিক তেমনি।

এ জন্যে তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব স্বীয় অনুভূতি ও প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বপ্নটা এই কিশোরের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিতবহ। তবে সেটা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি, স্বপ্নের বিবরণ থেকেও তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়নি। এমনকি পরবর্তী দু'টো স্বপ্নের পরে ছাড়া এর কোনো লক্ষণও আর টের পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে তিনি যে কতো বড় হবেন, তা পুরোপুরিভাবে জানা যায় শুধু কাহিনীর শেষ প্রান্তে পৌঁছার পর এবং অদৃশ্যের পর্দার আড়ালের ঘটনা সংঘটিত হবার পর। এ জন্যে তিনি তাকে উপদেশ দিলেন যে, তোমার ভাইদের কাছে এ স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানিও না, যাতে অসহোদর ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা অনুমান করে তারা শয়তানের প্ররোচনায় ঈর্ষাকাতর হয়ে তার বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠতে না পারে।

'ইয়াকুব বললো, হে আমার ছেলে, তোমার ভাইদের কাছে তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হবে।'

এরই সাথে জুড়ে দিলেন এ কথাটাও,

'নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।'

মানুষের শত্রু হওয়ার কারণে শয়তান সব সময় তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত করে এবং অপরাধ ও অকল্যাণকে তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক বানিয়ে দেয়।

হযরত এসহাকের পুত্র ও হযরত ইবরাহীমের পৌত্র হযরত ইয়াকুব যখন তাঁর পুত্র ইউসুফের স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারলেন, এটা ভবিষ্যতে ইউসুফের একটা অসাধারণ কিছু হওয়ার লক্ষণ, বিশেষত তিনি যে নবুওতী পরিবেশে জীবন ধারণ করে আসছিলেন, তা থেকে তিনি এই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন যে, ইউসুফ যদি অসাধারণ কিছু হয় তবে তা ইসলাম, নৈতিক সংস্কার ও ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের ময়দানেই হবে। তাঁর দাদা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ঈমানদার আত্মীয়-স্বজনরা দুনিয়া এবং আখেরাতে মহাকল্যাণের অধিকারী হয়েছিলেন। এই পটভূমিতে হযরত ইয়াকুব আশান্বিত হয়ে ওঠেছিলেন যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে সম্ভবত ইউসুফই হবেন হযরত ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্যকার সেই পরবর্তী ব্যক্তি, যিনি হযরত ইবরাহীমের পারিবারিক ধারাবাহিকতায় মহাকল্যাণময় নবুওতের উত্তরাধিকারী হবেন। এ জন্যেই তিনি বললেন,

'এভাবেই তোমার প্রভু তোমাকে নির্বাচিত করবেন, তোমাকে কথার ব্যাখ্যা শেখাবেন, তোমার ওপর ও ইয়াকুবের বংশধরের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে তোমার দাদা ইবরাহীম ও এসহাকের ওপর পূর্ণ করেছেন। তোমার প্রতিপালক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।'

ইউসুফের স্বপ্ন থেকে হযরত ইয়াকুবের এরূপ ইংগিত পাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, তাঁর দাদা এসহাক ও ইবরাহীমের ওপর নবুওতের যে নেয়ামত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলো। সেই নেয়ামত পরিপূর্ণভাবে লাভ করার জন্যে পরবর্তীতে হযরত ইউসুফই নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু যে বিষয়টা একটু গভীর চিন্তা ভাবনার উদ্রেক করে তা হলো, হযরত ইয়াকুবের এই উক্তি 'এবং তোমাকে কথার ব্যাখ্যা শেখাবেন।'

মূলে 'তাবীল' শব্দটার প্রচলিত অর্থ ব্যাখ্যা। তবে এর নিগূঢ় অর্থ হলো কোনো কিছুর শেষ পরিণতি জানতে পারা বা পরিণামদর্শী ও পরিণাম সচেতন হওয়া। আর 'আহাদীস' বা কথা বলতে কী বুঝানো হয়েছে, সেটা আমাদের উদ্ধার করতে হবে। এর দু'রকম অর্থ হতে পারে।

এ শব্দটা দ্বারা হযরত ইয়াকুব এও বুঝিয়ে থাকতে পারেন যে, আল্লাহ ইউসুফকে এমন নির্ভুল অনুভূতি ও কার্যকর প্রজ্ঞা দান করবেন এবং শেখাবেন, যা দ্বারা কোনো কথার শুরু থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। অন্য কথায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই ইলহামী ক্ষমতা লাভ করবেন যা তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও তীব্র বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের দিয়ে থাকেন এবং যা দ্বারা তারা অন্যেরা যা সচরাচর জানতে ও বুঝতে পারে না, তা জানতে ও বুঝতে পারেন। এরপরই মন্তব্য আসছে,

'তোমার প্রতিপালক মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়।'

অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও শিক্ষার পরিবেশে যেরূপ ইলহামী জ্ঞান প্রয়োজন তা তিনি তোমাকে দেবেন।

অথবা এ দ্বারা হযরত ইয়াকুব স্বপ্নের তাবীরও বুঝিয়ে থাকতে পারেন, যা হযরত ইউসুফ পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে অর্জন করেছিলেন। এই উভয় অর্থই গ্রহণ যোগ্য এবং হযরত ইউসুফ ও ইয়াকুবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বপ্নের রহস্য

এ প্রসংগে স্বপ্ন সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই, যা এই কেসসা ও সূরার অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

আমরা এ কথা অবধারিতভাবে বিশ্বাস করে থাকি যে, কোনো কোনো স্বপ্ন নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। এই সূরায় হযরত ইউসুফের স্বপ্ন, জেলখানায় তাঁর দুই সহচরের স্বপ্ন এবং মিসরের তৎকালীন সম্রাটের স্বপ্ন যে রূপ নির্ভুলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, তা থেকে যেমন এরূপ বিশ্বাস করতে বাধ্য হই, তেমনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও এমন বহু পূর্বাভাসে পরিপূর্ণ স্বপ্ন বার বার দেখে থাকি, যার অস্তিত্ব অস্বীকার করা খুবই কঠিন। কেননা তা বাস্তবেই বিদ্যমান।

যদিও প্রথম কারণটাই যথেষ্ট ছিলো। তথাপি দ্বিতীয় কারণটা এ জন্য উল্লেখ করলাম যে, ওটা এমন এক বাস্তব সত্য, যা চরম গোয়ার্তুমি ছাড়া আর কোনোভাবে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

স্বপ্ন কাকে বলে?

এ প্রশ্নের জবাবে মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, স্বপ্ন হলো সেসব অবদমিত আকাংখার প্রতিচ্ছবি, যা অবচেতন মনে স্বতস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বপ্নের আংশিক সংজ্ঞা হিসাবে এটা মেনে নেয়া যায়, পরিপূর্ণ সংজ্ঞা হিসাবে নয়। ফ্রয়েড তাঁর অবৈজ্ঞানিক হঠকারিতা ও অনুমানসর্বস্ব মতামতের জন্য প্রসিদ্ধ হওয়া সত্তেও এক পর্যায়ে এ কথা স্বীকার না করে পারেননি যে, কিছু কিছু স্বপ্ন আসলেই ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এসব পূর্বাভাসদানকারী স্বপ্নগুলোর স্বরূপ কী?

এর জবাবে কোনো কিছু বলার আগেই বলবো, পূর্বাভাসদানকারী স্বপ্নের প্রকৃতি জানা বা না জানার সাথে এর অস্তিত্ব ও কোনো স্বপ্নের সত্য হওয়ার সম্পর্ক নেই। আমরা শুধু মানুষের বিস্ময়কর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বজগতে আল্লাহর কার্যকর প্রাকৃতিক নিয়ম কী কী, তা জানার চেষ্টা করবো।

আমরা স্বপ্নের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি এভাবে, সময়গত ও কালগত বাধা মানুষের অজ্ঞাত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জানার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে, আমরা যাকে অতীত বা ভবিষ্যত নামে আখ্যায়িত করে থাকি, তা শুধু কালগত বাধার কারণেই আমাদের কাছে অজানা থেকে যায়। আর বর্তমানকালের যা কিছু আমাদের অজানা, তা স্থানগত বাধার কারণেই অজানা থেকে যায়। মানুষের ভেতরে এমন একটা অনুভূতি শক্তি আছে, যার প্রকৃত পরিচয় আজও আমাদের অজানা। এই শক্তিটা বিভিন্ন সময়ে আকস্মিকভাবে জেগে ওঠে বা জোরদার হয়ে ওঠে। ফলে তা সময়ের বাধা জয় করে এবং এই বাধার আড়ালে আটকে থাকা সত্যকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। এই দেখতে পাওয়াটাকে জ্ঞান বলা যায় না, তবে একটা স্বচ্ছ ধারণা বলা যায়, যেমন কোনো কোনো মানুষ জাগ্রত অবস্থায়ই এরূপ ধারণা অর্জন করে থাকে। আবার কেউ কেউ স্বপ্নেও এরূপ ধারণা পায়। এরূপ ধারণা পাওয়ার কারণে কখনো কখনো সে কালগত, স্থানগত অথবা উভয় বাধা জয় করতে সক্ষম হয়।(১) যদিও আমরা ওই সময়ের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। অনুরূপভাবে স্বয়ং স্থানের তাৎপর্যও আমাদের যথাযথভাবে জানা ছিলো না, যা 'বস্তু' নামে অভিহিত। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের কেবল যৎসামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।'

যাহোক, হযরত ইউসুফের দেখা এই স্বপ্নের কী তাবীর হয়, পরবর্তীতে আমরা সেটা দেখবো।

ইউসুফের বিরুদ্ধে তার ভাইদের ষড়যন্ত্র

হযরত ইয়াকুব কর্তৃক স্বপ্নের বিবরণ শ্রবণ, তার ভাইদের কাছে বলতে নিষেধ করা ও তার ব্যাখ্যা দেয়ার পরই এ দৃশ্যটা অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং অন্য দৃশ্যের অবতারণা হয়। এটা হচ্ছে ইউসুফের ভাইদের ভবিষ্যত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করার দৃশ্য।

'ইউসুফ ও তার ভাইদের মধ্যে প্রশ্নকারীদের জন্য বেশ কিছু নিদর্শন রয়েছে। ...' (আয়াত ৭-১০)

অর্থাৎ যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্যে ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা ও সতর্কতা জাগিয়ে তোলার জন্যে এ ভূমিকাটুকু যথেষ্ট। এ জন্যে এটাকে আমরা ইউসুফের ভাইদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার দৃশ্য উন্মোচন নামে আখ্যায়িত করতে পারি।

বাইবেলের প্রাচীন পুস্তক যেমন বলেছে, তিনি তাঁর ভাইদের কাছে কি নিজে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে ফেলেছিলেন? আয়াতের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, ব্যক্ত করেননি। এখানে দেখা যাচ্ছে,

---

(১) আমি সব কিছুই অস্বীকার করতে পারতাম যদি নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারতাম। আমি এতোক্ষণ আমেরিকায় এবং আমার পরিবার কায়রোতে। একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমার এক যুবক ভাগ্নের চোখে রক্ত এবং সে জন্যে সে দেখতে পাচ্ছে না। আমি কাল বিলম্ব না করে ঐ ভাগ্নের চোখের অবস্থা জানতে চেয়ে চিঠি লিখলাম। জবাবে এলো যে, তার চোখে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং এর চিকিৎসা চলছে। আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বাইরে থেকে দেখা যায় না এবং খালি চোখে দেখলে চোখকে স্বাভাবিক দেখা যায়। আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষণের কারণে দৃষ্টিশক্তি অচল ছিলো। অথচ স্বপ্নে ভেতরে আটকে থাকা সেই রক্তটাই দেখা গেলো! আর কোনো উদাহরণ দিতে চাই না। কারণ এই একটাই যথেষ্ট।

ভাইয়েরা কেবল তাদের পিতা ইয়াকুব ইউসুফকে ও তার ছোট সহোদরকে তাদের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন, এটাই উল্লেখ করেছে। ইউসুফের স্বপ্নের কথা যদি তারা জানতো তাহলে সেটাও উল্লেখ করতো এবং ইউসুফ সম্পর্কে অধিকতর বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা বলতো। তথাপি পিতা ইয়াকুব ইউসুফ সম্পর্কে যে আশংকা পোষণ করেছিলেন সে আশংকা অন্য পথ ধরে বাস্তবে পরিণত হয়েছিলো। ইউসুফ অধিকতর পিতৃস্নেহের অধিকারী ছিলেন বলে সৎভাইদের ঈর্ষার শিকার হয়েছিলেন। তা না হয়েও উপায় ছিলো না। এর একাধিক কারণ ছিলো। একে তো নবুওতের মহান ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ইউসুফ নবুওতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হতে যাচ্ছিলেন, তদুপরি তার জীবনের ঘটনাবলী ও পারিবারিক পরিবেশ তাকে সে জন্য গড়ে তুলছিলো। উপরন্তু তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পিতার বার্ধক্যকালে। পিতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে কনিষ্ঠ সন্তানই তার কাছে সর্বাধিক স্নেহের পাত্র হয়ে থাকে। ইউসুফ ও তার কনিষ্ঠ সহোদর এবং তার সৎভাইদের বেলায় এটাই হয়েছিলো।

'তারা বললো, ইউসুফ ও তার সহোদর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়েও প্রিয়। অথচ আমরা পুরো একটা দল।'..........

অর্থাৎ আমরা একটা শক্তিশালী দল, আমরাই পরিবারের সব কিছুতে সহায়তা করি এবং পরিবারকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষা করি।

'আমাদের পিতা খুবই ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন।'

অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তার কাজে সক্ষম একদল সামর্থবান পুরুষের ওপর দুটো কিশোর ছেলেকে অগ্রাধিকার দেয়া তাঁর নিতান্তই ভুল কাজ।

এরপর এই হিংসা ও ঈর্ষা আরো বৃদ্ধি পায় এবং শয়তান হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে তাদের পরিস্থিতির মূল্যায়ন হয়ে পড়ে ক্রটিপূর্ণ। তারা ক্ষুদ্র জিনিসকে বড় এবং বড় জিনিসকে ক্ষুদ্র বলে অনুভব করে। তারা নবী না হলেও নবীর ছেলে। তথাপি তাদেরই ভাই আত্মরক্ষায় অক্ষম এক নিরীহ কিশোরকে হত্যা করা তাদের কাছে অতীব তুচ্ছ অপরাধ বলে গণ্য হয়। পিতা কর্তৃক তাকে একটু বেশী ভালোবাসা তাদের চোখে এতো বড় অন্যায় সাব্যস্ত হলো যে, নরহত্যাও তাদের চোখে তার সমান মনে হলো। অথচ আল্লাহর সাথে শেরেক করার পর নরহত্যার মতো মারাত্মক অপরাধ আর নেই। তারা বললো,

'ইউসুফকে হত্যা করো, অথবা কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দাও।'.... এই দুটোই তাদের কাছে সমপর্যায়ের ছিলো। অনেক দূরে ও বিচ্ছিন্ন কোনো জায়গায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া, যেখানে কাউকে ফেলে আসলে সাধারণত মৃত্যু তার জন্য অবধারিত হয়ে যায়, যা হত্যারই সমতুল্য।

'তাহলে তোমাদের পিতা তোমাদের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী হবেন।'

অর্থাৎ তোমাদের ও তোমাদের পিতার মাঝে ইউসুফ আড় হয়ে থাকবে না, তারা পিতার ভালোবাসা পাওয়ার তীব্র বাসনায় এরূপ ভয়ংকর পরিকল্পনা করেছিলো। তারা ভেবেছিলো, ইউসুফ চোখের আড়াল হলেই পিতার মন তাঁর ভালোবাসা থেকেও শূন্য হয়ে যাবে। আর এই সমস্ত ভালোবাসা তিনি অন্য ছেলেদের ওপর উজাড় করে দেবেন। আর হত্যার অপরাধ! ওটা তো তাওবা করলেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ভ্রাতৃহন্তা হলেও এরপর তোমরা ভালো মানুষ হয়ে যাবে।

'অতপর তোমরা সৎলোক হয়ে যাবে।'.........

এভাবেই শয়তান কু-প্ররোচনা দিয়ে থাকে। মানুষ যখন ক্রোধে দিশাহারা হয়ে যায়, তখন তাকে সে এভাবেই খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার সুবিবেচনা ও ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।

যখন ভ্রাতাদের মন হিংসায় ভরে ওঠলো, তখন শয়তান তাদের প্ররোচনা দিলো যে, ইউসুফকে হত্যা করো। এরপর তাওবা অতীতের সব কলংক ধুয়ে মুছে ফেলবে। অথচ তাওবা আসলে এমন জিনিস নয়। তাওবা শুধু সেই গুনাহর ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য, যা কোনো মানুষ অজ্ঞ ও অচেতন অবস্থায়, ভুলবশত ও প্রবৃত্তির তাড়নায় করে থাকে, পরে যখন সচেতন হয়, সংগে সংগেই অনুতপ্ত হয় এবং স্বতস্ফূর্ত মনেই তাওবা করে, অর্থাৎ ক্ষমা চায়, কিন্তু পাপের ক্ষতি দূর করার জন্যে পাপ কাজ করার আগে থেকেই যে তাওবার পরিকল্পনা করা হয় এবং করা হয়, সেটা কোনো তাওবাই নয়। এটা আসলে পাপকে জায়েয করার জন্যে শয়তানের সাজানো কারসাজি।

তবে ওই বৈমাত্রেয় ভাইদের মধ্যে একজন ছিলো প্রখর বিবেকবান। সে তার ভাইদের এমন ভয়ংকর কাজের পরিকল্পনা করতে দেখে ভড়কে যাচ্ছিলো। তাই সে এমন একটা মধ্যবর্তী কৌশল উদ্ভাবন করে তাদের কাছে উপস্থাপন করলো, যাতে ইউসুফের কবল থেকে তারা রেহাই পাবে, অথচ ইউসুফকে হত্যাও করা হবে না, কিংবা দূরবর্তী কোনো দেশেও তাকে ফেলে আসা হবে না, যা তার মৃত্যু অনিবার্য করে তুলবে– এরূপ সম্ভাবনাই বেশী। এই কৌশলটা হলো ইউসুফকে কোনো ব্যস্ত সড়কের পাশের কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়া, যাতে কোনো না কোনো কাফেলা তার সন্ধান পেয়ে তুলে দূর দেশে নিয়ে যাবে,

'তাদের একজনে বললো, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং তাকে কুয়ার গভীরে ফেলে দাও। কোনো কাফেলা তাকে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।' (আয়াত-১০)

তার 'যদি তোমরা কিছু করতেই চাও'.....এই কথাটা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সে ইউসুফের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কিছু করার ব্যাপারে তারা আসলে কৃতসংকল্প কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছে। এটা আসলে তাদের ঈপ্সিত অপকর্ম থেকে ফেরানোর এবং সংকল্প করে থাকলেও তার বাস্তবায়নে অসন্তোষ প্রকাশের একটা সূক্ষ্ম কৌশল, কিন্তু এটা তাদের হিংসা নিবৃত্ত করতে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি এবং এতে তারা তাদের দুরভিসন্ধিপূর্ণ সংকল্প থেকে ফিরে আসতেও প্রস্তুত হয়নি। পরবর্তী দৃশ্য থেকেই আমরা একথা বুঝতে পারি।

একদিন তারা তাদের পিতার কাছে হাযির হলো। পরের দিন থেকে তিনি যাতে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলা করতে যেতে দেন, সে জন্যে অনুনয় বিনয় ও পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। আসলে এভাবে তারা তাদের পিতাকে ধোঁকা দেয় এবং ইউসুফের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায়।

'তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আপনার কী হয়েছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের ওপর আস্থা রাখেন না?..........' (আয়াত ১১-১৪)

এ আয়াত কটার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য সাক্ষ্য দিচ্ছে, ইবরাহীমী কল্যাণধারা তথা নবুওতের উত্তরাধিকারী হবার যাবতীয় লক্ষণে উদ্ভাসিত কনিষ্ঠ পুত্রের স্নেহে অধীর পিতার মনকে বিগলিত করে. তাকে ধোঁকা দিয়ে মতলব সিদ্ধ করতে তারা কত চেষ্টা চালিয়েছিলো,

'হে আমাদের পিতা' এ শব্দ দ্বারা হযরত ইয়াকুবের সাথে ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভাইদের ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

'আপনার কী হয়েছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের ওপর আস্থা রাখেন না?' এ প্রশ্নের ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভর্ৎসনা, ক্ষোভ অনাস্থা ও অবিশ্বাস ঝেড়ে ফেলার জন্যে পিতার প্রতি অনুরোধ এবং তাদের কাছে ইউসুফকে সমর্পণ করার উদাত্ত আহবান। কেননা, হযরত ইয়াকুব (আ.) ইউসুফকে সব সময় নিজের কাছে কাছে রাখতেন এবং ভাইদের সাথে তাকে মাঠে মাঠে বিচরণ করে বেড়াতে পাঠাতেন না। কেননা তাকে তিনি অত্যধিক স্নেহ করতেন এবং ওসব বয়স্ক

ভাই যে সব দৌড়-ঝাঁপ ও পরিশ্রম করতে পারে, তা করতে পারবে না বলে আশংকা করতেন। তাদের দ্বারা তার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হবে এমন আশংকা করতেন না। তথাপি তিনি তাদের পিতা হয়েও ইউসুফের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন না কেন? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, আসলে তারা তাঁর এই মানসিকতা দূর করার জন্যে তাকে আবেগোদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলো। এ কথার ফল দাঁড়ালো এই যে, তিনি ইউসুফকে নিজের কাছে রেখে দেয়ার নীতির ওপর অবিচল থাকতে পারলেন না। এটা আসলে তাদের দুরভিসন্ধিমূলক একটা অপকৌশল ছিলো।

'আপনার কী হয়েছে যে, ইউসুফের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন না? অথচ আমরা তার শুভাকাংখী।'

অর্থাৎ তার জন্যে আমাদের মন একেবারেই নিষ্কলুষ ও শুভ কামনায় পরিপূর্ণ। এখানে 'নাসেহুন' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ আন্তরিক ও শুভাকাংখী। আসলে এ শব্দটা দ্বারা তারা নিজেদের শঠতা ও প্রতারণাকে ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছে। কেননা কথায় বলে, 'চোরের মন পুলিশ পুলিশ করে।'

'আগামীকাল ওকে আমাদের সাথে পাঠান, ফুর্তি করবে ও খেলবে। আমরা তার রক্ষক থাকবো।' (আয়াত ১২)

কিশোর ইউসুফ স্বভাবতই খেলাধুলা ও আমোদ ফুর্তি করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে এরূপ একটা ধারণা দিয়ে পিতা যাতে আরো আনন্দের সাথে তাকে তাদের সাথে যেতে দেন, সে জন্যেই তারা এ কথাটা বলেছিলো। আর এতে আরো জোর দিয়ে তার নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হয়েছিলো।

ছেলেদের প্রথম ক্ষোভপূর্ণ প্রশ্নের জবাবে ইয়াকুব (আ.) পরোক্ষভাবে বলতে চাইলেন যে, তিনি তাদের ইউসুফের নিরাপত্তার ব্যাপারে অবিশ্বাস করেন না; বরং তাকে কাছ ছাড়া করাটাই তাঁর পক্ষে অসহনীয় এবং তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে কিনা এই আশংকায় তিনি অস্থির। ১৩ নং আয়াতে তিনি এই বক্তব্যই দিয়েছেন।

'আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে............?'

অর্থাৎ ইউসুফের বিচ্ছেদ আমার জন্যে দুর্বিষহ। তাঁর এ উক্তি তাদের হিংসা আরো বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা এ দ্বারা তিনি জানালেন, ইউসুফকে তিনি এতো ভালোবাসেন যে, এক-আধ দিনের জন্যেও তার বিচ্ছেদ সহ্য হয় না, অথচ তারা তাকে জানিয়েছে, ইউসুফ নিছক আমোদ ফুর্তি করার জন্যেই তাদের সাথে যাবে।

'আমার আশংকা যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তা টেরও পাবে না।' পিতার এই জবাবে স্বভাবতই তারা সেই অজুহাতটাই পেয়ে গেছে, যা তারা হন্যে হয়ে খুঁজছিলো। এমনও হতে পারে যে, হিংসা বিদ্বেষের আতিশয্যে অন্ধ হয়ে তারা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে, সেটা বাস্তবায়নের পর পিতাকে তারা কী জবাব দেবে তা এখনো স্থির করতে পারেনি। এবার পিতার জবাব থেকেই তারা সেই জবাবটা শিখে নিলো!

কিন্তু পিতার এই আশংকা দূর করার জন্যে তারা অত্যন্ত কার্যকর পন্থা অবলম্বন করলো।

'তারা বললো, আমরা এমন একটা শক্ত-সমর্থ দল থাকতে তাকে যদি বাঘে খেয়ে যায়, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তই থাকবো।' (আয়াত-১০)

অর্থাৎ আমাদের পরাভূত করে বাঘ যদি তার ওপর চড়াও হতে পারে, অথচ আমরা এতো বড় একটা শক্তিশালী দল, তাহলে আমাদের আর ভালাই নেই, আমরা তাহলে একটা নিরেট ক্ষতিগ্রস্ত দল এবং আমরা আর কখনো কোনো কিছুরই যোগ্য হবো না।

ইউসুফকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ

এভাবে আশ্বাসের পর আশ্বাস ও চাপের পর চাপে দিশেহারা হয়ে পিতা ছেলেদের দাবী মেনে নিলেন। এতে আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া এবং কাহিনীর আল্লাহার ইচ্ছামত গতিতে অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম হলো।

তারা ইউসুফকে নিয়ে গেলো, তারপর তাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলো। ওদিকে আল্লাহ কিশোরের মনে প্রবোধ দিলেন যে, এটা তার জন্যে একটা ক্ষণস্থায়ী কষ্ট। সে বেঁচে যাবে এবং ভাইদের একদিন সে স্মরণ করিয়ে দেবে তারা তার সাথে আজ কী আচরণ করছে। তখন তারা বুঝতেও পারবে না যে, সে স্বয়ং ইউসুফ।

'যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং তাকে কুয়ার মধ্যে ফেলতে একমত হলো.. ।' (আয়াত-১৫)

অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা তাকে কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করার ব্যাপারেই একমত হলো। এভাবে সে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। কুয়ার ভেতরে নিক্ষিপ্ত হবার যে ভয়ংকর হতাশার মুহূর্তটা তার সামনে এল, মৃত্যু তার খুব কাছে মনে হলো এবং তাকে সাহায্য করা বা উদ্ধার করার আর কেউ সেখানে ছিলো না। ইউসুফ ছিলো একা ও নিরীহ কিশোর, আর তার দশ দশটা শক্ত সমর্থ ভাই তার বিপক্ষে। এহেন নিরুপায় অবস্থায় আল্লাহ তাকে আশ্বাস দিলেন যে, তুমি অচিরেই এখান থেকে মুক্তি পাবে, একদিন তুমি তোমার ভাইদের মুখোমুখি হয়ে তাদের এই ঘৃণ্য আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, অথচ তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে, কিশোর বয়সে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়া সেই ভাই ইউসুফ এখনো বেঁচে আছে এবং সে তাদের মুখোমুখি হয়ে অতীত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ইউসুফকে আমরা অন্ধকূপের গভীর কঠিন মসিবতে রেখে এসেছি। এ সময় আল্লাহ তাকে যে আশ্বাস দিয়ে আশ্বস্ত করে রেখেছেন, নিসন্দেহে তা তাকে শান্ত ও নিশ্চিন্ত রেখেছে। এবার আমরা তার ভাইদের দেখতে যাচ্ছি, অপরাধ সংঘটিত করার পর কিভাবে তারা তাদের শোকাহত পিতার মুখোমুখি হয়,

'তারা রাতের বেলা কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এলো।............' (আয়াত-১৬-১৯)

মাত্রাতিরিক্ত হিংসা তাদের মিথ্যা বলা একেবারেই সহজ বানিয়ে দিয়েছিলো এবং মিথ্যা যে কতো ভয়ংকর গুনাহর কাজ, সে সম্পর্কে তাদের অনুভূতিকে শিথিল করে দিয়েছিলো। তাদের মাথা যদি ঠান্ডা ও স্থির থাকতো, তাহলে হযরত ইয়াকুব ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলা করতে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার পর এতো দ্রুত এ কাজটা তারা করতো না, কিন্তু তারা ছিলো অতিমাত্রায় দ্রুততা প্রিয় ও ধৈর্যহীন। তারা ভেবেছিলো, এ সুযোগ এখনই গ্রহণ না করলে সহজে আর নাও পাওয়া যেতে পারে। বাঘে খাওয়ার গল্প ফাঁদা থেকে প্রমাণিত হয়, তারা অকারণে অতি মাত্রায় তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। মাত্র গতকালই পিতা তাদের সাবধান করেছেন যে, ওকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে। তারা এর সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যানও করেছে এবং তা নিয়ে অনেকটা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করেছে। সুতরাং এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, পিতা আগের দিন যে বাঘ সম্পর্কে সাবধান করলেন, পরদিন সকালে ইউসুফকে নিয়েই তারা বাঘের খোরাক হবার জন্য ছেড়ে দেবে। আর এই দ্রুততার বশেই তারা তার জামার ওপর কৃত্রিমভাবে রক্ত মেখে নিয়ে এসেছে, যা বিশ্বাসযোগ্য ছিলো না, তাই এই সাজানো নাটকটা এমন প্রকাশ্য মিথ্যাচার ছিলো যে, তাকে 'মিথ্যা রক্ত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তারা রাতের বেলায় পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এলো। তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা, আমরা ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের কাছে রেখে প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম। তখন তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।' এ কথা বলার সময় তারা নিজেরাও আশংকা করছিলো যে, তাদের

মিথ্যাচারের মুখোশ এই বুঝি খসেই পড়লো। কেননা কথায় বলে, 'চোরের মন পুলিশ পুলিশ করে।' তাই তারা বললো,

'আমরা সত্যবাদী হলেও আপনি আমাদের বিশ্বাস করবেন না।' অর্থাৎ আমাদের কথা সত্য হলেও আপনার বিশ্বাস হবে না। কেননা আপনি আমাদের সন্দেহ করেন, অবিশ্বাস করেন।

সুরতহাল প্রমাণাদি দেখেই ইয়াকুব বুঝতে পারলেন এবং তাঁর মনও সাক্ষ্য দিলো যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং ছেলেরা তার বিরুদ্ধে একটা কিছু ষড়যন্ত্র করেছে। তারপর তারা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা গল্প ফেঁদে এনেছে। তিনি তাদের বললেন, কু-প্রবৃত্তি তাদের দ্বারা একটা অপকর্ম সহজে সংঘটিত করিয়ে নিয়েছে এবং তার প্রমাণও তৈরী করে দিয়েছে। তবে তিনি এ নিয়ে কোনো শোক বিলাপ না করে ধৈর্য ধারণ করলেন এবং তাদের সকল চক্রান্তের মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। (আয়াত-১৮)

এবার আমাদের দ্রুত ইউসুফের কাছে সেই কুয়ায় ফিরে যাওয়া দরকার। যাতে কাহিনীর এই পর্বের শেষ দৃশ্যটা দেখতে পারি।

'একটা কাফেলা এলো। কাফেলা তার পথ প্রদর্শককে পানি আনতে পাঠালো। সে কূয়ার ভেতরে বালতি ফেললো। সে বললো, কী সুসংবাদ! এযে একটা কিশোর ছেলে!......(আয়াত ১৯, ২০)

কুয়াটা কাফেলা যাতায়াতে ব্যবহৃত একটা ব্যস্ত সড়কের পাশেই অবস্থিত ছিলো। কাফেলার লোকেরা স্বভাবতই আশপাশের সম্ভাব্য কুয়ায় পানি সন্ধান করতো। পথিপার্শ্বের এসব কুয়ায় স্বল্প-পরিমাণ বৃষ্টির পানি কিছুক্ষণের জন্যে থাকতো। আবার অনেক কুয়া শুকনোও থাকতো।

'একটা কাফেলা এলো।'

এখানে কাফেলার আরবী প্রতিশব্দ 'সাইয়ারা' ব্যবহৃত হয়েছে। দীর্ঘ পথযাত্রী কাফেলাকে 'সাইয়ারা' বলা হয়ে থাকে, যেমন দীর্ঘ দিন অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত ব্যক্তি বা দলকে 'কাশশাফা', দীর্ঘ দিন ভ্রমণকারীকে 'জাওয়ালা' এবং দীর্ঘ দিন শিকার করার নেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে 'কান্নাসা' বলা হয়।

'তারা তাদের পথপ্রদর্শককে পাঠালো।'

অর্থাৎ এমন লোককে পাঠালো যে পানি কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা জানে।

'সে বালতি নামালো।'

অর্থাৎ কুয়া থেকে পানি ভরে তোলার জন্য বালতি ছাড়লো। এখানে হযরত ইউসুফ কর্তৃক বালতি ধরে ঝুলে পড়া এবং ওপরে ওঠে আসার ব্যাপারটা উহ্য রাখা হয়েছে, যাতে শ্রোতা ও পাঠককে কাহিনীর আকস্মিকতার স্বাদ উপভোগ করানো যায়।

'সে বললো, কী সুসংবাদ! এ যে একটা কিশোর ছেলে!'

এরপর কী কী ঘটলো, কে কী বললো, ইউসুফ কুয়া থেকে ওঠতে পেরে কেমন খুশী হলেন, এবং কাফেলার সাথে তার পরবর্তী সময় কিভাবে কাটলো, সে সবই এখানে উহ্য রাখা হয়েছে।

'তারা তাকে একটা বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে লুকিয়ে রাখলো।'

অর্থাৎ কাফেলা তাকে একটা গোপন বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করলো এবং তাকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করতে মনস্থ করলো। যেহেতু এ কিশোর আসলে ক্রীতদাস হিসাবে আনীত হয়নি, তাই তাকে গোপন করে দৃষ্টির আড়ালে রাখা হলো, অতপর স্বল্প মূল্যে বিক্রি করা হলো।

'তার ব্যাপারে তারা বেশী মুনাফালিপ্সু ছিলো না।'

কেননা তারা একটা স্বাধীন মানুষকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রির দায়ে ধরা পড়ার আশংকা থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলো। এভাবে মহান নবী ইউসুফের জীবনের প্রথম কষ্টকর যুগটার অবসান ঘটে।

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ؗ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٢٤﴾

রুকু ৩

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিলো সে (তাকে নিজ ঘরে এনে) তার স্ত্রীকে বললো, সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা করো, সম্ভবত (বড়ো হয়ে) সে (কোনোদিন) আমাদের উপকারে আসবে, অথবা (ইচ্ছা করলে) তাকে আমরা নিজেদের ছেলেও বানিয়ে নিতে পারি; এভাবেই (একদিন) আমি (মিসরের) যমীনে ইউসুফকে (সম্মানজনক) প্রতিষ্ঠা দান করলাম, যাতে করে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (-সহ অন্যান্য বিষয়-আশয়) সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি; আল্লাহ তায়ালা (সব সময়ই) স্বীয় এরাদা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ মানুষ (এ কথাটা) জানে না। ২২. অতপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে নানারকম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম; আর আমি এভাবেই নেককার লোকদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। ২৩. (একদিন এমন হলো,) সে যে মহিলার ঘরে থাকতো সে তাকে তার প্রতি (অসৎ উদ্দেশে) আকৃষ্ট করতে চাইলো এবং (এ উদ্দেশ চরিতার্থ করার জন্যে) সে তার ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে (তাকে) বললো, এসো (আমার কাছে, এ অশ্লীল প্রস্তাব শুনে) সে বললো, আমি (এ থেকে বাঁচার জন্যে) আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, তিনিই আমার মালিক, তিনিই আমার উৎকৃষ্ট আশ্রয়, (যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আশ্রয় দিয়ে এখানে থাকতে দিয়েছেন তার সাথে এ যুলুম আমি করবো কিভাবে); তিনি (অকৃতজ্ঞ) যালেমদের কখনো সাফল্য দেন না। ২৪. সে মহিলা তার প্রতি (অসৎ কাজের) এরাদা করে ফেলেছিলো এবং সেও তার প্রতি (একই উদ্দেশে) এরাদা (প্রায়) করেই ফেলেছিলো, যদি না সে (বিশেষ রহমত হিসেবে) তার মালিকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করতো, এভাবেই (আমি ইউসুফকে নৈতিকতার উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত রাখলাম) যেন আমি তার থেকে অন্যায় ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাজ দূরে সরিয়ে রাখতে পারি; অবশ্যই সে ছিলো আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের একজন।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ
قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ
قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ
قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ
قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي
الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا

২৫. অতপর তারা উভয়েই (সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশে) দরজার দিকে দৌড়ে গেলো, মহিলা (তাকে ধরতে গিয়ে) পেছন দিক থেকে তার জামা (টেনে) ছিঁড়ে ফেললো, এমতাবস্থায় তারা (উভয়েই) তার স্বামীকে দরজার পাশে (দেখতে) পেলো, তখন মহিলাটি (স্বীয় অভিসন্ধি গোপন করার জন্যে ইউসুফকে অভিযুক্ত করে) বললো, কি শাস্তি হওয়া উচিত সে ব্যক্তির, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে? এ ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে যে– তাকে হয় জেলে পাঠাতে হবে নতুবা অন্য কোনো কঠিন শাস্তি হবে। ২৬. সে বললো, সে (মহিলা)-ই আমাকে অশ্লীল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলো, (এ সময়) সে মহিলার আপনজনদের মধ্য থেকে একজন এসে সাক্ষী হিসেবে (নিজের সাক্ষ্য পেশ করে) বললো (ইউসুফের জামা তদন্ত করে দেখা যাক), যদি তার জামার সম্মুখভাগ ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে, অভিযোগের ব্যাপারে) সে মহিলা সত্য বলেছে এবং সে (ইউসুফ) মিথ্যাবাদীদের একজন। ২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে), সে (নারী) মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে-ই সত্যবাদীদের একজন। ২৮. অতপর (এ মূলনীতির ভিত্তিতে) সে (গৃহস্বামী) যখন দেখলো, তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (আসল ঘটনা বুঝতে পেরে নিজের স্ত্রীকে) বললো, কোনো সন্দেহ নেই, এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনা, আর সত্যিই তোমাদের (মতো নারীদের) ছলনা বড়ো জঘন্য! ২৯. হে ইউসুফ, তুমি (এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা) ছেড়ে দাও এবং (হে নারী,) তুমি তোমার অপরাধের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, কেননা তুমিই হচ্ছো (আসল) অপরাধী।

রুকু ৪

৩০. (বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে) শহরের নারীরা (নিজেদের মধ্যে) বলতে লাগলো, আযীযের স্ত্রী তার (যুবক) গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তাকে (তার গোলামের)

لَنَرٰهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٠ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ

لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا

رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ

هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝٣١ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ

رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا

مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝٣٢ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ

وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝٣٣

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٣٤

প্রেম উন্মত্ত করে দিয়েছে, আমরা সত্যিই দেখতে পাচ্ছি সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে। ৩১. সে (মহিলা) যখন ওদের (কানাকানি ও) ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো, তখন সে ওদের (সবাইকে নিজের ঘরে) ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্যে একটি মাহফিলের আয়োজন করলো, (রীতি অনুযায়ী) প্রত্যেক মহিলাকে (খাবার গ্রহণের জন্যে) এক একটি ছুরি দিলো, অতপর (যখন তারা খাবার গ্রহণ করার জন্যে ছুরির ব্যবহার শুরু করলো তখন) সে (ইউসুফকে) বললো, (এবার) তুমি এদের সামনে বেরিয়ে এসো, যখন মহিলারা তাকে দেখলো তখন তারা তার (রূপ যৌবনের) মাহাত্মে অভিভূত হয়ে গেলো (এবং নিজেদের অজান্তেই ছুরি দিয়ে খাবার গ্রহণের পরিবর্তে) নিজেদের হাত কেটে ফেললো, তারা বললো, কি অদ্ভুত (সৃষ্টি!) এ তো কেনো মানুষ নয়; এ তো হচ্ছে এক সম্মানিত ফেরেশতা! ৩২. (এবার বিজয়িনীর ভংগিতে) সে (মহিলা) বললো, (তোমরা দেখলে; তো?) এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করছিলে, (এটা ঠিক) আমি তার কাছ থেকে অসৎ কিছু কামনা করেছিলাম, অতপর সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে; (কিন্তু) আমি তাকে যা করতে আদেশ করি সে যদি তা না করে তাহলে অবশ্যই সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং অপমানিত হবে। ৩৩. (মহিলার দম্ভোক্তি শুনে) সে দোয়া করলো, হে আমার মালিক, এরা আমাকে যে (পাপের) দিকে আহ্বান করছে তার চাইতে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়, যদি তুমি আমাকে এদের ছলনা থেকে রক্ষা না করো তাহলে হয়তো আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবো এবং এভাবে আমিও জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো! ৩৪. অতপর তার মালিক তার ডাকে সাড়া দিলেন, তার কাছ থেকে তিনি মহিলাদের চক্রান্ত সরিয়ে নিলেন, নিশ্চয়ই তিনি (মানুষের সব ডাক) শোনেন এবং (তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও) তিনি সম্যক অবগত।

তাফসীর

আয়াত ২১-৩৪

এখান থেকে শুরু হচ্ছে কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব। এ সময় হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরে পৌঁছে গেছেন। ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রিতও হয়েছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে কিনলো, সে তার ভেতরে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলো। সাধারণত উজ্জ্বল চেহারার মধ্যে 'শুভ লক্ষণ' দেখা যায়, বিশেষত উজ্জ্বল চেহারার সাথে যখন মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। যাহোক, যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিলো সে তার স্ত্রীকে বিশেষভাবে ছেলেটার যত্ন নিতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো। আর এখানেই হয়েছিলো স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্তরের সূচনা।

কিন্তু বয়োপ্রাপ্তির পর অন্য ধরনের একটা দুর্যোগ হযরত ইউসুফের অপেক্ষায় ছিলো। এ সময় হযরত ইউসুফ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামের জ্ঞান (এলেম) ও তার বাস্তবায়ন কৌশল (হেকমত) অর্জন করেছেন, আর এই দুটো খোদা প্রদত্ত অস্ত্র দিয়েই তিনি সেই দুর্যোগের মোকাবেলা করেছেন, যার মোকাবেলায় একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সফলতা লাভ করতে পারে। এই দুর্যোগটা আর কিছু নয়, রাজপ্রাসাদের অন্তপুরে বিকৃতি, বিপথগামিতা ও বেলেল্লাপনার হাতছানি। তথাকথিত 'অভিজাত শ্রেণীর বেহায়াপনা ও ব্যভিচারের হাতছানি, কিন্তু হযরত ইউসুফ এই দুর্যোগ থেকে নিজের চরিত্র ও দ্বীনদারীকে সম্পূর্ণ নিষ্কলংক অবস্থায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তবে দুর্যোগের ভেতরে পতিত হয়েও পরিকল্পিতভাবে তার মোকাবেলা করেই এতে সফলতা লাভ করলেন।

'মিসরে যে ব্যক্তি ইউসুফকে কিনেছিলো, সে তার স্ত্রীকে বললো, ওকে যত্নের সাথে রেখো ....'(আয়াত-২১)

চলমান পর্ব থেকে আমরা জানতে পারি না ইউসুফের ক্রেতা কে ছিলো। তবে পরবর্তী এক পর্বে জানতে পারি, তিনি ছিলেন মিসরের আযীয উপাধিধারী এক কর্মকর্তা (কারো কারো মতে তিনি প্রধানমন্ত্রী)। তবে আমরা এটুকু জানতে পারি যে, ইউসুফ এ সময় একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছেন, তার একটা দুর্যোগপূর্ণ যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তিনি এখানে থেকে সামনে যতো দূরই যান, কল্যাণ অভিমুখেই যেতে পারবেন।

'ওকে যত্নের সাথে রেখো।'

'মাসওয়া' শব্দটার অর্থ অবস্থানস্থল, আর তার অবস্থানস্থলকে সম্মানিত করার অর্থ তাকে যত্ন করা বা যত্নের সাথে রাখা। তবে সামগ্রিকভাবে এ অভিব্যক্তি আরো ব্যাপক ও গভীর। কেননা এ দ্বারা শুধু ব্যক্তিগতভাবে হযরত ইউসুফকে নয় বরং তার অবস্থানস্থলকে সম্মান মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে বলা হয়েছে। এ দ্বারা সম্মান ও যত্নের আধিক্য বুঝানো হয়েছে। কূয়ার মধ্যে ও তার আশপাশে যে কষ্টকর ভীতিপ্রদ পরিবেশে তাকে অবস্থান করতে হয়েছে তার তুলনায় এটা সম্মানজনক বটে!

শুধু তাই নয়, বরং ওই ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে কিশোর ইউসুফের মধ্যে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও আশার আলো দেখতে পেয়েছে তাও ব্যক্ত করলো।

'হয়তো সে আমাদের উপকারে লাগবে অথবা তাকে আমরা সন্তান হিসাবে গ্রহণ করবো।'

সম্ভবত এই দম্পতির কোনো সন্তান ছিলো না। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকেও এটাই জানা যায়। এ জন্যই পুরুষটি তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে আসলে তার প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং ইউসুফের কায়িক সৌন্দর্যের পাশাপাশি তার উচ্চ বংশ মর্যাদা ও নৈতিক মাহাত্ম্য সম্পর্কে তার যথাযথ মূল্যায়নই প্রকাশ পায়।

এই পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করে দেন যে, ইউসুফের এই সম্মান ও মর্যাদার সুবন্দোবস্ত স্বয়ং তিনিই করেছেন এবং তিনিই ইউসুফকে ওই দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এই প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছে ওই কর্মকর্তার বাড়ীতে ও মনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে। এখানে এই মর্মেও ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, ইউসুফ এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শিখে সামনে এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রেখেছেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষমতা যে দু'রকমের হতে পারে সেটা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইউসুফকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া যেভাবে শুরু করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কোরআন মন্তব্য করেছে যে, আল্লাহর শক্তি সব কিছুর ওপর বিজয়ী। তার পথে কেউ কোনো বাধা আরোপ করতে পারে না। তিনি তাঁর সমস্ত কর্মকান্ডের সর্বময় কর্তা ও মালিক মোক্তার। তাই তার কোনো পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় না, থেমে থাকে না বা বিপথগামী হয় না।

'এভাবেই আমি ইউসুফকে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছি.........?' (আয়াত-২১)

হযরত ইউসুফকে দেখুন। ভাইয়েরা তার সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, আর আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেহেতু আল্লাহ নিজের সিদ্ধান্তের সর্বময় কর্তা, তাই তার সিদ্ধান্তই কার্যকর হলো, কিন্তু ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের সিদ্ধান্তের সর্বময় কর্তা নয়, তাই তারা তাঁর সম্পর্কে যা করতে চেয়েছিলো তা করতে পারেনি। তাই ইউসুফ তাদের মুঠোর মধ্য থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছেন।

'তবে বেশীর ভাগ লোক জানে না।'

অর্থাৎ আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম যে অপ্রতিরোধ্য সে কথা অধিকাংশ মানুষই জানে না।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ইউসুফের জন্য যা চেয়েছেন এবং তাঁকে কথার ব্যাখ্যা শেখাবেন বলে যে আশ্বাস দিয়েছেন তা তাঁর বয়োপ্রাপ্তির পর কার্যকর হয়েছে,

'যখন সে বয়োপ্রাপ্ত হলো তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম ....?' (আয়াত-২২)

অর্থাৎ তাঁকে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো, দেয়া হয়েছিলো বিভিন্ন বিষয়ের পরিণাম জ্ঞান, স্বপ্নের তাবীর কিংবা জীবন ও তার বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত আরো ব্যাপক বিস্তৃত জ্ঞান, আর এটা ছিলো তাঁর সততা, তাঁর মহৎ বিশ্বাস ও সদাচরণের পুরস্কার।

'এভাবে আমি সৎলোকদের পুরস্কৃত করে থাকি।'

হেরেমে ষড়যন্ত্রের শিকার ইউসুফ (আ.)

এরপরই আসে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় দুর্যোগ। এটা ছিলো প্রথম দুর্যোগের চেয়েও কঠিন। এই দ্বিতীয় দুর্যোগ যখন এলো, তখন তিনি লাভ করেছেন নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং নির্ভুল জ্ঞান। আর এ দুটো ছিলো আল্লাহর রহমতের ফল। আল্লাহ তাঁকে এই দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করার জন্যে এই রহমতে ভূষিত করেন, যাতে তাঁর সততার পুরস্কার দেয়া যায়। আর তাঁর এই সততা আল্লাহ কোরআনে সংরক্ষণ করেছেন।

এবার আমরা তাঁর ওপর আপতিত সেই ভয়ংকর দুর্যোগটা কী ছিলো দেখবো।

'যে মহিলার বাড়ীতে ইউসুফ থাকতো, সে ইউসুফকে ফুসলাতে লাগলো। একদিন দরজা বন্ধ করে তাকে বললো, এদিকে এসো। ইউসুফ বললো, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। ....'(আয়াত ২৩-২৯)

আয়াতে ইউসুফের ও ওই মহিলার বয়স উল্লেখ করা হয়নি, তবে এ বিষয়ে আমরা একটা আনুমানিক হিসাব বের করতে পারি।

কাফেলা যখন ইউসুফকে কুড়িয়ে পায় ও মিসরে বিক্রি করে, তখন তিনি চৌদ্দ বছর বা তারও কম বয়সের কিশোর ছিলেন, চৌদ্দ বছরের মধ্যে থাকলেই কিশোর বলা হয়। এরপর বয়সের বৃদ্ধি অনুপাতে ক্রমান্বয়ে তরুণ, যুবক ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হতে থাকে। তাঁর কিশোর বয়সেই হযরত ইয়াকুব এ কথা বলা মানানসই হয় যে, 'আমার আশংকা হয়, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে।' এ সময় ওই মহিলা মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ছিলো এবং সে ও তার স্বামী তখনো কোনো সন্তান লাভ করেনি। এটা তার স্বামীর এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, 'হয়তো আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারবো।' সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার এই চিন্তাটা সাধারণত কারো মাথায় তখনই আসে, যখন সে নিসন্তান থাকে এবং সন্তান হবার কোনো আশাও তার থাকে না। 'সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, তাদের বিয়ের বেশ কিছুকাল তখন অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং তারা সন্তান না থাকার অবস্থাটা অনুভব করছে। যাহোক, এ সময় মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর বয়স চল্লিশ এবং তার স্ত্রীর বয়স ত্রিশের কম হবে না।

এটাও ধরে নেয় যেতে পারে যে, ইউসুফের বয়স যখন পঁচিশ বা তার কাছাকাছি হয়েছে, তখন ওই মহিলার বয়স চল্লিশ বছর হয়েছে। খুব সম্ভবত এই বয়সেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিলো। এ অনুমানের কারণ, এই ঘটনায় ও তার পরে মহিলার যে ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়, তা থেকে ধারণা জন্মে, সে এ সময় পূর্ণ বয়স্কা, সাহসী, নিজের ষড়যন্ত্রের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারিণী এবং নিজের পালিত তরুণকে পাওয়ার জন্য মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলো। পরবর্তী সময়ে মহিলারা যে কথা রটিয়েছিলো, 'প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী তার তরুণকে ফুসলায়,' 'ফাতা' বা তরুণ শব্দটা যদিও ক্রীতদাসের ক্ষেত্রেই সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে বয়সের দিক দিয়ে ইউসুফের সাথে কিছু মিল না থাকলে তার বেলায় এ শব্দ প্রয়োগ করা হতো না, পরিস্থিতির লক্ষণাদি থেকে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়।

আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই। আমরা বলতে চাই, হযরত ইউসুফ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বা যে অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করেছেন, তা শুধু এখানকার আয়াতে বর্ণিত ফুসলানির সফল প্রতিরোধই ছিলো না; বরং হযরত ইউসুফের প্রথম যৌবনের সমগ্র সময়টা– ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের কোটা পর্যন্ত পৌঁছার এই সময়টা অবাঞ্ছিত এই মহিলার প্রাসাদের অভ্যন্তরেই কেটেছে। এই প্রাসাদের ভেতরকার পরিবেশ কেমন ছিলো তা তার স্বামীর সেই উক্তি থেকেই আঁচ করা যায়, যা সে তার স্ত্রীকে ইউসুফের সাথে দেখে উচ্চারণ করেছিলো।

সে বলেছিলো,

'ইউসুফ, তুমি এ ব্যাপারটা এড়িয়ে যাও, আর বেগম, তুমি তোমার পাপের জন্যে ক্ষমা চাও। তুমি বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত।'

রাজধানীর মহিলারা প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী সম্পর্কে নানা রকম কানাঘুষা শুরু করেছিলো। এর জবাবে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী তাদের দাওয়াত দিলো ও বিশেষ ভোজের আয়োজন করলো। সেই সাথে এ ব্যবস্থাও রাখা হলো যে, ইউসুফ তাদের সামনে বেরুলেন, তাঁর রূপ যৌবন দর্শনে মহিলারা অভিভূত হলো, 'এ তো মানুষ নয় বরং ফেরেশতা' বলে চিৎকার করে ওঠলো, আর সেই সুযোগে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীও ঘোষণা করলো,

'আমি ওকে ফুসলিয়েছি, কিন্তু সে নিষ্কলুষ থাকার চেষ্টা করেছে। এখন থেকে আমি যা আদেশ করবো, তা যদি সে না করে তবে ওকে জেল খাটতে হবে এবং লাঞ্ছিত হতে হবে।'

এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা পরিবেশ। যে সমাজ এ জাতীয় কর্মকান্ড অনুমোদন করে, তা কোনো সাধারণ সমাজ নয়। বস্তুত বিত্তশালী শ্রেণীর সামাজিক পরিবেশ এ রকমই হয়ে থাকে। ইউসুফ এ সমাজে একজন পরাধীন মানুষ ছিলেন এবং যে বয়সটা সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ, সেই বয়সেই তিনি ওই সমাজে লালিত পালিত হয়েছেন। সুতরাং এটা কোনো নির্দিষ্ট দিনের ঘটনা মাত্র নয়; বরং এটা ছিলো হযরত ইউসুফের জীবনের একটা দীর্ঘস্থায়ী অগ্নিপরীক্ষা। এ পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। এই বয়সে এমন একটা উচ্ছৃংখল নারীর সাথে একই ছাদের নীচে জীবন যাপন করা যে কত কঠিন, বিশেষত তা যদি এতো দীর্ঘস্থায়ী হয়, ভাষায় বর্ণনা করা দুসাধ্য। মহিলাটা যদি একা হতো এবং দীর্ঘ দিন ধরে প্ররোচনা ও প্রলোভন না দিয়ে আকস্মিকভাবেই এরূপ চাপ দিতো, তাহলে এ চাপ প্রতিরোধ করা ইউসুফের জন্যে এতো কঠিন হতো না। বিশেষত সে যখন এখানে প্রার্থিত- প্রার্থী নয়। নারীর দুর্বলতা কখনো কখনো পুরুষকে আত্মসংযমে সাহায্য করে থাকে। এখানে তো মহিলাই হযরত ইউসুফের প্রতি আসক্ত।

এবার আয়াতের প্রতি মনোনিবেশ করা যাক।

'ইউসুফকে সেই মহিলা কু-প্ররোচনা দিলো, দরজা বন্ধ করলো এবং বললো, চলে এসো।'........ (আয়াত-২৩)

এ আয়াতাংশ থেকে সুস্পষ্ট যে, মহিলা এবারে একেবারে খোলাখুলিভাবেই কু-প্রস্তাব দিয়েছিলো। দরজা বন্ধ করা থেকে বুঝা যায়, মহিলা এবার তার ঘৃণ্য দৈহিক উত্তেজনার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো এবং দৈহিক চাহিদার সর্বশেষ আহ্বানটাই সে 'চলে এসো' বলে জানিয়েছিলো।

এই সুস্পষ্ট ও ঘৃণ্য আহ্বান মহিলার প্রথম নয় বরং সর্বশেষ আহ্বান ছিলো। মহিলা ইতিপূর্বে তার সামনেই ইউসুফকে পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করতে দেখেছে। তার নিজের দৈহিক চাহিদাও সহ্যের বাইরে চলে গেছে। কাজেই ইতিমধ্যে গোপন ও পরোক্ষ প্ররোচনা যে বহুবার দেয়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই .... ' (আয়াত-২৩ শেষাংশ)

অর্থাৎ এমন কাজ করা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

'তিনি আমার প্রতিপালক, তিনিই আমাকে উত্তম আবাসস্থল দিয়েছেন।'

অর্থাৎ তিনি আমাকে কুয়া থেকে উদ্ধার করে আজ এই নিরাপদ বাড়ীতে সসম্মানে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন।

'অত্যাচারীরা কখনো সফলকাম হয় না।'

অর্থাৎ যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে এবং এই মুহূর্তে তুমি যে অপকর্মে আমাকে প্ররোচিত করছো, তা যারা করে, তারা সফলকাম হয় না।

আয়াতের বক্তব্য থেকে দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্যভাবে জানা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর সুস্পষ্ট কু-প্ররোচনার জবাবে ইউসুফ শুধু তা প্রত্যাখ্যানই করেননি; বরং আল্লাহ তাঁর ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন এবং তিনি মানুষের জন্যে যে সীমারেখা নির্দেশ করেছেন তা স্মরণ করেছেন। সেই সাথে তিনি তার নির্ধারিত সীমারেখা লংঘনকারীর শাস্তির কথাও স্মরণ করেছেন। সুতরাং ওই মহিলা দরজা বন্ধ করার পর সুস্পষ্টভাবে ব্যভিচারের যে নোংরা আহ্বান জানিয়েছে, তার প্রতি হযরত ইউসুফ কর্তৃক প্রাথমিকভাবেও সম্মতি জ্ঞাপনের প্রশ্নই ওঠে না। পবিত্র কোরআন তার এই নোংরা আহ্বানকে অপেক্ষাকৃত শালীন ভাষায় নিম্নরূপ উদ্ধৃত করেছে,

'সে বললো, চলে এসো।'

এবার যাওয়া যাক, পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায়,

'নিশ্চয় ওই মহিলা তার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলো এবং সেও মহিলার প্রতি ঝুঁকে পড়তো যদি তার প্রতিপালকের যুক্তি প্রমাণ সে দেখতে না পেতো। ....' (আয়াত-২৫)

প্রাচীন তাফসীরকার ও হাদীসবেত্তাদের সকলেই সেই সর্বশেষ ঘটনাটার মধ্যেই নিজেদের দৃষ্টি সীমিত করে ফেলেছেন। তাদের মধ্যে যারা ইসরাঈলী রেওয়ায়াতগুলোর অনুসরণ করেছেন, তারা বহু কল্পকাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ সব কল্পকাহিনীতে হযরত ইউসুফকে এমন কামোত্তেজিত ব্যক্তি হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যাকে আল্লাহ বহু যুক্তি প্রমাণ দিয়েও ব্যাভিচারের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে ফেরাতে পারেননি। অতপর কক্ষের ছাদের কাছে যখন তাঁর পিতা ইয়াকুবের আংগুল কামড়ে ধরা অবস্থায় ছবি ভেসে ওঠলো এবং সেই সাথে কোরআনের সেসব আয়াত লিখিত কিছু ফলক তুলে ধরা হলো, যাতে এমন নোংরা কাজ অর্থাৎ ব্যভিচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তখনও তিনি ব্যভিচার থেকে নিবৃত্ত হতে চাননি। অবশেষে আল্লাহ 'আমার বান্দাকে ঠেকাও' এই নির্দেশ দিয়ে যখন জিবরাঈলকে পাঠালেন এবং তিনি এসে হযরত ইউসুফের বুকে থাপ্পড় মারলেন, কেবল তখনই তিনি নিবৃত্ত হলেন। মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন, এসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের অনুসারী তাফসীরকাররা হযরত ইউসুফের সামনে কোরআনের আয়াত লিখিত ফলকও উন্মোচন করে ছেড়েছেন। এসব কাহিনী যে একেবারেই ভিত্তিহীন ও মনগড়া, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, মহিলা দৈহিকভাবেই ব্যভিচারের প্রস্তুতি নিয়েছিলো, আর ইউসুফ শুধুমাত্র মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাত আল্লাহর স্মারক দলীল তাঁর সামনে ভেসে ওঠলে তিনি ওই কু-বাসনা ত্যাগ করেন।

তাফসীর আল মানারের লেখক শেখ রশীদ রেজা এই শেষোক্ত মতও খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, মহিলা ইউসুফকে মারতে উদ্যত হয়েছিলো, কেননা তিনি নিজের মনিবের আদেশ অত্যন্ত অবমাননাকরভাবে লংঘন করেছেন। অন্যদিকে ইউসুফ প্রথমে এই আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্যোগ নিলেও পরে ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি দৌড় দেয়ার সাথে সাথে মহিলা পেছন থেকে তাঁকে ধরে ফেললো এবং পেছন দিক থেকে তাঁর জামাও ছিঁড়ে ফেললো।

'হাম্মুন' বা ঝুঁকে পড়ার ব্যাখ্যা হিসাবে 'মারতে উদ্যত হওয়া' ও 'মার প্রতিরোধে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া' বলার পক্ষে কোনো প্রমাণ আলোচ্য আয়াতে নেই। এটা নিছক একটা ব্যক্তিগত অভিমত এবং খুবই কৃত্রিম ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা।

আমি যখন এই আয়াতের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি এবং নবুওত লাভের আগে ও পরে হযরত ইউসুফ এই ধূর্ত মহিলার সাথে মিসরের প্রাসাদপুরীতে যে পরিবেশে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেন তা পর্যালোচনা করেছি, তখন আমার মনে 'মহিলা ইউসুফের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলো এবং ইউসুফও তার প্রতি ঝুঁকে পড়তো ....' এ আয়াতে যে ব্যাখ্যা অগ্রগণ্য মনে হয়েছে তা এই যে, এটা ছিলো দীর্ঘ দিনব্যাপী পরিচালিত একটা কু-প্ররোচনার অভিযানের ফল। প্রথম দিকে ইউসুফ কু-প্ররোচনা প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করে নিষ্পাপ থাকতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একনাগাড়ে দীর্ঘ দিন এ অপচেষ্টা চলতে থাকায় সর্বশেষ তিনি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন, যা একজন মানুষ হিসাবে তাঁর জন্য মোটেই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত ছিলো না, কিন্তু এটা ছিলো সাময়িক। পরক্ষণেই তিনি আত্মসংবরণ ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই দুঃসহ

অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন, কিন্তু কোরআনের আয়াতে সেই মানবীয় ভাবাবেগের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি যা পর্যায়ক্রমে হযরত ইউসুফের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, কখনো দুর্বল ও কখনো প্রবল হয়েছে, কখনো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে আবার কখনো অবদমিত হয়েছে। কোরআন এই কাহিনীর জন্যে যতোটুকু প্রয়োজন কেবল ততোটুকই আবেগের উত্থান পতনের বিবরণ দিয়েছে। ক্রমোন্নতিশীল মানব জীবনের আওতাধীন যতোটুকু না হলেই নয়, ততোটুকুই বর্ণনা করেছে। কাহিনীর শুরুতে ও শেষে হযরত ইউসুফের যে দৃঢ়তা ছিলো, তার বিবরণই দিয়েছে বিস্তারিতভাবে। কেননা সেটাই ছিলো দীর্ঘস্থায়ী। মাঝখানে ক্ষণিকের জন্যে যে দুর্বল মুহূর্তগুলো নিছক মানবীয় দুর্বলতা হিসাবে এসেছে, তাও সংক্ষেপে উল্লেখ করেছে, যাতে সত্য ও ন্যায়ের সাথে বাস্তবতা এবং শালীন পরিবেশের সঠিক সমন্বয় ঘটে পরিপূরণ সাধিত হয়।

আল্লাহভীতির কাছে মোহনীয় নারীর ছলনা ব্যর্থ

সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে গিয়ে আমার যা বুঝে এসেছে, তা এতোটুকুই। এটুকুই মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি ও নবীসুলভ পবিত্রতার নিকটতম। বস্তুত ইউসুফ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ছিলেন না। তবে আল্লাহর একজন প্রিয় ও সৎ বান্দা ছিলেন। তাই একটি মুহূর্তের জন্যেও তাঁর দুর্বলতা মানসিক দুর্বলতা অতিক্রম করে শরীরিক দুর্বলতার পর্যায়ে গড়ায়নি। এই মানসিক দুর্বলতা ততোক্ষণই টেকসই হয়েছে, যতোক্ষণ আল্লাহর সতর্কবাণী ও নিষেধাজ্ঞা তাঁর মনে আসেনি। যখনই আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী তাঁর বিবেকে ও স্মৃতিপটে ভেসে ওঠেছে, তখনই সেই মানসিক দুর্বলতাও উধাও হয়ে গেছে এবং দৃঢ়তা ফিরে এসেছে।(১)

'এভাবেই আমি তাঁকে সত্যের প্রমাণ দেখিয়েছি, যাতে তার কাছ থেকে অন্যায় অশ্লীলতাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি। .... (আয়াত-২৪)

'আর তারা উভয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলো।'............ (আয়াত-২৫)

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ সচেতন হয়ে ওই ঘৃণ্য প্রস্তাব থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টায় ছুটতে লাগলেন। আর মহিলা তখনো পাশবিক উত্তেজনায় অধীর হয়ে তাঁর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো।

'সে ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেললো।'

অর্থাৎ তাকে দরজা থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে টেনে ধরতে গিয়ে পেছন থেকে জামা ছিঁড়ে ফেললো।

আর এই সময় ঘটে গেলো কাকতালীয় ঘটনা,

'দু'জনেই দেখলো মহিলার স্বামীকে।'

এখানেই স্পষ্ট হয়ে গেলো মহিলাটি কত ধুরন্ধর। সন্দেহের উদ্রেককারী দৃশ্যটি দেখে স্বামীর মনে যে প্রশ্ন জাগতে পারে, তার ত্বরিত জবাব খুঁজে পেলো সে। সে যুবক ইউসুফকে অভিযুক্ত করে বললো,

---

(১) আল্লামা যামাখশারী তাফসীরে কাশশাফে লিখেছেন, 'প্রশ্ন ওঠতে পারে যে, আল্লাহর একজন নবীর পক্ষে এটা কিভাবে সম্ভব হলো যে, তিনি পাপ কাজের দিকে ঝুঁকলো এবং এ ইচ্ছা তার মনে স্থান পেলো এর জবাব এই যে, নিছক যৌবনের তাড়নায় তার মনে যৌন মিলনের কামনা জন্মেছিলো মাত্র, যার ইচ্ছা ও সংকল্পের সাদৃশ্য ছিলো, কিন্তু আসলে তা ইচ্ছা ও সংকল্পের সমপর্যায়ের ছিলো না। এই কামনা যদি প্রবল আকারে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান না থাকতো, তাহলে এ কামনা সংযতকারী আল্লাহর কাছে প্রশংসিত হতো না। কেননা, পরীক্ষা যতো কঠিন হবে, তাতে ধৈর্য ধারণ করা ততোই মর্যাদাপূর্ণ বিবেচিত হবে। ইমাম যামাখশারী মুতাযেলা মতাবলম্বী হলেও এখানে তার যুক্তি মোটামুটিভাবে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

'যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর প্রতি খারাপ ইচ্ছা পোষণ করে তার কী শাস্তি হওয়া উচিত?'

কিন্তু যেহেতু সে ইউসুফকে ভালোবাসতো। তাই সে তার মারাত্মক কোনো ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক ছিলো। তাই সে তাকে অপেক্ষাকৃত লঘু ও নিরাপদ দন্ড দেয়ার পরামর্শ দিয়ে বললো,

'কারাদন্ড অথবা অন্য কোনো কষ্টদায়ক শাস্তিই তার প্রাপ্য।'

এক্ষণে মিথ্যা অপবাদের জবাবে ইউসুফ সত্য প্রকাশে সোচ্চার হয়ে ওঠলেন।

'ইউসুফ বললো, ও-ই তো আমাকে ফুসলিয়েছে।' .... (আয়াত-২৬)

এ পর্যায়ে কোরআন উল্লেখ করছে যে, ওই মহিলার জনৈক আত্মীয় নিজের অভিমত জানিয়ে এ বিতর্কের নিষ্পত্তি করে দেয়।

'মহিলার জনৈক আত্মীয় অভিমত দিলো যে, ইউসুফের জামা যদি সম্মুখ থেকে ছিঁড়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে) মহিলা সত্য বলেছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী। আর যদি জামার পেছন থেকে ছিঁড়ে থাকে তাহলে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী।'

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এই অভিমতদাতা কোথায় ও কখন নিজের মত জানালো? সে কি মহিলার স্বামীর সাথেই আসছিলো এবং ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শী, না তার স্বামী তাকে ডেকেছে এবং তার কাছে বিষয়টা তুলে ধরে তার মতামত চেয়েছে? এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত এ রকমই ঘটে থাকে যে, স্বামী স্ত্রীর পরিবারের কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ডেকে সে যা দেখেছে তা জানায়। বিশেষত তৎকালীন মিসরের সেই নৈতিকতাহীন পরিবেশে এ রকমটি ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

উভয়টিই ঘটে থাকতে পারে। যেটাই ঘটুক, মূল বিষয়টার তাতে কোনো হেরফের হয় না। অভিমতদাতার এই অভিমতকে কোরআনে 'শাহাদাত' বা সাক্ষ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা সংশ্লিষ্ট ঘটনায় ও উভয় পক্ষের তরফ থেকে পেশকৃত বিরোধে তার অভিমত যখন চাওয়া হয়েছে, তখন তার অভিমতকেই সাক্ষ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা সাক্ষ্য যেমন বিরোধ নিষ্পত্তিতে ও ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে থাকে, এটাও তেমনি সাহায্য করেছে। জামা যদি সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, ইউসুফ তার ওপর বলাৎকার করার চেষ্টা করেছিলো, মহিলা তার প্রতিরোধ করেছিলো এবং সেই প্রতিরোধের ফলেই জামা ছিঁড়েছে। এমনটি হয়ে থাকলে মহিলা সঠিক অভিযোগই করেছে এবং ইউসুফই মিথ্যাবাদী। আর যদি জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, ইউসুফ মহিলার কাছ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ছুটে ছিলো এবং মহিলা তার পিছু ধাওয়া করেছিলো। এরূপ হয়ে থাকলে ইউসুফ সত্যবাদী ও মহিলা মিথ্যুক। প্রথমটাই আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটা সঠিক হলে মহিলার সত্যবাদিতা ও ইউসুফের মিথ্যাচার প্রমাণিত হবে। মহিলা হচ্ছে গৃহকর্ত্রী ও মনিব, আর ইউসুফ হলেন একজন ভৃত্য। তাই প্রথমটা আগে উল্লেখ করারই অধিকতর দাবীদার। আর এটা সত্যের কাছাকাছি হওয়াও অসম্ভব নয়।

'অতপর যখন সে দেখলো যে, জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া ....।' (আয়াত-২৮)

বাস্তব যুক্তিভিত্তিক সাক্ষ্যের আলোকে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, মহিলাই ফুসলিয়েছে এবং সে-ই আবার উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চক্রান্ত এঁটেছে। এখানে হাজার হাজার বছর আগের জাহেলী সমাজে 'অভিজাত শ্রেণী'র চরিত্রের একটা দিক আমাদের সামনে এমনভাবে ফুটে ওঠেছে, যেন তা আজকেরই ঘটনা। আজকের মতই যৌন অপরাধে লিপ্ত হবার উদগ্র বাসনা এবং সেটাকে সমাজের চোখ থেকে আড়াল করারও ফন্দি ফিকির।

'সে (মিসরের প্রধানমন্ত্রী) বললো, এটা তোমাদেরই চক্রান্ত ....' (আয়াত ২৮-২৯)

এখানে প্রবল উত্তেজনাকর ঘটনাকেও শিথিল মনোভাব নিয়ে পর্যালোচনা করা এবং আপন বেগমের কারসাজিকে গোটা মহিলা সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তার কারসাজিকে হালকা করার প্রয়াসই শুধু নেয়া হচ্ছে না; বরং খানিকটা প্রশংসাসূচক ভাষাও প্রয়োগ করা হচ্ছে। বস্তুত কোনো মহিলাকে 'তোমাদের চক্রান্ত খুবই সাংঘাতিক' বললে সে নাখোশ হবে না। কেননা সে এ দ্বারা অনুভব করবে যে, সে একজন পরিপক্ক ও দক্ষ নারীতে পরিণত হয়েছে এবং বড় বড় চক্রান্ত করার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

এরপর প্রধানমন্ত্রী ইউসুফকে সম্বোধন করেন,

'ইউসুফ, তুমি এটা এড়িয়ে যাও।'............ (আয়াত-৩০)

অর্থাৎ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিও না এবং এ নিয়ে কারো সাথে আলোচনা করো না। ব্যাপারটা যাতে জানাজানি হয়ে না যায়, সে জন্যই এই সযত্ন প্রয়াস। আর নিজ ভৃত্যকে ফুসলিয়ে অপকর্মে লিপ্ত হবার চেষ্টাকারিণী মহিলাকে উপদেশ দিলেন,

'আর হে বেগম, তুমি তোমার অপকর্মের জন্যে ক্ষমা চাও ....'

এ হচ্ছে প্রত্যেক জাহেলী সমাজের বিত্তশালী গোষ্ঠীর চিরাচরিত চরিত্র।

এই পর্যায়ে এসে এই কলংকজনক ঘটনার বর্ণনার পরিসমাপ্তি ঘটে। আয়াতে এই জঘন্য যৌন অপরাধের ঘটনা পর্যাপ্ত শালীনতার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কিন্তু এরপরও প্রধানমন্ত্রী আপন ভৃত্যের সাথে স্ত্রীর প্রেমে বাধা দিতে পারেননি; বরং তার চেষ্টা অব্যাহত থেকেছে। এটাই প্রাসাদপুরীর চিরাচরিত রীতি।

তবে প্রাসাদপুরীতে অনেক দাসদাসী ও চাকর চাকরানী থাকে, তাই কোনো কিছুই গোপন থাকে না, বিশেষত অভিজাতদের মধ্যে তো নয়ই। কেননা ওই সমাজের নারীদের তাদের ভেতরে সংঘটিত ঘটনাবলী নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা ছাড়া এবং এসব কেলেংকারি প্রচার করে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজই থাকে না।

'শহরে একদল নারী বলে বেড়াতে লাগলো যে, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী নিজের ভৃত্যের সাথে প্রেম-প্রণয়ে লিপ্ত ....' (আয়াত-৩১)

এ ধরনের ঘটনায় সকল জাহেলী সমাজের নারীরা কমবেশী এ ধরনের কথাই বলে থাকে। এ পর্যায়ে এসেই সর্বপ্রথম জানা গেলো, এই মহিলা আসলে আযীয উপাধিধারী মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী এবং ইউসুফকে মিসরের যে ব্যক্তি খরিদ করেছিলো, তিনি স্বয়ং মিসরের প্রধানমন্ত্রী। শহরে কেলেংকারির খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এটাও জানা গিয়েছিলো।

'প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী আপন ভৃত্যকে ফুসলায়। সে তার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে। তার প্রেম তার হৃদয়ের আবরণ চূর্ণ করে তার ভেতরে ঢুকে গেছে। 'শিগাফ' অর্থ পাতলা আবরণ।

'আমরা তাকে সুস্পষ্ট বিকারগ্রস্ত দেখতে পাচ্ছি।'

কেননা সে দেশের সেরা ব্যক্তির সেরা স্ত্রী। একটা ইবরানী ক্রীতদাসের ভালোবাসায় মাতোয়ারা হওয়া তার পক্ষে অশোভন। এমনও হতে পারে যে, তারা এ ব্যাপারটা জানাজানি হওয়াতেই সমালোচনামুখর হয়েছিলো। কেননা এই শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টিতে এই কাজটা ততো নিন্দনীয় নয় যদি তা গোপন থাকে। কেবল প্রকাশ হওয়াটাই নিন্দনীয়।

পরবর্তী আয়াতে দেখানো হচ্ছে, এই অভিজাত শ্রেণীতে কতো বিচিত্র ঘটনা ঘটতে পারে এবং এই মহিলা কতো সাহসের সাথে ও কতো চাতুর্যের সাথে নিজ শ্রেণীর মহিলাদের প্রচারণার মোকাবেলা করেছিলো।

'যখন সে মহিলাদের চক্রান্তের কথা শুনলো...........' (আয়াত-৩২)

সে নিজ প্রাসাদে তাদের জন্যে ভোজের আয়োজন করে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, তারা সবাই অভিজাত শ্রেণীর মহিলা ছিলো। কেননা তারাই প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং তাদের জন্যেই এতো উচ্চাংগের আপ্যায়নের আয়োজন হতে পারে। আয়াতের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয়, তারা বালিশে হেলান দিয়ে গদিতে বসে খেতো এবং এটাও ছিলো তৎকালীন প্রাচ্যের রীতি। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীও তাদের জন্যে এরূপ বিলাসী বৈঠকের আয়োজন করেছিলো। তাদের সবাইকে খাবারে ব্যবহার করার একটি করে ছুরি দিলো। এ থেকেও বুঝা যায়, তৎকালীন মিসরে বিলাস ব্যসন ও ভোগবাদী সভ্যতা অত্যন্ত উচ্চমানে অবস্থান করছিলো। কেননা এতো হাজার বছর আগেও খাবারে ছুরি ব্যবহার সেই সভ্যতার চরমোন্নতিরই লক্ষণ। যখন মহিলারা ছুরি দিয়ে গোশত টুকরো করছিলো বা ফলের খোসা ছাড়াচ্ছিলো, ঠিক সে সময় তাদের সামনে এসে পড়লো তরুণ ইউসুফ।

'মহিলাটি ইউসুফকে বললো, ওদের সামনে বেরিয়ে এসো। অতপর সে যখন বেরিয়ে এলো, তখন তারা তাকে অসাধারণ মনে করলো।

অর্থাৎ তাকে দেখে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।'

'এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেললো।'

অর্থাৎ আকস্মিক বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে তারা চাকু দিয়ে হাত কেটে ফেললো।

এবং বললো, 'হাশা লিল্লাহ।'

'হাশা লিল্লাহ' একটা বিস্ময়সূচক বাক্য।

'এ তো মানুষ নয়, এ তো এক সম্মানিত ফেরেশতা।'(১)

আমরা আগেই বলেছি, ফেরেশতার উল্লেখ ও অন্যান্য আলামত দ্বারা বুঝা যায়, তৎকালীন মিসরীয় সমাজে কিছু ইসলামী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো।

মহিলাটি তার শ্রেণীর মহিলাদের ওপর বিজয়ী হয়ে এবং তাদের ইউসুফের রূপমুগ্ধ হতে দেখে ঔদ্ধত্যের চরম সীমায় উপনীত হলো। তারপর চরম নির্লজ্জের মতো ইউসুফের ওপর নিজের কর্তৃত্বের বাহাদুরি প্রকাশ করে বললো,

'এ হচ্ছে সেই মানুষটি, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে তিরস্কার করেছো।' .... (আয়াত-৩৩)

এখন তোমরাই দেখো, তাকে দেখে তোমরা কতো বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছো।

'আমি তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে সংযম অবলম্বন করেছে।'

অর্থাৎ তোমাদের মতো আমিও তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়েছে। সে এ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছে যে, ইউসুফ তার প্রলোভন ও প্ররোচনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কিন্তু আসলে ইউসুফের ওপর তার কর্তৃত্ব এখনো বহাল রয়েছে। তাই সে মহিলাদের সামনে নিজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ যৌন আবেগ প্রকাশ করতে কোনোই দ্বিধা সংকোচ অনুভব করলো না।

---

(১) মিসরীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাকে মুগ্ধকারী তরুণ ইউসুফের সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় তাফসীকারকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ তার মধ্যে সৌন্দর্যের এমন উপাদানও কল্পনা করেছেন, যা পুরুষের নয় বরং নারীর জন্যে মানান সই। অথচ এ ধরনের উপাদান নারীকে মুগ্ধ করে না। পুরুষের সৌন্দর্যের বিশেষ ধরনের উপাদান রয়েছে, যা তার পৌরুষকেই পূর্ণতা দান করে। অবশ্য অভিজাত শ্রেণীর নারীদের স্বভাবের বিকৃতি বশত নারী সুলভ সৌন্দর্যোপাদানও তাদেরকে মুগ্ধ করতে পারে।

'এখন যদি সে আমার নির্দেশমতো কাজ না করে তাহলে অবশ্যই তাকে জেল খাটতে হবে এবং অপমানিত হতে হবে।'

এভাবে সে হুমকিও দিলো এবং হুমকির আওতাধীন নতুন করে প্রলোভনও দিলো।

মোহিত নারীদের সভায় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর বক্তব্য ও অন্যান্য মহিলার মন্তব্য শুনে ইউসুফ আল্লাহর কাছে মনে মনে বললেন,

'হে আমার প্রতিপালক, ওরা যেদিকে আমাকে ডাকছে, তার চেয়ে জেলে যাওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।' .... (আয়াত-৩৪)

শুধু নিজের মনিবের স্ত্রীর কথা না বলে তিনি সকল স্ত্রীলোকের কথা বললেন। কেননা তারা সবাই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ব্যভিচারে অংশীদার। অতপর তিনি এই সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে সকাতর অনুনয় বিনয় করেন।

'আর যদি তুমি তাদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাকে রক্ষা না করো তাহলে আমি তাদের দিকে আকৃষ্ট হবো এবং আমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।'

তাঁর এই দোয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি এমন একজন মানুষের অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটালেন যে নিজের মানবীয় দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন, নিজের নিষ্পাপত্ব নিয়ে দাম্ভিকতায় লিপ্ত নয়, সে আল্লাহর অধিকতর সাহায্য ও সুরক্ষা কামনা করে এবং প্রলোভন ও ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে চায়।

'অতপর তার প্রতিপালক তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র থেকে তাকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'

ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার কাজটা আল্লাহ এভাবেও করে থাকতে পারেন যে, ইউসুফকে বশে আনার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের মনে হতাশা সৃষ্টি করে দিয়েছেন অথবা ইউসুফের মনে দৃঢ়তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, যার ফলে তাদের কোনো প্রলোভনই আর তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করে না অথবা এই উভয় পন্থায়ই।

'নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'

অর্থাৎ তিনি সকল ষড়যন্ত্রমূলক হুমকি, আস্ফালনও শোনেন, সকল দোয়াও শোনেন এবং ষড়যন্ত্র ও দোয়ার পশ্চাতে কী মনোভাব বিরাজ করে তাও জানেন।

এভাবে হযরত ইউসুফ তার দ্বিতীয় কঠিন পরীক্ষা অতিবাহিত করেন। আর এই সাথে তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হয়।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۭ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۭ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ۭ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ۭ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاۗءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ

৩৫. (আযীযসহ অন্যান্য) লোকদের কাছে অতপর এটাই (তখনকার মতো) সঠিক (সিদ্ধান্ত) মনে হলো যে, তাকে কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (হলেও) কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে,. অথচ তারা ইতিমধ্যে (তার সচ্চরিত্রতার) যাবতীয় নিদর্শন (ভালো করেই) দেখে নিয়েছে।

রুকু ৫

৩৬. (ঘটনাক্রমে সে সময়) তার সাথে আরো দু'জন যুবকও (একই) কারাগারে প্রবেশ করলো, (একদিন) ওদের একজন (ইউসুফকে) বললো, অবশ্যই আমি (স্বপ্নে) দেখেছি, আমি আংগুর নিংড়ে (তার) রস বের করছি, অপর জন বললো, আমি দেখেছি আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং (কিছু) পাখী তা (খুঁটে খুঁটে) খাচ্ছে (উভয়ই ইউসুফকে বললো); তুমি আমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দাও, আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি (আসলেই) ভালো মানুষদের একজন। ৩৭. সে বললো (তোমরা নিশ্চিত থাকো), এ বেলা তোমাদের যে খাবার দেয়া হবে তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি তোমাদের উভয়কে এর ব্যাখ্যা বলে দেবো (তবে জেনে রেখো); এ (যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা তা) হচ্ছে সে জ্ঞানেরই অংশবিশেষ, যা আমার মালিক আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; (আমি প্রথম থেকেই) আসলে তাদের মিল্লাত বর্জন করেছি যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, (উপরন্তু) তারা আখেরাতেও বিশ্বাস করে না। ৩৮. আমি তো আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতেরই অনুসরণ করে আসছি; (ইবরাহীমের সন্তান ও তাঁর অনুসারী হিসেবে) এটা আমাদের শোভা পায় না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবো; (তাওহীদের) এ (উত্তরাধিকার) হচ্ছে আমাদের ওপর এবং সমস্ত মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার এক (মহা) অনুগ্রহ, কিন্তু (আমাদের)

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ
خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً
سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا
لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ
وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ
تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫
فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ
الْمَلِكُ اِنِّيْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ

অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। ৩৯. হে আমার জেলের সাথীরা (তোমরাই বলো), মানুষের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন মালিক ভালো না এক আল্লাহ তায়ালা (ভালো), যিনি মহাপরাক্রমশালী; ৪০. তাকে ছেড়ে তোমরা যাদের এবাদাত করছো, তা তো কতিপয় নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, (অজ্ঞতাবশত) যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা রেখে দিয়েছো, অথচ আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে (তাদের সাথে) কোনো দলিল প্রমাণ নাযিল করেননি, (মূলত) আইন বিধান জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই; আর (এ বিধানের বলেই) তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী করবে না; (কারণ) এটাই হচ্ছে সঠিক জীবনবিধান, কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এটা) জানে না। ৪১. হে আমার জেলের সাথীরা (এবার তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনো), তোমাদের একজন সম্পর্কে কথা হচ্ছে, সে তার মালিককে শরাব পান করাবে, আর অপরজন, যার মাথা থেকে পাখী (খুঁটে খুঁটে) রুটি খাচ্ছিলো, তার সম্পর্কে কথা এই যে, (অচিরেই) সে শূলবিদ্ধ হবে (এটা হচ্ছে সে বিষয়টির ব্যাখ্যা), যা তোমরা উভয়ে জানতে চাচ্ছো (ইতিমধ্যেই কিন্তু) তার ফয়সালা করা হয়ে গেছে! ৪২. তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে সে মনে করেছে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে, তাকে (উদ্দেশ করে) সে বললো, (তুমি যখন মুক্তি পাবে তখন) তোমার মালিকের কাছে আমার সম্পর্কে বলো যে, (আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারি), কিন্তু (সে মুক্তি পাওয়ার পর) শয়তান তাকে তার মালিকের কাছে (ইউসুফের প্রসংগে বলার কথা) ভুলিয়ে দিলো, ফলে কয়েক বছর সময় ধরে সে কারাগারেই পড়ে থাকলো।

রুকু ৬

৪৩. (ঘটনা এমন হলো, একদিন) বাদশাহ (তার পারিষদদের) বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, সাতটি পাতলা গাভী সাতটি মোটা গাভীকে খেয়ে ফেলছে, (আরো দেখলাম)

سُنۢبُلٰتٍ خُضۡرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰۤاَيُّهَا الۡمَلَاُ اَفۡتُوۡنِىۡ فِىۡ رُءۡيَاىَ اِنۡ كُنۡتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُوۡنَ ﴿۴۳﴾ قَالُوۡۤا اَضۡغَاثُ اَحۡلَامٍ ۚ وَمَا نَحۡنُ بِتَاۡوِيۡلِ الۡاَحۡلَامِ بِعٰلِمِيۡنَ ﴿۴۴﴾ وَقَالَ الَّذِىۡ نَجَا مِنۡهُمَا وَادَّكَرَ بَعۡدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمۡ بِتَاۡوِيۡلِهٖ فَاَرۡسِلُوۡنِ ﴿۴۵﴾ يُوۡسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيۡقُ اَفۡتِنَا فِىۡ سَبۡعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٌ وَّسَبۡعِ سُنۢبُلٰتٍ خُضۡرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّىۡۤ اَرۡجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴۶﴾ قَالَ تَزۡرَعُوۡنَ سَبۡعَ سِنِيۡنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدۡتُّمۡ فَذَرُوۡهُ فِىۡ سُنۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّمَّا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۴۷﴾ ثُمَّ يَاۡتِىۡ مِنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ سَبۡعٌ شِدَادٌ يَّاۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّمَّا تُحۡصِنُوۡنَ ﴿۴۸﴾

সাতটি সবুজ (ফসলের) শীষ আর শেষের সাতটি (দেখলাম) শুকনো, হে (আমার দরবার) প্রধানরা, তোমরা আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যদি তোমরা (কেউ এ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানো! ৪৪. তারা বললো (হে রাজন), এ তো হচ্ছে কতিপয় অর্থহীন স্বপ্ন, আমরা (এ ধরনের) অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। ৪৫. যে দু'জনের একজন (কারাগার থেকে) মুক্তি পেয়ে ছিলো, দীর্ঘ দিন পর তার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হলো, সে (দরবারী লোকদের কথাবার্তা শুনে) বললো, আমি এক্ষুণি তোমাদের এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দাও। ৪৬. (কারাগারে গিয়ে সে বললো,) হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী, তুমি আমাদের 'সাতটি মোটা গাভী সাতটি পাতলা গাভীকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শ্যামল ফসলের শীষ অপর সাতটি শুকনো শীষ'-এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা বলে দাও, যাতে করে এ ব্যাখ্যা নিয়ে আমি মানুষদের কাছে ফিরে যেতে পারি, হয়তো (এর ফলে) তারা (স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে তোমার মর্যাদা সম্পর্কেও) জানতে পারবে। ৪৭. সে বললো (এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও সে সম্পর্কে তোমাদের করণীয় হচ্ছে), তোমরা ক্রমাগত সাত বছর ফসল ফলাতে থাকবে (এ সময় প্রচুর ফসল হবে), অতপর ফসল তোলার সময় আসলে তোমরা যে পরিমাণ ফসল তুলতে চাও তার মধ্য থেকে সামান্য অংশ তোমরা খাবারের জন্যে রাখবে, তা বাদ দিয়ে বাকি অংশ শীষ সমেত রেখে দেবে (এতে করে ফসল বিনষ্ট হবে না)। ৪৮. এরপর আসবে সাতটি কঠিন (খরার) বছর, যা এর আগের কয় বছরের (গোটা সঞ্চয়ই) খেয়ে ফেলবে, তা ছাড়া যা তোমরা আগেই এ কয় বছরের জন্যে জমা করে থাকবে, সামান্য পরিমাণ, যা তোমরা (বীজের জন্যে) রেখে দেবে।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ

فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا

عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز اَنَا

رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ

بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٢﴾

৪৯. অতপর একটি বছর এমন আসবে, যখন মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে, তাতে তারা (প্রচুর) আংগুরের রসও বের করবে।

রুকু ৭

৫০. (সে ব্যক্তি যখন বাদশাহকে স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা বললো, তখন) বাদশাহ (আগ্রহের সাথে) বললো, তাকে আমার সামনে নিয়ে এসো, যখন (শাহী) দূত তার কাছে (এ খবর নিয়ে কারাগারে) এলো, তখন সে বললো (আমি অনুকম্পায় মুক্তি চাই না, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আগে প্রমাণিত হোক), তুমি বরং তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, সে নারীদের (সঠিক) ঘটনাটা কি ছিলো? যারা (প্রকাশ্য মজলিসে) নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিলো, যদিও আমি জানি, আমার মালিক তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন (কিন্তু আমার মুক্তির আগেই আমার নির্দোষিতার ঘোষণা একান্ত প্রয়োজন)। ৫১. (এরপর) বাদশাহ সে নারীদের (দরবারে তলব করলো এবং তাদের) জিজ্ঞেস করলো, (ঠিক ঠিক আমাকে বলো তো, সেদিন) তোমাদের কী হয়েছিলো যেদিন তোমরা ইউসুফের কাছ থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে; তারা বললো, আশ্চর্য আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য! আমরা তো তার ওপর কোনো পাপ কিংবা এ ধরণের কোনো অভিযোগই দেখতে পাইনি; (একথা শুনে) আযীযের স্ত্রী বললো, এখন (যখন) সত্য প্রকাশিত হয়েই গেছে, (তখন আমাকেও বলতে হয়, আসলে) আমিই তার কাছে অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো সত্যবাদীদের একজন। ৫২. (শাহী তদন্তের খবর শুনে ইউসুফ বললো,) এটি (আমি) এ জন্যে (করতে বলেছিলাম), যেন সে (বাদশাহ) জেনে নিতে পারে, আমি (আযীযের) অবর্তমানে (তার আমানতের) কোনো খেয়ানত করিনি, কেননা আল্লাহ তায়ালা কখনো খেয়ানতকারীদের সঠিক পথ দেখান না।

তাফসীর

আয়াত ৩৫-৫২

এ হচ্ছে হযরত ইউসুফের জীবনের তৃতীয় ও শেষ কঠিন পরীক্ষা। এরপর তার জীবনে শুধুই সুখ ও প্রাচুর্য বিরাজ করে। ইতিপূর্বে তিনি শুধু দুঃখ কষ্টে ধৈর্যের পরীক্ষা দেন। এখন তার সুখ ও প্রাচুর্যে কেমন ধৈর্য ধারণ করতে পারেন সেই পরীক্ষা দেয়ার পালা। এ পর্বে তাকে নিরপরাধ

প্রমাণিত হয়েও জেলে যেতে হয়। বস্তুত নিরপরাধ মানুষের জেল খাটা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর, যদিও নিজের নিরপরাধ হওয়ার অনুভূতি তাকে সান্ত্বনা যোগায়।

এই কষ্টের যুগেই আল্লাহর অনুগ্রহ হযরত ইউসুফের ওপর বর্ষিত হয়। তন্মধ্যে স্বপ্নের তাবীর সংক্রান্ত জ্ঞান এবং আংশিক অদৃশ্য জ্ঞান অন্যতম। এরপর তার ওপর আল্লাহর আরো অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এভাবে যে, রাজার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তার নির্দোষিতা ঘোষিত হয় এবং তার এমন সব প্রতিভা প্রকাশ পায়, যা তাকে উচ্চতর মর্যাদা, বৃহত্তর ক্ষমতা ও সর্বাত্মক আস্থার অধিকারী করে।

ইউসুফ (আ.)-এর কারাজীবন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান

'এরপর তারা তাকে কিছু কালের জন্যে জেলে আটকে রাখা সংগত মনে করলো।' .... (আয়াত ৩৫)

এ রকমই হয়ে থাকে প্রাসাদের পরিবেশ, একনায়কতন্ত্রের পরিবেশ, অভিজাত মানুষদের পরিবেশ এবং জাহেলিয়াতের পরিবেশ। ইউসুফের সততা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী মহিলাদের সম্মেলন ডেকে তাদের সামনে তার সেই যুবককে উপস্থিত করার ঔদ্ধত্য দেখালো, যার প্রেমে সে হাবুডুবু খাচ্ছিলো, অতপর তাদের সামনে ঘোষণাও করলো যে, সে যথার্থই তার রূপে মুগ্ধ, মহিলারাও তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্ররোচনা দিলো, এ কারণে ইউসুফ এই পরিবেশ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন, ওদিকে মহিলা সমাগত নারী সমাবেশে নির্লজ্জভাবে ঘোষণা দিলো যে, তার ভৃত্যকে হয় তার কথামতো কাজ করতে হবে, নচেত অপমানিত হয়ে জেল খাটতে হবে, অতপর তিনি ওই মহিলার আদেশ পালন করার ওপর জেল খাটাকে অগ্রাধিকার দিলেন, এতোসব কিছু ঘটে যাওয়ার পরও তারা তাঁকে সাময়িকভাবে জেলে পাঠানো সমীচীন মনে করলো।

সম্ভবত হুমকির পর নিজের চেষ্টা তদবীরের সাফল্য সম্পর্কে মহিলা হতাশ হয়ে গিয়েছিলো এবং সম্ভবত তার কার্যকলাপ সমাজের সর্বস্তরে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিলো। তাই ঘরোয়া ব্যাপার স্যাপার বাইরে যাতে না ছড়ায়, তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু পুরুষরা যখন তাদের ঘরোয়া ব্যাপার ও তাদের ঝি-বৌদের কার্যকলাপের গোপনীয়তা রক্ষা করতে অক্ষম হয়েই পড়লো, তখন এমন একজন নিরীহ যুবককে জেলে পাঠাতে তো তারা অক্ষম নয়, যার একমাত্র দোষই হলো, সে অপকর্মের সহযোগী হতে রাযি হয়নি, উচ্চ মহলের এক মহিলা তার প্রেমে পড়েছে এবং সেই মহিলা সম্পর্কে সমাজে রি রি পড়ে গেছে!

'ইউসুফের সাথে দু'জন যুবক জেলে ঢুকলো।'............ (আয়াত ৩৬)

পরবর্তীতে আমরা জানতে পারবো যে, এরা উভয়ে রাজার বিশিষ্ট ভৃত্য ছিলো।

জেলে ইউসুফ কী অবস্থায় কাটিয়েছেন, তিনি কেমন সততা ও পরোপকারের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর প্রতি কিভাবে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং বন্দীদের পরম প্রিয়জনে পরিণত হয়েছেন, সেসব বিষয়ে কোরআনে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়েছে। এসব বন্দীর কেউ কেউ নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশত জেলে এসেছিলো। রাজার সাময়িক আক্রোশের শিকার হয়ে তারা জেলে আসতে বাধ্য হয়েছে। এসব বিবরণ সংক্ষিপ্ত করে কোরআন শুধু জেলে ইউসুফের অবস্থান, দুই প্রতিবেশী যুবকের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও তাঁর কাছে তাদের স্বপ্নের বিবরণ দেয়ার ঘটনাবলী বর্ণনা করেছে। তারা তাঁর কাছে স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে তার তাবীর জানতে চেয়েছিলো। কেননা তাঁর সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও পুণ্যময়তা দেখে তারা তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে।

'তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম মদ বানাচ্ছি। অপরজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম, মাথায় রুটি বয়ে বেড়াচ্ছি, তা থেকে পাখীরা রুটি খাচ্ছে। তুমি আমাদের এর ব্যাখ্যা জানাও। তোমাকে আমরা সৎলোক দেখতে পাচ্ছি।' ....(আয়াত ৩৬)

ইউসুফ কয়েদীদের মধ্যে নিজের সত্য ও নির্ভুল আকীদা বিশ্বাস প্রচারে এই সুযোগ কাজে লাগালেন। কেননা আকীদা বিশ্বাস, চরিত্র ও মানুষের প্রভুত্বভিত্তিক বাতিল সমাজ ব্যবস্থা সংশোধনের দায়িত্ব থেকে কেউ কেবল করাবন্দী হওয়ার ওজুহাতে রেহাই পেতে পারে না।

ইউসুফ তাঁর কারাসংগীদ্বয়কে প্রথমে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি শীঘ্রই তাদের স্বপ্নের তাবীর বলে দেবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে তার তাওহীদপ্রীতি ও শেরেক পরিত্যাগের পুরস্কার হিসাবে এ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে তিনি শুরু থেকেই এই মর্মে তাদের আস্থা অর্জন করেন যে, তিনি স্বপ্নের তাবীর ব্যক্ত করতে পারেন। অনুরূপভাবে তিনি তাদের কাছে নিজের নতুন ধর্মের জন্যেও পরিচিত হয়ে রইলেন। ....(আয়াত ৩৭-৩৮)

হযরত ইউসুফের আলোচনা থেকে মানুষের মন জয়ের কৌশল, দক্ষতা ও নম্রতা জানা যায়। বস্তুত এ জিনিসটাও কেসসার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

'ইউসুফ বললো, তোমাদের বরাদ্দকৃত খাদ্য আসার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের তাবীর বলে দেবো। এ জিনিসটা আমার প্রভু আমাকে শিখিয়েছেন।' .... (আয়াত ৩৭)

এই জোরদার আশ্বাস থেকে আস্থা জন্মে যে, হযরত ইউসুফ আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যা দ্বারা তিনি ভবিষ্যতের খাদ্য সংক্রান্ত তথ্য জানেন এবং যা জানেন তা অন্যকে অবহিত করেন। এটা একে তো আল্লাহর প্রিয় ও সৎ বান্দা ইউসুফের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের স্বাক্ষর, উপরন্তু সেকালে স্বাভাবিকভাবেই যত্রতত্র ও যখন তখন নবীর আবির্ভাব ঘটতো এবং অনেকেই নানারকম স্বপ্ন দেখতো। আর হযরত ইউসুফও স্বপ্নের তাবীর সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী বলে নিজেকে দাবী করলেন। তাই মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটা ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উপযোগী একটা চমৎকার সময় বলে বিবেচিত হলো। তাছাড়া তিনি উক্ত বিশেষ জ্ঞানকে তার স্বপ্নের তাবীরের জ্ঞানের উৎস হিসাবেও উল্লেখ করলেন। এভাবে সব দিক দিয়ে সময় উপযুক্ত সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি মূল দাওয়াত এভাবে উপস্থাপন করলেন,

'যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী নয়, তাদের ধর্ম আমি ত্যাগ করেছি।'

এ কথা দ্বারা তিনি সেই জাতির প্রতি ইংগিত করেছেন যে জাতির মধ্যে তিনি এ যাবত লালিত পালিত হয়েছেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর পরিবার ও রাজার অনুসারীরা, কিন্তু তিনি এই দুই জনকে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ না করে গোটা জাতিকে দোষারোপ করেছেন, যাতে ওই দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব আহত না হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে না পড়ে। এটা তাঁর প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় বহন করে।

জেলে বসেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা

এখানে হযরত ইউসুফের উক্তিতে আখেরাতের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকেই পৃথিবীতে যতো নবী রসূল এসেছেন, তাদের সকলের মুখে প্রচারিত আকীদা বিশ্বাসের অন্যতম উপাদান ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো এই আখেরাত। তথাকথিত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ধ্বজাধারীদের এ বক্তব্য মোটেই সঠিক নয় যে, আখেরাত সংক্রান্ত আকীদা বিশ্বাস সর্বশেষে প্রচারিত হয়েছে। এ কথা সত্য যে, জাহেলী যুগের পৌত্তলিক আকীদা বিশ্বাস উৎখাত করার জন্য কার্যত সর্বশেষে এ আকীদার আগমন ঘটেছে, কিন্তু এটা আল্লাহর কাছ থেকে আগত

ও সকল নবী রসূলের মুখ দিয়ে প্রচারিত ওহীভিত্তিক বিশুদ্ধ ধর্মের মৌলিক উপাদান হিসাবে আবহমানকাল ধরেই বিদ্যমান ছিলো।

হযরত ইউসুফ কুফরীর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করার পর তাঁর ও তাঁর পিতৃপুরুষদের অনুসৃত ইসলামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন,

'আর আমি অনুসরণ করেছি আমার বাপ দাদা ইবরাহীম, এসহাক ও ইয়াকুবের আদর্শ। আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়।...........' (আয়াত ৩৮)

অর্থাৎ আমি যে আদর্শ অনুসরণ করছি, তা হলো নির্ভেজাল তাওহীদ, যা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করার অনুমতি কখনো দেয় না। আর এই তাওহীদের সন্ধান পাওয়া আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের ফল। যারা তাওহীদের সন্ধান পেয়েছে, তারা যেমন এ অনুগ্রহের অংশীদার হয়েছে, তেমনি সকল মানুষই ইচ্ছুক ও সচেষ্ট হলে এর সন্ধান পেতে পারে এবং এই অনুগ্রহে অংশীদার হতে পারে। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি, বিবেক বুদ্ধি ও চেতনা অনুভূতিতে এর মূলনীতি ও আভাস ইংগিত রয়েছে। তাদের আশেপাশে বিরাজমান বিশ্ব প্রকৃতিতেও এর সাক্ষ্য প্রমাণ ও আভাস রয়েছে। নবী রসূলদের আনীত বাণীতেও এর সুস্পষ্ট বিবরণ এবং ঘোষণা রয়েছে, কিন্তু মানুষ এই অনুগ্রহের কথা জানে না এবং জানলেও তার জন্যে কৃতজ্ঞ নয়।

'এটা আমাদের ওপর ও মানুষের ওপর বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহের অংশ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।'

অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, উদারতা, বিনয় ও সতর্কতা সহকারে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে উভয়ের মনমগযে ইসলামী আকীদা প্রবেশ করানো হচ্ছে, কিন্তু এই দীর্ঘ ভূমিকার পরেই শুরু হয়েছে কারাসংগীদ্বয়ের মনমগযে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস আরো জোরদারভাবে প্রবেশ করানোর চেষ্টা। সম্পূর্ণ খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে ইসলামী আকীদা তুলে ধরা হচ্ছে এবং প্রচলিত পৌত্তলিক ধ্যান ধারণা ও সমাজ ব্যবস্থার ভ্রান্তি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

'হে আমার কারাসংগীদ্বয়, ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য প্রভু থাকা ভালো না শুধুমাত্র মহাপরাক্রান্ত ও একক আল্লাহই ভালো?' .... (আয়াত ৩৯-৪০)

এই ক'টা সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো কথার মধ্য দিয়ে হযরত ইউসুফ ইসলামের সব ক'টা মৌলিক বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করে দিয়েছেন এবং শেরেকী, তাগুতী ও জাহেলী চিন্তাধারার সমস্ত ভিত্তিগুলো নড়বড়ে করে দিয়েছেন।

'হে আমার কারাসংগীদ্বয়' এ সম্বোধন দ্বারা তাদের উভয়কে তিনি নিজের সাথীতে পরিণত করেছেন এবং তাদের প্রিয় হতে চেষ্টা করেছেন, যাতে এই প্রীতির প্রবেশদ্বার দিয়ে মূল দাওয়াতে ও মূল আকীদার মধ্যে তাদেরকে ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব হয়। তথাপি তিনি এক্ষুনি তাদের সরাসরি দাওয়াত না দিয়ে নিছক একটা বাস্তব বিষয় হিসাবে তুলে ধরেছে যে,

'ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক প্রভু ভালো, না এক অদ্বিতীয় মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ ভালো?'

এটা এমন এক প্রশ্ন যা মানুষের স্বভাবের গভীরে প্রচন্ড আঘাত হানে, প্রবল জোরে ধাক্কা দেয়। বস্তুত মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি ও বিবেক বুদ্ধি একজন মাত্র উপাস্যকেই চেনে। তাহলে কোন যুক্তিতে একাধিক খোদা, প্রভু ও উপাস্যের সমাগম ঘটে? যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টির প্রভু ও মনিব হবার অধিকারী, তাদের এবাদাত আনুগত্য পাওয়ার হকদার, নিজের হুকুম জারি করার, নিজের আইন চালু করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে, সে সত্তা একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ।

যখন প্রমাণিত হলো যে, এবাদাত উপাসনা ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী মাত্র একজন এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে একমাত্র তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তখন এটাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, মানব জাতির জীবনে একজনই হবে হুকুম ও আইন জারি করার অধিকারী। মানব জাতির জন্যে এক মুহূর্তের জন্যেও এটা বৈধ হতে পারে না যে, আল্লাহকে এক অদ্বিতীয় বলে জানবে, তাঁকেই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলে চিনবে, আর তারপর অন্য কারো আনুগত্য করবে, অন্য কারো হুকুম মেনে চলবে এবং আল্লাহর পাশাপাশি অন্যান্য সত্ত্বাকেও মনিব, প্রভু এবং হুকুমদাতা হিসাবে স্বীকার করবে। যিনি রব বা প্রভু হবেন, তিনি অবশ্যই এই বিশ্ব জগতের সর্বময় কর্তা, পরিচালক ও হুকুমদাতা হবেন। বিশ্ব প্রকৃতিতে নিজের হুকুম বা আদেশ চালাতে পারে না এবং বিশ্বকে তার আদেশ মানতে বাধ্য করতে পারে না, এমন দুর্বল ও অক্ষম সত্ত্বা মানুষের প্রভু হবে এবং তাদের ওপর নিজের হুকুম বা আদেশ নিষেধ চালাবে, এটা কখনো হতে পারে না।

একক ও সর্বাত্মক ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নেয়া অজ্ঞ, অক্ষম, অদৃশ্য জগত সম্পর্কে অন্ধ একাধিক সত্ত্বাকে প্রভু বা খোদা মানার চেয়ে অবশ্যই ভালো। মানব জাতি একাধিক সত্ত্বাকে প্রভু ও হুকুমদাতা মেনে নেয়ার কারণে যতো দুঃখ দুর্দশা ও বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, ততোটা দুঃখ দুর্দশা ও বিপর্যয়ের শিকার আর কোনো কারণে কখনো হয়নি। আল্লাহর বান্দাদের নিজেদের খোদায়ীর আওতায় ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নিজেদের স্বার্থ ও লালসা চরিতার্থকরণের হাতিয়ারে পরিণত করে এই ভুয়া প্রভুরা যতো অনর্থ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, ততোটা আর কেউ কখনো করেনি। দুনিয়ার এসব অবৈধ খোদা, যারা আল্লাহর প্রভুত্ব ও হুকুম জারি করার অধিকার জবর দখল করেছে, কিংবা অজ্ঞ মানুষেরা বিভিন্ন ভিত্তিহীন ও অলীক কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা বল প্রয়োগ, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের প্রভুর আসনে বসিয়েছে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও নিজেদের স্বার্থ, লোভ লালসা, ক্ষমতালিপ্সা ও বিরোধী দলনের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার দুর্নিবার উচ্চাভিলাষ থেকে মুক্ত হতে পারে না।

অথচ এক অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ সম্পূর্ণ নিস্বার্থ এবং সমগ্র বিশ্বের সহায় সম্পদের প্রতি নিরাসক্ত। তিনি মানব জাতির কাছ থেকে কেবল তাঁর দেয়া বিধান মোতাবেক সততা, আত্মসংযম ও গঠনমূলক তৎপরতা আশা করেন। আল্লাহর বিধান মোতাবেক হলে দুনিয়ার যাবতীয় কাজই এবাদাতে গণ্য হয়। যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক এবাদাতের হুকুম তিনি মানুষকে দিয়েছেন তা দ্বারাও তিনি তাদের মন মগয, চিন্তা ও কর্মের সংশোধন চান। নচেত আল্লাহ মানুষের এবাদাতেরও মুখাপেক্ষী নন। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'হে মানব জাতি! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ অভাবহীন, চির প্রশংসিত।' সুতরাং এক আল্লাহর আনুগত্য ও একাধিক প্রভুর আনুগত্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

এরপর হযরত ইউসুফ (আ) জাহেলী আকীদা বিশ্বাস খন্ডনে আরো এক কদম এগিয়ে যান। তিনি বলেন,

'তোমরা তোমাদেরই নির্ধারিত কিছু নামের আনুগত্য করে থাকো, যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি, ...' (আয়াত ৪০)

এই সব প্রভু, চাই মানুষ হোক কিংবা জ্বিন, শয়তান, আত্মা, ফেরেশতা বা আল্লাহরই হুকুমে বশীভূত প্রাকৃতিক শক্তিই হোক, তাদের প্রভুত্ব করা, হুকুম জারি করা ও আইন রচনা করার কোনোই অধিকার নেই। সত্যিকার প্রভুসুলভ কোনো গুণ বৈশিষ্ট্যও তাদের নেই। প্রভুত্ব একমাত্র

আল্লাহর ন্যায়সংগত অধিকার, যিনি তাঁর বান্দাদের সৃষ্টিও করেছেন এবং তাদের ওপর সর্বপ্রকার ক্ষমতা ও বল প্রয়োগের ক্ষমতাও রাখেন, কিন্তু মানুষ বিভিন্ন জাহেলী ধ্যান ধারণার অধীন কিছু মনগড়া নাম স্থির করে নেয়। সেগুলোর জন্যে কিছু গুণাবলী কল্পনা করে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় যে গুণ বৈশিষ্ট্য স্থির করে, তা হলো তার আইন ও হুকুম জারি করার ক্ষমতা এবং অধিকার। অথচ আল্লাহ এ ক্ষমতা কাউকে দেননি।

এই পর্যায়ে এসে ইউসুফ (আ.) তার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আঘাত হানেন। তিনি জানিয়ে দেন, আইন রচনা, হুকুম জারি করা ও এবাদাত পাওয়ার অধিকার কার?

'আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। এটা অপরিবর্তনীয় বিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

হুকুম দেয়া প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য বিধায় হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। যে ব্যক্তি এ অধিকার দাবী করে, সে আল্লাহর ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়, চাই এই দাবীদার কোনো ব্যক্তি, দল, শ্রেণী, সংস্থা, জাতি বা সারা দুনিয়ার মানুষ কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার আকারে হোক না কেন। আর যে ব্যক্তি বা দল বা জাতি আল্লাহর হুকুম দেয়ার অধিকার নিজের প্রাপ্য বলে দাবী করে, সে প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত হয়। এটা যে কুফরী, সেটা প্রমাণ করা শুধু এই আয়াতের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং ইসলামের মৌল জ্ঞানে স্বতসিদ্ধভাবেই তা প্রমাণিত।

আইন রচনা ও হুকুম জারি করায় এই খোদায়ী অধিকার মানুষ কর্তৃক দাবী করার পন্থা শুধু একটা নয় বরং একাধিক। কুফরীকে অনিবার্য করে তোলা এই অপকর্মটা শুধু ফেরাউনের মতো 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু' বা 'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো প্রভু থাকতে পারে বলে আমার জানা নেই' বলার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয় না; বরং শুধু আল্লাহর শরীয়ত বা আইনকে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা থেকে অপসারণের মাধ্যমে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার অধিকার দেয়ার মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। এমনকি সমগ্র মুসলিম জাতি মিলিত হয়েও যদি কাউকে আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাসনের ক্ষমতা প্রদান করে এবং সে আল্লাহকে সার্বভৌমত্বের মালিক ও আইনের উৎস মনে না করে, তাহলেও সে ইসলাম বহির্ভূতই থেকে যাবে। বস্তুত সার্বভৌমত্বের উৎস ও মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। অনেক মুসলিম গবেষক শাসন পরিচালনা ও আইন রচনার ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করে না। সমগ্র মানব জাতি মিলিত হয়েও আইন রচনার ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। এ ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষ শুধু আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর আইন বাস্তবায়ন করার অধিকারী। আল্লাহ যে বিষয়ে আইন রচনা করেননি, সে বিষয়ে কাউকে ক্ষমতা ও অধিকার না দিয়ে থাকলে কারো আইন রচনা করার ক্ষমতা থাকে না।

ইউসুফ (আ.) তার 'আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন রচনা করার ক্ষমতা নেই', এই উক্তির যৌক্তিকতা এভাবে তুলে ধরেন– 'তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদাত করা চলবে না।'

আল্লাহর জন্যে একান্তভাবে নির্ধারিত 'এবাদাত' শব্দের তাৎপর্য কী, তা না জেনে আমরা এই যুক্তির সারবত্তা ততোটা বুঝতে পারবো না, যতোটা একজন আরব বুঝতে পারে।

এবাদাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নতিস্বীকার করা, অধীন হওয়া, আনুগত্য করা। শুরুতে এর অর্থ আনুষ্ঠানিক এবাদাত ছিলো না। শুধুমাত্র এর আভিধানিক অর্থই প্রচলিত ছিলো।

অতপর যখন সর্বপ্রথম এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কোনো আনুষ্ঠানিক এবাদাত প্রবর্তিত হয়নি যে, এই শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হবে। তখনো তার আভিধানিক অর্থই পারিভাষিক অর্থে পরিণত হয়েছিলো। এ দ্বারা বুঝানো হতো একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য, দাসত্ব ও হুকুম পালন, চাই তা আনুষ্ঠানিক এবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক, কিংবা নৈতিক বা আইনগত বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন করাই এবাদাতের অর্থ। এটা আল্লাহর একান্ত অধিকার, তার কোনো সৃষ্টির এতে কোনো অধিকার নেই।

এভাবে যখন আমরা এবাদাতের অর্থ বুঝি, তখন আমরা এটাও বুঝতে পারি যে, একমাত্র আল্লাহকে এবাদাতের যোগ্য মনে করার কারণেই হুকুম দেয়া তাঁর একমাত্র অধিকার হলো কিভাবে। বস্তুত হুকুম দেয়ার অধিকার যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারো থাকতো, তাহলে এবাদাত বা আনুগত্য আল্লাহর একক অধিকার হিসাবে বহাল থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রাকৃতিক হুকুম ও ইচ্ছামূলক হুকুম উভয়ই সমান।

আমরা পুনরায় দেখতে পাই যে, আইন রচনা ও হুকুম জারি করার অধিকার কেউ নিজের জন্যে দাবী করলে সে আল্লাহর দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়। আর এটা ইসলামের একটা স্বতসিদ্ধ বিধান। কেননা এ দ্বারা বান্দা আল্লাহর একক আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে শেরেক। এ দ্বারা মানুষ আল্লাহর দ্বীন থেকে সুনিশ্চিতভাবে বেরিয়ে যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহর এই অধিকারের ওপর নিজের দাবী প্রতিষ্ঠাকারীকে যারা সমর্থন করে, আনুগত্য করে এবং তার এই অন্যায় দাবীর প্রতি তাদের মনে কোনো ঘৃণা থাকে না, তারাও অদ্রূপ আল্লাহর দ্বীন থেকে বহির্ভূত। এই উভয় পক্ষই আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় সমান।

ইউসুফ (আ.) ঘোষণা করছেন যে, হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহর একক অধিকার হওয়াই সঠিক আনুগত্য। কারণ এভাবেই একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা সম্ভব।

'এ হচ্ছে সঠিক দ্বীন বা আনুগত্য।......... '

বস্তুত ইসলাম ব্যতীত আর কোনো ধর্ম বা আনুগত্য সঠিক হতে পারে না। কেননা একমাত্র এর মধ্য দিয়েই আল্লাহর একক হুকুম দানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং একক আনুগত্য বাস্তবায়িত হতে পারে।

'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'

বস্তুত অজ্ঞতাই অধিকাংশ মানুষকে আল্লাহর সঠিক দ্বীনের ওপর বহাল থাকতে দেয় না। কোনো বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে ওই বিষয়ে বিশ্বাস করা এবং ওই বিশ্বাস বাস্তবায়িত করাও সম্ভব হয় না। কোনো মানবগোষ্ঠী যদি ইসলামের মর্ম উপলব্ধি না করে, তাহলে তারা যে মুসলমান এ কথা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। তাদের অজ্ঞতাকেও অজুহাত হিসাবে মেনে নেয়া যায় না। আর এমতাবস্থায় তাদের মুসলমান বলে স্বীকৃতিও দেয়া যায় না। কারণ অজ্ঞতা যে কোনো গুণ অর্জনের পথে বাধা। কোনো কিছুতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে প্রথমে তা জানা জরুরী। এটা অকাট্য ও স্বতসিদ্ধ সত্য।

ইউসুফ (আ.) এই সংক্ষিপ্ত ক'টা কথার মাঝে ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি শেরেক এবং জাহেলিয়াতের ওপরও কঠোর আঘাত হেনেছেন।

পৃথিবীতে আল্লাহর সর্বপ্রধাম গুণ প্রভুত্ব তথা মানুষকে হুকুম দেয়া, আইন রচনা করা ও আইনের অনুগত বানানোর ক্ষমতার দাবীদার না হয়ে কোনো তাগুতী শক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সে মুখে না বললেও বাস্তবে এই গুণ বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করার মাধ্যমেই এর দাবীদার হয়ে থাকে। কেননা কথার চেয়ে কাজ অধিক শক্তিশালী প্রমাণ।

আর তাগুত তথা বাতিল শক্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন ইসলাম ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাস মানুষের মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। মানুষের বিশ্বাসে যদি এটা প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই, তা হলে বাতিল ও খোদাদ্রোহী শক্তি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। কারণ এবাদাত আল্লাহ ছাড়া আর কারো হতে পারে না। আর হুকুমের আনুগত্যই হলো এবাদাত। এটাই এবাদাতের প্রকৃত মর্মার্থ।

এ পর্যন্ত পৌঁছেই ইউসুফ (আ.) তার ভাষণ সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি তার সাথীদ্বয়কে স্বপ্নের তাবীর জানিয়ে দেন এবং এর মাধ্যমে তার ওপর আস্থা আরো বাড়িয়ে দেন,

'হে আমার কারাসংগীদ্বয়, ...' (আয়াত ৪১)

বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যে তিনি সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের মালিককে চিহ্নিত না করে কেবল 'তোমাদের একজন' বলেছেন।

তবে তিনি এ তাবীর সুনিশ্চিত বলে জোর দেন,

'যে দু'টো বিষয় তোমরা জানতে চেয়েছিলে, তার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ আল্লাহ যেভাবে ফয়সালা করেছেন সেভাবেই তা ঘটবে।

নিরপরাধ কয়েদীকে ইউসুফ রাজার কাছে তার ব্যাপারে তদন্ত অনুষ্ঠানের অনুরোধ পৌঁছে দিতে বললেন। কেননা রাজার কাছে কেউ ইউসুফ ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর ঘটনাটা সম্পূর্ণ উল্টোভাবে ব্যক্ত করেছিলো। আর রাজা কোনো তদন্ত বা অনুসন্ধান না চালিয়েই তাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

'যে কয়েদী সম্পর্কে ইউসুফ জানতো যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে সে বললো, তোমার মনিবের কাছে আমার বিষয়টা উল্লেখ করো। .... ' (আয়াত ৪২)

অর্থাৎ আমার অবস্থা ও আসল পরিচয় তোমার সেই মনিবকে জানিয়ে দিয়ো, যার অধীনে তুমি কাজ করো। এখানে মনিব, হুকুমদাতা, আইন রচয়িতা ও শাসক অর্থে 'রব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ দ্বারা ইসলামী পরিভাষায় ব্যবহৃত 'রব' শব্দের তাৎপর্য আরো সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, মিসরের রাখাল রাজারা ফেরাউনের মত মুখ দিয়ে প্রভুত্ব বা খোদায়ীর দাবী করতো না। ফেরাউনের মতো তারা দেব দেবীদের সাথে নিজেদের বংশ পরিচয়ও যুক্ত করতো না। সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব ছাড়া প্রভুত্ব ও খোদায়ীর আর কোনো উপাদানও তারা ধারণা করতো না।

ইউসুফ কর্তৃক রাজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

এ পর্যায়ে এসে আয়াতে কাহিনীর এই অংশটুকু বাদ দেয়া হয়েছে যে, স্বপ্নের তাবীর ইউসুফ যেভাবে করেছিলেন সেভাবেই কার্যকর হয়েছিলো। এখানে শূন্যতা রাখা হয়েছে। আমরা এ থেকে জানতে পারি যে, এ সব কিছু এভাবেই সংঘটিত হয়েছিলো, কিন্তু ইউসুফ যে কয়েদী সম্পর্কে মুক্তি পাবে ধারণা করেছিলেন, সে যথাযথভাবে মুক্তি পেয়েছিলো, কিন্তু ইউসুফের অনুরোধ সে প্রাসাদের অসংখ্য ব্যস্ততায় ভুলে গেলো এবং তার মনিবের কাছে উপস্থাপন করলো না।

'শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো তার মনিবের কাছে উল্লেখ করার কথা। ....'

'ফলে ইউসুফ বেশ কয়েক বছর জেলে পড়ে থাকলো।' (আয়াত-৪২)

ইউসুফ জেলে পড়ে রইলেন। কারণ আল্লাহ চেয়েছিলেন তাঁকে দুনিয়ার যাবতীয় উপায় উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল আল্লাহর প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত রাখবেন। কোনো বান্দার মাধ্যমে কিংবা বান্দার সাথে যুক্ত উপায় উপকরণের মাধ্যমে তার কোনো প্রয়োজন পূরণ না হোক

এটাই ছিলো আল্লাহর ইচ্ছা। আর এটা ছিলো তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আলামত।

বস্তুত আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাদের কর্তব্য, তারা যেন তাদের প্রতিটি কাজে ও পদক্ষেপে একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করেন এবং তাঁর সাহায্য চান, কিন্তু মানবিক দুর্বলতাবশত যারা এটা করতে ব্যর্থ হন, আল্লাহ তাদের এটা করতে বাধ্য করেন, যাতে পরে বুঝে শুনে স্বেচ্ছায়, সানন্দে ও স্বতস্ফূর্তভাবে এরূপ করতে সম্মত হয়ে যান। এতে করে তাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে আমরা রাজসভায় হাযির হয়েছি। রাজা একটা উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখেছেন। সভাসদ জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছ থেকে স্বপ্নের তাবীর চাইলেন।

'রাজা বললো, আমি স্বপ্ন দেখেছি সাতটা চিকন গাভী সাতটা মোটা গাভীকে খেয়ে ফেললো ....।' (আয়াত ৪৩-৪৪)

রাজা তার স্বপ্নের তাবীর জানতে চাইলেন, কিন্তু উপস্থিত সভাসদ ও জ্যোতিষীরা তার তাবীর বলতে পারলো না। এমনও হতে পারে যে, তারা এ স্বপ্নের ফল খারাপ বুঝতে পেরে বলতে চায়নি। কারণ রাজ-সভাসদদের এটাই চিরাচরিত নিয়ম, রাজা যাতে আনন্দিত হয় তারা সেটাই শুধু প্রকাশ করে আর যাতে বিব্রত হয় সেটা গোপন করে এবং কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তারা বললো, এ একটা জগাখিচুড়ি স্বপ্ন। এটা কোনো পূর্ণাংগ স্বপ্ন নয় যার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 'আমরা স্বপ্নের তাবীরে বিশেষজ্ঞ নই,' অর্থাৎ কোনো জগাখিচুড়ি স্বপ্নের তাবীর বলতে পারিনে। কেননা এর কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকে না।

আমরা এ পর্যন্ত মোট তিনটে বিবরণ দেখলাম। হযরত ইউসুফের স্বপ্ন, কারাবন্দীদ্বয়ের স্বপ্ন এবং রাজার স্বপ্ন। প্রতিবার এসব স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া এবং এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ থেকে সেকালের মিসর ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর পরিবেশ কেমন ছিলো আমরা তা বুঝতে পারি। স্বপ্নের তাবীরের যে বিশেষ জ্ঞান হযরত ইউসুফকে দেয়া হয়েছিলো, তা ওই যুগের প্রচলিত রীতির সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলো। নবীদের প্রত্যেক মোজেযাই থাকে এরূপ, কিন্তু এটা হযরত ইউসুফের মোজেযা ছিলো কিনা, সেটা ভিন্ন প্রসংগ। এখানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। আপাতত আমরা রাজার স্বপ্ন সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করতে চাই।

এ পর্যায়ে হযরত ইউসুফের কারাসংগীদ্বয়ের মধ্য থেকে যে জন মুক্তি পেয়েছিলো তার কথা আসছে। শয়তান তাকে হযরত ইউসুফের বিষয়ে আলোচনা করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলো। সে সহসা একদিন হযরত ইউসুফের কথা মনে করলো। হযরত ইউসুফ তাদের দু'জনের স্বপ্নের তাবীর বলেছিলেন এবং তা সত্য হয়ে ফলেছিলো।

'দু'জনের মধ্য হতে যে জন মুক্তি পেয়েছিলো এবং দীর্ঘ দিন পর তার মনে পড়লো, সে বললো, আমি এ স্বপ্নের তাবীর তোমাদের জানিয়ে দেবো। আমাকে পাঠাও।' (আয়াত ৪৫)

এখানে আবার কাহিনীর ছেদ পড়ে। তাকে জেলখানায় ইউসুফের কাছে পাঠানো হয় এবং সে গিয়ে জিজ্ঞেস করে–

'হে মহা সত্যবাদী ইউসুফ, আমাদের এ স্বপ্নের তাবীর বলে দাও যে, সাতটা চিকন গাভী ....।' (আয়াত ৪৬)

রাজার সুরা সরবরাহকারী ইউসুফকে 'মহা সত্যবাদী' আখ্যায়িত করলো। ইতিপূর্বে তার সম্পর্কে তার যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিলো, সেটাই তাকে এরূপ উপাধি দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সে রাজার কথিত স্বপ্নের বিবরণ হু-বহু উদ্ধৃত করলো। কেননা সে তার ব্যাখ্যা চায় ও রহস্য জানতে চায়। সে যথাযথভাবে এ বিবরণ উদ্ধৃত করে, যাতে সে তার ব্যাখ্যা নিয়ে আসতে পারে।

কিন্তু ইউসুফের বক্তব্য সরাসরি ব্যাখ্যা নয় এবং শুধু ব্যাখ্যাও নয়। এতে ব্যাখ্যার সাথে সাথে এর ফলাফলের মোকাবেলা করার ব্যাপারে পরামর্শও রয়েছে। এভাবে এটা অধিকতর পূর্ণাংগ বক্তব্যে পরিণত হয়েছে।

'ইউসুফ বললো, তোমরা একাক্রিমে সাত বছর ফসল ফলাবে।' (আয়াত ৪৭)

এ ছিলো সাতটা স্বর্ণপ্রসূ বছর, যার প্রতীক ছিলো সাতটা মোটা গাভী।

'তোমরা যা ফসল কাটবে তা তার শীষেই রেখে দিও।' কেননা এতে তা পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে।

'কেবল নিজেদের খাওয়ার জন্যে কিছু বাদে।'

অর্থাৎ যা খাওয়ার জন্যে প্রয়োজন হবে তা শীষ থেকে ছাড়িয়ে নিও। আর বাদবাকী ফসল পরবর্তী দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর জন্যে সংরক্ষণ করো, যার প্রতীক ছিলো স্বপ্নে দেখা জীর্ণ শীর্ণ সাতটা গাভী।

'এরপর সাতটা কঠিন বছর আসবে।' (আয়াত ৪৮)

অর্থাৎ তখন ফসল জন্মাবে না।

'তোমাদের সঞ্চিত খাদ্য ওই সাত বছরে নিশেষ হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ক্ষুধার তীব্রতায় সব সঞ্চিত খাদ্য ফুরিয়ে যাবে।

'কেবল তোমাদের সঞ্চিত সামান্য কিছু খাদ্য বাদে।'

অর্থাৎ যা সযত্নে রক্ষা করবে তাই বেঁচে যাবে।

'এরপর আবার একটা প্রাচুর্যের বছর আসবে।' (আয়াত ৪৯)

অর্থাৎ এই দুর্ভিক্ষের সাত বছর কেটে যাবে, যা তোমাদের সঞ্চিত খাদ্যের ভিত্তিতে চলবে। অতপর একটা প্রাচুর্যের বছর আসবে। এ সময় মানুষকে পানি ও ফসল দিয়ে সাহায্য করা হবে এবং তারা নানা ফলের নির্যাস বের করবে।' যয়তুন, আংগুর ইত্যাদি জন্মাবে ও তার নির্যাস বের করা হবে।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শেষের প্রাচুর্যের বছরটি সম্পর্কে রাজার স্বপ্নে কোনো আভাস নেই। সুতরাং এ বছর সম্পর্কে সুসংবাদ দান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফকে শেখানো 'ইলমে লাদুন্নী' তথা বিশেষ জ্ঞানের ফসল। এ সুসংবাদ রাজার সুরা সরবরাহকারী রাজা ও জনগণকে জানালো। দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার শেষে আল্লাহ একটা সুখময় বছর উপহার দেবেন।

ইউসুফ (আ.)-এর কারামুক্তি

এখানেও কিছু দৃশ্য উহ্য রাখা হয়েছে। সুরা সরবরাহকারী এসে স্বপ্নের তাবীর বর্ণনা করলো, তাবীরদাতা ইউসুফ সম্পর্কে এবং তার জেল খাটার কারণ ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলো, এ সবই উহ্য রাখা হয়েছে। শুধু উল্লেখ করা হয়েছে, এর ফলে রাজার মনে ইউসুফকে দেখার আগ্রহ সৃষ্টির বিষয়টি।

'রাজা বললো, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' (আয়াত-৫০)

এবার পুনরায় রাজার আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়টি উহ্য রাখা হয়, কিন্তু আমরা দেখতে পাই, ইউসুফ রাজার দূতকে ফেরত পাঠালেন। এই দূত কে ছিলো তা আমরা জানি না, সে ওই সুরা সরবরাহকারীও হতে পারে, যাকে রাজার স্বপ্নের তাবীর জানতে পাঠানো হয়েছিলো, আবার অন্য

কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তাও হতে পারে, যাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। আমরা দেখতে পাই, দীর্ঘ কারাবাস সত্ত্বেও ইউসুফ (আ.) জেল থেকে মুক্তিলাভে তাড়াহুড়ো করেন না। তিনি আগে গুরুত্ব দেন তার বিষয়টার তদন্তকে এবং নিজের নির্দোষ প্রমাণিত হওয়াকে। তার মহান প্রতিপালক আল্লাহ স্বয়ং তাকে মার্জিত ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই তিনি ধীর স্থির ও শান্ত থাকেন সর্বাবস্থায়। কখনো তাড়াহুড়ো করেন না।

হযরত ইউসুফের দুটো ভূমিকায় বিরাট ব্যবধান দেখতে পাওয়া যায় এবং এতে আল্লাহর শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একটা ভূমিকায় তিনি মুক্তি পেতে যাচ্ছে এমন এক কারাবন্দীকে রাজার কাছে তার বিষয়ে আলোচনা করতে বলেন। অপর ভূমিকায় তিনি রাজদূতকে ফেরত পাঠান এবং জেল থেকে বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করেন এই বলে, 'তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং জিজ্ঞেস করো হাত কেটে ফেলা মহিলাদের সম্পর্কে। ....'

রাজা তাকে ডেকে পাঠানোর যে আদেশ দেন, ইউসুফ তা প্রত্যাখ্যান করেন, যাতে তিনি তার বিষয়টা তদন্ত করে দেখেন এবং যে মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিলো, তাদের অবস্থাটাও জানতে পারেন। তার বিরুদ্ধে পরিচালিত ওই ষড়যন্ত্রের তদন্ত হোক এই শর্তে তিনি জেল থেকে বেরুতে রাযি হন, যাতে এ এই তদন্ত তিনি জেলে থাকা অবস্থায়ই তার কোনো তদবীর বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্পন্ন হয়। কেননা তিনি নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন, সত্যকে বেশী দিন ধামা চাপা দিয়ে রাখা যায় না।

হযরত ইউসুফ যে 'রব' (প্রভু) শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কোরআন তা তার সঠিক অর্থেই উদ্ধৃত করেছে। আসল রবের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য, আর রাজার ক্ষেত্রেও। রাজা দূতের প্রভু। কেননা রাজা হুকুমদাতা এবং সে তার হুকুমের অনুগত। আর আল্লাহ হচ্ছেন ইউসুফের প্রভু। কেননা তিনি ইউসুফের হুকুমদাতা মনিব এবং ইউসুফ তাঁর অনুগত।

রাজদূত ফিরে গেলো, রাজাকে সব কথা জানালো এবং রাজা মহিলাদের ডেকে কৈফিয়ত তলব করলেন। এই কথাগুলো উহ্য রাখা হয়েছে, যা পরবর্তী আয়াত থেকে জানা যাবে।

'রাজা বললো, তোমরা যে ইউসুফকে ফুসলিয়েছিলে, সে সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী?'

'খাতবুন' যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বলা হয়। এ বক্তব্য থেকে মনে হয়, রাজা আগেই তদন্ত অনুষ্ঠিত করেছেন এবং মহিলাদের মুখোমুখি হবার আগেই তাদের বিষয়টা আগাগোড়া জেনে নিয়েছেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত এ রকমই ঘটে থাকে। রাজা কোনো বিষয়ে বিচার অনুষ্ঠানের আগেই সে সম্পর্কে তদন্ত করে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে নেন। তিনি আসল দোষী কে তা জেনে নিয়েই তাদের মুখোমুখি হন।

'তোমরা যে ইউসুফকে ফুসলিয়েছিলে, সে সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী?'

এ থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর গৃহে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় কী কী ঘটেছিলো, তার কিছু কিছু আভাস পাই। সেখানে যে মহিলারা ইউসুফের ওপর কতো চাপ সৃষ্টি করেছিলো এবং কতো প্ররোচনা দিয়েছিলো– তা আমরা জানতে পারি– যদিও তা ইতিহাসের অতি প্রাচীনকালের একটা ঘটনা। বস্তুত নতুন বা প্রাচীন যাই হোক, জাহেলিয়াতের চরিত্র চিরকাল একই। যেখানেই প্রাচুর্য, বিলাসিতা, প্রাসাদ, রাজকীয় উজীর অমাত্য থাকে, সেখানে আভিজাত্যের নামে চরিত্রহীনতা ও লাম্পট্য বিরাজ করবেই।

রাজার উপস্থিতিতে অভিযোগের ব্যাপারে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, তখন সেখানে অস্বীকার করার কোনো উপায় যে ছিলো না, তা সুস্পষ্ট।

'তারা বললো, 'হাশা লিল্লাহ', ইউসুফের মধ্যে আমরা খারাপ কিছু জানি না।'

বস্তুত এটা এমন ধ্রুব সত্য, যা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। যদিও তারা তেমন সত্যনিষ্ঠ মহিলা ছিলো না, কিন্তু ইউসুফের সততা নিয়ে বিতর্কের কোনোই অবকাশ ছিলো না।

এ পর্যায়ে ইউসুফের প্রেমিকা এগিয়ে এলো। সে তার ব্যাপারে আগেই হতাশ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারছিলো না। তাই সে সত্য কথা স্বীকার করতে এগিয়ে এলো।

'আযীযের স্ত্রী বললো, এখন সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলিয়েছি এবং সে সত্যবাদী।'.... (আয়াত ৫১)

পরবর্তী আয়াত থেকে জানা যায়, এ মহিলা এত দীর্ঘকাল পরেও হযরত ইউসুফের প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়নি। এও বুঝা যায়, এ মহিলার মনে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সে ঈমান এনেছে।

এর কারণ এই যে, সে যেন জানে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না। (আয়াত ৫২)

এই স্বীকারোক্তি তার অন্তরের গভীর ভাবাবেগকে প্রতিফলিত করে।

বস্তুত এই দুটি আয়াতে এ মহিলার পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফের সততার পক্ষে সুদৃঢ় ও পরিপূর্ণ সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। রাজা ও জনতার সামনে তার এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতির পেছনে কি শুধুই সত্যের উদ্দীপনা সক্রিয় ছিলো, না অন্য কিছুও?

আয়াতে আরো একটা বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যা তাকে এই সরল স্বীকারোক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। সেটি হলো, এই প্রত্যাশা, যে মর্দে মোমেন তার শারীরিক উস্কানিতেও কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি, সে যেন তাকে এ জন্যে শ্রদ্ধা করে যে সে ঈমান এনেছে, সত্য কথা বলেছে এবং তার অনুপস্থিতিতেও তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে।

'এটা এজন্য যেন সে জানে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।'

অতপর সে সততার প্রতি তার প্রত্যাবর্তন আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে বললো,

'আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না।'

অতপর এই পবিত্র মনোভাব ব্যক্ত করতে সে আরো এক ধাপ এগিয়ে যায় এবং বলে,

আমি নিজের প্রবৃত্তিকে নির্দোষ বলি না। প্রভৃত্তি সর্বক্ষণ খারাপ কাজের প্ররোচনা দেয়। (আয়াত ৫৩)

বস্তুত এ এক প্রেমময়ী মহিলা ছিলো। যে পুরুষটিকে সে ভালোবেসেছিলো তাকে সে তখনো মহৎ জেনেছে যখন সে জাহেলিয়াতে লিপ্ত ছিলো, আর আজ মুসলমান হয়েও তাকে মহৎ জানে। কেননা সে আজও তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখতে চায় অথবা অন্তত তাকে খুশী দেখতে চায়।

এভাবে এ কাহিনীর মানবীয় উপাদানটা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। এ কাহিনী শৈল্পিক চেতনা নিয়ে বর্ণিত হয়নি, শুধু শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই বর্ণিত হয়েছে। আকীদা বিশ্বাস ও দাওয়াতের উদ্দেশ্যে এটা বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীতে যা কিছু শৈল্পিক সুষমা আছে, তা আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টির মহৎ লক্ষ্যেই নিবেদিত। এটা একটা পরিপূর্ণ কাহিনী, যার ভেতরে সব ধরনের প্রেরণাদায়ক বাণী ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার সমাবেশ ঘটেছে।

এ পর্যন্ত এসে হযরত ইউসুফের কারাবাস ও মিথ্যা অপবাদের ঘটনার সমাপ্তি ঘটলো। এরপর শুরু হয় হযরত ইউসুফের জীবনের সুখ ও প্রাচূর্যের যুগ। এখানে তার পরীক্ষা হয়েছে। দুঃখ দিয়ে নয় সুখ দিয়ে।

সূরার ১৩তম পারাভুক্ত অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

(আলোচ্য) এই খন্ডে রসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কী যিন্দেগীতে অবতীর্ণ সূরা ইউসুফের অবশিষ্ট অংশ এবং সূরা রাদ ও সূরা ইবরাহীম সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এ খন্ডে মক্কী সূরাসমূহের সকল বৈশিষ্ট্য উপস্থিত রয়েছে।(১)

সূরা রা'দ ও সূরা ইবরাহীমের পরিচয় ইনশাআল্লাহ আমরা উপযুক্ত স্থানেই পেশ করবো। এখানে সূরা ইউসুফের অবশিষ্ট অংশের ব্যাপারে আমাদের আবেদন থাকবে যেন আলোচ্য বিষয়টাকে পূর্ব অধ্যায়ের সাথে মিলিয়ে পড়া হয়। এজন্যে আমরা আশা করবো, পাঠক পাঠিকারা এ অংশ পড়ার আগে এর যোগসূত্রটা সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যে পূর্ববর্তী সূরাটা একটু পড়ে নেবেন।

এ খন্ডের মধ্যে আসুন আমরা ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের ওপর আলোকপাত করি। এখানে দেখা যায়, ওই ঘটনার পর্যালোচনা করতে সরাসরি কিছু কথা পেশ করা হয়েছে। আর এমনি করে এ সূরায় বর্ণিত এক মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের মৌলিক এবং সম্পূর্ণ একটি দিক সামনে আসছে। আর এই আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইউসুফ (আ.)-কে সাধারণভাবে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর মিশনকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে গোটা কাহিনীর অবতারণা করেছেন। সূরাটির শুরুতেই যে বর্ণনা এসেছে তাতে ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে কি ঘটবে, তার পূর্বাভাস দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাঁর মিশন সফল করার জন্যে আল্লাহর ইচ্ছাতেই ওই ঘটনা সংঘটিত হবে।

বর্তমান পর্যায়ের আলোচনায় আমরা নতুন কিছু দৃষ্টি আকর্ষণী ঘটনা দেখতে পাবো, যার মাধ্যমে তাঁর উন্নত মানের চরিত্র ফুটে ওঠবে। মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই প্রাকৃতিক প্রয়োজন থাকে। সে প্রয়োজন পূরণের জন্যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে এক উদগ্র বাসনা, কিন্তু তার মধ্যে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের অনুভূতি যখন তীব্রতর হয় তখন সে নিজের ওই স্বাভাবিক বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আলোচ্য সূরার বর্ণনার মধ্যে ইউসুফ (আ.)-এর ব্যক্তিত্বে ওই বিশেষ দিকটা ফুটে ওঠেছে।

এ সূরাটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিনে দিনে ইউসুফ (আ.) বেড়ে ওঠছেন আর বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্টগুলোও ধীরে ধীরে ফুটে ওঠছে। যেসব বিপদ আপদ উপর্যুপরি তাঁর ওপর এসেছে তাতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই নেক বান্দাকে (তাঁর ওপর অর্পিত গুরুত্ব পালনের লক্ষ্যে) ট্রেনিং দিয়েছেন, এ সবের দ্বারা তিনি চেয়েছেন পৃথিবীর বুকে ইউসুফ (আ.)-কে ক্ষমতাসীন বানাতে, যেন ক্ষমতাবলে তিনি দ্বীনের দাওয়াত প্রভাবপূর্ণভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। আল্লাহ তায়ালা আরও চেয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের এই কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর [ইউসুফ (আ.)-এর] ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হোক এবং রাজ্যের সকল কাজে তিনি প্রভাবপূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ করুন।

এই অধ্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর সাহায্যক্রমে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখা, প্রশান্ত বদনে তাঁর দিকে ঝুঁকে থাকা। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন। তার এই নেক বান্দা তাঁর কাছে বিশ্বস্ত থাকুক, পরিপূর্ণভাবে তাঁর অনুগত থাকুক, তাঁর জন্যে সামগ্রিকভাবে নিবেদিত থাকুক এবং পৃথিবীর যে কোনো মূল্যবোধ থেকে সে বে-পরওয়া থাকুক। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে যে

---

(১) সপ্তম খন্ডের মধ্যে সূরায়ে আনয়াম-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য, আরও দেখুন সূরায়ে ইউনুস-এর ভূমিকা (১১তম খন্ডে) এবং (১২তম খন্ডে) সূরায়ে হুদ-এর ভূমিকা।

কোনো বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। চেয়েছেন যেন তাঁর এ প্রিয় বান্দা শক্তিশালী কোনো শাসকগোষ্ঠীর কাছে নিজেকে কোনো অবস্থাতেই তুচ্ছ জ্ঞান না করে এবং আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার সামনেও যেন সে অন্য শক্তি ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ইউসুফ (আ.)-এর এই বাহ্যিক কার্যাবলী ও সুস্পষ্ট ব্যবহার সবার কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেছিলো। যার জন্যে এই সময়েই কারাগারের মধ্যে বাদশাহের লোক এসে তাঁকে জানাল, বাদাশাহ তাঁর সাথে দেখা করতে চান। ... কাজেই ইউসুফ (আ.) তাঁকে আহ্বানের ব্যাপারটা মোটেই হালকা করে দেখলেন না, কারাগার থেকে বেরোনোর জন্যেও তিনি কোনো অস্থিরতা প্রদর্শন করলেন না। যে কারাগারে তাঁকে যুলুম করে পাঠানো হয়েছিলো, সেখান থেকে খোদ বাদশাহর আমন্ত্রণে যাওয়ার সময়ে মানসিক কিছু চাঞ্চল্য আসাটা স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু না, তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার ভাবান্তর দেখা যায়নি।

এই সংকটপূর্ণ অবস্থান ত্যাগ করতে পারার জন্যে কোনো আনন্দের ভাবও তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। দীর্ঘ প্রায় নয় বছর ধরে কারাগারে থাকার পর মুক্তির সামান্যতম আভাসে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, ন্যায়নিষ্ঠ ও পরম সত্যবাদী ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরের গভীরে আনন্দের কোনো ছোঁয়া লাগেনি– একথা বলা মশকিল; কিন্তু বাইরে এর কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায়নি। সত্য সত্যই যখন মুক্তির সে দিনটি এলো তখন ইউসুফ (আ.)-এর মধ্যে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছিলো) বটে তবে বাইরে তাঁর (অন্তরের মধ্যে প্রবহমান উচ্ছ্বাসের) কোনো প্রকাশ ঘটেনি। এটাই ছিলো ঈমান এবং ঈমানের অবদান, যা মানুষকে একমাত্র আল্লাহ পরওয়ারদেগারের কাছেই আশা করতে শেখায় এবং একমাত্র তাঁর ওপরই নির্ভরশীল বানায়। ইউসুফ (আ.) জানতেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে সুনির্দিষ্ট সময়েই মুক্তি আসবে, এ জন্যে সে মহামূল্যবান মুহূর্তের জন্যে প্রশান্ত মনে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, অবশ্যই আসবে সে শুভদিন; তবে কখন কিভাবে সে শুভ সময়ের আগমন ঘটবে পরম পুলকিত মনে তা প্রত্যক্ষ করার জন্যে তিনি দিন গুনে চলেছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিলো সেই অবিচলতা, সেই নিশ্চিন্ততা, সেই একই তৃপ্তি, যা তাঁর মরহুম দাদাজান ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে ছিলো, যা প্রকাশ পেয়েছিলো সেই আনন্দঘন মুহূর্তে যখন অতীব আনন্দের সাথে ইবরাহীম (আ.) তাঁর মালিককে মিনতিভরে বলছিলেন, হে আমার রব, 'দেখিয়ে দাও না আমাকে হে পরওয়ারদেগার তোমার সেই মহা ক্ষমতা, যার বলে তুমি মৃতকে যিন্দা করো, তিনি তাঁর মালিকের কাছে নিবেদন করছিলেন, অথচ তাঁর মালিক তো তাঁর সব কথা এবং সব ইচ্ছাই জানতেন, জানতেন তাঁর অন্তরের গোপনে রক্ষিত গভীর বিশ্বাসের কথা। তবুও জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি কি (আমার এই ক্ষমতা) বিশ্বাস করো না।'

একথা ইবরাহীম (আ.) বলছেন এবং যখন তিনি কথাগুলো বলছেন তখন তাঁর রব ভালো করেই জানেন তিনি কি কথাটা বলছেন এবং একথার মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে। তাই তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর একথাটা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলছেন, 'অবশ্যই (আমি বিশ্বাস করি), কিন্তু তবুও আমার রব (আমি দেখতে চাই), যাতে আমার মনটা প্রশান্ত হয়।'

এ হচ্ছে সেই নিশ্চিন্ততা যা বিপদ আপদরূপী পরীক্ষার মধ্যদিয়ে যে কোনো হৃদয়ে আসতে পারে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তাঁরই ট্রেনিং দেয়ার কারণে এই নিশ্চিন্ততা ও নির্লিপ্ততা আসে; তিনিই তাঁর নেক বান্দাদেরকে এমনি করে সাহায্য করেন। তাঁর শক্তি-ক্ষমতার বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে বিস্ময়ভরা সৃষ্টির রহস্যরাজি তাদের সামনে হাযির করে, বিশ্বময় ছড়িয়ে

থাকা জ্ঞানভান্ডারের মধ্য থেকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও তার রহস্য বুঝার শক্তি, উন্নত মানের রুচি দিয়ে তাদের সজ্জিত করেন .... এরপর তাদের মধ্যে অনবদ্য বিশ্বস্ততা, প্রশান্ত এবং নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত হৃদয় দান করেন।

আর এইভাবেই প্রকাশিত হয়েছে ইউসুফ (আ.)-এর প্রতিটি কাজ, ব্যবহার ও পদক্ষেপগুলো। এমনকি তাঁর শেষ অবস্থার যে তথ্য জানা যায়, তা ছিলো রবের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও দুনিয়ার সকল বিরূপ অবস্থা থেকে মুক্তি এবং পৃথিবীতে যতো প্রকার অস্থিরতা থাকতে পারে, তার সব কিছু থেকে তাঁর নাজাতলাভ। তাঁর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে, 'হে আমার রব, অবশ্যই তুমি আমাকে এক বাদশাহী দিয়েছো এবং আমাকে বিভিন্ন কথার (সর্বাত্মক) ব্যাখ্যা জানিয়েছো। সৃষ্টিকর্তা, তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, তুমি আমার অভিভাবক দুনিয়ায় ও আখেরাতে। আমার প্রত্যাবর্তন (ওফাত) মুসলিম হিসাবে মঞ্জুর করো এবং ভালো লোকদের সাথে আমাকে মিলিয়ে দাও।'

ইউসুফ (আ.)-এর এই কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে যে মন্তব্য করা হয়েছে এবং এ কাহিনীকে কেন্দ্র করে সমগ্র সূরার মধ্যে যে আলোচনা এসেছে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে সূরাটির শুরুতেও আলোচনা করা হয়েছে এবং ওই বিষয়ে প্রসংগ অনুসারে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এ কাহিনী বর্ণনায় আমরা শুধু চেয়েছিলাম আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ.)-এর ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক মৌলিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে। এর দ্বারা আমরা আশা করেছিলাম ওই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের পূর্ণাংগ দিকগুলো ফুটে ওঠবে। যেহেতু তাঁর জীবনের এতোগুলো দিক একত্রে তাঁর ওই বাহ্যিক চরিত্রের মধ্যে ফুটে ওঠেছে, যেগুলো একজন পূর্ণাংগ মানুষের গুণাবলী হিসাবে যথেষ্ট এবং এসব গুণাবলী দ্বারা মানুষকে গড়ে তোলাই হচ্ছে আল কোরআনের পদ্ধতি ....

এখন আমরা আল কোরআনের বর্ণিত তথ্যগুলোর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ
رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا
كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ
ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ
مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾
وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ
فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ
ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ

৫৩. (তবে) আমি আমার ব্যক্তিসত্তাকেও নির্দোষ মনে করি না, কেননা (মানুষের) প্রবৃত্তি মন্দের সাথেই (ঝুকে থাকে বেশী), কিন্তু তার কথা আলাদা, যার প্রতি আমার মালিক দয়া করেন; অবশ্যই আমার মালিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৫৪. বাদশাহ বললো, তাকে আমার কাছে হাযির করো, আমি তাকে একান্তভাবে আমার নিজের করে রাখবো, (ইউসুফকে আনার পর) অতপর বাদশাহ তার সাথে কথা বললো, (কথা প্রসংগে) সে বললো, আজ সত্যিই তুমি আমাদের সবার কাছে একজন সম্মানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি (বলে প্রমাণিত) হলে! ৫৫. সে (বাদশাহকে) বললো, (যদি তুমি আমাকে বিশ্বস্তই মনে করো তাহলে) রাজ্যের এ (বিশৃংখলা খাদ্য)-ভান্ডারের ওপর আমাকে নিযুক্ত করো, আমি অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত রক্ষক ও (অর্থ পরিচালনায়) অভিজ্ঞ বটে। ৫৬. (তাকে রাষ্ট্রীয় ভান্ডারের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করার পর আল্লাহ তায়ালা বললেন) এবং এভাবেই আমি ইউসুফকে (মিসরের) ভূখন্ডে ক্ষমতা দান করলাম, সে দেশের যথা ইচ্ছা বসবাস করতে পারবে, আর আমি যাকে চাই তার কাছেই আমার রহমত পৌঁছে দিই, আমি কখনো নেককার লোকদের পাওনা বিনষ্ট করি না। ৫৭. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্যে তো আখেরাতের পাওনা রয়েছে, যা অনেক উত্তম।

রুকু ৮

৫৮. ইউসুফের ভাইয়েরা (পরিবারের রসদ কেনার জন্যে মিসরে) এলো এবং (একদিন) তার সামনেও হাযির হলো, সে তাদের (দেখে) চিনতে পারলো, (কিন্তু) তারা তার জন্যে অচেনাই থাকলো। ৫৯. যখন সে তাদের রসদের (যাবতীয়) ব্যবস্থা (সম্পন্ন) করে দিলো, তখন সে (তাদের) বললো, এরপর (যদি আবার আসো তাহলে তোমরা) তোমাদের পিতার কাছ থেকে তোমাদের (বৈমাত্রেয়) ভাইটিকে নিয়ে আমার কাছে আসবে, তোমরা কি দেখতে পাও না, আমি (মাথা হিসাব করে) পূর্ণ মাত্রায় মেপে মেপে রসদ দেই, (তা

الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ

فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا

أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ

عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا

فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ

هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ

ছাড়া) আমি তো একজন উত্তম অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিও বটে। ৬০. যদি তোমরা (আগামীবার) তাকে নিয়ে আমার কাছে না আসো, তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্যে (আর) কোনো রসদ থাকবে না, (সে অবস্থায়) তোমরা আমার কাছেও ঘেঁষো না। ৬১. তারা বললো, এ বিষয়ে আমরা তার পিতাকে অনুরোধ (করে সম্মত) করবো, আমরা অবশ্যই (এ চেষ্টা) করবো। ৬২. সে তার (রসদ) কর্মচারীদের বললো, এ লোকদের মূলধন তাদের মালপত্রের ভেতর রেখে দাও, যাতে করে ওরা তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে গেলে তা চিনতে পারে, হতে পারে (এ লোভে) তারা (আবার) ফিরে আসবে। ৬৩. যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেলো, তখন তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমাদের (ভবিষ্যতের) রসদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, অতএব তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে যেতে দাও, যাতে করে আমরা (তার ভাগসহ) ওযন করে রসদ আনতে পারি, অবশ্যই আমরা তার হেফাযত করবো। ৬৪. (জবাবে) সে বললো, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সেভাবেই ভরসা করবো, যেভাবে ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাদের ওপর ভরসা করেছিলাম; (হাঁ,) অতপর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন উত্তম রক্ষক এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। ৬৫. অতপর তারা যখন মালপত্র খুললো তখন তারা তাদের মূলধন (যা দিয়ে রসদ খরিদ করেছিলো- দেখতে) পেলো, তা তাদের (পুরোপুরিই) ফেরত দেয়া হয়েছে; (এটা দেখে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, এর চাইতে বেশী (মহানুভবতা) আমরা আর কি চাইতে পারি; (দেখো) আমাদের মূলধনও আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে; (এবার অনুমতি দাও আমরা ভাইকে নিয়ে যাই এবং) আমরা আমাদের পরিবারের জন্যে রসদ নিয়ে আসি, আমরা আমাদের ভাইয়েরও হেফাযত করবো এবং (ভাইয়ের কারণে) আমরা অতিরিক্ত একটি উট (বোঝাই

بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ

اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ

مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا

مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ

إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ

حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً

فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّي أَنَا

করে) রসদও আনতে পারবো; (এবার আমরা যা এনেছি) এটা তো (ছিলো) পরিমাণে নিতান্ত কম। ৬৬. সে বললো, আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না– যতোক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে (আমাকে) অংগীকার দেবে যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে (ফিরিয়ে) আনবে, তবে হাঁ, কোথাও যদি তোমরা নিজেরাই (সমস্যায়) পরিবেষ্টিত হয়ে যাও, তাহলে তা হবে ভিন্ন কথা, অতপর যখন তারা তার কাছে তাদের অংগীকার নিয়ে হাযির হলো, তখন সে বললো (মনে রেখো), আমরা যা কিছু (এখানে) বললাম, আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর চূড়ান্ত কর্মবিধায়ক (হয়ে থাকবেন)। ৬৭. সে বললো, হে আমার ছেলেরা, তোমরা (মিসরে পৌঁছে কিন্তু) এক দরজা দিয়ে (নগরে) প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (তাহলে তোমাদের দেখে কারো মনে হিংসা সৃষ্টি হবে না, মনে রাখবে), আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোনো কাজেই আসবো না; বিধান (জারি করার কাজ) শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); আমি (সর্বদা) তাঁরই ওপর নির্ভর করি, (প্রতিটি মানুষ) যারা ভরসা করে তাদের উচিত শুধু আল্লাহর ওপরই ভরসা করা। ৬৮. অতপর তারা মিসরে ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা তাদের আদেশ করেছিলো; (মূলত) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে এটা কেনোই কাজে আসেনি, তবে (হ্যাঁ,) এটা ছিলো ইয়াকুবের মনের একটি ধারণা, যা সে পূর্ণ করে নিয়েছিলো, অবশ্যই সে ছিলো অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, কেননা তাকে আমিই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

রুকু ৯

৬৯. যখন তারা ইউসুফের কাছে হাযির হলো, তখন সে তার (নিজ) ভাইকে তার পাশে (বসার) জায়গা দিলো এবং (একান্তে) তাকে বললো (দেখো), আমি (কিন্তু) তোমার ভাই

أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ

السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ

جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا

لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ

كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي

الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ

أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا

(ইউসুফ), এরা (এ যাবত তোমার আমার সাথে) যা কিছু করে আসছে তার জন্যে তুমি মনে কোনো কষ্ট নিয়ো না। ৭০. অতপর সে যখন তাদের রসদপত্রের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে দিলো, তখন (সবার অজান্তে) তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে সে একটি (রাজকীয়) পানপাত্র রেখে দিলো, (এরপর যখন তারা মালপত্র নিয়ে রওনা দিলো, তখন পেছন থেকে) একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বললো, হে কাফেলার যাত্রীদল (শাহী পানপাত্র চুরি হয়ে গেছে), আর নিসন্দেহে তোমরাই হচ্ছো চোর! ৭১. ওরা তাদের দিকে (একটু) এগিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, কি জিনিস যা তোমরা হারিয়েছো? ৭২. তারা বললো, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, যে ব্যক্তিই তা (খুঁজে) আনবে, (তার জন্যে) উট বোঝাই (রসদ দেয়ার ব্যবস্থা) থাকবে এবং আমিই তার যামিন থাকবো। ৭৩. (একথা শুনে) তারা বললো, আল্লাহর শপথ, তোমরা ভালো করেই একথা জানো, আমরা (তোমাদের) দেশে কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি, (উপরন্তু) আমরা চোরও নই! ৭৪. লোকেরা বললো, যদি (তল্লাশি নেয়ার পর) তোমরা মিথ্যাবাদী (প্রমাণিত) হও তাহলে (যে চুরি করেছে) তার শাস্তি কি হবে? ৭৫. তারা বললো, তার শাস্তি! (হাঁ) যার মাল-সামানার ভেতরে সে (পানপাত্র)-টি পাওয়া যাবে, সে নিজেই হবে নিজের শাস্তি; আমরা তো (আমাদের শরীয়তে) যালেমদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৭৬. তারপর সে তার (নিজ) ভাইয়ের মালপত্রের (তল্লাশির) আগে ওদের মালপত্র দিয়েই (তল্লাশি) করতে শুরু করলো, অতপর তার ভাইয়ের মালপত্রের ভেতর থেকে সে (চুরি হয়ে যাওয়া রাজকীয় পানপাত্র)-টি বের করে আনলো; এভাবেই ইউসুফের জন্যে আমি (তার ভাইকে কাছে রাখার) একটা কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম; নতুবা (মিসরের) রাজার আইন অনুযায়ী সে তার ভাইকে (চাইলেই) রেখে দিতে পারতো না, হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যদি চান তা ভিন্ন

اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا

نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا

مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

কথা; আমি যাকেই চাই তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেই; প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির ওপরেই রয়েছেন অধিকতর জ্ঞানী সত্তা (যা বৃহত্তর জ্ঞানকেই পরিবেষ্টন করে আছে)। ৭৭. (যখন বস্তুটি পাওয়া গেলো তখন) তারা বললো, যদি সে চুরি করেই থাকে (তাহলে এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই), এর আগে তার ভাইও তো চুরি করেছিলো, (নিজের সম্পর্কে এতো জঘন্য কথা শুনেও) কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন করেই রাখলো, (আসল ঘটনা যা) তা কখনো তাদের কাছে প্রকাশ করলো না, (মনে মনে শুধু এটুকুই) সে বললো, তোমাদের অবস্থা তো আরো নিকৃষ্ট, তোমরা (আমাদের সম্পর্কে) যা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। ৭৮. তারা বললো, হে আযীয, এ ব্যক্তি (যাকে তুমি ধরে রেখেছো), অবশ্যই তার পিতা (বেঁচে) আছে, সে অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর জায়গায় তুমি আমাদের একজনকে রেখে দাও, আমরা দেখতে পাচ্ছি (আসলেই) তুমি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন। ৭৯. সে বললো, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করুন, যার কাছে আমরা আমাদের (হারানো) মাল পেয়েছি, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রেখে দেবো কি করে? এমনটি করলে আমরা তো যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো!

তাফসীর
আয়াত ৫৩-৭৯

এখন ইউসুফ (আ.)-এর কেসসা নিয়ে আমরা আলোচনার আর একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচন করতে যাচ্ছি– এটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায়। এ তাফসীরের দ্বাদশ খন্ডের শেষের দিকে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা শেষ করেছিলাম। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁকে কারাগার থেকে বের করা হয়েছে খোদ বাদশাহর আমন্ত্রণক্রমে। কারাগারের বাইরে আসায় তাঁর মর্যাদা বেড়ে গেছে বহুগুণে– এ ব্যাপারেই আমাদের সামনের আলোচনা নতুনভাবে আসছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষের কথাটার সাথে সম্পর্ক রেখেই শুরু হচ্ছে এই অধ্যায়ের আলোচনা। ওই দৃশ্যটা সামনে আসছে, যার মধ্যে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর আমন্ত্রণে নগরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের আগমন এবং ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের হাত কাটার দৃশ্য। এ অনুষ্ঠানটার আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিলো ওইসব মহিলাদের বুঝতে দেয়া যে, তারা বুঝুক, কোন কারণে আযীযের বেগম ওই যুবকের প্রতি পাগলিনীর মতো আকৃষ্ট হয়েছিলো। আযীযের বেগম তাদের একটু শিক্ষাও দিতে চেয়েছিলো, যেহেতু তারা একজন যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় বেগমের প্রতি কটাক্ষপাত করেছিলো। এই উদভ্রান্ত মহিলা তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে জেলে প্রেরণের মাধ্যমে ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি চাপ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলো যেন ওই যুবক [ইউসুফ (আ.)] তার কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। যাই হোক, উক্ত মহিলাদের হাত কাটার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হওয়ার পূর্বেই যে অভিযোগে তাঁকে জেলে দেয়া হয়েছিলো তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলো এবং তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষিত হলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীতভাবে সবার কাছে প্রমাণিত হলো। তাই এবার তাঁর কলুষমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও নিশ্চিন্ত জীবন শুরু হলো, তাঁর জীবনে পরম প্রশান্তি নেমে এলো, তাঁর অন্তর পরিতৃপ্ত হলো এবং তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন, এই রাজ্যের মধ্যে তাঁর প্রকাশ্য ও সম্মানজনক জীবন শুরু হতে যাচ্ছে। সুতরাং দাওয়াতী কাজের জন্যে তিনি এখন মুক্ত, তাঁর সকল দোষ খন্ডন হওয়ায় সবাই তাঁর কথা ভালো মনে মেনে নেবে এবং অতীতের সকল কদর্য দূর হয়ে যাবে।

ইউসুফ (আ.) যখন সকল দোষ থেকে মুক্ত বলে প্রমাণিত হলেন এবং তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্য সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠলো, তখন তিনি আযীযের বেগম সম্পর্কে কোনো কথা উল্লেখ করলেন না এবং ইশার ইংগিতেও ওই মহিলার বিরুদ্ধে কোনো কথা যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্যে তিনি বিশেষভাবে খেয়াল রাখলেন, কিন্তু তিনি আমন্ত্রিত মহিলাদের হাত কেটে ফেলার ঘটনাকে বাদশাহের সামনে তুলে ধরলেন এবং যখন এর কারণ জানতে চাইলেন তখন আযীযের বেগম নিজেই এগিয়ে এসে সত্য ঘটনাটা পুরোপুরিভাবেই তুলে ধরলো। বললো,

হ্যাঁ, সত্য প্রকাশিত হয়েছে, আমি নিজেই তাকে আমার দিকে প্ররোচিত করেছিলাম, অবশ্যই তিনি সত্যবাদীদের দলভুক্ত। একথা আমি বলছি এজন্যে যেন ভালভাবেই জানাজানি হয়ে যায় যে, আমি গোপনে কোনো খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করিনি, আর একথাও যেন প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীদের কোনো চক্রান্তই সফল হতে দেন না [এ কথার জের ধরে সামনের কথা এগিয়ে চলেছে এবং ইউসুফ (আ.)-এর কথা উদ্ধৃত করা হচ্ছে]।

'না, আমিও নিজেকে একেবারে দোষমুক্ত বলতে চাচ্ছি না, নিশ্চয়ই মানুষের কু-প্রবৃত্তি মানুষকে ভীষণভাবে প্ররোচনাদানকারী, তবে পারে না তাকে যার প্রতি আমার রব (আল্লাহ তায়ালা) রহম করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব মাফ করনেওয়ালা, মেহেরবান।'

হে পাঠক পাঠিকা খেয়াল করুন, শেষের একথাটাতে আপনাদের সামনে একথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে যে, উক্ত মহিলা ভেতরে ভেতরে মোমেনা ছিলেন, কিন্তু [ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যের আকর্ষণে] তিনি আপনহারা ও সাময়িকভাবে হলেও পাগলিনী প্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। নারী-পুরুষের মধ্যে এই আকর্ষণ আল্লাহরই দান। মহান আল্লাহ তায়ালা চান পারস্পরিক এ আকর্ষণ তাঁর অনুমোদিত পন্থায় মিলনের পথ করে নিক, যার জন্যে যুবক-যুবতীকে নির্জন সাক্ষাত থেকে পরহেয করতে বলা হয়েছে। অতপর যখন তাঁর দুর্বলতাটা মানুষের গোচরীভূত হয়ে গেলো,

তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে নিজের দোষটা অপরের ঘাড়ে তুলে দিয়ে দোষমুক্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন আল্লাহ কর্তৃক পরিস্থিতির ভিন্ন মোড় নিলো, তখন বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে আবেগতাড়িত ওই মহিলা ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন এবং যতোটুকু অন্যায় তাঁর দ্বারা হয়েছে তা স্বীকার করে বাস্তবে কোনো খেয়ানত হতে পারেনি একথা সবাইকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলেন। এ প্রসংগে ইউসুফ (আ.)-এর পরিচ্ছন্নতা ঘোষণা করতে গিয়ে তাঁর নিজের সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তব সততা প্রমাণিত হলো, যদিও নিজেকে তিনি একেবারে দোষমুক্ত বলে দাবী করতে চাননি। কারণ হিসাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে যে,

'মানুষের কু-প্রবৃত্তি অবশ্যই ভীষণভাবে অন্যায় কাজের দিকে প্ররোচনাদানকারী, পারে না শুধু তাকে, যার প্রতি আমার রব রহম করেছেন।'

এরপর এমন কিছু কথা তিনি ঘোষণা করলেন যা আল্লাহ তায়ালার ওপর তাঁর দৃঢ় ঈমানের কথা প্রকাশ করে। আর এমনও হতে পারে, তিনি তাঁর অপচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ও ইউসুফ (আ.)-কে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে দেখে এবং তাঁকে মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ওঠতে দেখে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘ আট-নয় বছর কারাগারে থাকাকালে ইউসুফ (আ.)-এর নবুওতী চরিত্রের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো, তার সন্ধান পেয়ে ঈমান আনার জন্যে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইউসুফ (আ.)-এর শিক্ষার ছোঁয়াচ অবশ্যই তিনি পেয়েছিলেন, যেমন করে পেয়েছিলো কারাগারের অভ্যন্তরের লোকজন। এ জন্যে আশান্বিত হয়ে তাঁর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে, 'নিশ্চয়ই আমার রব অবশ্যই মাফ করনেয়ালা, মেহেরবান।'

রাজ-মোসাহেবী হামেশাই নিন্দনীয়

বর্তমান এ আলোচনা জানাচ্ছে যে, সর্বশেষ ঘটনা ন্যায়নিষ্ঠ ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের ওপর থেকে অতীতের ব্যথা বেদনা সব তুলে নিয়েছিলো এবং ধীরে ধীরে তাঁকে শান্ত সুন্দর, সম্মানজনক ও ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত এক নবজীবনের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলো।

এ পর্যায়ে এসে নাটকের পট পরিবর্তন হলো এবং 'বাদশাহ বললেন, নিয়ে এসো তাকে আমার কাছে। আমি তাকে আমার খাস (বিশিষ্ট) সংগী বানিয়ে নেই।' তারপর তাঁর সাথে কথা বলা হলে তিনি বললেন, ঘোষণা দিচ্ছি, আজকে থেকে অবশ্যই তুমি আমাদের এখানে স্থায়ীভাবে এবং মর্যাদার সাথে বসবাস করবে, তুমি থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং (আমার) পরম বিশ্বস্ত সাথী। সে বললো, আমাকে দেশের অর্থভান্ডারের দায়িত্বশীল বানিয়ে দিন, অবশ্যই আমি হেফাযতকারী, সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। ...... আর এইভাবেই আমি (মহান আল্লাহ) তার জন্যে সারাদেশের ক্ষমতা লাভ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি ..... আর অবশ্যই যারা ঈমানদার ও আল্লাহকে যারা ভয় করে চলে, তাদের জন্যে আখেরাতের পুরস্কারই উত্তম। (আয়াত ৫৬)

এ আয়াতে জানা যাচ্ছে যে, বাদশাহর কাছে ইউসুফ (আ.)-এর নির্দোষ হওয়ার কথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এরপর তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করায় তাঁর জ্ঞান সম্পর্কেও তিনি ভালোভাবেই জেনে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, অভিজাত ও বিত্তশালী সমাজের মহিলাদের ডেকে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে আবেদন জানানোতে তাঁর গভীর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সম্পর্কেও বাদশাহ টের পেয়েছিলেন। সাথে সাথে তিনি ইউসুফ (আ.)-এর মান সম্মান ও আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল হয়েছিলেন। অপরদিকে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসায় ইউসুফ (আ.) তেমন কোনো উল্লসিতও হননি বা বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যে তিনি কোনো গৌরবান্বিতও বোধ করেননি। কোন বাদশাহ ছিলেন তিনি? মিসরের বাদশাহই তো! বাদশাহর সামনে এসে যখন তিনি

দাঁড়ালেন, তখন তিনি একজন যথেষ্ট আত্ম-সম্ভ্রমশীল ব্যক্তি হিসাবে দাঁড়ালেন, যার সম্পর্কে বাদশাহর কাছে (অন্যায়ভাবে) দোষারোপ করার খবর পৌঁছেছিলো, যিনি দীর্ঘকাল কারাগারে কাটিয়েছেন একজন মযলুম কয়েদী হিসাবে; অধীর আগ্রহে যিনি দিন গুনতে থেকেছেন তাঁর সম্পর্কিত মিথ্যাচার অপনোদনের। তিনি চাইছিলেন, কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পূর্বেই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা জনশ্রুতি দূর হয়ে যাক, চাইছিলেন তিনি, বাদশাহর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর আগেই তাঁর আত্মসম্মান ও যে দ্বীনকে তিনি পেশ করছিলেন তার মর্যাদা সবার কাছে জেগে উঠুক।

.... এসব তথ্য বাদশাহর অন্তরে তাঁর জন্যে এক মর্যাদাবোধ ও ভালোবাসা পয়দা করে দিয়েছিলো। তাই তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে,

'নিয়ে এসো তাকে আমার কাছে, আমি তাকে বিশেষভাবে এবং আমার একান্ত আপন মানুষ বানিয়ে রাখবো।'

এই বাদশাহ তাঁকে শুধু কারাগার থেকে মুক্তির কথা শোনানোর জন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা নয়, ওই কঠিন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিলো যে মহান ব্যক্তি, তাঁকে দেখার উদ্দেশ্যেও ডাকেননি বা মহামান্য বাদশাহর কোনো কথা শোনানোর জন্যও ডাকা হয়নি, যার জন্যে তার অতীতের যুলুমের ক্ষতের কষ্ট দূর হয়ে যাবে...... না এর কোনোটার জন্যেই ডাকা হয়নি; বরং বাদশাহ তাঁকে ডেকেছিলেন তাঁর নিজের খাস ব্যক্তি বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। বাদশাহ তাকে একান্ত ও বিশিষ্ট পরামর্শদাতা, গোপনে আলাপ আলোচনার সাথী এবং পরম বিশ্বস্ত বন্ধু বানাতে চেয়েছিলেন।

হায়, আফসোস! সেসব ব্যক্তির জন্যে যারা শাসকদের পায়ের নীচে নিজেদের মর্যাদাবোধ ধূলায় মিশিয়ে দেয়, তারা মুক্ত হয় বটে, কিন্তু নিজেরাই ওইসব শাসকবর্গের গোলামীর জোয়াল নিজেদের হাতেই নিজেদের কাঁধে নেয় আর উল্লসিত হয়ে তাদের খুশী করার জন্যে নানা প্রকার স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করতে থাকে, আর যে কোনো মানুষ একবার এইভাবে আনুগত্য ভাব প্রদর্শন করে, তার কাছে বন্ধুত্বের কোনো মর্যাদা থাকে না। ....

হায়, আফসোস! ওইসব ব্যক্তির জন্যেও যারা আল কোরআন অধ্যয়ন করে এবং সূরা ইউসুফ পড়ে, তাদের জানা দরকার। মানুষের মান মর্যাদা, গৌরব তখনই ধ্বংস হয়ে যায় যখন তার সকল কাজ ও আচরণ পরিচালিত হয়। দুনিয়ার লাভকে কেন্দ্র করে। এমনকি এসব পার্থিব সুযোগ সুবিধা যতো বেশীই হোক না কেন এবং যতো রংগিনই হোক না কেন, তা মানুষের সম্মান নষ্ট করবেই। দেখুন, কথাগুলো আল্লাহ তায়ালা কি ভাবে পেশ করছেন।

'বাদশাহ বললেন, ওই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার নিজের জন্যে একান্ত আপনজন হিসাবে বিশেষভাবে মর্যাদা দিয়ে রাখব।'

ইউসুফ (আ.)-এর দায়িত্বগ্রহণ সম্পর্কিত বিতর্কের অপনোদন

এখানে বাদশাহর হুকুম তামিল কিভাবে করা হয়েছিলো তার খুঁটিনাটি আলোচনা হয়নি। অর্থাৎ বাদশাহর ইচ্ছা প্রকাশ পাওয়ার পর কিছু ছোটখাট ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে, যার পর তার সাথে ইউসুফ (আ.)-কে দেখা গেলো। বর্তমান আলোচনায় ওইসব ছোটখাটো ঘটনার উল্লেখ নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন তাঁর সাথে সম্মানিত বাদশাহ কথা বললো; বললো, অবশ্যই আজ থেকে তুমি আমার কাছে বড়ই মর্যাদাবান, বিশ্বস্ত ব্যক্তি।'

অর্থাৎ বাদশাহ তাঁর সাথে আলাপ করে তাঁর সততা ও মর্যাদা যাঁচাই করে নিলেন। তার সুমহান ব্যক্তিত্ব দেখে তার সততা, সত্যবাদিতা ও তার মর্যাদার কথা যথাযথভাবে বুঝলেন গভীরভাবে অনুভব করলেন যে, এ ব্যক্তি হিব্রু বংশোদ্ভূত দাসত্ব মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনো সাধারণ যুবক নয়, এ যুবক অবশ্যই অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি, এ ব্যক্তি কোনো দাগী সন্ত্রাসী কয়েদী নয়; বরং এ অবশ্যই কোনো সৎ ও বিশ্বস্ত যুবক। তাই তার জন্যে ছিলো, এ মর্যাদা আর বাদশাহর কাছে এই নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা এবং ভালোবাসা। অতপর, দেখুন ইউসুফ (আ.) কি বললেন?

তাঁকে মুক্তি দেয়াতে তিনি ভক্তিতে গদগদ হয়ে ও কৃতজ্ঞতাভরে তেমনি করে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাজদা করেননি যেমন করে আল্লাহদ্রোহী শক্তির সামনে অধীনস্থ তোষামোদকারীরা সাজদাবনত হয়ে শুকরিয়া জানায়। আর একথাও বলেননি; দীর্ঘজীবী হোন হে আমার মুক্তিদাতা মনিব। আমি আপনার অনুগত ও বিনয়াবনত দাস। অথবা বিশ্বস্ত খাদেম যেমন স্বেচ্ছাচারী আল্লাহদ্রোহী শাসকবর্গের কাছে কথা বলে।

বাদশাহ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন যে, সাত বছর ভালো ফসল হওয়ার পর সাত বছর একেবারেই কোনো ফসল হবে না, যার ফলে যে দুর্ভিক্ষ আসবে তা সামাল দেয়ার যোগ্যতা তিনি রাখেন বলে অনুভব করছিলেন এবং এ জন্য তিনি চাইছিলেন, অর্থ দফতরের দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হোক, তাহলে যে কোনো সমস্যা আসুক না কেন, নগরীর যে কোনো লোকের তুলনায় তিনি অধিক যোগ্যতার সাথে তার সমাধান দিতে পারবেন। তিনি জানান, তিনি আরও বিশ্বাস করেন, অনাগত ভবিষ্যতে যে দুর্ভিক্ষ আসছে উক্ত কঠিন দুঃসময়ে অগণিত প্রাণহানি এবং জানমালের যে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে তা রোধ করার জন্যে তাঁর কাছে এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে আশা করা যায় জান মাল ও দেশের ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ হবে, বন্ধ হবে দুর্ভিক্ষ। এটা কোনো অনুমান নয়, তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই এ কথাগুলো তিনি বলছেন। তাই তাঁর কথাটা কালামে পাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

'সে বললো, আমাকে দেশের অর্থভান্ডার পরিচালনার দায়িত্ব দিন। অর্থাৎ সাত বছর দুর্ভিক্ষের পূর্বে সাত বছর ধরে যে প্রচুর ফসল হবে এই সময়ে খাদ্য খাবার অপচয় না করে সীমিতভাবে বন্টন করতে হবে, যাতে করে পরবর্তী সাত বছর ধরে রক্ষিত ফসল দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মেটানো যায়। এর জন্যে যে জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োজন তা অবশ্যই তাঁর আছে বলে তিনি অনুভব করেন। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস, তাঁকে দায়িত্ব দিলে শুধু মিসরেই নয়, সন্নিহিত এলাকার লোকদেরও প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করা সম্ভব হবে। তাই তাঁর যবানীতেই বলা হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি সংরক্ষণকারী জ্ঞানবান।'

ইউসুফ (আ.) তার নিজের জন্যে এ ক্ষমতা চাননি, তিনি দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও যোগ্যতা দেশের কল্যাণের জন্যেই তাকে দায়িত্ব চাইতে উদ্বুদ্ধ করছিলো এবং এই জন্যেই অর্থ-ভান্ডারের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে তিনি অনুরোধ করছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে সময় সুযোগ বুঝে ও স্থান কাল পাত্র ভেদে কথা বলার বুদ্ধি দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর কথায় সাগ্রহে সাড়া দেয়া হয়েছিলো এবং তার পরামর্শ সংগে সংগে গ্রহণ করা হয়েছিলো। বাদশাহ এমন কঠিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার ব্যাখ্যা ইউসুফ (আ.) ছাড়া আর কেউ বলতে পারেনি এবং যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন, বাদশাহর কাছে তা সঠিক মনে হয়েছিলো এবং তিনি বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। এমনই এক নাজুক সময়ে সেই ব্যাখ্যাদাতাই যখন ঐ

জটিল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিজেই নিতে চাইছেন তখন বাদশাহ ভীষণ দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। বাদশাহর কাছে এটা স্পষ্ট ছিলো যে, উপর্যুপরি সাত বছরের দুর্ভিক্ষের সময়ে মিসরসহ আশপাশের সকল জনপদের সকল মানুষের খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব চাওয়া এটা কোনো খেল তামাশা বা ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের চাহিদার কারণে হয়নি। এ ছিলো এক সুকঠিন দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলে নেয়া এবং এ দায়িত্ব চাইছেন তিনি, যিনি জীবনের সব থেকে কঠিন পরীক্ষায় পাস করেছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন, পার্থিব কোনো লোভ লালসার হাতছানি তাকে নীতিভ্রষ্ট করতে পারবে না। এ সেই জিতেন্দ্রিয় ও মহান ব্যক্তিত্বই তো নিতে চাইছেন এতোবড় বিশাল জনপদকে রেশন সরবরাহের দায়িত্ব। সুতরাং শুধু রাযি হওয়াই নয়, বাদশাহ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাই তিনি ইউসুফ (আ.)-এর হাতে শুধু অর্থ-ভান্ডারের দায়িত্বই দিলেন না, বরং বস্তুতপক্ষে তাঁকে দেশের সকল ক্ষমতা ব্যবহারের দায়িত্ব দিয়ে কার্যত তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। যেহেতু মানুষের প্রয়োজনসমূহের মধ্যে পেটের জ্বালা নিবারণ করাই হচ্ছে প্রথম প্রয়োজন, আর এ দায়িত্ব যার হাতে থাকে সে মানুষের মনের মধ্যে আসন করে নিতে সক্ষম– এজন্যে বাদশাহর সাথে দেশের আম জনতাও ইউসুফ (আ.)-এর এ দায়িত্ব গ্রহণে সমভাবে খুশী হয়েছিলো।

এখানে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয় এ কথায় যে, ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, 'বানিয়ে দাও আমাকে দেশের সমুদয় অর্থব্যবস্থার ওপর দায়িত্বশীল'– এভাবে দায়িত্ব চাওয়া কি ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ নয়?

আসলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় কোরআন ও হাদীসের আলোকে দু'টি বিষয় নিষিদ্ধ বলে মনে হয়।

এক. দায়িত্ব চাওয়া, রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিম্নলিখিত হাদীস অনুসারে দায়িত্ব চেয়ে নেয়া নিষিদ্ধ।

'বোখারীও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমরা এ কাজের দায়িত্ব এমন কোনো ব্যক্তিকে দেই না– যে তা চায় (অথবা এর জন্যে লালসা পোষণ করে)।'

দুই. আত্মশুদ্ধির বিষয়, এ ব্যাপারেও আল কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা নিজেদের পবিত্র করেছো বলে দাবী করো না, অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করো না।'

এ বিষয়ে আমরা এ জওয়াব দিতে চাই না যে, এটা মোহাম্মদ (স.)-এর যামানার হুকুম। পূর্বেকার নবীদের হুকুম ছিলো আলাদা, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যে যে হুকুম প্রযোজ্য তা ইউসুফ (আ.)-এর উম্মতের জন্যে প্রযোজ্য ছিলো না। ইসলাম যেহেতু মানুষের জন্যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে, তাই যে ব্যবস্থা মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের জন্যে ক্ষতিকর তা সর্বকালের সকল উম্মতের জন্যেও ক্ষতিকর, অতএব, সবার জন্যে কল্যাণবাহী হুকুম আহকাম একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে আকীদা বিশ্বাস মানুষের জীবনের জন্যে স্থায়ী অবদান রাখে তার বাস্তব প্রয়োগ সকল যামানায় একই হতে হবে। এ জন্যে আমরা এ জওয়াব দিয়েও কোনো গা বাঁচানোর চেষ্টা করবো না; বরং বলবো, অবশ্যই অন্য এমন কোনো কারণ আছে যার জন্যে ইউসুফ (আ.)-এর মুখ দিয়ে একথাটা বেরিয়েছিলো আর তা সঠিক ছিলো বলেই তো আল্লাহ তায়ালা তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর সে কারণ আরও সূক্ষ্ম এবং আমরা সাধারণভাবে যে চিন্তা করতে পারি তার থেকে আরও গভীর।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সাধারণ যে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন তার দ্বারা এই জটিল প্রশ্নের জট খোলা বড়ই কঠিন। বিশেষ করে সেই যামানায় এর রহস্য জানা কঠিন যখন আমাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে স্থবির করে দেয়া হয়েছে এবং বাস্তব প্রয়োজন সামনে রেখে গবেষণা করার অভ্যাস বিদূরিত করে দেয়া হয়েছে।

নীতিগতভাবে আমাদের একথা মেনে নিয়ে এ জট খোলার চেষ্টা করতে হবে যে, ইসলামী আদর্শ আমাদের জীবনকে সংকীর্ণ কোনো গন্ডির মধ্যে এমনভাবে আবদ্ধ করে রাখেনি যে, আমাদের জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মিটবে না। এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা আমাদের বুঝতে হবে যে, ইসলাম কোনো শূন্যে নাযিল হয়নি। এ ব্যবস্থা শূন্যের ওপরও গড়ে ওঠেনি। এ ব্যবস্থার যুক্তি এক মুসলিম জনপদের মধ্যে গড়ে ওঠে সে সমাজকে সর্বাধিক সুন্দর পথ দেখিয়েছে এবং বাস্তব জীবনে যতো সমস্যা আসতে পারে সে সকল সমস্যার সুন্দরতম সমাধান দিয়েছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে ও কোরআনের আয়াতে যে দিকদর্শন দেয়া হয়েছে, অবশ্যই তা মুসলিম সমাজকে শান্তির জীবন যাপনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে এবং তাকে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা প্রদর্শনের মনোবৃত্তি থেকে রোধ করেছে।

ইউসুফ (আ.) যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে এ কথাগুলো বলেছিলেন তার ছিলো দু'টো দিক। এক. তিনি নবী ছিলেন এবং তখনকার প্রয়োজন সামনে রেখে তিনি যা কিছু বলেছিলেন, আল্লাহর নির্দেশেই বলেছিলেন। হয়তো তাঁর জন্যে এ কথাগুলো বলার অনুমতি ছিলো। তবুও প্রশ্ন থাকে, ইউসুফ (আ.)-এর অনুসৃত পদ্ধতি আমাদের কাছে কেন তুলে ধরা হলো? এর জবাব হচ্ছে, আল কোরআনের মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে তুলে ধরার মধ্যে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন কিছু হেকমত রেখেছেন; আর সেই হেকমতটা বুঝার জন্যে চেষ্টা না করে যারা ওপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস তুলে ধরে এর সমাধান দিতে চেষ্টা তারা সঠিকভাবে ইসলামের মূল তাৎপর্য বুঝতে পারেননি এবং অপরকেও কল্যাণের পথের দিকে এগিয়ে দিতে পারেননি। তাঁরা কেতাবপত্রের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার কারণে কোরআন হাদীস সামনে নিয়ে জীবন সমস্যা সমাধান করার জন্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অবশ্যই আমাদের জীবন সমস্যার সমাধানে আল কোরআন ও নবী (স.)-এর হাদীস আমাদের সে পথ দেখিয়েছে এবং সে পথ একটি মাত্র নয়, কখন কোন পথ কোরআন হাদীসের আলোকে অবলম্বন করতে হবে সেটাই হবে ফেকাহ শাস্ত্রের গবেষণার বিষয়। এক্ষেত্রে অন্তরের মধ্যে একটা কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করতে হবে, আর তা হচ্ছে, জীবনের সমস্যাগুলো যতো জটিলই হোক না কেন, অবশ্যই ইসলাম তার যথাযথ সমাধান দিয়েছে। কোনো ব্যাপারেই এখানে কোনো শূন্যতা নেই একথা মনে করা হবে।

আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে চালু করা তথা বিশ্ব সম্রাটের আইন তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বস্তরে চালু করার মাধ্যমে সর্বসাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্যে আল কোরআন নাযিল হয়েছে এবং হাদীসের শিক্ষার আলোকেই মানুষের জীবনে ইসলামের প্রয়োগ সাধিত হয়েছে।

বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্যে আজকের মনীষীদের চিন্তাভাবনা হয়তো পূর্বেকার গবেষকদের মতামত থেকে ভিন্ন হবে, কিন্তু আধুনিক এ গবেষণা কোরআন হাদীসের মূল সুর ও ভাবধারার সাথে যদি সংগতিপূর্ণ হয়, তাহলে তার সাথে রক্ষণশীল ফেকাহবিদদের সাথে মতপার্থক্য থাকায় কোনো অসুবিধা নেই।

দেশে দেশে একামতে দ্বীনের প্রয়োজনে যে ইসলামী আন্দোলন গড়ে ওঠছে তার সাথে প্রাচীন ফকীহদের লেখনীর মিল যদি না থাকে– না থাক। মানব কল্যাণ সামনে নিয়ে কোরআন হাদীসের গবেষণা করেই যেতে হবে এবং বাস্তব সমস্যার সমাধান করতেই হবে।

এসব বিবেচনায় এটা স্পষ্ট যে, কোনো একটা ফেকাহ অনুসরণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং অবস্থার প্রেক্ষাপটে ফেকাহর পরিবর্তন হতে থাকবে। কোনো এক কালের বুঝ সর্বকালের জন্যে চূড়ান্ত হতে পারে না। এখানে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কোরআন ও হাদীসের মধ্যে যেসব বিষয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে একমাত্র সেগুলোই সর্বকালের জন্য চূড়ান্ত সত্য বলে বুঝতে হবে, যার মধ্যে মতভেদ করার বা কোনো কালের কোনো মনীষীর মত খাটানো বা বুঝ প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ নেই।

এই সাধারণ আলোচনা থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোনো বিশেষ দায়িত্বের জন্যে নিজেকে পেশ করতে গিয়ে নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা যায় না। যেহেতু কোরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, তোমরা নিজেকে দোষমুক্ত বলে ঘোষণা করো না। আর রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস থেকে জানা যায়, 'আল্লাহর কসম, আমরা এ গুরুদায়িত্ব তাকে দেই না যে এটা পেতে চায় (অথবা এর জন্যে লোভ করে)।

মুসলিম সমাজে কোরআন হাদীসের এসব নির্দেশের ভিত্তিতে চেতনা গড়ে ওঠেছে এবং দায়িত্ব প্রদানের কাজ চলে এসেছে, যাতে সমাজে কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাত না বাধে, মানুষ আরামে বাস করতে পারে এবং সমাজের প্রয়োজন ভারসাম্যপূর্ণভাবে মিটতে থাকে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, একক কাজ বা যৌথ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই ইসলামী নীতি অবলম্বন করার ফলে বিশৃংখলা সৃষ্টির সুযোগ বরাবরই কম থেকেছে; বিশেষ করে যেখানেই সামাজিক বা যৌথ কোনো কাজ এসেছে সেখানেই এই নীতির কার্যকারিতা বেশী প্রমাণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্র এমনও আছে, যখন এর ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সে সব ক্ষেত্রে, ইসলাম আমাদের এমন জটিল ও অচলাবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়নি যে, সেসব ক্ষেত্রে বিবেক হতবুদ্ধি হয়ে যায় ও সংকটাপন্ন বোধ করে। এ রকমই একটি অবস্থা কোরআনে উল্লেখিত [ইউসুফ (আ.)-এর] এই ঘটনাতে পাওয়া যায়।

এখন আমরা বুঝতে চাই, কেন মুসলিম সমাজে আত্ম প্রশস্তি (বা নিজের প্রশংসা নিজে) করা যায় না বা কোনো গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে নিজেদের যোগ্যতা ও গুণাবলী তুলে ধরা যায় না এবং মজলিসে শূরার মেম্বার হওয়ার জন্যে, পরিচালক হওয়ার জন্যে বা প্রশাসক হওয়ার জন্যে নিজেদের পেশ করতে গিয়ে কোনো প্রচার কাজ চালানো যায় না বা নিজেদের পক্ষে নিজেদের মূল্যায়ন করা যায় না।

প্রকৃত পক্ষে মুসলিম সমাজের মধ্যে কারো যোগ্যতা তুলে ধরার জন্যে ফলাও করে প্রচার করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারো শ্রেষ্ঠত্ব বা কারও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কোনো প্রচার প্রোপাগান্ডা করারও প্রয়োজন নেই, যেহেতু এ সমাজের ব্যক্তিরা দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহকে লোভনীয় বা আকর্ষণীয় মনে করে না, তারা এগুলোকে কষ্টকর ও জওয়াবদিহিমূলক দায়িত্ব ও বোঝা মনে করে। (যেহেতু) তাদের মধ্যে আখেরাতের বিশ্বাস মযবুত এবং দুনিয়াতে সঠিকভাবে এসব দায়িত্ব পালন না করতে পারলে পরকালে আল্লাহর কাছে ধরা পড়তে হবে বলে তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে, এ কারণে দায়িত্ব লাভ করার জন্যে সেখানে কোনো ধাক্কাধাক্কি বা প্রতিযোগিতা নেই। একজন মুসলমানের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই কেবল কোনো

প্রতিযোগিতা হতে পারে। এ কারণে যারা পার্থিব দায়িত্ব হাসিল করার জন্যে পাল্লা দেয় তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই পাল্লা দেয়, আর ব্যক্তিগত স্বার্থে যারা কোনো ক্ষমতা লাভ করতে চায়, অবশ্যই তাদের ক্ষমতা দেয়া চলে না, কিন্তু এ সত্য বুঝতে হলে প্রথম যুগে মুসলমানদের অগ্রগতির ইতিহাস সামনে আনতে হবে, সামনে আনতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম বাস্তবায়িত করাকালে ওই সমাজের শান্তিপূর্ণ অবস্থা।

নিশ্চয়ই ওই সমাজের মধ্যে ইসলামী আকীদা ও তার ভিত্তিতে সকল কাজ পরিচালনার আন্দোলনই ছিলো মুখ্য কাজ। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী আকীদা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্যে পরিচালিত আন্দোলনের ফল ছিলো তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও তার শান্তিপূর্ণ সভ্যতা। যে যে কারণে এ শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠেছিলো তা হচ্ছে–

প্রথমত. ইসলামী আকীদা গড়ে ওঠার মূল উৎস হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা নিজে, যাঁর বহির্প্রকাশ ঘটেছে নবুওতের যমানায় রসূলুল্লাহ (স.)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তাঁর কাজের মাধ্যমে, অথবা আল্লাহর পথে দাওয়াতদানকারী ওই সকল ব্যক্তির দ্বারা, যারা আল্লাহর কালাম ও সুন্নতে রসূল (স.)-এর শিক্ষার আলোকে পরবর্তীকালে যুগ যুগ ধরে প্রচারাভিযান চালিয়েছেন। এর ফলে বহু মানুষ স্থানীয় শাসকবর্গের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এবং অনেক সময় ওইসব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হঠকারী মানুষের তরফ থেকে আসা দুঃসহ জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেও সত্যের এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ দুশমনদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পূর্ব অবস্থায় ফিরে গেছে, আর অনেকে আল্লাহর সাথে তারা যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূরণ করতে গিয়ে জীবন দেয়া কবুল করেছেন ও শাহাদাত লাভ করেছেন এবং আরো অনেকে তাদের ও তাদের জাতির মধ্যে সঠিক চূড়ান্ত ফায়সালা আসার অপেক্ষায় আপসহীন।

এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের হাতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বিজয়ী করেছেন এবং তাদের আল্লাহ তায়ালা নিজের কুদরত থেকে কিছু নযিরও দেখিয়েছেন তিনি তাদের সরাসরি সাহায্য করার যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করতে গিয়ে পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতাসীন বানিয়েছেন, যেহেতু তারা আল্লাহর সাহায্যকারীরূপে কাজ করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ ক্ষমতা পৃথিবীর বুকে কায়েম করার জন্যে এবং পৃথিবীতে তাঁর বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন; যাতে করে পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়ে যায়। অবশ্য এখানে এটাও মনে রাখতে হবে, তাঁর নিজের জন্যে কারো কোনো সাহায্য অথবা তাঁর ক্ষমতা খাটানোর প্রয়োজন নেই। তিনি চান তাঁর প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা সারা জগতে চালু হয়ে যাক এবং এজন্যেই মানুষের চেষ্টা করা প্রয়োজন– এটাই তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করার নাম। এভাবেই বান্দাদের মধ্যে তাঁর 'রবুবিয়াত' তাঁর মালিকানা ও শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহর রাজ্য যেহেতু গোটা বিশ্ব এবং তাঁর নিবেদিত বান্দারা যেহেতু সেই মহাবিশ্বের মহা-সম্রাটের উৎসর্গ প্রাণ সৈনিক, এ জন্যে তারা তাদের বাদশাহ-পরওয়ারদেগারের ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং নির্দিষ্ট কোনো এক এলাকাতে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত করে থেমে যায় না, থেমে যায় না কোনো বিশেষ জনপদ, কোনো জাতি কোনো বর্ণের লোক, কোনো ভাষাভাষী, কোনো সম্পদশালী বা এ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ও ছোট কোনো জনপদের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেও ক্ষান্ত হয়ে যায় না; বরং আল্লাহর এ সৈনিক দল এই আল্লাহ মুখী আকীদা নিয়ে, সারা বিশ্বের সকল মানুষকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্যে গোটা জাহানে ছড়িয়ে পড়তে চায়, মানুষের মর্যাদা উন্নীত করতে চায় আল্লাহদ্রোহীদের গোলামী

থেকে তাদের মুক্ত করে, তাদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগাতে চায়। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার ওপর ভারসা করে আল্লাহর এ অপরাজেয় বাহিনী কোনো বিদ্রোহী (তাগূতী) শক্তির পরওয়া করে না, সে যেইই হোক না কেন।(১)

আমরা দেখেছি, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে আল্লাহর সৈনিক দল কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বিজয়ী হয়ে এবং মুসলিম কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়ে যায় না, থেমে যায় না তারা কোনো সীমাবদ্ধ এলাকায়। কোনো মানব শ্রেণীর মধ্যে অথবা কোনো জাতির মধ্যে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করেও তারা থেমে যায় না; বরং মানুষের মূল্য যথাযথভাবে কায়েম করার জন্যে আত্ম-নিয়োগ করে, তারা সমাজে তাদের সঠিক অবস্থান নিশ্চিত করে এবং তাদের এই অবস্থান ও মর্যাদা নিরূপণ করতে গিয়ে তারা নিজেদের ঈমানের নিক্তিতে মাপে, ঈমানের মাপকাঠি দিয়ে তারা নিজেদের মূল্যায়ন করে এবং জেহাদের মাধ্যমে তারা পরস্পরের পরিচয় লাভ করে। তাকওয়া, সংশোধনী প্রচেষ্টা, এবাদাত, সদ্ব্যবহার, যোগ্যতা ও সক্ষমতার পরীক্ষা এই জেহাদী তৎপরতার মাধ্যমেই হয় এবং যে কোনো কাজের জন্যে এসব গুণাবলীর প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন। এ গুণাবলী যে কোনো আন্দোলনের কাজ এগিয়ে দেয়। এই গুণাবলী দ্বারা সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে এবং এর সদস্যবর্গের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়,..... এ জন্যই এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের সদস্যদের জন্যে নিজেদের সততা ও যোগ্যতার সাফাই দেয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। অথবা নিজেদের গুণাবলী তুলে ধরে নেতৃত্ব কর্তৃত্বলাভ বা শূরার সদস্য হওয়ার জন্যে প্রার্থী হতে হয় না।

যে সমাজের জন্যে এসব কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঈমানের বলে বলীয়ান এক মুসলিম সমাজ, যে সমাজের লোকদের আল্লাহর ভয়, আখেরাতে বিশ্বাস ও রসূলের পরিচালনায় উন্নতমানের চরিত্র গড়ে তোলা হয়েছে, যাদের নমুনা আমরা দেখতে পাই প্রথম যুগের মোহাজের, আনসার, বদরী সাহাবা, স্বেচ্ছায় সানন্দে জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত 'বায়য়াতুর রেদওয়ান'-এর সদস্য ও সেসব সাহাবার মধ্যে, যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় ও যুদ্ধ করেছেন।

তারপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর টিকে থাকার জন্যে তাদের ওপর যেসব পরীক্ষা এসেছে তার মাধ্যমেই তাদের মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে, ভালো মন্দের পার্থক্য সূচিত হয়েছে........ ইসলামের আলোকে গঠিত আদর্শ সমাজে কেউ কারো ক্ষতি করবে না এবং মর্যাদাবান লোকদের মর্যাদা কেউ অস্বীকার করবে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মানবতার গুণাবলীর সাথে সাথে কিছু দুর্বলতাও রয়েছে, যখন এই দুর্বলতাগুলো জয়ী হয়ে ওঠে তখন প্রায়ই তাদের লোভ লালসা বশীভূত করে ফেলে, আর তখনই দেখা যায়, যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের গুণাবলী প্রকাশ ও প্রচার করতে শুরু করে দেয়, নেতৃত্ব দাবী করে অথবা শূরার মেম্বার হওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা করতে লেগে যায় এবং সেখানে তারা নিজেদের ওইসব গুণাবলীর ভিত্তিতেই ওইসব কাজের জন্যে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চায়।

পদপ্রার্থীতার ব্যাপারে ইসলামী বিধান

অবশ্য আজকের যামানায় অনেক লোকের কাছে মনে হয় যে, এভাবে পদপ্রার্থী না হওয়ার এ নিয়ম আগের যুগের মুসলমানদের জন্যে খাস ছিলো এবং এটা এখন একটা ঐতিহাসিক বিষয়। বর্তমান বাস্তব অবস্থা এই নিয়ম মেনে নিতে পারে না, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, প্রথম যুগে

(১) দেখুন মায়ালেমু ফিত্তারীক নামক পুস্তকে 'আল জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' অধ্যায়।

প্রবর্তিত নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠিত না করা হলে কাংখিত সেই ইসলামী সমাজ কিছুতেই গড়ে ওঠতে পারে না যা মানুষকে অভূতপূর্ব শান্তি দিয়েছে। ওই নিয়ম নীতির অভাব থাকলে আজও যেমন ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠতে পারবে না, তেমনি ভবিষ্যতেও পারবে না। সুতরাং আমরা যদি ওই স্বর্ণ যুগে ফিরে যেতে চাই এবং ইসলামের পূর্ণাংগ শান্তির স্বাদ পেতে চাই, তাহলে মানুষকে নতুন করে এই দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাতে হবে, আবার তাদের নতুনভাবে ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যে জাহেলী চিন্তাধারার মধ্যে পতিত হয়ে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে তার থেকে তাদের বের করে আনতে হবে। এটাই হবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠার প্রথম কাজ অবশ্য এই কাজ শুরু করার সাথে সাথে শুরু হয়ে যাবে তাদের ওপর যুলুম-নির্যাতন– এইভাবে তাদের নানা প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, পূর্বেও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এসব কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়ে অনেক মানুষ বিপদাপন্ন বোধ করবে এবং দ্বীন ও তার দাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অবশ্য এমনও কিছু লোক পাওয়া যাবে, যারা আল্লাহর সাথে করা চুক্তি সত্যে পরিণত করবে, সর্বপ্রকার কঠিন অবস্থাতেও আল্লাহর পথে দৃঢ়তা অবলম্বন করবে, শত অত্যাচার সয়েও তারা তাদের ওয়াদা সফল করবে এবং অবশেষে শহীদ হিসাবে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে নেবে, তবু নিজেদের জীবন লক্ষ্য অর্জনের কাজ থেকে পিছপা হবে না। সকল অবস্থাতেই তারা সবর করবে, অবিচল থাকবে, অপরকেও অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং ইসলামের ওপর সংকল্পবদ্ধ হয়ে টিকে থাকবে– যেমন করে কেউ আগুনে পতিত হতে চায় না, তেমনি করেই তারা জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যেতে অপছন্দ করবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের ও তাদের জাতির মধ্যে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা না করে দেয়া পর্যন্ত এবং অতীতে আল্লাহ তায়ালা তাদের যেমন করে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন তেমনিভাবে আজও তাঁর নিজ মেহেরবানী বলে তাদের ক্ষমতায় না বসানো পর্যন্ত তারা এইভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন করে যাবে। আর এই দৃঢ়তা অবলম্বনের কারণেই আল্লাহর যমীনের কোনো না কোনো অংশে কায়েম হবে নেযামে ইসলামী বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। আর সেদিনই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে প্রথম যুগে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিলো তা সফলতার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে, সেদিনই ওসব মর্যাদাবান মোজাহেদদের সকল প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করবে, সেদিনই তাদের ঈমানের বলিষ্ঠতা ও মূল্য মানুষ যথাযথভাবে বুঝতে পারবে, আর সেই পরিবেশেই মানুষ নিজের গুণাবলী নিজে প্রকাশ ও প্রচার করার প্রয়োজন অনুভব করবে না। কারণ যে সমাজ গঠনের সংগ্রামে তারা নিবেদিত ছিলো, সেই সমাজের মানুষদের পক্ষে আজও তাদের চিনতে কোনো বেগ পেতে হবে না, তাদের যোগ্যতা এবং গুণাবলীও তাদের কাছে অজানা থাকবে না।

অবশ্য পরবর্তীকালে আবারও বলা হয়েছে, এটা হয়তো ইসলামী সমাজ গঠনের প্রথম স্তরে সম্ভব হতে পারে, তারপর যখন সমাজ পুরোপুরি গঠিত হয়ে যাবে তখন কি হবে? এ প্রশ্ন তারাই করে যারা এই মহান দ্বীনের প্রকৃতি জানে না, বুঝে না। এ মহান দ্বীন সদা সর্বদা এক সচল আন্দোলন, কোনো দিন এর চলা বন্ধ হবে না, থেমে যাবে না এর আন্দোলন কোনো দিন। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে এ আন্দোলন চিরদিন চলতে থাকবে। মানুষ বলতে কোনো এক সময়ের বা এক এলাকার মানুষ নয়; বরং দুনিয়ার সর্বকালের সর্ব এলাকার মানুষ। এ সব মানুষকে উদ্ধত অহংকারী মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীতে আবদ্ধ করার এ আন্দোলন চিরদিন আছে, চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর নশ্বর অসার এ জীবনের অস্তিত্ব একদিন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন চলতেই থাকবে।

এতে বুঝা গেলো, এ আন্দোলন অবিরামভাবে চলবে। মূলত আল্লাহর দ্বীনের প্রকৃতিই এটা। যারা সচ্ছল এবং নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে, তাদের ও যারা বিপদকে আলিংগন করে নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।একদল চায় এ জীবন নিয়ে সুখে থাকতে, পরকালের চিন্তা তাদের কাছে নগণ্য। অপর দল এ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং পরকালের নাজাত হাসিলের জন্যে যে কোনো বিদপ কবুল করে নেয়। এ সমাজকে তারা স্থিতিশীল ও নিশ্চিন্ত বানানোর জন্যে আন্দোলনের কাজে কোনো সময় বিরতি দেয় না, বরং এ বিরতিকে তারা মনে করে ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন। এহেন ইসলামী সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতায় সজ্ঞানে আত্মপ্রশস্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই চালু থাকবে। নিজেকে পেশ করার প্রতিক্রিয়া ও কুফলের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইসলামে এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে, কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন সমাজের ব্যাপ্তি ঘটবে প্রচুর পরিমাণে, মানুষ মানুষে জানাজানির সুযোগ কমে যাবে, প্রাচুর্য বাড়বে, যারা সর্বপ্রকার সুবিধা দানের ঘোষণা দিয়ে ময়দানে নামবে, নিজেদের যোগ্যতা ও গুণাবলীর কথা নিজেরাই প্রচার করতে উদ্যোগী হবে এবং এসব যোগ্যতার দোহাই দিয়ে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে চাইবে।

বর্তমান জগতে একথাটাই সাধারণভাবে সত্য বলে দেখা যাচ্ছে। তারা বলছে যে, তারা আধুনিক জাহেলী সমাজ সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে..... কিন্তু মুসলিম বসতি যে সব এলাকা ও মহল্লার মধ্যে গড়ে ওঠেছে, সেখানে তাদের জুময়ার নামায, ঈদের নামায ও অন্যান্য সমাজ সংগঠনমূলক কাজের মাধ্যমে এমন করে ট্রেনিং দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যে অপরিচিতির ব্যবধান বা দূরত্ব কমে আসে, পরস্পর তারা কাছাকাছি হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং তখন তাদের কাছে যোগ্য, দানশীল ও গুণান্বিত মানুষদের পরিচিতি গোপন থাকে না, আর তাদের মধ্যে ঈমানী শক্তি প্রবল হওয়ার কারণে এসব যোগ্য ও গুণান্বিত ব্যক্তিদের মূল্যায়নও হয়ে থাকে, তাকওয়া পরহেযগারী ও দানশীলতার কারণে তাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং সমাজের অন্যায়কারী, মোত্তাকী পরহেযগার এবং বিত্তশালী নির্বিত্ত ব্যক্তি নির্বিশেষে তাদের উপেক্ষা করে না; বরং এসব যোগ্য লোকদেরকেই (তাদের নিজেদের স্বার্থে) মজলিসে শূরা, স্থানীয় নেতৃত্ব বা বৃহত্তর সমাজের কর্তৃত্বের পদে সর্বত্র দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এহেন যোগ্য ব্যক্তিদের গোটা জাতি নেতৃত্বের পদে বরণ করে নেয় এবং সমস্যা সমাধানকারী জ্ঞানে সাধারণভাবে সবাই সর্বতোভাবে তাদের সাহায্য করে এবং বিশেষভাবে তাদের সাহায্য করা হয় শূরার সাধারণ সমর্থন দ্বারা। প্রকশ থাকে যে, ইসলামী সমাজে শূরার এসব সদস্যদের তাদের যোগ্যতা, ত্যাগ ও বিচক্ষণতার কারণে সাধারণভাবে মানুষ ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং তাদের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামী আন্দোলনের কাজ চলতে থাকবে, কোনো সময় থেমে যাবে না। অন্যায় অবিচার, যুলুম-নির্যাতন অত্যাচারীদের রুখবার জন্যে জেহাদও চলতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা আল্লাহ তায়ালা অনর্থক আমাদের সামনে পেশ করেননি। ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত যে সমাজে আমরা বাস করব, সেখানে আমাদেরকেও ইউসুফ (আ.)-এর মতো উন্নত মানের চরিত্র ও নৈতিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে, তবেই কঠিন ও দুঃসময়ে মানুষ আমাদের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান পাওয়ার আশায় ডাকবে। এ সমাধান দিতে গিয়ে যদি বুঝা যায়, সমস্যার জটিলতায় বিশেষ কোনো এলাকার জনপদ হয়রান পেরেশান

হয়ে গেছে এবং তারা ওই কঠিন অবস্থা থেকে বের হওয়ার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না, সে অবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের কোনো ব্যক্তিত্ব যদি অনুভব করে, ওই সমস্যার সমাধান তার দ্বারা হবে, তখন সে নিজেকে অবশ্যই পেশ করে বলবে, 'ঠিক আছে, আমাকে দায়িত্ব দিন, আমি আল্লাহ প্রদত্ত যে জ্ঞান রাখি, তার আলোকে এ সমস্যার সমাধান করতে পারবো বলে আশা রাখি।' এখানে দু'টি জিনিস পাশাপাশি থাকতে হবে—

এক. সমস্যার জটিলতায় মানুষ দিশেহারা হবে এবং তারা মনে প্রাণে চাইবে কোনো জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্বশীল মানুষ এ জটিল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসুক।

দুই. আল কোরআন ও হাদীসের আলোকে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে এমন আত্মপ্রত্যয় থাকবে যা তাকে আল্লাহর ওপর ভরসা করে সমস্যার সমাধান দা· করার কথা ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

উপরে বর্ণিত এই অবস্থা হতে ·বে সেই সমাজে, যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু নেই এবং মানুষের সমস্যা সমাধানের কোনো উপায়ও তাদের নযরে পড়ে না।

ইউসুফ (আ.)-এর দায়িত্ব চেয়ে নেয়ায় মানুষ যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো এবং কারো মনে তাঁর স্বার্থপরতার কথা জাগেনি, তেমনি আজও সেক্ষেত্রে ওইভাবে দায়িত্ব চেয়ে নেয়া যাবে যেখানে মানুষ এ দায়িত্ব চাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে এবং সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে যিনি দায়িত্ব চাইবেন, তাঁর সম্পর্কে কোনো স্বার্থপর হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হবে না। উপরন্তু মনে হবে যে, লোকটা আমাদের এক কঠিন বিপদ থেকে মুক্তির পথ দেখালো, নচেৎ কি সর্বনাশটাই না হতো!

এইভাবে আজও উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব চাওয়া কোরআন হাদীসের বিরোধী তো হবেই না; বরং মানুষের সমস্যা সমাধানে আল্লাহর দেয়া খেলাফতের দায়িত্বই পালন করা হবে।

প্রচলিত রাজনীতির সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মৌলিক তফাৎ

আজকের দিনে যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে এবং এর বাস্তবায়ন দেখতে চায় অথবা এ বিষয়ে লেখালেখি করে, তারা সাধারণভাবে আসলে কোরআন হাদীসের সন্তোষজনক জ্ঞান রাখে না, যার কারণে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ আয়াত বা হাদীস সামনে আসায় তারা হয়রান পেরেশান হয়ে যায়। কারণ তারা বিরাজমান জাহেলী ব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করতে চায়, সব কিছু মিলিয়ে এক যৌথ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়; যাতে করে জাহেলী সমাজ ব্যবস্থাকেও মূল্যায়ন করা হয় এবং মনে করা হয়, এর সাথে খাপ খাইয়ে ইসলামী ব্যবস্থাও কায়েম করা যাবে, মানব নির্মিত ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ইসলামী ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা যাবে। আসলে এটা হচ্ছে এ ব্যবস্থা চালু করার এক কাল্পনিক চিন্তা। বাস্তবে এটা কখনো সম্ভব নয় এ জন্যে যে, মানব নির্মিত ব্যবস্থা ও আল্লাহর ব্যবস্থা পরস্পর বিরোধী। ইসলামী ব্যবস্থায় সকল নিয়ম নীতি এক স্থায়ী বুনিয়াদের ওপর গড়ে ওঠেছে, যার মূলে আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর রসূলের ব্যবস্থাপনা সক্রিয় রয়েছে এবং তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হচ্ছে গোটা বিশ্ব। এ ব্যবস্থার নিরন্তর চেষ্টাই হচ্ছে জাহেলী ব্যবস্থার মধ্য থেকে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা, আর জাহেলিয়াত এটা কিছুতেই বরদাশত করতে রাযি নয়, যার কারণে যারাই ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাদের নানা প্রকার যুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে চরম ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। এ পরীক্ষা চলে তাদের ওপর (জাহেলী ব্যবস্থার মধ্যে থাকাকালে) সারা যিন্দেগীভর। অপরদিকে বর্তমানে যে জাহেলী ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা হচ্ছে মানবনির্মিত, এ ব্যবস্থা পরিবর্তন

বিরোধী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের সংরক্ষণার্থে সক্রিয় এবং রক্ষণশীল ঈমান ও ইসলামের সাথে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। এ জন্যে এ ব্যবস্থার সাথে আপস?—এটা শুধু মুখের কথা ও শূন্যে স্বর্গ রচনার মতোই অবাস্তব। যেখানে মানব নির্মিত ব্যবস্থা বিজয়ী অবস্থায় চালু আছে, সেখানে কোনো আপসরফা করে আল্লাহর ব্যবস্থা চালু করা যায় না।

যে সব লেখক ও আলোচক এ উভয় প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান ঘুচাতে চায়, এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চায়, তারা আপসরফা করতে গিয়ে আসলে খুবই মুশকিলে পড়ে যায়। প্রথম যে জটিলতার তারা সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে, সমস্যা সমাধানকল্পে নিয়োগযোগ্য প্রভাবশীল ব্যক্তির নিয়োগ প্রশ্নে ও পদ্ধতিতে, অথবা শূরার মেম্বার নির্বাচন পদ্ধতিতে। এ প্রশ্নে যে আত্মপ্রচার করা যাবে না এবং নিজেদের গুণাবলী সম্পর্কে নিজেরা কিছু বলা যাবে না, ওদের বিবেচনায় আজকে এ জনবহুল সমাজে— যখন কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কারো পরিচয় জানে না, সে অবস্থায় কারও যোগ্যতা ও প্রার্থীপদ লাভের যোগ্যতা জনগণকে জানানোর উপায় কি? যে দায়িত্বপূর্ণ পদে তাদের বসানো হবে সে কাজে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বুঝার জন্যে সত্যিকারে কি ব্যবস্থা আছে, কোন নিক্তিতে তাদের সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিমাপ করা হবে, তাদের নির্দোষিতা প্রমাণের ও আমানতদারী যাচাইয়ের উপায় কি, নেতা-নির্বাচনের উপায় ও তাদের যোগ্যতা মাপার পথ ও পদ্ধতিই বা কি হবে? সাধারণ ভোটে কি নেতা নির্বাচন হবে, না মৌলিক গণতন্ত্রের কায়দায় প্রভাবশীল জনগণ দেশের নেতা নির্বাচন করবে? তারাই বা কোন নীতির ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন করবে? হাঁ, দেশের প্রভাবশীল ব্যক্তিদের ভোটে যদি নেতা নির্বাচনের কাজ সমাধা হবে বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে মুষ্টিমেয় ওই লোকগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের স্বপক্ষে নিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়, কিন্তু এদের পকেটে নিয়ে যখন কেউ নেতা নির্বাচিত হয়ে যাবে তখন তার হাতে সমস্ত ক্ষমতাই চলে যাবে এবং সে এমন নেতা হয়ে যাবে যে, তার ওপর আর কেউ কিছু বলার থাকবে না। আর যতোদিন সে অবলীলাক্রমে তার কর্তৃত্ব চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে, তার কাছে এই দলটিই হবে প্রথম বিবেচনাযোগ্য। যাদের খুশী রাখাই হবে তার বড় কাজ।

এই ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন তোলা হয়, যার জওয়াব পাওয়া খুবই মুশকিল!

এই জটিল চিন্তার শুরু কোথায় তা আমি জানি। সাধারণভাবে এটা ধরে নেয়া হয়, যে জাহেলী সমাজে আমরা বাস করি তাকে আমরা একটা মুসলিম সমাজ মনে করি। এখন চলুন আমরা বর্তমান জাহেলী সমাজে প্রচলিত আইন কানুন ও সামাজিক রীতি নীতি কতোটুকু ইসলামী বিধি বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ তা একটু খতিয়ে দেখবো, দেখবো ইসলামী মূল্যবোধের সাথে ও ইসলামী চরিত্রের সাথে এর কতোটুকু মিল আছে।

প্রকৃতপক্ষে জটিল চিন্তনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে এইটাই মূল কথা যে, আমরা মুসলিম সমাজ মনে করলেও এ সমাজের চিন্তা চেতনা, রুচি, আইন কানুন বহুলাংশে বিজাতীয় ভাবধারায় প্রবাহিত। আমরা এক সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে ইসলামী জীবন ও তার সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং এমন এক সমাজের মধ্যে তা তালাশ করছি যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে অনৈসলামী ভাবধারা। এ ভাবধারা যেমন দূর দেশে রয়েছে, তেমনি দেশের অভ্যন্তরেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

যে জাহেলী সমাজে আমরা বসবাস করছি তা মোটেই কোনো ইসলামী সমাজ নয়; সুতরাং এখানে শরয়ী হুকুম আহকাম বা ইসলামী আইন কানুন এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু করা

সম্ভব নয়, সম্ভব নয় এখানে ফেকাহর যেসব জটিলতা ও মতভেদ রয়েছে সেগুলোর মীমাংসা করা। এ সব কঠিন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এ জন্যে যে, এগুলোর কার্যকারিতাও ক্ষতিকর দিক কোনো শূন্য পরিবেশে পরীক্ষা করা যায় না। আসলে ইসলামের স্বর্ণযুগে বাস্তব জীবনে এগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয়ে মানুষকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সমাধান করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, যুগ ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে আজো সেসব বিষয়ে কোরআন হাদীসের পরিপন্থী ব্যবহার না করেও পরিবর্তন আনা সম্ভব।

অবশ্যই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গঠন পদ্ধতি জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। এ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন বিশেষ এক জনপদ, যারা প্রকৃতির দিক দিয়ে হবে সংগ্রামী ও ত্যাগী। এ সমাজ ব্যবস্থা গড়তে গিয়ে তাদের জাহেলী সমাজের সব কিছুর সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছে, এ সমাজের মূল্যায়নকে সুন্দর বানাতে হয়েছে এবং বরাবর স্থানীয় মানব রচিত যাবতীয় তৎপরতা ও আল্লাহ-রসূলের পথের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে।

এটা ছিলো এক নতুন জনপদ, নব গঠিত এক সমাজ, এ সমাজ ছিলো চির সবুজ, চির সচল এবং মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করার জন্যেই এ সমাজের জন্ম হয়েছিলো– কোনো বিশেষ জনতার মুক্তির জন্যে নয়। গায়রুল্লাহর দাসত্বের বন্ধন থেকে পৃথিবীর সকল জনগণের মুক্তির আহ্বান নিয়ে এ সমাজ গড়ে ওঠেছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহদ্রোহী সকল প্রকার শক্তির দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করে মানবতার মর্যাদাকে উন্নত করা.......... সে তাগুতী শক্তি যারাই হোক না কেন।

এ সমাজ গঠনকালে আত্মশুদ্ধির নিয়ম কানুন শিক্ষা দেয়া হয়। নির্দেশ দানকারী নেতা নির্বাচন, পরিচালক নির্বাচন, শূরা গঠন পদ্ধতি এবং এ সম্পর্কিত আরও এমন বহু বিষয় শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা জীবনকে প্রভাবিত করে, যা নিয়ে ইসলামকে জানার জন্যে মানুষ কিছু অবসর পেলেই আলোচনা করতে চায়, বিশেষ এমন এক জাহেলী সমাজের মধ্যে বসে তারা আলোচনা করে যার মধ্যে আজ আমরা বাস করছি .... এ জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ছাড়াই মুসলিম সমাজে এ ব্যবস্থা কিভাবে চালু করা হবে তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মানুষ আলোচনা করে চলেছে– এ জীবন ব্যবস্থার মূল্য ও মর্যাদা, এর যথার্থতা, এর মধ্যে বিরাজমান নৈতিক শিক্ষা, এর বিভিন্ন চিন্তাধারা, এর চরিত্র গঠন-পদ্ধতি– এসব বিষয়ে দিনের পর দিন তারা নিষ্ফল আলোচনা করে চলেছে।

এসব আলোচনার আরো বিষয়বস্তু হচ্ছে, আধুনিক সমাজে প্রচলিত সূদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে কিভাবে ইসলামকে খাপ খাওয়ানো যায়, সূদী ব্যবস্থার নিয়ম কানুন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, জানি না আরও কতো কিছু। তবে এসব বিষয়ের মধ্যে শেষ যে বিষয়টি নিয়ে তারা বেশী ব্যস্ত, যাকে তারা সব থেকে বেশী কঠিন মনে করে এবং তাদের কাছে সব থেকে প্রিয় আলোচনা– তা হচ্ছে তারা চায়, মানুষ এ নিয়ে মাথা ঘামাক এবং ইসলামকে এসবের সাথে খাপ খাইয়ে নিক!

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আলোচনার শুরুতেই এসব মহান (?) ব্যক্তি নানা প্রকার চিন্তায় জড়িয়ে পড়ে। তাদের কথা শুরু হয় এই অনুমান দিয়ে যে, আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার সাথে তো আমাদের খাপ খাইয়ে চলতে হবে, এমতাবস্থায় কি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও তার হুকুম-আহকাম সংশোধন করে বর্তমান অবস্থার উপযোগী করে নেয়া যায় না? এটা করতে পারলে গোটা পরিবেশে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা চালু করে দেয়া সহজ হবে এবং সমগ্র জগতে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে।

হাস্যোদ্দীপক এ সব কল্পনা, দুঃখজনকও বটে!

ইসলামী আইন কানুন এবং এর যাবতীয় যুক্তি মুসলিম সমাজ কর্তৃক গড়ে ওঠেনি। প্রথমত, জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে এবং দ্বিতীয়ত, বাস্তব দুনিয়ার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে পুরোপুরি ইসলামী আইন কানুনের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যবস্থা তার ফেকাহশাস্ত্র গড়ে তুলেছে। এখন এর মধ্যে যদি কোনো মানুষের মত অনুপ্রবেশ করে, তাহলে এটা আর আল্লাহর আইন থাকলো না।

এটা সদা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী ফেকাহ কোনো শূন্যের ওপর গড়ে ওঠেনি এবং শূন্যের ওপর বাসও করে না, এটা কোনো উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত বিধান নয়, না এটা মানব নির্মিত কোনো ইতিহাস; বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে এবং রসূল (স.)-এর শিক্ষার আলোকে বাস্তব জীবনকে শক্তি শৃংখলামতে পরিচালনা করার জন্যে বুদ্ধিগ্রাহ্য একটা ব্যবস্থা, যা বিশেষ করে মুসলমানদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গড়ে একটা ইসলামী সমাজ গড়ে তোলে। এ সমাজের বিধি নিষেধগুলো সবই মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। ইসলামের এই বিধানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ইসলামী ফেকাহ (বুঝ বা যুক্তি বুদ্ধি) এবং এ যুক্তি বুদ্ধি নিয়ে এ ব্যবস্থা সব কিছুর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, অবশ্য এর মধ্যে কিছু মতভেদও থাকে...........।

আল্লাহর দেয়া পূর্ণাংগ এ জীবন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে চাই আল্লাহর আইন দ্বারা বিশেষভাবে গঠিত এক সমাজ, যা জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হবে এবং ধীরে ধীরে জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন হক-ইনসাফ মতো মেটানোর ব্যাপারে মানুষকে সাহায্য করবে .... এভাবে, এ ব্যবস্থা মানুষকে অর্থনৈতিক যাবতীয় কর্মকান্ডেও পথ দেখাবে। আধুনিক চিন্তা চেতনা ও বাস্তব জীবনকে গ্রাস করে নিয়েছে যে ব্যাংক ব্যবস্থা, ইনস্যুরেন্স (বীমা ব্যবস্থা) ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, এ প্রশ্নগুলোর যথাযথ জবাব দেবে। প্রকাশ থাকে যে, এসব রংগিন মত ও পথ দেখিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীরা মানুষকে শোষণ করার জন্যে এসব হাতিয়ার আবিষ্কার করে এগুলোর ফযীলত এমনভাবে বর্ণনা করে চলেছে যে, সরলমনা সাধারণ জনতা এর বিভ্রান্তিগুলো বুঝতে সক্ষম হয় না। এগুলো সবই এক শ্রেণীর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত পদ্ধতি। এগুলোর কোনো প্রয়োজন ইসলামী সমাজে হয় না, এজন্যে এগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। ইসলাম যেখানে যাকাত ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে এবং সরকার যেখানে সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত, সেখানে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণমনা মানব নির্মিত কোনো ব্যবস্থা তার পাশে উন্নততর হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আরও মনে রাখতে হবে, মানুষের চিন্তা ভাবনা ও দৃষ্টি পৃথিবীর সংকীর্ণ গন্ডি ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারে না, অপরদিকে ইসলামের দৃষ্টি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এ জীবনের সীমা পেরিয়ে পরপারের অসীমতায়। জাহেলী ব্যাংক ব্যবস্থা, জীবনবীমা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা– এগুলোর কোনো প্রয়োজন মুসলিম সমাজ বোধ করে না, অতীতেও এসব চিন্তা ইসলামী সমাজে ছিলো না। এগুলোর সাথে একমত হওয়া এবং এগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে চলা তো দূরের কথা, এই বাতিল সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বও ইসলাম মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। মানব নির্মিত এ বাতিল সমাজ ভেংগে চুরমার করে দিয়ে আল্লাহর রাজ্যে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে ইসলাম বদ্ধপরিকর এবং এর জন্যে আল্লাহর সৈনিকরা আপসহীন সংগ্রাম করে যাবে।

ওই আলোচনাকারীদের ব্যাপারে আসল কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে, ওরা মনে করে, জাহেলী ব্যবস্থাই মূল সভ্যতা, যার সাথে ইসলামী সভ্যতাকে মানিয়ে নিতে হবে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত; অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাই আসল, এর সাথে মানুষ খাপ খাইয়ে চলবে এবং নিজেদের উদ্ভাবিত সকল পন্থা পদ্ধতি পরিত্যাগ করবে। জাহেলী আমলের সব কিছুকে ছোট জানবে, কিন্তু এই ছোট মনে করা এবং পরিবর্তন আনা একটিমাত্র পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারবে, আর তা হচ্ছে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম। এর উদ্দেশ্য একটিই, তা হচ্ছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করা, বান্দাদের একমাত্র তাঁরই প্রভুত্ব মেনে নেয়া, মানুষকে তাগূতী শক্তির গোলামী থেকে মুক্ত করা এবং তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আইন কানুন চালু করা। তবে এটা ঠিক যে, এ আন্দোলন নিষ্কন্টক নয়– এর পদে পদে রয়েছে বিপদ, কষ্ট ও নানা প্রকার পরীক্ষা। যারা ধৈর্যশীল ও অবিচল, তারা এসব পরীক্ষায় সফলতা লাভ করবে। আর যারা দুর্বলচেতা, তারা এ সব পরীক্ষার কঠোরতা বরদাশত করতে না পেরে হাল ছেড়ে দেবে এবং প্রাণপ্রিয় যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছিলো তার থেকে পিছিয়ে যাবে। যারা আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা সত্যে পরিণত করবে এবং সত্যের পথে শাহাদাত বরণ করবে, অথবা বিপদ-আপদের ঝড়ঝঞ্ঝা যাইই আসুক না কেন তা অম্লান বদনে সহ্য করবে এবং এগিয়ে যাবে সত্যের পতাকা হাতে বীরদর্পে সামনের দিকে, আর চলতে থাকবে ততোক্ষণ যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের ও তাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা না করে দেবেন। তারা দ্বীনের ঝান্ডা হাতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে, একমাত্র এই প্রক্রিয়াতেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের বীর মোজাহেদরা এইভাবেই বরাবর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করে এসেছে এবং এ জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এইভাবে, আল্লাহর মেহেরবানীতে যখন এ মহান দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে তখন তাদের জীবনের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন ও সমস্যা সামনে আসবে এবং সেগুলোর সমাধান ধীরে ধীরে আসতে থাকবে; অবশ্য তাদের সমস্যা ও সমাধান বর্তমান জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার সমস্যা ও সমধান থেকে ভিন্নতর হবে। তখন ওই নতুন অবস্থা অনুসারে ইসলামী হুকুম আহকাম প্রয়োগ করা হবে। এ সময় ইসলামের যুক্তি-বুদ্ধির বলিষ্ঠতা ও প্রাণ প্রবাহের প্রমাণ পাওয়া যাবে। এগুলো শুধু মৌখিক কথা নয় যে শূন্যে ভাসতে থাকবে; বরং জীবন্ত ইসলামী সমাজের মধ্যে আগত বাস্তব সমস্যার সমাধানকল্পে এ সমাধান আসবে।

আজকের বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কেউ কি আমাদের এমন একটা দৃশ্য দেখাতে পারবে, যেখানে মুসলিম সমাজের মতো যাকাত দান করা হয় এবং আল কোরআনে বর্ণিত খাতগুলোতে সে অর্থ ব্যয়িত হয়, মানুষে মানুষে ভালোবাসাবাসি, দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়, দুঃখ বেদনা, সংকট সমস্যার সুযোগ নিয়ে শোষণ করার পরিবর্তে দরদ ভালোবাসা নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর সকল সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা হয়, সকল ব্যক্তির মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, যেখানে মানুষের জীবনে কোনো অপচয় থাকে না, থাকে না প্রদর্শনীমূলক কাজ বা অহংকার ও আত্মপ্রশান্তিমূলক গালগল্প........... এইভাবে অতীতে গোটা ইসলামী সমাজের চিত্রের মতো কোনো চিত্র আধুনিক সভ্যতাগর্বী সমাজের কোথাও আছে বলে কেউ দেখাতে পারবে কি? কেউ কি বলতে পারবে, ইসলামের স্বর্ণযুগে মানব সভ্যতার যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো, যে শান্তি ও সমৃদ্ধি এসেছিলো, আজকেও যদি আমরা অনুরূপ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি তাহলে সেখানে মানব নির্মিত এ ধরনের আরো কোনো সংস্থা গঠনের প্রয়োজন থাকতে পারে?

এমনি করে কেউ কি আমাদের বলতে পারবে, উপরোক্ত ইসলামী সমাজের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা বা অনুরূপ কোনো কর্মসূচীর প্রয়োজন হবে? আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর যে বান্দা দুনিয়ায় আসা সাব্যস্ত হয়ে রয়েছে- তাদের ঠেকানোর কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে? এমনি করে মানুষের মনগড়া বিধি বিধান প্রণয়নে উদ্ভূত হাজারো রকম যে সমস্যা আজকের (আধুনিক) সমাজে বিরাজ করছে, রসূল (স.)-এর অনুকরণে আল্লাহর বিধানে পরিচালিত সমাজে কি ওইসব কঠিন সমস্যা আসতে পারে?

আর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে কি শান্তি স্থাপিত হতে পারে তা যদি আমরা অনুমান করতে না পারি এবং আজকের ((জাহেলী) সমাজ সভ্যতার মধ্যে নানা মতভেদের কারণে, নানা প্রকার চেতনা ও মূল্যায়নের দরুন আগত সমস্যা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি, তাহলে সে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চাওয়ার এবং ইসলামের আলোকে উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টায় আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে গাত্রদাহের হেতু কি? ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামী চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যখন বিভিন্নমুখী চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করলো, তখনই তারা সীমাহীন সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে গেলো, কিন্তু সমস্যা আরও ঘনীভূত হলো তখন যখন মানুষ আধুনিক মুসলিম সমাজকে ইসলামী সমাজ মনে করে, এর মধ্যে বিরাজমান ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থা মনে করে এর কাছেই সমাধান আশা করলো। ইনশাআল্লাহ, শীর্ঘই আমরা এ বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্যে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করবো এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাংগ রূপ তুলে ধরবো, তুলে ধরবো পূর্ণাংগ ইসলামী চিন্তাধারাকে, এর মূল্যায়ন ও পরিমাপের নীতিকে।

আবারো বলছি, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার প্রশ্নে যে মূল জটিলতা আমরা অনুভব করছি তা হচ্ছে, আধুনিক মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানব রচিত বর্তমান জাহেলী সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে তার সাথে আল্লাহ রসূলের কিছু আইন জোড়াতালি দিয়ে ইসলামী সমাজ কায়েম করার স্বপ্ন দেখে এবং তারা ইসলামী বিধানের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে রাতারাতি এ বিপর্যয় সমাজের সকল সমস্যা ও সংকট দূর করতে চায়, অথচ মানব রচিত ওইসব বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের বিরোধিতা করা, এর অসারতা প্রমাণ করে কোরআন সুন্নাহ থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া এবং এইভাবে বাস্তবে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া।

অবশ্য, আমরা মনে করি, সময় এসেছে ইসলামের প্রচারকদের দ্বারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার। তারা আর আধুনিক জাহেলী জীবন ব্যবস্থার সেবাদাস হয়ে থাকবে না এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়ে থেকে জাহেলিয়াতের মনিবদের আর আনুগত্য করে যাবে না; বরং যারা তাদের কাছে জানতে চাইবে তাদের বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে সকল মানুষকে ডেকে বলবে, 'সর্বপ্রথম তোমরা আল্লাহর দ্বীনের দিকে এসো, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার ঘোষণা দাও এবং এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নেই- এই ঘোষণা এবং এর বাস্তব অনুশীলন ছাড়া ঈমান ও ইসলাম কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। এর অর্থ হচ্ছে, যেমন করে ঊর্ধ্বাকাশে প্রভুত্ব করার ও ক্ষমতা খাটানোর অধিকার একমাত্র আল্লাহর, তেমনি পৃথিবীর ওপরও আধিপত্য করার, রাজত্ব চালনোর অধিকার এবং ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আকাশ রাজ্যে যেমন তাঁর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বিরাজ করছে, তেমনি পৃথিবীর সর্বত্রও তাঁর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং এখানকার অধিবাসীদের একমাত্র তাঁরই আইন মানতে হবে, অর্থাৎ

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাঁরই শাসন ক্ষমতা ও তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বান্দাদের বান্দার গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে, আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষের ওপর থেকে মানুষের মনগড়া শাসন ক্ষমতা অপসারিত করে এবং মানুষের ওপর থেকে মানব রচিত আইন তুলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আইন তাঁর বান্দার ওপর চালু করা হবে।

পৃথিবীর যে কোনো ভূখন্ডে তখনই আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা চালু হবে, যখন সাধারণভাবে মানুষ এ জীবন ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করবে, অথবা অন্তত কোনো নির্দিষ্ট দেশের এক উল্লেখযোগ্য জনতা এ আহ্বানে সাড়া দেবে। এজন্যে অবশ্যই কোনো এক মুসলিম সংগঠনকে কোনো নির্দিষ্ট ভূখন্ডে কদম জমিয়ে বসে যেতে হবে, আর তখনই তাদের কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঈমানদার ব্যক্তিরা বুঝে সুঝে তাদের সাথে যোগ দিতে থাকবে। এইভাবে সত্যাশ্রয়ী জনতার কাফেলা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তারা বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আল্লাহর বিধান চালু করতে থাকবে, বাস্তবে এই ইসলামী সমাজ গঠন করার পূর্বে ফেকাহ ও সাংগঠনিক বিধি-বিধানের ময়দানে যে কাজ করা হয় তা নিছক এক ধোঁকা ও আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। কারণ এ কাজের অর্থ হচ্ছে হাওয়ায় বীজ বপন। আর শূন্যে ইসলামী ফেকাহ কখনো কোনো গাছ রোপণ করতে পারবে না, যেমন বাতাসে কোনো বীজ বোনা যায় না।

চিন্তা ও কল্পনার ক্ষেত্রে ইসলামী ফেকাহর যে চর্চা হয় তা নিছক এক আমোদজনক খেলা! এর কারণ হচ্ছে, এ খেলায় কোনো ঝুঁকি নেই; বরং প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের কোনো কাজও নয় বা এটা দ্বীন ইসলামের কোনো পদ বা পদ্ধতি বা ইসলামের কোনো মেযাজও নয়! এটা তাদের কাছে একটি আরামদায়ক মজার খেলা। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় যখন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম নেই, সে সময়ে ইসলামের জন্যে এ ধরনের মুখরোচক ইসলামী ফেকাহ রচনা বা ফেকাহ সম্পর্কিত আলোচনাকে আমি ওই রকমের এক কল্পনাবিলাস মনে করি। মনে করি, এ হচ্ছে সময় ও শ্রম নষ্ট করা (যেহেতু বাস্তবে এর কোনো প্রতিষ্ঠা নেই), আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

অবশ্য অবশ্যই দ্বীন ইসলাম এমন কোনো ফেরারী উট বা কোনো পলাতক জীব জানোয়ার নয়, যা মাঠে-ময়দানে পালিয়ে বেড়াবে; বা নয় এটা কোনো এক অনুগত (চাকর,) যা এমন এক জাহেলী সমাজের মানুষের তাবেদারী করে যারা তার থেকে দূরে থাকতে চায়, যারা এর সাথে সাক্ষাত হওয়াটাও পছন্দ করে না, এ চাকর ও তার খেদমত গ্রহণ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে চায় ...... হাঁ, কখনও কখনও সংকটে সমস্যায় পড়ে বিদ্রূপাত্মকভাবে ফতোয়া অবশ্য তারা চায় (তাচ্ছিল্য ভরে ওদের কাছে সমস্যার সমাধান চায়)! আসলে ওই বাতিল সমাজ ও তার লোকেরা ইসলামের কোনো সমাধান চায় না, বা ইসলামী আইনের কাছে নতিস্বীকার করতে চায় না, ইসলামী শাসন মানতে চায় না।

আবারো বলছি, দ্বীন ইসলামের যুক্তিবিদ্যা এবং কোরআন হাদীসকে কেন্দ্র করে যে ফেকাহশাস্ত্র গড়ে ওঠেছে এবং এর বিধি বিধান জনমানবশূন্য কোনো প্রান্তরে অথবা উর্ধ্বাকাশের মহাশূন্যতায় গড়ে ওঠেনি, শূন্যের মধ্যে এ জীবন বিধান কাজ করে না ..... বরং বার বার এটাই দেখা গেছে যে, গোড়া থেকেই মুসলিম সমাজ আল্লাহর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর ক্ষমতার সামনে বরাবর মাথা নত করেছে, যেহেতু তাঁর হুকুম পালন করার উপকারিতা সম্পর্কে তিনিই জানিয়েছেন, জানিয়েছেন কখনো কোরআনের বাণী দ্বারা, আবার কখনো তাঁর রসূলের মাধ্যমে .... আল্লাহর নির্দেশাবলীর মধ্যে যৌক্তিকতা রাখার কাজটা কোনো মানুষের সংগঠন করেনি, বা এটা কোনো মানব সমাজ-উদ্ভাবিত কর্মও নয়। আর এমনও হয়নি যে, কোনো আয়াত উল্টে দেয়া হয়েছে।

নিছক ইসলামী সমাজের অগ্রগতির জন্যে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং এর (অগ্রগতির) পর্যায়ক্রমিক ধারাসমূহ এক স্থায়ী নিয়মে বাঁধা; আর জাহেলী ব্যবস্থা থেকে ইসলামী ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া কোনো একদিনে সম্ভব হয়নি বা এটা কোনো সহজ সরল কাজ ও নয়, বা মহাশূন্যে রচিত কোনো ব্যবস্থাও নয়, নয় এটা আকাশের জন্যে তৈরী কোনো জ্ঞানগর্ভ বিধান; বরং আমাদের সদা সর্বদা ইসলামী সমাজ ও ইসলামী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। এর জন্যে সর্বপ্রকার যোগাড় যন্ত্র করতে হবে আর ইসলামের আইন কানুনের বিস্তারিত বিবরণ, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ ছাড়া শুধু কল্পনার রাজ্যে গড়ে তুলে, সেখান থেকে এর সূচনা ধরে নিয়ে, তার আলোকে জনগণকে জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে এগিয়ে আনা সম্ভব হবে না। আর এইভাবে এসব জাহেলী সমাজ সংগঠনগুলো পরিবর্তিত হয়ে ইসলামের জ্ঞানগর্ভ সমাজে রূপান্তরিত হবে তাও নয়! আবার জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে আসায় যে জটিলতা আছে তা দূর করার জন্যে ইসলামী ব্যবস্থার আইন কানুনের মধ্যে কোনো শিথিলতা বা পরিবর্তন আনাও কোনোদিন সম্ভব হবে না। এভাবে ইসলামী বিধানে কেউ কাউকে ধোঁকা দিতে পারে না বা কারো দ্বারা ধোঁকা খাওয়াও চলে না।

তবে হাঁ, একমাত্র সেসব আল্লাহদ্রোহী শক্তিরাই জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত না করে ইসলামী ব্যবস্থা চালু করতে চায় এবং এ বিষয়ে বাগাড়ম্বর করে, যারা প্রকৃতপক্ষে একথা স্বীকার করতে চায় না যে, শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তারা এও স্বীকার করতে চায় না যে, মানুষের কর্তা-মনিব, প্রভু প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ এবং বিশ্বজগতের বাদশাহী থাকবে একমাত্র আল্লাহরই হাতে। এইভাবে আসলে তারা ইসলাম থেকে পরিপূর্ণভাবে বের হয়ে যায়। একথা বার বার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, গোটা বিশ্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ; সুতরাং দ্বীন ইসলামের ধারক বাহকদের কাছে আল্লাহর দাবী হচ্ছে একমাত্র তাঁরই আইন সারা বিশ্বে চালু করা .... এতদসত্তেও অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর বলদর্পী অহংকারী ব্যক্তিদের দাসত্ব করে চলেছে। অর্থাৎ তাদের আইন কানুন মেনে চলছে, তাদের কাছে নতিস্বীকার করছে এবং তাদের অনুসরণ করে চলেছে। এইভাবেই তাদের নানা কায়দায় তারা ত্রাণকর্তা ও নিঃশর্তভাবে আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য বানিয়ে নিয়েছে। আর এইভাবেই এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা অন্ধ আনুগত্য দ্বারা তাওহীদী বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গিয়ে শেরেকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এইটাই হচ্ছে শেরেকের সব থেকে বেশী প্রামাণ্য দলীল .... তাই দেখা যাচ্ছে, এভাবে বা ওভাবে পৃথিবীর প্রায় সবখানে শাসন ব্যবস্থার ওপর জাহেলিয়াতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর যেখানে বস্তুগত শক্তির প্রাবল্য যতো বেশী, ততোবেশী সেখানে মানুষের গোলামী জেঁকে বসে রয়েছে এবং ততোবেশী গোমরাহীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

ফেকাহ শাস্ত্রের বিধি বিধানের মধ্যে এসব জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করার কোনো কর্মসূচী নেই, নেই এমন কোনো উপযুক্ত উপায় উপকরণ ফেকাহবিদদের কাছে, যার দ্বারা তারা ওই তাগুতী শক্তির মোকাবেলা করতে পারেন। ওদের মোকাবেলা তো তারাই করতে পারবে যারা পুনরায় মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে ডাক দেবে, যারা জাহেলী ব্যবস্থার মোকাবেলা করার জন্যে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং জাহেলী ব্যবস্থার মধ্যেও ইসলামের দিকে মানুষকে সদা-সর্বদা দাওয়াত দিতে থাকবে। এতে সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা থাকবেই, তা সত্তেও যখন আল্লাহর নেক বান্দারা সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করতে থাকবে তখনই আসবে আল্লাহর সাহায্য। আর তখন যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের ও তাদের জাতির

মধ্যে আল্লাহ তায়ালা একটা ফয়সালা করে দেবেন। ইসলামের এমন বিজয় সূচিত হওয়ার পরই ফেকাহ নিয়ে আলোচনা এবং এ সম্পর্কিত মতভেদ দূর করার প্রয়াস পাওয়া সংগত হবে। আর তখনকার নতুন সমাজের নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ওইসব জীবন্ত সমস্যাগুলোর বাস্তবসম্মত সমাধান বের করা সম্ভব হবে। জীবনের নতুন নতুন এ সব সমস্যা ঘুরে ঘুরে নব নব রূপ নিয়ে আসবে এবং তখন এ সবের যুক্তি বুদ্ধিসম্মত সমাধানও দেয়া যাবে। এইভাবে নিত্য-নতুন সমস্যা যতোই আসুক না কেন, তা সবই আল্লাহ আলেমুল গায়েবের জ্ঞানভান্ডারের মধ্যে রয়েছে, যে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, কিন্তু ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা আমাদের পক্ষে যেমন আন্দাজ করা সম্ভব নয়, তেমনি এই মহান জীবন্ত ব্যবস্থা থেকে কি সমাধান বের করা যাবে তা আন্দাজ করাও সম্ভব নয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় কিন্তু এটা নয়। কোরআন ও হাদীসে শরয়ী যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে তা আজ কেতাবেই রয়ে গেছে। বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ না থাকায় তার সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমরা বলতে চাই, আজ আমাদের সেই সমাজ কায়েম করতে হবে যার মধ্যে ওই ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। আল্লাহ-রসূলের বিধান বাস্তবায়িত হওয়ার জন্যে যেমন প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি নিবেদিত এক সমাজ, তেমনি সমাজ সুন্দর হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে ওই বিধানের বাস্তবায়ন। সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এক ইসলামী সমাজ যখন আল্লাহর বিধানকে জীবনের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করে, তখনই ওই বিধানের সৌন্দর্য বিকশিত হয় এবং তার কার্যকারিতা মানুষের গোচরীভূত হয়; আর এটাও ঠিক, এ বিধানের প্রয়োগের জন্যে দরকার আল্লাহ প্রেমিক একটি আগ্রহী সমাজ.......... সুতরাং যে বিধানকে নিয়ে আমরা গৌরববোধ করি সেই ইসলামী জীবন বিধানের সৌন্দর্য যদি আমরা দেখতে চাই, বুঝতে চাই এর উপযোগিতা, শান্তি গড়ে তোলার জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা জানতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই এমন সমাজ গড়ার জন্যে বদ্ধপরিকর হতে হবে। আর এর জন্যে সমাজের ওইসব মুসলমানদের মনের মধ্যে এক দায়িত্ববোধ থাকতে হবে যারা নিজেদের মুসলমান মনে করে, যারা জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় এবং বিদ্রোহী অহংকারী ব্যক্তি ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ধারক বাহকদের নাগপাশ ছিন্ন করে উড়াতে চায় ইসলামী আইন কানুনের বিজয় কেতন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, আত্মগর্বী, শক্তিদর্পী ওইসব দুনিয়াদার লোকেরা বিশ্ব সম্রাটকে প্রতিপালক হিসাবে চিনতে চায় না, তার পরিবর্তে প্রতিপালক মনে করে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর দেহের অধিকারী কিছু ব্যক্তিকে, যাদের না আছে কোনো অতীত আর না আছে কোনো ভবিষ্যত; বরং ঘটনাক্রমে সাময়িকভাবে কোনো ক্ষমতার আসনে এরা জেঁকে বসার সুযোগ পেয়েছে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিসমূহ সকল যুগেই এক ও অভিন্ন

ইসলামী জাগরণের প্রকৃতি চিরদিন একই রকম থেকেছে, এর কোনো দিন কোনো পরিবর্তন নেই। যখনই জাহেলিয়াতের হাতে ক্ষমতা আসে এবং ইসলামের পতাকাবাহী মোজাহেদ দল এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়, তখনই শুরু হয় ইসলামকে বাস্তব ময়দানে কায়েম করার সংগ্রাম। পৃথিবীতে আল্লাহর আইন উৎখাত করে যখনই মানব রচিত আইন কানুন চালু হয়েছে, তখনই অশান্তি ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়েছে এবং তখন প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে, যদিও আযান একামাত ও মসজিদ এবং কিছু ইসলামী রীতি নীতি ও কাজ চালু থেকেছে, যার কারণে মানুষের অন্তরে এ দ্বীনের ক্ষীণ চেতনাটুকু মাত্র বাকি রয়ে গেছে বাকি রয়ে গেছে তাদের মনের পর্দায় ইসলামের কল্যাণকারিতার এক কাল্পনিক ছায়া, কিন্তু বিশ্বজয়ী যে ব্যবস্থা নিয়ে রসূল (স.) এসেছিলেন, আসলে তা মুছে গেছে।

অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, আমাদের সময়ের ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও চেতনা জাগরিত হওয়ার পূর্বে, সমাজে মসজিদ নির্মিত হওয়ার বহু বহু আগে গড়ে ওঠেছে প্রাচীন ইসলামের মূলমন্ত্র; আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করা যাবে না– এই অনুভূতির ভিত্তিতে এক ইসলামী নব চেতনার এই জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়েছিলো একটি ডাকে: এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহর (নিঃশর্তভাবে ও নিরংকুশভাবে মেনে নাও আল্লাহর হুকুম), নেই তোমাদের জন্যে তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রভু মনিব, মালিক, আইনদাতা ও শাসনকর্তা। অতএব, একমাত্র তাঁকেই দাও নিঃশর্ত নিরংকুশ এবাদাত (আনুগত্য), আর তাঁর প্রতি আনুগত্য শুধুমাত্র কিছু আনুষ্ঠানিক কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না; বরং গোটা জীবনে তাঁর যাবতীয় হুকুম ও আইন কানুন মানার মাধ্যমেই আনুগত্য প্রকাশিত হয়। এই মনোভাব নিয়েই শুরু হয়েছে আনুগত্য প্রকাশের শিক্ষা। এরপর এসেছে আইন কানুন। এইভাবে যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর যাবতীয় হুকুম মেনে নেয়ার মতো মন প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং এ বিষয়ে বিভিন্নভাবে গৃহীত পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তখনই শরয়ী বিধান নাযিল হতে শুরু করেছে। আর বাস্তবে যখন তারা বিভিন্ন প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছে এবং সেখানে আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে, তখনই এসেছে এমন কিছু বিধান, যেগুলোতে কোরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে মানবীয় যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করে ফয়সালা করার অধিকার দেয়া হয়েছে, যাকে বলা হয়েছে ফেকাহ প্রয়োগ। এই ফেকহী বিষয়াবলীতে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যবোধ রেখে নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছে।

মানব জীবনের সীমাহীন সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র পথ। এছাড়া মোমেনের যিন্দেগীতে অন্য কোনো পথ নেই। (ওদের দৃষ্টিতে মনে হয়) আহ, ইসলামের প্রথম যুগে যখন মৌখিকভাবে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছিলো এবং ইসলামের হুকুম আহকাম জানানো হচ্ছিলো, সে সময়ে সাধারণভাবে মানুষ যেভাবে দ্বীনের এ দাওয়াতে সাড়া দিচ্ছিলো, তার থেকে যদি কোনো পদ্ধতি (দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করার) থাকতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! কিন্তু না, এটা শুধু একটা আকাংখা প্রকাশ ছাড়া এর বাস্তব প্রয়োগ কখনো সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো এমন দেখা যায়নি যে, জাহেলিয়াত ও তাগুতী শক্তির এবাদাত পরিত্যাগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এক সথে ইসলামের দিকে এগিয়ে এসে একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করতে শুরু করেছে, বরং প্রতি যুগেই দেখা গেছে, পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এবং ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে মানুষ একজন দুই জন করে এগিয়ে এসেছে। প্রতিবারেই দেখা গেছে, শুরুতে একজন ইসলাম কবুল করেছে, সে পথ দেখিয়েছে অন্যদের তারপর প্রথম সারির একদল পথপ্রদর্শক অন্যদের সত্যের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। এরপর নবগঠিত এই ছোট্ট দলটি গড়ে তুলেছে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে এমন এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন, যা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিরামহীনভাবে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পৃথিবীর বুকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসনে। এইভাবে চিরদিন সত্যের বিজয় হয় এবং এ বিজয়পর্ব এসে যাওয়ার পরই মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে........... আর আল্লাহর দ্বীন বলতে বুঝায় তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা, তাঁর আইন এবং তাঁর দেয়া সমাজ ব্যবস্থা, যার বাস্তবায়ন আল্লাহ তায়ালা চান তাঁর বান্দার কাছে। এছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা তাদের জীবনে চলবে, আল্লাহ তায়ালা তা মোটেই বরদাশত করতে রাজি নন। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে নিজের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করবে, কিছুতেই তার থেকে তা কবুল করা হবে না।'

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার তাৎপর্য

আশা করা যায়, এ আলোচনা থেকে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার তাৎপর্য বুঝা সহজ হবে। তিনি এমন কোনো মুসলিম সমাজে বাস করছিলেন না, যেখানে, যার ওপর, মানুষের সামনে আত্মপ্রশংসা না করার নিয়ম প্রয়োগ করা যেতে পারতো এবং এই আত্মপ্রশস্তি না করার ভিত্তিতে কোনো দায়িত্ব চেয়ে নেয়া সম্ভব ছিলো, যেমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো যা তাঁর শাসক হওয়ার দাবী জানাচ্ছিলো। পরিস্থিতি তাঁকে এমন ক্ষমতাবান শাসক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছিলো যাঁর আনুগত্য করা হবে খুশী খুশীতে ও সন্তুষ্টচিত্তে। জনতা কিছুতেই চাইছিলেন না যে, এমন জ্ঞানীগুণী ও মহান এক ব্যক্তি জাহেলী পরিবেশের একজন খাদেম হিসাবে কোনো ক্ষমতা গ্রহণ করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করুন। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাপ্রবাহের ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বের এতদূর বিকাশ ঘটেছিলো যে, মানুষের হৃদয়ের আসনে তাঁর মর্যাদা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো যে তাঁর পক্ষে তাঁর 'দ্বীন'-এর দিকে দাওয়াতদানের পথ খোলাসা হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁর শাসনামলে গোটা মিসরে তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার পথ সম্পূর্ণভাবেই খুলে গিয়েছিলো। তাঁর যোগ্যতা ও চরিত্র সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের কারণে বস্তুতপক্ষে সেখানকার ক্ষমতাসীন সরকার ও বাদশাহর ক্ষমতা পুরোপুরিই ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো।

আসুন এবারে আমরা ফিরে যাই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে, অর্থাৎ ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার মধ্যে নিহিত মূল শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে, যার থেকে আমরা সাময়িকভাবে একটু দূরে সরে গিয়েছিলাম। এ পর্যন্ত আমরা একটি ভিন্ন প্রসংগে আলোচনা করছিলাম, যা মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট নয়, আমরা চাই, পাঠক যেন মনে না করতে পারে যে, মূল প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। সে বিষয়টা হচ্ছে, প্রাসংগিক আলোচনা এটা প্রমাণ করে না যে, ইউসুফ (আ.)-এর সাথে বাদশাহ সহযোগিতা করছিলেন। যেন বলা হচ্ছে তাঁকে ডেকে পাঠানো মানেই তো তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, তাঁর প্রতি সম্মান বৃদ্ধি এবং বাদশাহর কাছে তাঁর বিশেষ মর্যাদার বহির্প্রকাশ। এর জওয়াবে একথা বলাই যথেষ্ট হবে; বরং এটাই জওয়াব হওয়া উচিত যা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন। এখানে ইউসুফ (আ.)-এর উপস্থিতিতে বাদশাহর মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা উহ্য রয়ে গেছে, পাঠকও একথা বুঝতে ভুলে যাচ্ছে কোন স্থানে তাঁকে বাদশাহ ডেকে পাঠিয়েছিলেন; এ প্রসংগ শেষে আমরা যা বলবো তা উপরোক্ত কথাকেই সমর্থন করবে।

'আর এমনি করেই আমি, মহান আল্লাহ, ইউসুফকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা দিয়েছি .... আর আখেরাতের প্রতিদানই ঈমানদারদের জন্যে উত্তম, আর ওরা তাকওয়া পরহেযগারী করে চলতো।'

এইভাবেই ইউসুফ (আ.)-এর বহু মর্যাদা নানাভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁকে সকল দোষারোপ থেকে মুক্তি দিলেন, তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রতিভা, মনোমুগ্ধকর রূপ, বিস্ময়কর প্রজ্ঞা, চমৎকার ব্যবহার, হৃদয় কেড়ে নেয়ার মতো প্রকাশভংগি সব কিছুই বাদশাহকে চমৎকৃত করেছিলো, যার ফলে তিনি যে ক্ষমতা চাইলেন তা দিতে বাদশাহর এতোটুকু দ্বিধা সংকোচ হলো না.......... এভাবেই আমি মহান আল্লাহ ইউসুফকে পৃথিবীতে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দিলাম, তার পা দু'টিকে মযবুত করে জমিয়ে দিলাম এবং তাকে এমন সম্মান দান করলাম যা সবার নযরে পড়ার মতো ছিলো। দেশটি বলতে হয়তো মিসরকেই বুঝানো হয়েছে, অথবা তৎকালীন গোটা পৃথিবীও হতে পারে, যার মধ্যে মিসরের নাম নেয়া হয়েছে এই কারণে যে, তৎকালীন সভ্য জগতের মধ্যে মিসর সবার কাছেই সর্ববৃহ নগর ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র বলে বিবেচিত হতো।

তাঁর মর্যাদা জনগণের হৃদয় মাঝে এমনভাবে আসন করে নিয়েছিলো যে, তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই মানুষ তাঁকে মাথায় করে নিতো। অর্থাৎ তিনি যেখানে যে কাজ করতে চাইতেন, নির্বিবাদে করতে পারতেন, যেখানে তিনি পা রেখেছেন সে স্থানটাই তাঁর জন্যে মর্যাদা ডেকে এনেছে এবং তাঁর পদার্পণে উক্ত স্থানসমূহই ধন্য হয়ে গেছে। এক দিকে ছিলো সেই অন্ধ কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া, সেই ভয়ংকর কুঁয়ার মধ্যে নির্জনবাস, কারাগার ও তার মধ্যে চলাফেরার সীমাবদ্ধত, অপরদিকে সীমাহীন এই স্বাধীনতা ও অনাবিল সম্মান। এই তো ছিলো ইউসুফ (আ.)-কে প্রদত্ত মোজেযা। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'আমি মহান আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা তাকে আমার রহমত দান করি।'

অর্থাৎ আমার এই রহমতের কারণেই আমি কঠোরতাকে সহজ অবস্থায় পরিণত করে দেই, সংকীর্ণতাকে পরিবর্তন করে এনে দেই প্রশস্ততা, ভয়কে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করি, কয়েদখানার বন্দিদশাকে পরিবর্তন করে এনে দেই স্বাধীনতা এবং অবমাননাকর অবস্থাকে সম্মান ও সমুচ্চ মর্যাদার আসনে বদলে দেই।

এরশাদ হচ্ছে,

'আর, আমি মহান আল্লাহ এহসানকারীদের পুরস্কার নষ্ট করি না।'

নষ্ট করি না সেসব অবিচল বিশ্বাসীদের পুরস্কার যারা সুন্দরভাবে আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান রাখে এবং তাঁর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখে; সদাসর্বদা জীবন তাদের আল্লাহমুখী হয়ে থাকে, এ কারণেই তাদের ব্যবহার হয় মার্জিত, কাজ হয় সুন্দর এবং মানুষের সাথে তাদের লেনদেন হয় স্বচ্ছ। এটা তো তারা দুনিয়াতে আল্লাহর মহাদান হিসাবে পায়; তারপরে তো রয়েছে আখেরাতের সীমাহীন যিন্দেগীতে তাদের জন্যে অফুরন্ত নেয়ামত।

'আর অবশ্যই আখেরাতের পুরস্কার মোমেনদের জন্যে উত্তম, যেহেতু তারা তাকওয়া পরহেযগারী করে (আল্লাহর ভয়ে বাছ-বিচার করে) চলতো, আখেরাতের এই পুরস্কার যদিও দুনিয়ার জীবনে প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহ থেকে অনেক ভালো, তাই বলে দুনিয়াতে যে তাদের কিছুই দেয়া হবে না তা নয়, বা কিছুমাত্র কমও দেয়া হবে না। তবে অবশ্যই দুনিয়ার এ সব লাভের জিনিস থেকে আখেরাতের প্রাপ্য অনেক অনেক ভালো। আর আখেরাতের সেই প্রাপ্য তখনই পাওয়া সম্ভব হবে যখন মানুষ পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনবে এবং সারা যিন্দেগী আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আর তার রবের প্রতি এই ঈমানে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং গোপনে প্রকাশ্যে সদা-সর্বদা তাঁর ভয়ে সতর্ক হয়ে চলবে।

এইভাবেই দীর্ঘ দিনের কঠিন পরিশ্রম ও পরীক্ষার পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইউসুফ (আ.)-কে পুরস্কৃত করলেন, পৃথিবীর বুকে তাঁকে প্রভাব-প্রতিপত্তি দিলেন। আর ঈমান, সবর ও ইহসান প্রদর্শনের কারণে আখেরাতেও তাঁর জন্যে রয়েছে উপযুক্ত পুরস্কার।

ষড়যন্ত্রকারী ভাইদের নতি স্বীকার

এরপর দ্রুতগতিতে সময়ের পরিবর্তন ঘটলো; সহজভাবে উপরোল্লিখিত ফসলহানির বছরগুলো কেটে গেলো, তবে দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো কি না এবং হয়ে থাকলে কি কেমন করে সে কঠিন দিনগুলোতে ব্যবস্থা নেয়া হলো সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি, কিভাবে মানুষ ভূমি চাষ করেছে বা কিভাবে ইউসুফ (আ.) রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, প্রচুর ফসলের বছরগুলোতে সর্বপর্যায়ের মানুষদের কিভাবে নিয়ন্ত্রিত আকারে খাবার সরবরাহ করেছেন, কিভাবে পরবর্তী বছরগুলোতে খাদ্যদ্রব্যের মজুদ গড়ে তুলেছেন ইত্যাদিও উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এটা ঠিক,

সাত বছরের প্রচুর ফসল হওয়ার দিনগুলোতে সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এমনভাবে তিনি সব কিছু পরিচালনা করেছেন যেন এ সব কিছুর জন্যে সফল ব্যবস্থা আগে থেকে ঠিক হয়েছিলো।' যে জন্যে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, 'অবশ্যই আমি হেফাযতকারী, জাননেওয়ালা'।

একইভাবে দূর্ভিক্ষের বছরগুলোর আগমন কিভাবে ঘটলো, কিভাবে মানুষ এ বছরগুলোর মোকাবেলা করলো, কিভাবে খাদ্য সংকট দেখা দিলো-এসব কথারও কোনো স্পষ্ট বর্ণনা আসেনি.......... কারণ ইতিপূর্বে এসব বর্ণনা তো বাদশাহর স্বপ্নের মধ্যেই ইংগিত দেয়া হয়েছে এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যার মধ্যে এসব কথা এসে গেছে। বলা হয়েছে,

'এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, যখন বিগত সাত বছরের সঞ্চয় ওই অনটনের বছরগুলো খেয়ে ফেলবে, তবুও কিছু পরিমাণ থেকে যাবে, যা তোমরা (পৃথক করে)) সংরক্ষণ করে রাখবে।'

এমনি করে বাদশাহ এবং তার লোকজন সম্পর্কে এ প্রসংগে তেমন কোনো কথা প্রকাশ করা হয়নি। এতে বোঝা যাচ্ছে, আলোচনার সবটুকুই ইউসুফ (আ.)-কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে, যাঁকে ভয়ানক এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়েছিলো, সকল ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু একমাত্র তিনিই। তাঁর প্রতি, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তার প্রতি এবং তৎকালীন ফেতনার মধ্যে তাঁর ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করে সকল কথা বলা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটে গেলো তা হচ্ছে এমন বাস্তব সত্য, যা পেশ করে দুনিয়ার মানুষের জন্যে এক পূর্ণাংগ শিক্ষা দান করা হয়েছে।

দেখুন, দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করে কিভাবে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদেরকে এই মহা মিলনান্তর নাটকের মঞ্চে আনা হচ্ছে, ফিলিস্তীনের অন্তর্গত সুদূর কেনান থেকে খাদ্যের সন্ধানে মিসরে আগমন ঘটছে, আর এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষ শুধু মিসর দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এর প্রভাব আশেপাশের আরো বহু অঞ্চলের ওপর পড়েছিলো। এই কঠিন দুর্ভিক্ষের অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইউসুফ (আ.) কী চমৎকারভাবে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছেন, বিলি বন্টনের কী সুন্দর ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং গোটা দেশে ও দেশের বাইরে ইনসাফপূর্ণ বিলি বন্টনের মাধ্যমে যে হেকমত প্রদর্শন করছেন, তার ফলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণ জনতা তাঁর ওপর খুশী; আর এই সুযোগে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ভাইদেরকে তাঁর সামনে হাযির করে তাঁদের মধ্যে সংঘটিত অতীতের সকল হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছেন, যাতে ভবিষ্যতের মানুষ এই ঘটনা থেকে বহুমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর এলো ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা, প্রবেশ করলো তাঁর খাস কামরায় (একান্ত সান্নিধ্যে), তিনি তাদের চিনে ফেললেন, কিন্তু তাকে তারা চিনলো না। তারপর যখন সে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিলো তখন সে বললো, তোমাদে বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

অজন্মা ও ক্ষুধার জ্বালা মিসরের (পার্শ্ববর্তী দেশ) কেনান এবং অন্যন্য অঞ্চলকেও গ্রাস করে ফেলছিলো। তখন তারা অন্যদের সাথে ইউসুফ (আ.)-এর শরণাপন্ন হয়। সাধারণভাবে এটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো যে, অতীতের সাত বছর ধরে মিসরে প্রচুর খাদ্যভান্ডার মজুদ করা হয়েছে, তাই আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, সেই বিপুল ভান্ডার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্যে দেশ-বিদেশ থেকে দলে দলে লোক আসছে, এই সুযোগে সুদূর কেনান থেকে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইরাও ছুটে এলো। সাত বছর বয়সের সময় যারা ইউসুফ (আ.)-কে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো, এরপর দীর্ঘ এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে, স্বাস্থ্য চেহারা ও পদমর্যাদার কারণে তাঁর মধ্যে বহু পরিবর্তন হয়েছে। যার কারণে ওরা তাঁকে চিনতে পারেনি, কিন্তু ভাইদের মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় ইউসুফ (আ.) সহজেই তাদের চিনে ফেললেন। আসলে তাঁর

ভাইদের কল্পনাতেও আসেনি যে, তাদের ভাই বেঁচে থাকলেও এমন সুমহান মর্যাদার অধিকারী হতে পারে, কোথায় হিব্রু ভাষাভাষী এক বাচ্চা, যাকে তারা বিশ বছর বা তারও পূর্বে অন্ধ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো(১) সেখানে থেকে তাঁর এই পদমর্যাদায় পৌঁছে যাওয়া, তাঁর বয়স, পোশাক আশাক, শান শওকত, তাঁর গাম্ভীর্য, তাঁর সেবক ও সম্পদের আধিক্য সব কিছু মিলে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যাওয়াটা তাদের সম্পূর্ণ কল্পনার অতীত ব্যাপার ছিলো। তাই তারা তাঁকে চিনতে পারেনি।

ইউসুফ (আ.) নিজেও তাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এসব অবস্থা নিজেই তৈরী করে রেখেছিলেন সম্ভবত বিশেষ কোনো হেকমতের কারণে, যা তিনিই জানেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং তারা ওর কাছে (একান্ত সান্নিধ্যে) যখন প্রবেশ করলো তখন সে তাদের চিনে ফেললো, যদিও ওরা তাকে চিনতে পারেনি।'

বরং আলোচনা প্রসংগ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, ইউসুফ (আ.) ভাইদের এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং পরম আদর আহলাদের সাথে আপ্যায়ন করেছিলেন, তারপর তাদের ধীরে ধীরে প্রথম অধ্যায়ের দিকে নিয়ে গেলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর তাদের জন্যে রসদ প্রস্তুত করে দেয়ার পর সে বললো, তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে পরবর্তীতে নিয়ে এসো।'

একথা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ইউসুফ (আ.) তাঁর ব্যবহার দ্বারা তাদের মধ্যে তাঁর প্রতি ভালোবাসা জাগরিত করার চেষ্টা করছিলেন এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এই পরম সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের তাৎপর্য খুঁজে বের করার প্রেরণা সৃষ্টি করে চলছিলেন। যার ফলে তারা অকপটে নিজেদের বিস্তারিত পরিচয় দান করে ফেললো এবং আরও বললো, তাদের একজন বৈমাত্রেয় ভাই আসেনি এবং তাকে বাপ এত বেশী ভালবাসেন যে তার বিচ্ছেদ তিনি সহ্য করতে পারেন না। তারপর তাদের রওয়ানা হওয়ার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে দেয়ার পর তাদের তিনি বললেন, তিনি তাদের ওই ভাইটিকে দেখতে চান। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইটিকে (পরবর্তীতে) অবশ্যই নিয়ে আসবে কিন্তু।'

অর্থাৎ তোমরা তো আমার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও মেহমানদারী সব কিছু দেখে নিলে, দেখে নিলে আমি ক্রেতাদের রসদ পরিপূর্ণভাবে মেপে দিয়ে থাকি; সুতরাং তোমাদের ছোট ভাইটা তোমাদের সাথে আসলে আমি অবশ্যই তোমাদের আবারও অনুরূপভাবে পূর্ণ রেশন দান করবো। আর তোমরা তো দেখে নিলে, আমি কিভাবে মেহমানদারী করে থাকি; সুতরাং তোমরা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে, আমি তোমাদের ছোট ভাইকে কষ্ট দেব না এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা পুরোপুরিই করবো। তাই তাদের কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'তোমরা কি দেখছো না যে, আমি মাপযন্ত্র দিয়ে পুরোপুরি মেপে দেই এবং উত্তমভাবে মেহমানদারী করি?'

আর ওরা যখন বুঝেছিলো, তাদের পিতা তাদের সবার ছোট ভাইকে কিছুতেই তাদের সাথে দিতে রাযি হবেন না। বিশেষ করে ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস করে তাঁকে

---

(১) এখানে হিসাবটা এভাবে আসে যে সাত বছর বয়সে তাকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো মিসরের বাদশাহর বাড়ীতে বেশ কয়েক বছর (বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত) অন্তত ১২ বছর, কারাগারের ৯ বছর পরে আরও দুর্ভিক্ষের ২/৩ বছর মোট ২৪/২৫ বছর। সুতরাং মোট বয়স ৪২ বছর (নবুওত প্রাপ্তি ৪০ বছরে)।

হারানোর পর তাদের পুনরায় বিশ্বাস করাটা পিতার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠেছিলো। তাঁকে বুঝাতে গেলে বহু বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হবে, তবুও তারা অবশ্যই এ ব্যাপারে চেষ্টা করবে, ফিরে গিয়ে পুনর্বার আসার সময় ছোট ভাইটিকে সাথে আনার ব্যাপারে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরশাদে রব্বানীতে তাদের কথা পেশ করা হচ্ছে,

তারা বললো, আমরা অবশ্যই বাপকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে সাথে নিয়ে আসার ব্যাপারে চেষ্টা করবো।

'নুরাউইদু' শব্দটি দ্বারা সাধ্যমতো চেষ্টা করা বুঝায়।'

এদিকে ইসউসুফ (আ.) তাঁর কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তারা খাদ্য সামগ্রীর জন্যে যে মূল্য বা বিনিময় পণ্য নিয়ে এসেছিলো তা যেন গোপনে তাদের রসদের মধ্যে রেখে দেয়, যাতে করে পরবর্তীতে ওই বিনিময় মূল্য দিয়ে তারা অন্য জায়গা থেকে আরও খাদ্য শস্য ও পশু খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে, সংগ্রহ করতে পারে মরভূমি থেকে পশুর চামড়া, পশম এবং প্রয়োজনীয় অন্যন্য দ্রব্য সামগ্রী, অথবা ওই পয়সা দিয়ে বাজার থেকে অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে পারে। তিনি তাঁর কর্মচারীদের তাদের দেয়া মূল্য গোপনে তাদের খাদ্যের বস্তার মধ্যে রেখে দিতে বলেছিলেন। 'রাহল' বলতে বুঝায় মোসাফেরের সফরের মাল। তাদের প্রদত্ত মূল্য ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো যেন তারা নিজেদের পরিবারের কাছে গিয়ে এগুলো দেখে খুশী হয় এবং আবারও ফিরে আসে।

সুধী পাঠক, এবারে আসুন আমরা ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে রেখে উক্ত কাফেলার সাথে সুদূর কেনান দেশে ইয়াকুব (আ.)-এর পরিবারের মধ্যে ফিরে যাই। সেখান থেকে আগত কাফেলা ফেরার পথে কি করলো, কোথায় অবস্থান করলো এবং কেমন কাটলো তাদের সফর, সেগুলোর ঐতিহাসিক তেমন কোনো মূল্য না থাকায় সেসব বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর ওরা যখন তাদের বাপের কাছে ফিরে এলো, বললো, হে পিতা আমাদের ছোট ভাই (বিন ইয়ামীন)-কে না নিয়ে গেলে আমাদরে পুনরায় কোনো রেশন দেয়া হবে না বলে বলা হয়েছে। অতএব, আমাদের ভাইটিকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা পাওনা রেশন আনতে পারি। আমরা অবশ্যই তার হেফাযতকারী হব। .... তারপর ওরা যখন পাকা ওয়াদা দিলো, তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, যা কিছু আমরা বলাবলি করলাম, সে বিষয়ের ওপর আল্লাহ তায়ালাই খবরদারী করনেওয়ালা।' (আয়াত ৬৩-৬৬)

আলোচ্য বিবরণীতে জানা যাচ্ছে, ছেলেরা সবাই বাপের কর্তৃত্বাধীনেই ছিলো এবং খাদ্য দ্রব্যের বস্তা খোলার আগেই তারা খুবই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাপকে জানালো যে, মিসর অধিপতির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের ছোট ভাইটাকে এবারে সাথে না পাঠালে আর কোনো রেশন দেয়া হবে না বলে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এ জন্যে বাপের কাছে তাদের সবার আবেদন, যেন তাদের সাথে তাদের ছোট ভাইটাকে এবারে পাঠানো হয়, তাহলে তারা ওর জন্যে এবং অন্যান্য সবার জন্যে বরাদ্দ করা রেশন আনতে পারবে, আর অবশ্যই তারা ওর হেফাযত করবে বলে ওয়াদা করছে। তারপর দেখুন, এরশাদ হচ্ছে,

'এরপর যখন তারা তাদের বাপের কাছে ফিরে গেলো, বললো, হে পিতা, আমাদের তো পুনরায় রেশন দিতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে (যদি আমরা ছোট ভাইটিকে সাথে না নিয়ে যাই)। সুতরাং আমাদের ভাইটাকে আমাদের সাথে দয়া করে পাঠিয়ে দিন না! অবশ্যই আমরা তার হেফাযতকারী হব।

.... আর অবশ্য এ ওয়াদা ইয়াকুব (আ.)-এর অন্তরে কিছু পরিবর্তন আনলো, যদিও তারা ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে একই প্রকার ওয়াদা করেছিলো। সুতরাং তাদের এই ওয়াদা করা দেখে তাঁর অন্তরে পুঞ্জীভূত চাপা ব্যথা প্রচন্ডভাবে জেগে ওঠলো এবং এ কারণেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো,

'ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমাদের যেভাবে বিশ্বাস করেছিলাম আজকেও কি সেইভাবে তোমাদের বিশ্বাস করবো?'

'অতএব, রাখো তোমাদের ওয়াদা এবং রেখে দাও তোমাদের নিরাপত্তাদানের অংগীকার। অবশ্যই আমার বাচ্চার নিরাপত্তার জন্যে এবং আমার প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্যে দরখাস্ত (সঠিক স্থানে) পেশ করে দিয়েছি।

'সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনি সব দয়ালুর দয়ালু।'

সফরের ক্লান্তি কিছুটা লাঘব হলে এবং একটু আরাম করার পর তারা তাদের উটের পিঠে রক্ষিত মালামাল বের করার জন্যে বস্তাগুলো খুলে ফেললে দেখতে পেলো, কোনো খাদ্য দ্রব্য সেখানে নাই, আছে শুধু তাদের নিয়ে যাওয়া বিনিময় পণ্য, যা দ্বারা তারা খাদ্যশস্য কিনতে চেয়েছিলো।

না, ইউসুফ তাদের (গম জাতীয়) কোনো খাদ্য শস্য দেননি। তারা খাদ্য শস্য খরিদ করার জন্যে যে বিনিময় পণ্য নিয়ে গিয়েছিলো বস্তাগুলোর মুখ খুলে দেখা গেলো, সেগুলোই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে তারা বাপের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে আমাদের পিতা, আমাদের খাদ্য শস্য দিতে মানা করা হয়েছে। আসলে ইউসুফ (আ.) এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর ভাইটাকে নিয়ে তাদের ফিরে আসতে বাধ্য করতে এবং এভাবে ওদের তিনি একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

যাই হোক, তাদের বিনিময় ফিরিয়ে দেয়াতে এবং খাদ্য শস্য না পাওয়াতে ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে প্রমাণিত হলো, ওরা ওদের ছোট ভাইটাকে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে নিয়ে যেতে চাচ্ছে না, কোনো যুলুম করার অভিপ্রায়ও তাদের নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা বললো, হে আমাদের পিতা, আমরা কোনো যুলুম বা অন্যায় কাজ করছি না, এই দেখুন, আমাদের আমাদের পণ্য মূল্য(১) বাবদ যে মাল আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম তা আমাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

এরপর ওরা নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে এবং ছোট ভাইটাকে না নিয়ে গেলে এই চরম দুর্ভিক্ষের দিনে সপরিবারে না খেয়ে মরতে হবে, এসব সমস্যা দেখিয়ে, অবশেষে ছোট ভাইকে পাঠানোর ব্যাপারে বাপকে রাযি করাতে সক্ষম হলো। তাদের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'আমাদের পরিবারের জন্যে আমরা রসদ আনবো।' খাইরাতুন শব্দটি দ্বারা খাদ্য শস্য বা রেশন বুঝায়। এই ভাইয়েরা ছোট ভাইয়ের হেফাযতের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব পালনের কথা বার বার ব্যক্ত করছিলো। তাই তাদের মুখ দিয়ে বেরুলো, 'আমরা আমাদের ভাইয়ের হেফাযত করবো।'

ওরা একথাটাও যুক্তির সাথে তুলে ধরছিলো যে, এ ভাইটার কারণে আর একজনের রেশন বেশী আসবে। তাই ওদের মুখ দিয়ে বেরুলো–

(এ ভাইয়ের কারণে) 'আর এক উট বোঝাই মাল আমরা বেশী পাবো।'

(১) অতীতে যখন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়নি তখন বার্টার পদ্ধতি (Barter System)-এর মাধ্যমে পণ্যের লেন দেন হতো; অর্থাৎ এক মাল দিয়ে অপর মাল নেওয়া অথবা শ্রমের বিনিময়ে কোনো পণ্য লাভ করা হতো।

অর্থাৎ সে ওদের সাথে গেলে পাওনা রসদসহ আরও এক উট বোঝাই বেশী মাল পাবে বলে তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা তারা জানিয়ে বাপকে রাযি করানোর চেষ্টা করলো। 'ওই (অতিরিক্ত) রসদ পাওয়াটা সহজ হবে।'

অর্থাৎ তাদের উচ্চারিত কথা, 'আমরা এক উট বোঝাই মাল বেশী পাবো।' এর দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ পাচ্ছিলো যে, ইউসুফ (আ.) রেশন স্বরূপ মাথা প্রতি এক উট বোঝাই মাল প্রতি কয়েক মাস অন্তর দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এই পরিমাণ মাল দেয়ার কথা সাধারণভাবে জানাজানি ছিলো। যদিও এ মাল কিনে নিতে হতো। তাই বলে যে যতো ইচ্ছা কিনতে পারতো না। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, খাদ্যের অভাবের যামানায় সরকারীভাবে খাদ্য শস্য নিয়ন্ত্রণ করে বিক্রি করার ব্যবস্থা আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ.)-এর উদ্ভাবিত এক চমৎকার পদ্ধতি, যেন এ পদ্ধতি অবলম্বনে সকল শ্রেণীর জনগণ নির্দিষ্ট হারে খাদ্য শস্য লাভ করতে পারে।

এর ফলে ওই ব্যক্তি [ইয়াকুব (আ.)] অনিচ্ছা সত্তেও তাদের প্রস্তাবে রাযি হয়ে গেলেন। তবে ছেলেকে তাদের হাতে সমর্পণের জন্যে একটি শর্তও জুড়ে দিলেন।

'সে বললো, কিছুতেই আমি ওকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না যদি না তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করো। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার না হলে অবশ্যই তাকে তোমরা আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে।'

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে আমার কাছে ওয়াদা করবে যে, আমার বাচ্চাকে আমার কাছে অবশ্যই ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তবে এমন যদি হয় যে এমন কোনো মসিবতের মধ্যে তোমরা ঘেরাও হয়ে গিয়েছ, যার থেকে মুক্তি পাওয়া তোমাদের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। 'তবে তোমরা যদি প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগে ঘেরাও হয়ে যাও (তাহলে তা হবে স্বতন্ত্র ব্যাপার)।'

একথা দ্বারা বুঝা গেলো যে, ওদের হাতে বিন ইয়ামীনকে সোপর্দ করার পূর্বে তাদের কাছ থেকে পিতা সম্ভাব্য সকল প্রকার ওয়াদা নিয়ে নিলেন।

অতপর, ওরা যখন পিতার দাবী অনুযায়ী সকল প্রকার ওয়াদা করলো তখন তিনি বললেন, 'আমরা যা কিছু বলছি সেসব কিছুর ওপর আল্লাহ তায়ালাই আমাদের কার্যনিধারক।'

এ যাবত যতো কথা বলা হয়েছে এবং যতো প্রকার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে- সব কিছুর ওপর এ কথাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণযোগ্য।

এরপর দেখা যাচ্ছে, ওই মহান ব্যক্তি সফরের কিছু নিয়মাবলী শিক্ষা দিচ্ছেন। এই বাচ্চা মানুষটাকে ওই দুর্গম পথপরিক্রমায় সাথে নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু কৌশলগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে বিশেষভাবে কয়েকটি জরুরী হেদায়াত দিচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, হে (আমার) ছেলেরা, খবরদার, খবরদার, তোমরা শহরে প্রবেশকালে কিছুতেই সবাই এক দরজা দিয়ে ঢুকবে না, বরং বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমরা বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। এটা সত্য যে, আল্লাহর ফয়সালা থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারব না, অবশ্যই যাবতীয় ফয়সালার মালিক একমাত্র আল্লাহ, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করলাম এবং যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজ করে, তাদের তাঁর ওপরেই তাওয়াক্কুল করা উচিত।'

আসুন আমরা ইয়াকুব (আ.)-এর কথা, 'সকল কিছুর ফায়সালাদাতা বা হুকুমদানকারী একমাত্র আল্লাহ'- এ কথার ওপর একটু গভীরভাবে চিন্তা করি একথা দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর ফয়সালা আমোঘ অটল। তা কেউ রদ করতে পারে না। বা সে ফায়সালা থেকে

কেউ দূরেও সরে যেতে পারে না, তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ মুক্তিও পেতে পারে না। যার ভাগ্যে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু লিখে দিয়েছেন তা হবেই হবে, তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই, তাঁর ফায়সালার ওপর কোনো মানুষের কোনো হাত নেই– এই কথাটা মেনে নেয়ার নামই হচ্ছে তাকদীরের ভালো মন্দের ওপর বিশ্বাস। আর বাস্তব জীবনে দেখা যায়, মানুষ অনেক সময় যা করতে চায় তা করতে পারে না, তার ইচ্ছা এখতিয়ারের বাইরে তাকে মেনে নিতে হয় ভাগ্য লিখনকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহর ফয়সালার কাছে তাকে মাথা নত করতেই হয়। তাঁর ফয়সালা রদ করার ক্ষমতা কারও নেই। আসলে তাকদীরের এ বিষয়টা অবশ্যই এক শরয়ী বিধান, যা আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধের সীমার মধ্যে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ তাকদীরকে আল্লাহর বিধি নিষেধ পালনের মাধ্যমে আমরা বাস্তবরূপে দেখতে পাই এবং এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত হারাম হালাল বিধান ও বিধি নিষেধগুলো মানা হয় একমাত্র আল্লাহরই জন্যে। তাঁরই ভয়ে তাঁরই সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায়। এইভাবে আল্লাহ ভয় ও ভালোবাসার আশায় পরিচালিত যিন্দেগীই আল্লাহর বাঞ্ছিত জীবন, এটাই তাকদীরের লিখন। এমনই নিয়ন্ত্রিত জীবনে প্রাপ্ত অবস্থাকে বান্দা তার তাকদীর হিসাবে মেনে নিয়ে খুশী। তবে এখানে একটু মতভেদ আছে। আর তা হচ্ছে, মানুষ যখন কোনো কাজ করে তখন সে কাজটা না করার স্বাধীনতাও সে রাখে; তবে কাজ করার সময় (যদি প্রকৃতপক্ষে সে মোমেন হয়), দুনিয়ার জীবনে তার ফল পাওয়ার খেয়াল এবং আখেরাতে এ কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার পাওয়ার আশা তাকে উক্ত কাজের প্রেরণা যোগায়; কিন্তু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত (মুসলিম) ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে মনে করা যাবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কাজের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে না চলে।

এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাফেলা এগিয়ে চলেছে মিসর অভিমুখে এবং এর যাত্রীরা প্রতি পদে পিতার হুকুম অনুযায়ী কাজ করছে।

'আর যখন তারা সেভাবে নগরের মধ্যে প্রবেশ করলো, যেভাবে তাদের পিতা তাদের বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে ওই মহান ব্যক্তি তাদের আল্লাহর ফয়সালার বাইরে নিয়ে যেতে চাননি, বরং তাঁর মনে একটা কথা জেগেছিলো তাই তিনি বলেছিলেন, 'আর অবশ্যই আমার প্রদত্ত জ্ঞান লাভে সে জ্ঞানী ছিলো, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝে না।'

কিসের জন্যে ছিলো তাঁর এ ওসিয়ত (গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ)? কেন তাদের বাপ তাদের এ কথা বললেন, এক দরজা দিয়ে ঢুকো না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে নগরে প্রবেশ করবে?

এ কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। এ আয়াতের ওপর অপ্রয়োজনীয় কথাও জুড়ে দিয়েছেন, যার সাথে কোরআনুল কারীমের কোনো প্রাসংগিক সম্পর্কও নেই; বরং কোনো কোনোটা প্রাসংগিক কথার বিপরীতও বটে। এ কথার প্রাসংগিক কোনো কারণ যদি সত্যিই বলার প্রয়োজন থাকত তাহলে অবশ্যই আল কোরআন তা জানিয়ে দিতো। কিন্তু না, কোরআন শুধু বলেছে, 'ইয়াকুবের মনে একটা কথা জাগলো, তাই সে ওইভাবে ছেলেদের বলে দিলো।' সুতরাং আমি তো মনে হয়, মোফাসসেরদের উচিত এ বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে তাদের ইয়াকুব (আ.)-এর ইচ্ছা সামনে রেখেই কথা বলা। ওই সময়কার পরিস্থিতি জানাচ্ছে যে, তাদের ওপর কিছু বিপদ আসবে বলে তাঁর ভয় হচ্ছিলো। আর তাঁর কাছে মনে হচ্ছিলো, বিভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকলে ওই বিপদটা কেটে যাবে, যদিও তিনি জানতেন যে, আল্লাহর তরফ থেকে যা ঘটার তা ঘটবেই। কেননা যতো প্রকার ফয়সালা সব তো তাঁর কাছ থেকেই আসে, আর তিনিই তো সকল ভরসার স্থল। তিনি যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে বাচ্চাদের নির্দেশ দিয়েছেন আর এ জন্যে

তিনি তাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই কথাগুলো বলেছেন (ওসিয়ত করেছেন), যদিও তিনি অবশ্যই জানেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি এ শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করেছেন। 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ একথাটা বুঝে না।'

এবারে আমরাও একটু বুঝার চেষ্টা করি। এমন হতে পারে, এ ছোট্ট কাফেলাটিকে শাহী কৃপা ধন্য দেখে সম্ভবত কিছু হিংসুটে লোকের হৃদয়ে জ্বালাপোড়া শুরু হয়েছিলো, যার ফলে তাদের তারা বিপদে ফেলার জন্যে নানা প্রকার ফন্দি ফিকির করতে শুরু করছিলো, অথবা এতোগুলো যুবককে একসংগে দেখে বাদশাহর নযরে এদের বিদেশী কোনো চক্রের সংগে জড়িত মনে হতে পারে, অথবা তাদের পেছনে কেউ ধাওয়া করার আশংকা অনুভূত হতে পারে, অথবা এরকম আরও অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু এসব চিন্তা করে লাভ কি? এতে ওই ঘটনার মধ্যে এ ছাড়া আর কিছু কম বেশী হবে না যে, বর্ণনাকারী ও মোফাসসেররা এমন কিছু ব্যাখ্যা করবে যা কোরআনের মূল সুর থেকে ভিন্ন হবে। এগুলো দ্বারা তথাকথিত আধুনিক চিন্তাশীলদের খেদমত ছাড়া কোনো ফায়দা হবে না।

সুতরাং আসুন আমরা অসিয়ত ও সফরের পাতাটা উল্টিয়ে রেখে সামনে অগ্রসর হই যাতে করে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা ওখানে গিয়ে কি অবস্থার মধ্যে পড়লো তা দেখতে পারি।

'তারপর ওরা ইউসুফ (আ.)-এর কাছে পৌঁছে গেলে সে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তার ছোট ভাইকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নিলো। বললো, 'আমি তোমার ভাই, সুতরাং যেসব কাজ ওরা (এ পর্যন্ত) করেছে তার জন্যে কোনো দুঃখ করো না।'

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছোট ভাইটাকে পেয়ে ইউসুফ (আ.) অবিলম্বে তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নিলেন এবং তাকে জানিয়ে দিলেন, সে তাঁরই আপন ভাই, তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ওই (বৈমাত্রেয়) ভাইদের পেছনের সকল দুর্ব্যবহার ভুলে যাওয়ার জন্যে তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। এ ঘটনা থেকে জানা যায়, বাড়ীতে যে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছিলো ছোট হলেও ঘটনাটি তার স্মৃতিতে জাগরূক ছিলো; আর ওই দুঃখজনক ঘটনা কেনানের বাড়ীতে কিছুতেই গোপন রাখা সম্ভব হয়নি।

পিতা ও ভাইদের ফিরিয়ে আনার জন্যে ইউসুফ (আ.)-এর কৌশল

এখানের আলোচনার ধারা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ছোট ভাইটি ইউসুফ (আ.)-এর কাছে আশ্রয় পেয়েই যে সংগে সংগে তার মনের ব্যথা প্রকাশ করেছে তা নয়; বরং তাঁর কাছে কয়েক দিন থাকার পর যখন তাঁর স্নেহের পরশ তার হৃদয়কে বিগলিত করেছে তখনই ওই বৈমাত্রেয় ভাইদের নিষ্ঠুর আচরণ আর চেপে রাখতে পারেননি এবং ইউসুফ (আ.)ও এতদিন পরে তার ভাইকে কাছে পেয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে তিনি নিজের মেযাজের ভারসাম্য হারাননি।

এমতাবস্থায় ইউসুফ (আ.) প্রথম যে কাজটা করলেন তা বড়ই চমকপ্রদ! ভাইদের মেহমানদারীর সময়ে তাদের সাথে কি কি ব্যবহার করলেন, তাদের পুনরায় গৃহাভিমুখে সফরের বিবরণ দিয়ে সে বিষয়ের ওপর পাতা উল্টিয়ে আলোচনা এগিয়ে চলেছে। এ সময়ে নিজের ভাইটাকে কাছে রাখার জন্যে তিনি কি বাহানা তালাশ করলেন তার যেন একটা আলোকচিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ সময় তিনি ভাইদের সাথে যে ব্যবহার প্রদর্শন করলেন তার দীর্ঘ বিবরণী পেশ করে ওই ভাইদের এবং সকল যামানার সকল মানুষের শুভ-বুদ্ধি জাগ্রত করার জন্যে এক অতি চমৎকার শিক্ষা পেশ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর যখন সে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিলো তখন তার ভাই (বিন ইয়ামীন)-এর বস্তার মধ্যে মাপের বিশেষ পেয়ালাটি (গোপনে) রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করলো .... তাহলে আমরা অবশ্যই যালেম বলে পরিচিত হয়ে যাবো।' (আয়াত ৭০-৭৯)

এ অধ্যায়ের মধ্যে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এখানে ভাইদের পরিচয় না দিয়ে ছোট ভাইকে রেখে দেয়ার জন্যে এক অভিনয় করা হয়েছে। এতে তাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, কথোপকথন, অনুরোধ উপরোধ, ইউসুফ (আ.)-এর বাহ্যিক কড়া ও নিষ্ঠুর (?) ব্যবহার ইত্যাদির এমন এক দৃশ্যের বিবরণী দেয়া হয়েছে, যা পাঠক হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। আল কোরআনের ধারা বিবরণীর এ এক অতি চমৎকার বহির্প্রকাশ।

পর্দার অন্তরালে যে নাটকের অভিনয় করা হচ্ছিলো, তা ছিলো এই যে, ইউসুফ (আ.) নিজেই ছোট ভাই বিন ইয়ামীনের আনীত বস্তার মধ্যে গোপনে বাদশাহর স্বর্ণের পেয়ালাটি রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন। কেউ কেউ বলেন, এটা পানপাত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। বাদশাহর বাড়ীর মধ্যে গম বা অন্যান্য খাদ্য শস্য মাপার জন্যেও এ পাত্রটি ব্যবহার করা হতো। এটাকেই গোপনে ছোট ভাইয়ের খাদ্যভর্তি বস্তার মধ্যে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো এবং আল্লাহ তায়ালার ইশারাতেই এ কাজটি করা হয়েছিলো যার বিবরণ আমরা একটু পরে জানবো।

এরপর যখন কাফেলা রওয়ানা করছিলো সেই সময় একজন আহবাহক খুব উচ্চ স্বরে আওয়ায দিলো, 'হে কাফেলাবাসী শোনো, তোমরা সব চোর।'

এ ডাকে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা সচকিত হয়ে ওঠলো। কারণ চোর খেতাবটি তাদের ওপর এসে পড়েছিলো, অথচ তারা তো ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধর যিনি, ছিলেন ইসহাক (আ.)-এর সন্তান। আর ইসহাক (আ.) ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর ছেলে, সুতরাং সন্দেহপূর্ণ বিষয়টির সমাধানকল্পে তারা এগিয়ে এলো।

'তারা এগিয়ে এসে বললো, কি হারিয়েছো তোমরা?'

কর্মচারী বললো, বাদশাহর পেয়ালাটা পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘোষক উচ্চ স্বরে জানিয়ে দিলো, যে স্বেচ্ছায় উক্ত পেয়ালাটা হাযির করবে তাকে প্রভূত পুরস্কার দেয়া হবে এবং এ পুরস্কার হবে মহামূল্যবান।

'যে এটা হাযির করবে তাকে উন্নতমানের এক উট ভর্তি খাদ্য শস্য দান করা হবে। এ জন্যে আমিই জামিন।'

কিন্তু আগত জনগণ ও কাফেলার সকল মোসাফের তাদের নির্দোষ থাকার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলো। ভালোভাবেই জানতো যে, তারা চুরি করেনি, (এই কঠিন দুর্ভিক্ষের দিনে) তারা কেউ চুরি করতে আসেনি বা এমন কোনো অশান্তি সৃষ্টি করতেও তারা আসেনি যার কারণে তাদের বিশ্বস্ততা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা তাদের সম্পর্ক বিঘ্নিত হতে পারে। ওরা দৃঢ়তার সাথে কসম করে বলছিলো।

'আল্লাহর কসম, তোমরা তো (আমাদের সম্পর্কে) জেনেই নিয়েছো যে, আমরা (কোনো প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে) চুরি করতে আসিনি।

অর্থাৎ আমাদের অবস্থা তো বুঝতে পেরেছো, কত অসহায় আমরা এবং কি ভীষণ সংকটে পড়ে এখানে এসেছি, আমাদের বংশের পরিচয় তোমরা জানতে পেরেছো, আমাদের দ্বারা এমন জঘন্য কাজ হতে পারে না।

'আমরা কোনো দিন চোর ছিলাম না।' মূলত আমরা নবীর বংশ– আমাদের দ্বারা এমন নীচ কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়।

এর জওয়াবে কর্মচারী যুবক ও প্রহরীরা বললো, বেশ বেশ তোমরা চোর নও, কিন্তু যদি তোমরা চোর না হয়ে থাকো ভালো, কিন্তু যদি তোমরা মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হও তাহলে তোমরা কি শাস্তি নিতে চাও?

ইউসুফ (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা যে তদবীর শিখিয়েছিলেন তার একটা দিক এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি নিজে ইয়াকুব (আ.)-এর দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)-এর অনুসারী ছিলেন এবং জানতেন, সে জীবন ব্যবস্থার মধ্যে এ আইনটি কার্যকর রয়েছে, যে কোনো ব্যক্তি চুরি করলে চুরির শাস্তি স্বরূপ তাকেই জামিনে বা বন্দী করে রাখা হয়, অথবা তাকে দাস/দাসী বানিয়ে রাখা হয়। আর ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা যেহেতু নিশ্চিত ছিলো যে, তারা নির্দোষ। এ জন্যে তারা নিজেদের শরীয়তের আইন অনুযায়ী ফয়সালা মেনে নিতে সাগ্রহে রাযি হয়ে গেলো। এভাবে ইউসুফ (আ.) ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাঁর তদবীরকে পূর্ণ করে দিলেন। এরশাদ হচ্ছে, 'ওরা বললো, যার থলের মধ্যে পেয়ালাটা পাওয়া যাবে, তার শাস্তিস্বরূপ সে নিজেই বন্দিদশা গ্রহণ করবে। এইভাবে আমি মহান আল্লাহ যালেমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।'

অর্থাৎ আমাদের শরীয়তে এইভাবে আমরা চোরের শাস্তি দিয়ে থাকি। আর চোর যালেম গোষ্ঠীর একজন। এসব আলাপ-আলোচনা ইউসুফ (আ.)-এর চোখের সামনেই হচ্ছিল এবং তিনি নিজ কানেই এ কথাবার্তাগুলো শুনছিলেন। সুতরাং তিনি তল্লাশি চালানোর হুকুম দিয়ে দিলেন এবং তাঁর বিচার বুদ্ধি তাঁকে জানালো যে, ভাইদের বস্তাগুলো পরীক্ষা করার আগে অন্যদের থলেগুলো পরীক্ষা করা হোক, যাতে করে অনুসন্ধান কাজের ফলাফলের ব্যাপারে কারো কোনো কিছু বলার সুযোগ বা কোনো সন্দেহ করার অবকাশ না থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং ভাইদের পূর্বে অন্যদের মালামালের থলেগুলোতে অনুসন্ধান কাজ শুরু হলো। তারপর পেয়ালাটা তাঁর ভাইয়ের থলে থেকে বের করা হলো।'

এ ঘটনাটির আকস্মিকতাও ইয়াকুব (আ.)-এর ওই সন্তানদের মনোবেদনার অনুভূতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্যে এখানে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে, যারা নিজেদের নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা প্রদর্শন করেছিলো এবং বার বার হলফ করে তাদের নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলো, কিন্তু এ বিষয়টির ওপরে কোরআনে কারীমে কোনো আলোকপাত করা হচ্ছে না; বরং আমাদের চিন্তার ওপর বিষয়টির তাৎপর্য বুঝার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। চুরির ব্যাপারে যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো তখন কাফেলার ওই অভাবগ্রস্ত সদস্যদের অন্তরের মধ্যে কি তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছিলো তা ভেবে দেখার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তখন যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো তার লক্ষ্য সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আসছে। এমন কিছু কথা আসছে যার দ্বারা ওই সময়ের করুণ দৃশ্য ও ইয়াকুব (আ.)-এর ছেলেদের মনের নাযুক অবস্থা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। যেমন-

'এমনি করে, আমি মহান আল্লাহ, ইউসুফের জন্যে একটি বিশেষ কৌশল গ্রহণ করলাম।'

অর্থাৎ এইভাবে আমি মহান আল্লাহ সূক্ষ্ম তদবীরটি করলাম। মিসরের বাদশাহর আইনে তার ভাইকে নিজের কাছে ধরে রাখার জন্যে (চুরির এই দোষ দেখিয়েও) কোনো সুযোগ ছিলো না।' অর্থাৎ বাদশাহর আইন প্রয়োগ করে তার ভাইকে উপরোক্ত অপরাধের ভিত্তিতে আটকে রাখা সম্ভব ছিলো না। ওই আইনে চোরকে চুরির শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা ছিলো, কিন্তু এই অজুহাতে তাকে ধরে নিজের কাছে রেখে তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার কোনো সুযোগ ছিলো না। এটা তো ছিলো আল্লাহর বিশেষ এক ব্যবস্থা, যা ইউসুফ (আ.)-এর মাথায় তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ইয়াকুব

(আ.)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তৎকালীন শরীয়তে চুরি করার অপরাধে ধরে রাখার যে ব্যবস্থা ছিলো সে কথাটা তার ভাইদের মুখ দিয়ে বের করে, সেই আইনবলেই ছোট ভাই বিন ইয়ামীনকে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিলো। ভাইদের মুখ দিয়ে এই কথাটা বের করে ছোট ভাইকে ধরে রাখার সুযোগ করে দেয়া- এটা আল্লাহর এক বিশেষ তদবীর যা ইউসুফ (আ.)-এর জন্যে তিনি নিজে রচনা করেছিলেন। 'কায়দুন' (তদবীর) শব্দটি ভালো মন্দ উভয় উদ্দেশ্যের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভালো মন্দ যেহেতু আল্লাহর হাতে এবং তিনিই জানেন কিসে ভালো এবং কিসে মন্দ, সে জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে যা আসে, বুঝতে হবে তারই মধ্যে বান্দার কল্যাণ নিহিত। এই তদবীরটি যদিও সাময়িকভাবে ভাইদের বাপের কাছে শরমিন্দা করেছে এবং বাপেরও মনোবেদনার কারণ হয়েছে, কিন্তু এর মধ্য দিয়েই আল্লাহ তাদের সবাইকে অনেক বড় কল্যাণ দিতে চেয়েছিলেন যা তারা পরে বুঝেছিলো এবং তখন এই তদবীরের কল্যাণকারিতা অনুভব করে এতো বেশী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো যে, পেছনের দুঃখ বেদনার সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিলো। এই কথারই ইংগিত দেয়া হয়েছে নীচের আয়াতাংশে।

'বাদশাহর আইনে তার ভাইকে ধরে রাখা সম্ভব ছিলো না।' .... 'তবে আল্লাহ যদি চান (তিনি ধরে রাখার ব্যবস্থা অন্য যে কোনোভাবে করতে পারেন)।

এর সাথে ইউসুফ (আ.)-এর মর্যাদা বাড়ানোর দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'আমিই (মহান আল্লাহ) যার ইচ্ছা মর্যাদা বাড়াই।'

অর্থাৎ ইউসুফ (আ.) যা কিছু করেছেন তা আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতেই করেছেন। এর সাথে একথাও প্রকাশিত হয়েছে যে, আল্লাহর জ্ঞান সর্বোচ্চ।

এরশাদ হচ্ছে,

'আর সব কিছুর ওপরে আল্লাহর জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ।'

একথা দ্বারা আর একটি সূক্ষ্ম কথার দিকে ইশারা করা হয়েছে।

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আল কোরআন বর্ণিত এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বুঝার জন্যে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করা।

'এমনি করেই আমি (মহান আল্লাহ) ইউসুফের জন্যে এক বিশেষ তদবীর করলাম........... আসলে সে (মিসরের) বাদশাহর আইন প্রয়োগ করে তার ভাইকে (চুরির ওই অভিযোগে) ধরে রাখার অবস্থায় ছিলো না।'

দ্বীন বলতে কী বুঝায়?

এই আয়াতে 'দ্বীন' শব্দটি এক বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। সে অর্থটি বেশ গভীর, অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আইন। এ সময়ে মিসরে যে আইন চালু ছিলো তাতে কোনো ব্যক্তিকে চুরির অপরাধে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা ছিলো না; বরং ওই সময়ে ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে আল্লাহর প্রেরিত আইনে চুরির অপরাধে আটক করার ব্যবস্থা ছিলো এবং ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরাও তাদের ওপর তাদের নিজেদের ব্যবস্থা এবং তাদের নিজেদের আইন প্রয়োগ করায় সন্তুষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা কিছুতেই বুঝতে পারেনি যে, তাদের সেই পছন্দীয় আইনটুকু তাদের ওপর এমনভাবে চেপে বসবে। ইউসুফ (আ.)-এর ছোট ভাইয়ের রসদের থলের মধ্যে যখন পেয়ালাটা পাওয়া গেলো, তখন তিনি তাদের শরীয়তের আইন তাদের ভাইয়ের ওপর প্রয়োগ করলেন........ এইভাবে 'দ্বীন' শব্দ দ্বারা কোরআনে কারীমে যে জীবন ব্যবস্থা ও আইন বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা দেশের আইন।

কিন্তু আফসোস, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে জাহেলিয়াতে ছেয়ে গেছে। গোটা দুনিয়া এবং মুসলমান সবাই 'দ্বীন'-এর আসল সংজ্ঞা ভুলে গেছে।

আজকের মুসলমানরা, সাধারণভাবে 'দ্বীন'-এর অর্থকে বিশ্বাস ও চেতনার অর্থে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে, আর যারা আল্লাহর একত্বে ও রসূলের সত্যতায় বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে আল্লাহর ফেরেশতাদের ওপর, সকল আসমানী কেতাবের ওপর, রসূল ও আখেরাতের ওপর, তাকদীর অর্থাৎ ভালো মন্দ যা কিছু হয় তা সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়– একথার ওপর এবং যে সব আনুষ্ঠানিক কাজ বাধ্যতামূলক ফরয বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেসব কাজ যারা করে তারাই আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করেছে মনে করা হয়। অন্যদের প্রতি তাদের যতোই অন্ধ আনুগত্য থাকুক না কেন, যতোই অন্যের কাছে তারা মাথা নত করুক না কেন এবং আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে যতোই পৃথিবীর বিভিন্ন স্বেচ্ছাচারী রাজা-বাদশাহ বা শাসকবর্গের কর্তৃত্ব তারা মেনে নিক না কেন। আমাদের সামনে আল্লাহর কেতাব রয়েছে যাতে উল্লেখিত হয়েছে 'দ্বীনুল মালিক' (বাদশাহর আইন), অর্থাৎ তার রচিত ব্যবস্থাও আইন।

আধুনিক সমাজে আল্লাহর দ্বীনের প্রকৃত অর্থ অত্যন্ত ছোট করে ফেলা হয়েছে এবং তার সর্বব্যাপী ব্যাপকতা গুটিয়ে এনে বিশেষ কয়েকটা আনুষ্ঠানিক কাজ ও ব্যবহারের মধ্যে আজ এ দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত মহান এ 'দ্বীন' মানুষের বাস্তব জীবনকে পরিচালনার অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং আধুনিক জাহেলিয়াতের আমলে এ সর্বব্যাপী 'দ্বীন' শুধুমাত্র কিছু বিশ্বাস, কিছু পবিত্র অনুভূতি ও কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ ও ব্যবহার হিসাবে রয়ে গেছে। অথচ আদম (আঃ) থেকে মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবীর আমলে যখন এ মহান 'দ্বীন' এসেছিলো, তখন এর অবস্থা এমন করুণ ও দুর্বল ছিলো না।

বরাবরই এ 'দ্বীন'-এর প্রধান কথা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাঁর কাছেই নতিস্বীকার করতে হবে, তাঁরই আইন অনুযায়ী জীবনের সর্বক্ষেত্রে চলতে হবে, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ছাড়া ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য কারো ব্যবস্থা মানা যাবে না এবং মানতে হবে যে, পৃথিবীর সর্বত্র যেমন তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে তেমনি উর্ধ্ব আকাশের সর্বত্রও একমাত্র তাঁরই আধিপত্য ক্রিয়াশীল রয়েছে। এতোটুকুতেও তারা থেমে যাননি। গোটা মানব জাতির মনিব মালিক পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ– এ কথা তারা দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অর্থাৎ সবখানে তাঁরই শাসনক্ষমতা, তাঁর আইন, তাঁর ক্ষমতা এবং তাঁরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাস্তবে কে আল্লাহর দ্বীনের ওপর টিকে আছে এবং কে বাদশাহর তৈরী ব্যবস্থাকে নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা বানিয়ে নিয়েছে তা পার্থক্য করার মতো মানদন্ডও তারা পেশ করে গেছেন। প্রথম শ্রেণীর জনগোষ্ঠী একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন পদ্ধতি ও তাঁর রচিত বিধানের কাছে মাথা নত করেছে, আর অন্যরা কোনো রাজা বাদশাহর অন্ধ আনুগত্য করেছে এবং তারা মানব রচিত আইন মেনে নিয়েছে অথবা শেরেকের গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেছে, অর্থাৎ বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক কিছু এবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর কাছে মাথা নত করেছে, কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় আইন কানুন মানার ব্যাপারে গায়রুল্লাহর দরবারে তারা নতিস্বীকার করেছে!

দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে আজ অবশ্যই সঠিক জ্ঞান ও চেতনা থাকতে হবে এবং ইসলামী আকীদা সম্পর্কে সবার স্বচ্ছ জ্ঞান রাখতে হবে, নচেৎ অধিকাংশ সময়েই নিজের অজান্তে কোনো যালেমের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দিয়ে বিপথগামী হওয়ার সমূহ আশংকা থাকবে।

আজকাল মানুষের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক প্রগতিবাদী ও নরমপন্থী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা না জানার ভান করে, আবার কখনো জানে না বলে ওজরখাহী করে, কিন্তু তারা একমাত্র আল্লাহর বিধানকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করে না, বা 'দ্বীন'-এর সঠিক অর্থ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কোনো চেষ্টা সংগ্রামও করে না। এমতাবস্থায় সত্যিকারে, যদি সঠিক কর্তব্য পালন না করাটা দ্বীনের সঠিক অর্থ না জানার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে তাদের জন্যে ক্ষমার আশা করা যায় এবং তাদের মোশরেক মনে করা হবে না।

আমার বুঝে আসে না, যারা 'দ্বীনে'র মূল তাৎপর্য জানে না বা বুঝে না তারা কি করে নিজেদের দ্বীন ইসলামের আওতাভুক্ত মনে করে।

কোনো কিছু সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান থাকলেই তো তার ওপর মজবুত বিশ্বাস গড়ে ওঠে, না জেনে না বুঝে কোনো কিছুকে অন্তরে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করা, তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করা এবং তার জন্যে জান কোরবান করার প্রেরণা কি করে সৃষ্টি হতে পারে? কেমন করে তারা সেই দ্বীনের ধারক-বাহক হতে পারে যার প্রথম অর্থ ও তাৎপর্যই তারা জানে না?

না জানাটা আখেরাতের হিসাবে হয়তো ক্ষমার যোগ্য হতে পারে, অথবা না জানার কারণে হয়তো পরকালীন যিন্দেগীতে আযাব কিছু হালকা হতে পারে, অথবা জেনে শুনে যারা না জানার ভান করে সেসব মোনাফেকের সাথেও তাদের হিসাব নেওয়া হতে পারে (যেহেতু আল্লাহর কেতাব ও রসূলের সুন্নত তাদের সামনে থাকা সত্তেও তারা কেন জানার চেষ্টা করলো না এ প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক) .... কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নিজে এ প্রশ্নটা তোলেননি, এজন্যে এ সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে চাই না, তবে জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকদের জন্যে যে আখেরাতের জীবনে কোনো শুভ পরিণতি নেই বা থাকতে পারে না, এটাই যুক্তিসংগত কথা। এর বিপরীত কোনো শক্তিশালী যুক্তি নেই; আর পৃথিবীর যেসব মানুষকে আমরা ইসলামের দিকে ডাকছি, ওইসব মানুষকে আমরা উপরোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারি না।

আমরা আজ সেসব লোকদের কথা বলছি যাদের আমরা সাধারণভাবে দেখছি। তাদের অনুসৃত পন্থা এবং তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি অবশ্যই আল্লাহর 'দ্বীন' নয় (তারা নিজেরাও এটাকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বলে দাবী করে না)। আল্লাহর দ্বীন তো তাই যা সরাসরি কোরআন হাদীসের দ্ব্যর্থহীন কথা অনুযায়ী গড়ে ওঠেছে, যা সর্বকালের সকল দেশের সকল মানুষকে পরিচালনা করতে চায়। আর কোনো রাজা বাদশাহর ব্যক্তিগত খেয়াল খাহেশ মোতাবেক যা গড়ে ওঠেছে নিসন্দেহে তা তারই নিজস্ব আইন, সেটা কি করে আল্লাহর আইন হতে পারে! এ বিষয়ে কোনো কথাই উঠতে পারে না।

আবারও বলছি, যারা দ্বীনের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে না তাদের পক্ষে এ দ্বীনের প্রতি গভীর বিশ্বাস, এর জন্যে কোনো নিষ্ঠা বা ত্যাগ গড়ে ওঠতে পারে না। যেহেতু দ্বীনের মৌলিক ধ্যান ধারণাই তাদের মধ্যে নেই, অতএব, কিসের জন্যে তারা উপস্থিত এবং নগদ আনন্দ অভিলাষ ও স্বার্থ ত্যাগ করবে! সঠিক জ্ঞান ছাড়াই কোনো জিনিসের প্রতি নিষ্ঠা ও ত্যাগ তিতিক্ষা গড়ে ওঠা অবশ্যই যুক্তিবিরোধী। কেউ যদি কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং তার সত্যতা সে তীব্রভাবে অনুভব করে, তখন সেই বিষয়ের জন্যে তার আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও আকর্ষণ পয়দা হতে পারে, এটাই প্রকৃত সত্য কথা।

আর এ জন্যে মানুষের যাবতীয় কথা ও যুক্তির জওয়াব দিতে হবে আমাদের অনুরূপ অখন্ডনীয় যুক্তি দিয়ে। তাদের আল্লাহ রসূলের কথা বললে তো তারা শুনবেও না বুঝবারও চেষ্টা

করবে না, যেহেতু আল্লাহ-রসূলকে তারা যথাযথভাবে বা আদৌ মানে না। আমরা তাদের ওযর অজুহাতগুলো শুনবো এবং চেষ্টা করবো যেন আমরা তাদের আল্লাহর কথা শোনাতে গিয়ে তাদের সামনে পরম দয়ালু রূপে প্রতিভাত হতে পারি এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে যে অর্থে পেশ করতে চেয়েছেন সেভাবেই তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। ....

আমাদের জন্যে সর্বোত্তম পন্থা এটাই যে, আমরা তাদের সামনে আমাদের কথা, কাজ ও ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক অর্থ তাৎপর্য তুলে ধরি, এর ফলে আশা করা যায় অনেকে এ মহান দ্বীন গ্রহণ করবে। তবুও এ দাওয়াত তারাই পরিত্যাগ করবে যারা এ দুনিয়াটা নিয়েই ব্যস্ত এবং আখেরাতের যিন্দেগীর যারা কোনো তোয়াক্কা করে না।

আমাদের নিজেদের জন্যে এবং সাধারণ জনগণের জন্যেও উপরোক্ত পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়। .... এ পন্থা আমাদের জন্যে এ কারণে ভালো যে, এ পন্থায় কাজ করলে যারা এ দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না তারা আমাদের ওপর রাগ করতে পারবে না এবং আমাদের ক্ষমার যোগ্য মনে করবে, যেহেতু তারা প্রকৃতপক্ষে সত্যকে না জানার কারণেই যা করার করছে .... আর এ পন্থা অন্যদের জন্যে ভালো এ জন্যে যে, আমাদের এ ব্যবহারে তারা সত্যকে জানার সুযোগ পাবে। তাদের এখনকার অবস্থা হচ্ছে, তারা শাসকদের তৈরী জীবন ব্যবস্থার ওপরে আছে, তার রচিত নিয়ম কানুন ও তার নগদ ফল দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহর সম্মোহনী দ্বীনের সন্ধান তারা পায়নি, তারা কার্যকারিতাও তারা দেখেনি। আমাদের জীবন ও কার্যকলাপের মাধ্যমে যদি তারা আল্লাহর দ্বীনকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়, তাহলে অবশ্যই তাদের হৃদয় বিগলিত হবে এবং তারা জাহেলী ব্যবস্থা ত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীনকে আলিংগন করার জন্যে এগিয়ে আসবে। এগিয়ে আসবে তারা শাসকদের রীতি নীতি পরিত্যাগ করে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া মহান জীবন ব্যবস্থা সাগ্রহে গ্রহণ করার জন্যে।

এই পন্থাতেই রসূলরা কাজ করেছেন, তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহর অপার করুণা ও শান্তি। আজকে যারা ইসলামী পতাকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেসব দাঈ ইল্লাহকে, সকল যুগে ও সকল দেশে এই একই পথ অবলম্বন করতে হবে।

কৌশলে ছোট ভাইকে রাখতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থা

দ্বীনী দাওয়াতের সংক্ষিপ্ত এ পর্যালোচনার পর এবারে আসুন, আমরা আবার ফিরে যাই ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের দিকে, ফিরে যাই সেই পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে যখন ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের অন্তরে তাঁদের ওই ছোট ভাইয়ের প্রতি সংগোপনে এক ক্রোধ, ক্ষোভ ও ঘৃণা বোধ জেগে উঠেছিলো, যেমন করে ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ইতিপূর্বে জেগেছিলো। এই জন্যেই তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'চুরি যদি সে করে থাকে তাহলে তার ভাইও তো ইতিপূর্বে চুরি করেছিলো!'

এই যে কথাটা, সে চুরি করে থাকলে করতেও পারে, কারণ তার ভাইও তো ইতিপূর্বে চুরি করেছিলো– কথাটা খুবই প্রণিধানযোগ্য। ঠিক কার সম্পর্কে তারা এ কথাটা বললো, সে বিষয়ে বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার নানা কথা বলেছে, তারা নিজেদের কথার সপক্ষে নানা প্রকার যুক্তিও প্রদর্শন করেছে। ভাবখানা এই যে, ইউসুফের ব্যাপারে তারা তাদের বাপের সামনে কোনো মিথ্যা কথাই বলেনি, আর তাদের ওপর চুরি করার যে দোষারোপটা হলো তার জবাব দিতে গিয়ে তারা যেন বলতে চেয়েছে যে, তারা মিসরাধিপতির সামনে কিছুতেই কোনো মিথ্যা কথা বলতে পারে না। এইভাবে প্রকৃতপক্ষে তারা ইউসুফ ও তার ওই 'চোর' ভাইয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে

দায়িত্বমুক্ত হতে চায়, আর এইভাবেই ইউসুফ ও তার ভাইয়ের প্রতি তাদের পুরাতন আক্রোশ ঘৃণা প্রকাশিত হয়ে পড়ছে।

প্রকৃতপক্ষে এইভাবে তারা (বুঝে সুঝে) ইউসুফ ও তার ভাইকে বদনাম করার চেষ্টা করেছিলো। তাদের এ জঘন্য মনোভাব ইউসুফ (আ.) যথাযথভাবে বুঝেছিলেন, তাই তিনি কষ্ট পেলেন, কিন্তু তাদের এ দোষারোপ তিনি মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন এবং তাদের সামনে তা ঘৃণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না।

ইউসুফ (আ.) ভাইদের এই ঘৃণ্য মনোভাব ও আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর এই বুঝ মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন, এর কোনো প্রভাবও বাইরে প্রকাশ হতে দিলেন না, আর তিনি তো তাঁর ও তাঁর ভাইয়ের নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেনই; যার জন্যে তিনি শুধু এতোটুকু বললেন, 'না, তোমরা কোনো ভালো মানুষ নও।' অর্থাৎ, এই দোষারোপ করার কারণে তোমরা নিজেদের নীচ হৃদয় ও হীন চেহারাটা আল্লাহর সামনে ফুটিয়ে তুললে। আসলে এটাই ছিলো তাদের আসল অবস্থা, এটা কোনো ভিত্তিহীন দোষারোপ ছিলো না।

'আর তোমরা যা কিছু আরোপ করছো, সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।' ....

তিনি জানেন, ওই কথার সঠিক তাৎপর্য যা তোমরা বলছো। এ কথা বলে আসলে ইউসুফ (আ.) কথাটাকে এখানেই থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, জেনে বুঝে যে মিথ্যা কথা অবলীলাক্রমে ওরা বলে চলেছিলো, তিনি চাইলেন তা থেমে যাক এবং সেই অপ্রিয় কথাটা আর বেশী অগ্রসর না হোক, যেহেতু মূল বিষয়ের সাথে ওই কথার কোনোই সম্পর্ক নেই। এ সময় ওরা ফিরে গেলো সেই প্রতিশ্রুতির দিকে যা তারা তাদের ছোট ভাই বিন ইয়ামীনকে কেনান থেকে নিয়ে আসার সময় তাদের বাপের কাছে দিয়ে এসেছিলো। সে প্রতিশ্রুতি ছিলো, 'কোনো প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অকল্পনীয় কোনো বিপর্যয় না ঘটলে অবশ্যই তাকে তোমরা আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। এ কারণে ছোট ভাইয়ের প্রতি তারা ইউসুফ (আ)-এর দয়া সহানুভূতি এই কথা বলে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলো যে,তাদের ছোট ভাইটাকে যদি একেবারেই ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে তার বদলে তাদের মধ্যে অন্য যে কোনো একজনকে গ্রেফতার করা হোক, যেহেতু তাদের বৃদ্ধ বাপের এ হচ্ছে শেষ সন্তান। এ প্রস্তাব দিয়ে ও তাঁর দয়ার উদ্রেক করার আশায় তারা তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ভালো মানুষ হওয়ার কথা সাড়ম্বরে তুলে ধরলো এবং তাঁর কিছু প্রশংসাও করলো যাতে তাঁর মন নরম হয় এবং তিনি ওদের প্রস্তাবে রাযি হয়ে যান। ওরা বললো, 'হে শক্তিমান শাসনকর্তা বাদশাহ, ওর বাপ একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ, ওর যায়গায় আমাদের কাউকে পাকড়াও করুন, অবশ্যই আপনাকে বড় ভালো মানুষ, বড় এহসানকারী, বড় সুন্দর মানুষ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি।'

কিন্তু ইউসুফ (আ.) তাদের কিছু বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা দিতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন এমন কিছু বিস্ময়কর বিষয়ের দিকে যা আগে থেকেই তাদের জন্যে, তাঁর পিতা এবং অন্য সবার জন্যে তিনি ঠিক করে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে করে সেসব ঘটনা অগণিত মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর পানাহ, কিছুতেই আমরা সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে গ্রেফতার করতে পারি না যাকে আমরা মালসহ হাতেনাতে ধরে ফেলেছি। তা যদি করি তাহলে আমরা অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।'

তিনি একথা বললেন না, একজন চোরকে মুক্তি দিয়ে অন্য কাউকে বন্দী করা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই। কারণ তিনি তো জানতেনই যে, তাঁর ভাই চোর নয়। তিনি এমন জটিল মিসরীয় আরবী ভাষায় কথা বললেন, যে কথার মধ্যে এক জটিল মারপ্যাঁচ ছিলো যা ওরা ধরতে পারলো না। (১) বললো, দেখ, 'আল্লাহর পানাহ, যার কাছে আমরা মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমরা গ্রেফতার করতে পারি না'– এটাই ছিলো বাস্তব সত্য কথা, যা দ্বারা কোনো শব্দের হেরফের না করে দোষারোপটি কার্যকর করা হলো এবং তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হলো। বলা হলো, 'তা করলে অবশ্যই আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' এর অর্থ দাঁড়ায়, 'অবশ্যই আমরা যালেম হতে চাই না।'

এ প্রসংগে এটাই ছিলো চূড়ান্ত ও শেষ কথা এবং ওরাও জেনে নিয়েছিলো যে, একথার পর আর যত কথাই বলা হোক না কেন তাতে আর কোনো ফায়দা হবে না। তখন বাপের সামনে ফিরে গিয়ে এই কঠিন অবস্থার কি ব্যাখ্যা দেবে তা চিন্তা করতে করতে তারা ফিরে গেলো।

এরপর যখন তারা পুরোপুরি হতাশ হয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন এক জায়গায় গিয়ে তারা পরামর্শ করতে বসলো, ওদের মধ্যে সবার বড় ভাই বললো,

তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছিলো? .... হে আমাদের রব, তুমি আমাকে দিয়েছো রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং আমাকে শিখিয়েছো বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা, হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমার বন্ধু অভিভাবক। মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) হিসাবে আমাকে মৃত্যু দান করো এবং আমাকে নেক লোকদের সাথে মিলিয়ে দাও।'

(১) মূলত ইউসুফ (আ.)-এর মাতৃভাষা ছিলো হিব্রু, কিন্তু মিসরীয় ভাষা আরবীতে তিনি যথেষ্ট সেখানে দীর্ঘ বহু বছর থাকার কারণে পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এ জন্যে তিনি এমন এক জটিল আরবী বাক্য ব্যবহার করলেন, যার সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত অর্থ ওরা বুঝতে পারলো না। এ সময় হয় তিনি কঠিন আরবীতে বলায় ওদেরকে সহজ করে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছিলো, অথবা কেউ ওদেরকে হুবহু তর্জমা করে শোনাচ্ছিলো।

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِىْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْٓ اَبِىْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾ وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۖ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ

রুকু ১০

৮০. অতপর তারা যখন তার কাছ থেকে (সম্পূর্ণ) নিরাশ হয়ে পড়লো, তখন তারা একাকী বসে নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করতে লাগলো, তাদের মধ্যে যে বয়সে বড়ো (ছিলো) সে বললো, (আচ্ছা) তোমরা কি এটা জানো না, তোমাদের (বৃদ্ধ) পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অংগীকার নিয়েছিলেন, তা ছাড়া এর আগে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা (কতো) বড়ো অন্যায় করেছিলে! আমি তো কোনো অবস্থায়ই এদেশ থেকে নড়বো না, যতোক্ষণ না আমার পিতা আমাকে তেমন কিছু করতে অনুমতি দেন, কিংবা আল্লাহ তায়ালা আমার জন্যে (কোনো একটা) ব্যবস্থা করে না দেন, (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। ৮১. (সে তাদের আরো বললো,) তোমরা বরং তোমাদের পিতার কাছেই ফিরে যাও এবং তাকে বলো, হে আমাদের পিতা, তোমার ছেলে (বাদশাহর পানপাত্র) চুরি করেছে, আমরা তো সেটুকুই বর্ণনা করি যা আমরা জানতে পেরেছি, আমরা তো গায়বের (খবর) সংরক্ষণ করতে পারি না। ৮২. তোমার বিশ্বাস না হলে যে জনপদে আমরা অবস্থান করেছি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো এবং সে কাফেলাকেও (জিজ্ঞেস করো), যাদের সাথে আমরা (একত্রে) এসেছি; আমরা আসলেই সত্য কথা বলছি। ৮৩. (দেশে ফিরে পিতাকে তারা এভাবেই বললো, কথাগুলো শুনে) সে বললো, (আসলে) তোমাদের মন তোমাদের (সুবিধার) জন্যে একটা কথা বানিয়ে নিয়েছে (এবং তাই তোমরা আমাকে বলছো), অতপর উত্তম সবরই হচ্ছে (একমাত্র পন্থা); আল্লাহ তায়ালার (অনুগ্রহ) থেকে এটা খুব দূরে নয়, তিনি হয়তো ওদের সবাইকে একত্রেই (একদিন) আমার কাছে এনে হাযির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও (প্রজ্ঞাময়) কুশলী। ৮৪. সে ওদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং (নিজে নিজে) বললো, হায় ইউসুফ (তুমি এখন কোথায়)! শোকের কারণে (কাঁদতে

وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ

يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا

بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا

فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا

يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا

يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا

فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾ قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ؗ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ

কাঁদতে) তার চোখ সাদা হয়ে গেছে, সে নিজেও ছিলো মনোকষ্টে দারুণভাবে ক্লিষ্ট! ৮৫. (পিতার এ অবস্থা দেখে) তারা বললো, আল্লাহর কসম, তুমি তো দেখছি শুধু ইউসুফের কথাই মনে করে যাবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার চিন্তায় তুমি মুমূর্ষু হয়ে পড়বে, কিংবা (তার চিন্তায়) তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। ৮৬. সে (আরো) বললো, আমি তো আমার (অসহনীয়) যন্ত্রণা, আমার দুশ্চিন্তা (-জনিত অভিযোগ) আল্লাহ তায়ালার কাছেই নিবেদন করি এবং আমি নিজে আল্লাহর কাছ থেকে (তার কথাবার্তা) যতোটুকু জানি, তোমরা তা জানো না। ৮৭. হে আমার ছেলেরা, তোমরা (মিসরে) যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইকে (আরেকবার) তালাশ করো, (তালাশ করার সময়) তোমরা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে মোটেই নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে তো শুধু কাফেররাই নিরাশ হতে পারে। ৮৮. তারা যখন পুনরায় তার কাছে হাযির হলো, তখন তারা বললো, হে আযীয, দুর্ভিক্ষ আমাদের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করে দিয়েছে, (এবার) আমরা সামান্য কিছু পুঁজি এনেছি, (এটা গ্রহণ করে) আমাদের (পূর্ণমাত্রায়) রসদ দান করার ব্যবস্থা করুন, (মূল্য হিসেবে নয়) বরং এটা আমাদের (বিপন্ন মনে করে) দান করুন; যারা দান খয়রাত করে আল্লাহ তায়ালা তাদের পুরস্কৃত করেন। ৮৯. (ভাইদের এ আকুতি শুনে) সে বললো, তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করেছিলে, কতো মূর্খ ছিলে তোমরা তখন! ৯০. তারা বলে ওঠলো, তুমিই কি ইউসুফ! সে বললো, হাঁ, আমিই ইউসুফ, আর এ হচ্ছে আমার ভাই, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনেক মেহেরবানী করেছেন, (সত্যি কথা হচ্ছে,) যে কোনো ব্যক্তিই তাকওয়া ও ধৈর্যের আচরণ

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ
عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ
لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ
أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۚ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ
أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ
لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ
بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا
يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ

করে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা কখনোই নেককার মানুষের পাওনা বিনষ্ট করেন না। ৯১. ওরা বললো, আল্লাহর কসম, (আজ) আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আমরা (আসলেই) অপরাধী! ৯২. (ভাইদের কথা শুনে) সে বললো, আজ তোমাদের ওপর (আমার) কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিন, (কেননা) তিনি সব দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু! ৯৩. (এখন) তোমরা (বরং) আমার গায়ের এ জামাটি নিয়ে যাও এবং একে আমার পিতার মুখমন্ডলের ওপর রেখো, (দেখবে) তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, অতপর তোমরা তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনদের নিয়ে আমার কাছে চলে এসো।

রুকু ১১

৯৪. (এদিকে) এ কাফেলা যখন (মিসর থেকে) বেরিয়ে পড়লো, তখন তাদের পিতা (আপনজনদের উদ্দেশ করে) বলতে লাগলো, তোমরা যদি (সত্যিই) আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো তাহলে (আমি তোমাদের বলবো)– আমি যেন (চারদিকে) ইউসুফের গন্ধই পাচ্ছি। ৯৫. (ওখানে যারা হাযির ছিলো) তারা বললো, আল্লাহর কসম, তুমি তো (এখনো) তোমার (সে) পুরনো বিভ্রান্তিতেই পড়ে রয়েছো। ৯৬. অতপর সত্যিই যখন (ইউসুফের জীবিত থাকার খবর নিয়ে) সুসংবাদবাহক তার কাছে উপস্থিত হলো এবং (ইউসুফের কথানুযায়ী তার) জামাটি তার মুখমন্ডলে রাখলো, তখন সাথে সাথেই সে দেখার মতো অবস্থায় ফিরে গেলো, (উৎফুল্ল হয়ে) সে বললো, আমি কি তোমাদের একথা বলিনি, আমি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন) কিছু জানি যা তোমরা জানো না। ৯৭. তারা বললো, হে আমাদের পিতা (আমরা অপরাধ করেছি), তুমি (আল্লাহর কাছে) আমাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো, সত্যিই আমরা বড়ো গুনাহগার! ৯৮. সে বললো, অচিরেই আমি তোমাদের (গুনাহ মার্জনার) জন্যে আমার মালিকের কাছে দোয়া করবো, অবশ্যই

رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ

اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى

الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ز

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْٓ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ

بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ ؕ اِنَّ

رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ

الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف

اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾

তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৯৯. অতপর যখন তারা (সবাই) ইউসুফের কাছে (মিসরে) চলে এলো, তখন সে তার পিতামাতাকে (সম্মানের সাথে) নিজের পাশে স্থান দিলো এবং (তাদের স্বাগত জানিয়ে) সে বললো, তোমরা সবাই (এবার) আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করো। ১০০. (সেখানে যাওয়ার পর) সে তার পিতামাতাকে (সম্মানের) উচ্চাসনে বসালো এবং ওরা সবাই (দরবারের নিয়ম অনুযায়ী) তার প্রতি (সম্মানের) সাজদা করলো (এ ইউসুফ তার স্বপ্নের কথা মনে করলো,) সে বললো, হে আমার পিতা, এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা, (আজ) আমার মালিক যা সত্যে পরিণত করেছেন; তিনি আমাকে জেল থেকে বের করে আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তোমাদের মরুভূমির (আরেক প্রান্ত) থেকে (রাজদরবারে এনে) তোমাদের ওপরও মেহেরবানী করেছেন, (এমনকি) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যেকার সম্পর্ক খারাপ করার (গভীর চক্রান্ত করার) পরও (তিনি দয়া করেছেন); অবশ্যই আমার মালিক যা ইচ্ছা করেন, তা (অত্যন্ত) নিপুণতার সাথে আঞ্জাম দেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রবল প্রজ্ঞাময়। ১০১. হে (আমার) মালিক, তুমি আমাকে (যেমনি) রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো, (তেমনি) স্বপ্নের ব্যাখ্যা (-সহ দুনিয়ার আরো বহু বিষয় আসয়) শিক্ষা দিয়েছো, হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমিই আমার একমাত্র অভিভাবক, একজন অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমার মৃত্যু দিয়ো এবং (পরকালে) আমাকে নেককার মানুষদের দলে শামিল করো।

তাফসীর

আয়াত ৮০-১০১

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা ছোট ভাইটিকে মুক্ত করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে গেলো এবং ওখান থেকে সরে গিয়ে দূরে এক জায়গায় এক পরামর্শ সভায় তারা মিলিত হলো এবং গভীরভাবে শলা পরামর্শ করলো। অবশ্য তাদের এই গোপন পরামর্শ সভার

সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো বিবরণ এখানে দেয়া হয়নি; শুধু যে কথার ওপর তারা বৈঠক শেষ করলো সেটাই জানানো হয়েছে, 'তার [ইউসুফ (আ.)] থেকে যখন তারা হতাশ হয়ে গেলো, তখন গোপন এক বৈঠকে পরামর্শের জন্যে তারা মিলিত হলো .... জিজ্ঞাসা করুন ওই এলাকার লোকদের যেখানে আমরা ছিলাম এবং জিজ্ঞেস করুন ওই কাফেলার লোকদের যাদের সাথে একত্রিত হয়ে আমরা এসেছি, (বিশ্বাস করুন) আমরা সত্যবাদী। (আয়াত ৮০-৮২)

ওদের বড় ভাই ওদের পাকাপোক্ত ও কঠিন ওয়াদার কথা বার বার স্মরণ করাচ্ছিলো। এমনকি ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে অতীতে তারা যে ওয়াদা করেছিলো সে কথাও স্মরণ করাচ্ছিলো এবং তাদের একথা বুঝাচ্ছিলো যে, পেছনের ওয়াদা ভংগ এবং এ ওয়াদা ভংগ একই প্রকারের অপরাধ। অবশেষে তার শেষ সিদ্ধান্ত সে জানিয়ে দিলো যে, সে কিছুতেই বাড়ী যাবে না এবং পিতা তাকে ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত সে মিসরেই থেকে যাবে, অথবা আল্লাহর তরফ থেকে যদি কোনো ফয়সালা আসে তাই সে মেনে নেবে।

অবশ্য একথায় তারা একমত হলো যে, তারা বাপের কাছে ফিরে গিয়ে সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বাপকে জানাবে এবং পরিষ্কারভাবে বলবে যে, তার ছেলে চুরি করেছে বলে তাকে ধরে রাখা হয়েছে, তারা যা দেখেছে তাইই বলছে, কোনো বানাওটি কথা তারা বলছে না। সে নির্দোষ কি না বা এই বাহ্যিক ঘটনার অন্তরালে অন্য কিছু গোপন ব্যাপার আছে কি না তা তারা জানে না। গায়েবী কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো কথা বলা তাদের সাধ্যের বাইরে এবং এটাও সত্য কথা যে, যা ঘটেছে তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। এমনি করে গায়েবের কোনো জ্ঞান না থাকায় গায়েবী শক্তির ইংগিতে যা ঘটে সে বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। তারা পরামর্শ করলো, যদি এতেও বাপ বিশ্বাস না করেন তো তাঁকে বলতে হবে, যেখানে তারা ছিলো সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন আমরা মিথ্যা বলছি না সত্য বলছি। আর একথা তো আমাদের জানা আছে যে, তারা মিসরের রাজধানী কায়রোতেই ছিলো। এখানে কারইয়াহ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে মহানগরী। তারা ঠিক করল, যদি বাপ একথাও না মানেন তখন তাঁকে বলতে হবে যে কাফেলার সাথে তারা সফরে ছিলো তাদের জিজ্ঞেস করুন। আমরা তো আর একা সফর করিনি। মিসর অভিমুখী কাফেলায় কেনান থেকে অজস্র লোক রেশন আনার জন্যে মিসরে যাতায়াত করছিলো। তাদের জিজ্ঞেস করলেও আমাদের কথার সত্যতা সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন। এই সব শলা পরামর্শের পর তাদের বৈঠক সমাপ্ত হলো এবং তারা বাপের কাছে ফিরে গেলো।

আল্লাহ তায়ালার ওপর হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অবিচল আস্থা

পথিমধ্যে কি ঘটল সেসব বিষয়ের কোনো বিবরণ না দিয়ে আল কোরআন সরাসরি আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সেই দৃশ্যের দিকে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা অপরাধী মন নিয়ে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক বলে যাচ্ছে তাদের দীর্ঘ সফর ও হৃদয়বিদারক সেই ঘটনার কথা, যা মিসরে ঘটে গেলো। কিন্তু অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছোট কিন্তু দ্রুতগতিতে ঘটে যাওয়া কিছু দুঃখভরা ও কঠিন বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়া; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমরা এও দেখতে পাচ্ছি, এ সব দুঃখভরা কথার সাথে জড়িয়ে আছে আল্লাহর ওপর এক কঠিন বিশ্বাস এবং এক মযবুত আশা যে, হয়তো আল্লাহ তাঁর উভয় সন্তানকে ফিরিয়ে আনবেন; অথবা তিনটি ছেলেকেই ফিরিয়ে দেবেন, যাদের মধ্যে ঐ বড় ছেলেটিও থাকবে যে বদ্ধপরিকর ছিলো যে, সে মিসরেই থেকে যাবে অথবা আল্লাহর তরফ থেকে তার সম্পর্কে কোনো ফায়সালা এসে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, তোমরা যা বলছো– সব বাজে কথা; বরং আসল কথা হচ্ছে, তোমাদের কোনো অন্যায় কাজ করার জন্যে তোমাদের তোমাদের কুপ্রবৃত্তি প্ররোচিত করেছে; সুতরাং আমি উত্তমভাবে সবর করছি, হয়তো আল্লাহ তায়ালা ওদের সবাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন। নিশ্চয়ই তিনিই মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিমান।'

'বরং তোমাদের কুপ্রবৃত্তি কোনো অন্যায় কাজকে তোমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছে; সুতরাং সবর করলাম আমি উত্তমভাবে' .... এই কথাটাই ইউসুফ (আঃ)-এর অবর্তমানে বরাবর তাঁর সাথী হয়ে ছিলো; কিন্তু এবারে কথাটাকে তিনি পুনরায় ব্যক্ত করে তাঁর অন্তরের গভীরে লালিত সেই আশাকে আবারও ছেলেদের সামনে প্রকাশ করে বললেন যে, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে হয়ত আল্লাহ তায়ালা ইউসুফও তার ভাইকে ফিরিয়ে দেবেন এবং ফিরিয়ে শেষোক্ত সেই ভাইটিকেও যে আর ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো। .... 'অবশ্যই তিনি জাননেওয়ালা, তিনিই মহাবুদ্ধিমান' যিনি (প্রকৃতপক্ষে) জানেন তার অবস্থা বরং জানেন সেই মূল অবস্থাও যা এইসব ঘটনা এবং এ সব পরীক্ষার পেছনে নিহিত রয়েছে, আর তিনিই সব কিছুকে তার উপযুক্ত সময়ে সংঘটিত করবেন। যখন তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা পর্যায়ক্রমে কার্যকারণ ঘটাবেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় যথোপযুক্তভাবে তার পরিণতিতে পৌঁছে দেবেন।

এই বৃদ্ধ ব্যক্তির কাছে ঐ আলোর ছটাটা কোত্থেকে এল? হাঁ, এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ওপর তাওয়াক্কুল ও তাঁর কাছে গভীর আশার ফল, এটাই হচ্ছে তাঁর সাথে মযবুত সম্পর্কের পরিণতি এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও তাঁর রহমতের সঠিক চেতনার অবদান, এই চেতনাই বিরাজ করে আল্লাহর পছন্দনীয় সেই বান্দার অন্তরে যে তাঁর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছে, ফলে হাত দ্বারা যা স্পর্শ করা যায় এবং চোখ দিয়ে যা দেখা যায় তার থেকেও বেশী সত্য এবং তার থেকেও বেশী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তার কাছে আল্লাহ তায়ালার কথা। এরশাদ হচ্ছে,

'আর সে (ওদের থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো, হায়! হায়! হায় আফসোস আমার ইউসুফের জন্যে! এইভাবে আর্তনাদ করতে করতে এবং দুঃখের চোটে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ দু'টি সাদা হয়ে গেলো।'

এই হচ্ছে পুত্রহারা ও মানসিক দিক দিয়ে চরমভাবে বিপর্যস্ত এক পিতার হৃদয়ফাটা বিলাপের করুণ চিত্র। তিনি অনুভব করছেন তার দুঃখের সাথী আর কেউ নেই, তার বিপদে তিনিই একা, তাঁর অন্তরে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, যে দুঃসহ দুঃখ জ্বালা তাঁর হৃদয়কে নিষ্পেষিত করছে, আশে পাশে এমন কেউ নেই যে তাঁর ব্যথায় ব্যথিত হতে পারে, অথবা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সবার থেকে আলাদা হয়ে নিজের অন্তরের বেদনা নিয়ে তিনি তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর প্রিয় সন্তান ইউসুফের জন্যে তিনি বিলাপ করছেন, এক মুহূর্তও যাকে তিনি ভুলতে পারেন না, সেই পরম প্রিয় পুত্রের জন্যে, বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও তাঁর এ ব্যথা কিছুমাত্র কম হয়নি; আর তারই ছোট ভাইটির ওপর সম্প্রতি আসা মসিবত পেছনের দুঃখ বেদনাকে আরও তাজা করে দিলো, তখন তার এই নতুন ব্যথা তার এ পর্যন্তকার সবরকে টলমলায়মান করে দিলো, আর তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল! হায় আফসোস, হায় আমার ইউসুফ!

অনেক সময় এমন হয়, মানুষ দুঃখ হজম করে যায় এবং আরও বেশী দমন করতে চায়। তখন তার শিরা-উপশিরার ওপর এমন কঠিন চাপ পড়ে যা সহ্য করতে না পেরে তার কোনো অংগহানি হয়ে যায়। তাই হলো ইয়াকুব (আঃ)-এর ওপর। তাঁর শিরা উপশিরাগুলো আত্মসংযমের কঠোর সাধনা সহ্য করতে না পেরে জওয়াব দিয়ে দিলো, যার ফলে দুঃখ বেদনায় তাঁর চোখ দু'টি সাদা হয়ে গেলো। কালামে পাকে কথাটা এইভাবে বলা হচ্ছে,

'আর দুঃখের চাপে তাঁর চোখ দু'টি সাদা হয়ে গেলো, যখন তিনি দুঃখকে চরমভাবে দমন করছিলেন।'

তাঁর ছেলেদের মনে ইউসুফের প্রতি বিদ্বেষ এত চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তাদের অন্তরে ইউসুফ (আ.)-এর জন্যে কোনো প্রকার দয়ামায়ার লেশমাত্র ছিলো না; বরং ইউসুফের জন্যে দিবারাত্রি তাঁর ক্রন্দন তাদের হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধছিলো। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ধরে তিনি যে তাঁর শোকের আগুন দমন করে যাচ্ছিলেন, এটা তাদের কাছে মোটেই গোপন ছিলো না, এর কোনো মূল্যও তাদের কাছে ছিলো না; আর তিনি যে এখনও আশায় বুক বেঁধেছিলেন তারও কোনো কারণ তারা খুঁজে পাচ্ছিল না, বরং তারা তাঁর অন্তর থেকে আশার শেষ রশ্মিটুকুও মুছে ফেলতে চাচ্ছিলো।

'ওরা বললো, আল্লাহর কসম, আপনি যেভাবে সর্বক্ষণ ইউসুফকে স্মরণ করতে থাকেন, এতে হয়তো আপনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়বেন, অথবা আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।'

একথাটা তারা রাগের সাথে বলতো অথবা তাদের কাছে তাঁর এ শোক করাটা ছিলো বড়ই অপ্রিয়, এ জন্যে মেকী দরদ দেখিয়ে তারা বলতো, আল্লাহর কসম, আপনি সদা সর্বদা ইউসুফকে কেন স্মরণ করেন, এতে আসলে আপনার ক্ষতি ছাড়া তো আর কোনো লাভ হবে না; বরং এতে আপনার মারাত্মক ব্যাধি বা মৃত্যু হতে পারে। আপনি নিরর্থক এই দুঃখ করছেন। ইউসুফ তো শেষ হয়ে গেছে, সে তো আর কখনো ফিরে আসবে না!

এর জওয়াবে ওই মহান ব্যক্তি বলতেন, তিনি তাঁর ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, এ বিষয়ে তিনি কারো সাথে তর্ক বিতর্ক করতে চান না বা সৃষ্টি জগতের কারো কাছে তিনি নালিশও করতে চান না। তিনি তাঁর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে জুড়ে রেখেছেন, অন্য কারো সাথে নয় এবং তিনি জানেন এমন কিছু সত্য যা তারা জানে না। এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, অবশ্যই আমি আমার শোক ও দুঃখের কথা আল্লাহর কাছে পেশ করে রেখেছি এবং জানি আমি তাই যা তোমরা জানো না।'

অর্থাৎ এই কথাগুলোর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে তাঁর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কথা, একইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে আল্লাহর সর্বব্যাপী মর্যাদার ও তাঁর সীমাহীন মেহেরবানীর কথা।

বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে হতাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিলো। কারণ এতো দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর কোনো হদিস না পাওয়াতে বাপের কাছে তাঁর ফিরে আসা তো দূরের কথা, তাঁর বেঁচে থাকার কোনো আশা করাই সম্ভব ছিলো না; কাজেই ইয়াকুব (আ.)-এর ওই ছেলেরা, তাঁর সারা জীবন ধরে আফসোস করা ও ইউসুফ (আ.)-এর পুনরায় ফিরে আসার আশায় এখনো বুক বেঁধে থাকায় যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছিলো তা খুবই স্বাভাবিক। এতদসত্ত্বেও পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর অন্তরে কোনো ভাবান্তর ছিলো না, ছিলো না কোনো হতাশা। বিচ্ছেদ বেদনা তাঁকে ক্লান্ত করলেও এখনো তিনি আশান্বিত যে, সে ফিরে আসবে। এই নেক বান্দা তাঁর রবের ওপর এক মুহূর্তও আস্থা হারাননি। যেহেতু তিনি তাঁর রব সম্পর্কে সেই খবর রাখেন যা আর কেউ রাখে না। সেই সুপ্ত জ্ঞান পর্দার আড়ালে থেকে তাঁকে সেই সত্য দৃশ্যটি দেখাচ্ছিলো যা অন্য কারো পক্ষে দেখা সম্ভব ছিলো না। অবিচল এই আস্থা– এটাই হচ্ছে পরিপক্ব ঈমানের নগদ মূল্য, আর আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে এই জ্ঞানই তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যায় আরও গভীর রহস্য সাগরের দিকে। তিনি আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি, সৌন্দর্য ও মেহেরবানী যেন নিজ চোখে দেখছিলেন, যার

ফলে শত বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি অবিচল থাকতে পেরেছিলেন এবং শত বিরূপ অবস্থার মধ্যেও তাঁর আশা নষ্ট হয়নি। আল্লাহর অপার অসীম ক্ষমতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিলো তাঁর এ প্রিয় বান্দা-রসূলের সামনে, যার কারণে তাঁর দর্শনের সাথে অন্য কারো কোনো তুলনাই হয় না।

দেখুন, এ কথাগুলোর– 'আমি জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে সেসব তথ্য যা তোমরা জানো না' এ বাক্যটি দ্বারা সেই মহা সত্য প্রকাশ পাচ্ছে যা আমাদের কোনো কথায় প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়– একথার মধ্যে এমন একটি স্বাদ রয়েছে যা সবাই পায় না, পায় সেই ব্যক্তি যে ইতিপূর্বে অনুরূপ কথার স্বাদ পেয়েছে সুতরাং সেইই বুঝতে পারে একথাগুলো দ্বারা আল্লাহর ওই নেক বান্দা কি বুঝাতে চেয়েছিলেন।

আর যে অন্তর এ কথার স্বাদ পেয়েছে সে কোনো কঠিন অবস্থাকেই কঠিন মনে করে না, তা সে অবস্থা যতো কঠিনই হোক না কেন তবে হয়তো, তার অনুভূতিটা গভীর হবে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা অসহনীয় বলে মনে হবে।

এর থেকে বেশী মন্তব্য করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং আমরা এ কথার ওপর আল্লাহর শোকরগোযারী করতে পারি এবং আমাদের ও তাঁর মধ্যে যে বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে সে বিষয়টিকে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করতে পারি, অর্থাৎ যেখানে আমরা বুঝতে পারব না এবং যে বিষয়টি আমাদের জ্ঞানে ধরবে না, সে বিষয়টা আমরা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবো। কেননা তিনি তো অনন্ত অসীম, তাঁর জ্ঞানও সীমাহীন; সীমাহীন সাগরের বুকে আমি তো একটি বুদ্বুদ মাত্র; সুতরাং সুমহান মহা পবিত্র মাবুদের জ্ঞানের পরিধি করার আশা করি আমি কোন সাহসে, যতোটুকু তিনি আমায় দেখান ততোটুকুই আমি দেখি আর যতোটুকু তিনি আমাকে জানান ততোটুকুই আমি জানতে পারি।

তারপর দেখুন, কী অসীম রহস্যের সাগরে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। আল্লাহর পরম প্রিয় বান্দা ইয়াকুব (আ.) ওদের দৃষ্টি ফেরাচ্ছেন ইউসুফ ও তার ভাইয়ের ছোঁয়াচ পাওয়ার দিকে। তিনি বলছেন, আল্লাহর রহমত থেকে তিনি কিছুতেই এবং কোনো দিনই নিরাশ হননি, তারাও যেন নিরাশ না হয়ে যায়, নিরাশ যেন না হয় তাদের আবার মিলিত হওয়ার ব্যাপারে, কারণে আল্লাহর রহমত ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বব্যাপী এবং তাঁর প্রশস্ততা চিরস্থায়ী রয়েছে সকল বিদগ্ধ চক্ষুষ্মানদের সামনে। এরশাদ হচ্ছে, 'হে আমার ছেলেরা, যাও, এগিয়ে যাও সামনের পানে, আর একটু খোঁজ করে দেখো ইউসুফ ও তার ভাইকে, আল্লাহর মেহেরবানী থেকে নিরাশ হয়ো না, একমাত্র কাফেররাই তো আল্লাহর রহমত পাওয়া থেকে হতাশ হয়ে যায়।'

সুতরাং হে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাওয়ার আকাংখী হৃদয়, হতাশ হয়ো না, হতাশ হয়ো না পরম করুণাময় আল্লাহর সীমাহীন রহমত থেকে!!!

'হে আমার পুত্ররা, যাও, যাও, একটু খুঁজে দেখো আমার ইউসুফ ও তার ভাইকে।'

খুঁজে দেখো ওদের তোমাদের হৃদয় মন দিয়ে, তোমাদের অন্তরের গভীরে একবার তাদের খোঁজ করো, খোঁজ করো বাহ্যিক চোখ দিয়ে, এ ব্যাপারে খবরদার, খবরদার, অস্থির হয়ো না, বিচলিত হয়ো না এক মুহূর্তের জন্যেও, হতাশ হয়ো না আল্লাহ থেকে, তাঁর সুমহান প্রশস্ততা থেকে, তাঁর অপার করুণারাশি থেকে। আর, হে প্রিয় পাঠক, একবার ভেবে দেখুন এই 'রওহ্' শব্দটির দিকে, শব্দটি তিনটি অক্ষরে গড়া অতি ক্ষুদ্র হলেও এর মধ্যে রয়েছে এক সাগর ব্যাপকতা, আল্লাহর সজীবতা, আল্লাহর প্রাণময়তা। আল্লাহর চিরশান্ত ও শান্তিময় করুণা যাদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের কাছে সব কিছু বিলীন হয়ে যায়। তারা নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে

ফেলে। তারা সেই মহা শান্তিময় অস্তিত্বে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে পরম শান্তি লাভ করে। দুঃখে দৈন্যে বিদীর্ণ ধ্বংসপ্রায় এ আদম সন্তান, আত্মা যার ছটফট করে ফিরছে সারাক্ষণ, ফিরছে এ দিকে-ওদিকে দিশেহারা হয়ে, হয়রান পেরেশান হয়ে।

তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহর চির সজীব ও সঞ্জীবনী সুধা থেকে দূরে সরে গেছে, হতাশ হয়ে গেছে মহান সে রব্বুল আলামীন থেকে, তার ক্ষমতা অস্বীকারকারী সেই সীমালংঘনকারী জাতি।'

শোনো শোনো, হে প্রিয় পাঠক, মোমেন তো তারা যাদের হৃদয় জুড়ে রয়েছে মহাপ্রেমময় মালিক আল্লাহর সাথে। তাঁর হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে যারা চির সজীব হয়ে যায়, জীবনের কোনো পর্যায়ে, কোনো ক্রমেই তারা নির্জীব হয়ে যায় না। মহান আল্লাহর অস্তিত্বের অনুভূতি রয়েছে তাদের হৃদয় জুড়ে, সর্বান্তকরণে তারা সারা জীবন ধরে আল্লাহর সঞ্জীবনী সুধা অনুভব করে। হয় না তারা হতাশ কভু আল্লাহর রহমত থেকে, যদিও তারা ঘেরাও হয়ে থাকে পাপ পংকিলময় এ পৃথিবীর বুকে; যদিও দুঃখ দৈন্য, সংকট সমস্যা ও বিপদ আপদ নিত্য তাদের সংগের সাথী। সর্বাবস্থায় মোমেন দিল ঈমানের ছায়াতলে থেকে নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত থাকে, তার রব-প্রতিপালকের সাথে ভালোবাসার কারণে হৃদয় তাদের জুড়ে থাকে নিরন্তর, তারা তাদের মালিকের ওপর অবিচল আস্থার কারণে নিরুদ্বিগ্ন থাকে সদা সর্বদা এবং দুনিয়ার যতো সংকট সমস্যাই তাদের পেরেশান করুক না কেন, তারা কখনোই সাহসহারা হয়ে যায় না বা ভেংগে পড়ে না।

ভাইদের কাছে ইউসুফ (আ.)-এর পরিচয় দান

এবার আসছে ওই মিলনান্ত নাটকের তৃতীয় ও চূড়ান্ত দৃশ্য। দেখুন, তৃতীয় বারের মতো ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা মিসরে প্রবেশ করছে, বড় দুর্ভিক্ষক্লান্ত তারা, পয়সা কড়ি, পুঁজি পাট্টা অভাবের তাড়নে সব শেষ হয়ে গেছে। রেশনের বরাদ্দ পাওয়ার জন্যে সামান্য কিছু বিনিময় দ্রব্য নিয়ে এসেছে তারা আজ, যার দ্বারা রেশনের কোনো সামান্য পরিমাণ আশা করা যায় না। দেখুন, কত শ্রান্ত ক্লান্ত, দুঃসহ অভাবে কোমর তাদের ভেংগে পড়েছে, গলার আওয়ায ক্ষীণ হয়ে গেছে, এমন বিনয়াবনত জীবনে আর কোনোদিন তাদের হতে হয়নি, আর দুর্ভিক্ষের এই কষ্ট তাদের পেছনের সকল দুষ্কৃতির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আত্মগ্লানিতে তারা আজ বড়ই লজ্জিত, বড়ই কাতর! এরই বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠছে নীচের লাইনটিতে,

'যখন তারা তাঁর কাছে প্রবেশ করলো তখন বললো, আমাদের এবং আমাদের গোটা পরিবারকে আজ গ্রাস করে ফেলেছে সীমাহীন ক্ষুধা ও নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট, আর আমরা অতি সামান্য কিছু বিনিময় সামগ্রী নিয়ে এসেছি, এই সামান্য মূল্য নিয়েই, দয়া করে আমাদের রেশনের বরাদ্দ দিয়ে দিন এবং আমাদের সদকা হিসাবে কিছু খাদ্য দান করুন; অবশ্যই সদকাদানকারীকে আল্লাহ তায়ালা নিজেই পুরস্কার দেবেন।'

যখন ঘটনাটা এতোদূরে গড়িয়ে গেলো যে, নিজ ভাইয়েরা তাঁর সামনে কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করছে, কৃপাপ্রার্থী হয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জীর্ণ শীর্ণ দেহে, বিনয়াবনত মাথায় সমবেদনা পাওয়ার আশায় এবং রুদ্ধ কণ্ঠে তারা নিজেদের অভাবের কথা জানাচ্ছে, তখন ইউসুফ (আ.) আর স্থির থাকতে পারলেন না। ক্ষুধাক্লিষ্ট, বিপদগ্রস্ত এবং জীর্ণ শীর্ণ ভাইদের দিকে তাকিয়ে ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় তাঁর বিগলিত হয়ে গেলো। তিনি আর বেশীক্ষণ বাদশাহী বেশভূষার অন্তরালে থেকে স্থির থাকতে পারলেন না, তাঁর করুণাভরা হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠলো, খান খান হয়ে ভেংগে পড়লো তাঁর শাসকসুলভ গাম্ভীর্য, খতম হয়ে গেলো ভাইদের তাঁর শিক্ষা দেয়ার মনোভাব,

কাছে এসে গেলো হঠাৎ করে আত্মপ্রকাশ করার মহা নায়ুক সেই মুহূর্তটি, যখন ভাইদের দীর্ঘ দিনের হীন মনোভাব দূরীভূত হয়ে যাবে, তাদের অভাব মোচন হবে এবং তারা অনুশোচনার মাধ্যমে উন্নততর মানুষ হওয়ার সুযোগ লাভ করে জীবনকে ধন্য করতে পারবে; সেই মহামূল্যবান মুহূর্তটি এগিয়ে এলো যখন তারা সেই দূর অতীতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবে, যার খবর একমাত্র তাদের কাছেই আছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে নয়। সেই মহামূল্যবান ক্ষণ যখন এসেই গেলো তখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, 'সে বললো, তোমাদের কি মনে পড়ে, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে তোমরা কি ব্যবহার করেছিলে যখন তোমরা সঠিক জ্ঞান বিবর্জিত ও হঠকারী ছিলে!'

এ বাক্যটি শোনার সাথে সাথে তাদের কানে যেন ধ্বনিত হয়ে গেলো এক অতি পরিচিত মিষ্টি মধুর আওয়ায এবং তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠলো একটি করুণ মুখ। আশ্চর্য! সেই মুখচ্ছবি এবং যাকে সামনে দেখছে এই দুই মুখ কি একই ব্যক্তির? মিসরের সর্বোচ্চ পদে আসীন ওই ব্যক্তির পোশাক, জাঁকজমক ও পদমর্যাদা এবং তাদের এই অসহায় অবস্থার কারণে তারা এই মুখের দিকে কখনো একবারের জন্যেও খেয়াল করে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পায়নি। তাই তাদের অন্তর্দৃষ্টি দ্রুতগতিতে চলে গেলো সুদূর অতীতের সেই মযলুম মুখটির দিকে এবং পুনরায় ফিরে এসে নিবদ্ধ হয়ে স্থির রইলো এই সুমহান ব্যক্তিত্ব, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাবান মিসরের এই অধিপতির দিকে, তারা কতোক্ষণ হতবাক হয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইলো, তার বর্ণনা পাওয়া না গেলেও একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বেশ খানিকক্ষণ তারা নির্বাক হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলো তার দিকে, তারপর যখন তারা সম্বিত ফিরে পেলো, বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলো, তখন চরম লজ্জিত কণ্ঠে 'তারা জিজ্ঞেস করলো, তুমিই কি তাহলে, তুমিই ইউসুফ?'

তুমি কি তাহলে, তুমিই কি? এ কথা বলার সাথে সাথে তাদের অন্তর, অংগ প্রত্যংগ, তাদের কানগুলো সব কিছুর মধ্যে সেই ছোট্ট ইউসুফ থেকে নিয়ে আজকের এই পদমর্যাদা, এই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষটির ছায়া ঘুরপাক খেয়ে গেলো।

'তিনি বললেন, হাঁ আমিই ইউসুফ, আর এ হচ্ছে আমার আপন ভাই, অবশ্যই মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি বড় এহসান করেছেন। অবশ্যই একথা চিরসত্য, যে তাঁকে ভয় করে চলে এবং সবর করে (কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হয় না), এ ধরনের এহসানকারী ব্যক্তিদের কারো প্রাপ্য তিনি কখনো নষ্ট করেন না।'

এ ছিলো এক আকস্মিক ঘটনা। পরম ও চরম আশ্চর্যজনক এবং অনাকাংখিত এক অতি বিরল ঘটনা! তাদের সামনে ইউসুফ নিজেই এ ঘটনা প্রকাশ করছেন এবং তারা ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সাথে অজ্ঞানান্ধকারে থাকাকালে যে দুর্ব্যবহার করেছিলো তিনি তার বর্ণনা পেশ করে তাদের অতীত দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন; অতীতের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে এর বেশী কিছু তিনি বললেন না যে, এটা তাঁর ও তাঁর প্রতি আল্লাহর বড় এহসান যে, এ পর্যন্ত তিনি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং আজকের এই মহান মর্যাদার আসনে তাঁকে উন্নীত করেছেন। আল্লাহর এহসান প্রদর্শনের জন্যে তিনি তিনটি কারণ উল্লেখ করলেন, মানুষের পক্ষে তাকওয়া ও সবর এবং এই গুণাবলীর প্রতিদানস্বরূপ দেয় আল্লাহর 'সুবিচার' (অর্থাৎ এই গুণাবলীর অধিকারীদের উচিত পুরস্কার দেয়ার তাঁর অমোঘ নিয়ম)।

হাঁ, এ সময়ে শরমিন্দা ওই ভাইদের চোখের সামনে এবং তাদের হৃদয়পটে ভেসে ওঠলো ওইসব ঘটনাবলীর ছবি যা তারা বিগত দিনে ইউসুফের সাথে করেছিলো। তাদের হৃদয়ের

অভ্যন্তরে হীনতা ও পরাজয়ের গ্লানি এবং চরম লজ্জানুভূতি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠলো, তারা একি দেখছে, তাদের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের প্রতি সকল দিক থেকে সুন্দর ব্যবহারকারী পরম দয়ালু সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যার প্রতি তারা জঘন্যতম ব্যবহার করেছে। কতো ভদ্র, কতো সহনশীল, কতো দয়াবান সে তাদের প্রতি। ভুলে গেছে সে অতীতের সব কথা, তাদের সাথে তার আজ এ কী মধুর এ কি মার্জিত ব্যবহার অথচ তারা তাকে কি চরমভাবে বে-ইযযত করেছে, কি নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে! কতো হৃদয়হীনতার সাথে এক অন্ধ কূপের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়েছে । হায়, কি চরম অভদ্র আচরণই না তারা করেছে– এসব কথা আজ তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে উদিত হওয়ায় অনুশোচনার আগুনে তারা মুহুর্মুহু দগ্ধীভূত হতে লাগলো।

তাদের ওই সময়কার তীব্র অনুভূতি ও বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলো তারা বলে ওঠলো, 'আল্লাহর কসম, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আমাদের ওপর মর্যাদাবান বানিয়েছেন, আমাদের তুলনায় তোমাকে বহু বহু সম্মানিত স্থান দিয়েছেন এবং অবশ্যই একথা সত্য যে, তখন আমরা ভীষণ অপরাধী ছিলাম।'

ইয়াকুব (আ.)-এর পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ

এ ছিলো তাদের পক্ষ থেকে তাদের অপরাধের অকৃত্রিম স্বীকৃতি এবং অকপট লজ্জানুভূতির খোলাখুলি বহির্প্রকাশ। আজ তারা নিজেদের চোখে দেখতে পাচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে মর্যাদার কতো উঁচুস্তরে তুলেছেন, দান করেছেন তাঁকে কত বিপুল পরিমাণে ধন সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা শান-শওকত, আর তার সাথে বানিয়েছেন তাকে কতো সহনশীল, কতো উপকারী বন্ধু, কতো দয়ালু, কতো মহানুভব, কতো দরদী, কতো আল্লাহভীরু, কতো মহান। অন্তরের অভ্যন্তরে তারা তাদের নিজেদের অবস্থার সাথে তাঁর অবস্থার তুলনা করছে, দেখছে তারা কতো হীন, কতো নীচ, কতো হিংস্র, কতো অসহিষ্ণু, কতো নির্মম এবং কতো বড় অপরাধী, অপর দিকে ইউসুফ কতো ভদ্র, কতো মায়াভরা, কতো সৎ গুণাবলীর অধিকারী, কতো সংবেদনশীল, কতো পরোপকারী, কতো মহান, কতো সুন্দর, কতো ক্ষমাশীল, বড়দের প্রতি কতো শ্রদ্ধাশীল! আহ! আজ ইউসুফ সর্বপ্রকার নেয়ামত লাভ করেও কোনো অহংকারী হয়নি, সে নেয়ামতের আধিক্যজনিত সকল কঠিন পরীক্ষায় কী চমৎকারভাবে পাশ করেছে, যেমন করে সে পাশ করেছিলো ভীষণ বিপদের দিনে সবরের সকল কঠিনতম পরীক্ষায়। অবশ্য অবশ্যই সে এহসানকারী ও পৃথিবীর সেরা এহসানকারীদের দলভুক্ত এক মহান মানুষ। তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে কতো সুন্দর কী মহান কথা! 'সে বললো, না, না, কোনো দুঃখ নেই, আজ আমার তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।' আজ আমার অন্তর থেকে সকল বিষাদ, সকল দুঃখ গ্লানি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। নিঃশেষে মুছে গেছে সকল বেদনার শেষ ছাপটুকুও, আর তা কখনও ফিরে আসবে না, নিশ্চিন্ত থাকো তোমরা, হে আমার ভাইয়েরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর সীমাহীন মাগফেরাত অপার করুণা দান করুন, পরম করুণাময় তিনি, সকল দয়ালুর বড় দয়ালু তিনি, আমার প্রেমময় মহান আল্লাহ! এরপর কথার মোড় ফিরে যাচ্ছে অন্য আর একটি অবস্থার দিকে– তাঁর মুহ্যমান ও চরম শোকার্ত পিতার দিকে, যাঁর চোখ দু'টি তাঁর বিরহে অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে সাদা হয়ে গিয়েছিলো, এ জন্যে ইউসুফ খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁকে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে, আত্মপ্রকাশের পর তাঁর পিতার অন্তরের এতোকাল যাবত সঞ্চিত দুঃখ-বেদনার অপসারণের জন্যে, পুত্রহারা হওয়ার যে শোক তাকে তিলে তিলে এ যাবত ক্ষয় করে ফেলেছে এবং দূরীভূত করে ফেলেছে তাঁর সমগ্র শক্তিকে, সেই কষ্টকর অধ্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যে, তাঁর সাক্ষাতের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠলেন। তাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো,

'তোমরা নিয়ে যাও আমার এই জামাটা আর রেখে দিও এটাকে আমার পিতার চোখের ওপর, দেখবে তিনি তার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, আর তারপর পরিবারের সবাইকে তোমরা (যথাসম্ভব) শীঘ্র আমার কাছে নিয়ে এসো।'

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইউসুফ (আ.) কেমন করে জানলেন যে তার জামার মধ্যে তার শরীরের যে গন্ধ লেগে রয়েছে তার প্রভাবে তার পিতার ঘোলা চোখ ভালো হয়ে যাবে? আসলে এ তো ছিলো আল্লাহ প্রদত্ত এক অকল্পনীয় জ্ঞান। এ ছিলো এক নবীর আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া মহামূল্যবান জ্ঞান, এই জ্ঞানের কারণে মাঝে মাঝে তিনি কিছু বিস্ময়কর কথা বলেন, অনেক সময় যার অলৌকিক ফলও দেখা যায়। তিনিও নবী এবং তার পিতা ইয়াকুব (আ.)-ও নবী। তাঁদের পক্ষে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করার অধিকারী হওয়াটা মোটেই কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়।

ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীর শুরু থেকে নিয়ে আমরা দেখে আসছি এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা একের পর এক ঘটে আসছে; পরিশেষে আমরা দেখতে পাই ওই ছোট্ট বালক ইউসুফের দেখা স্বপ্নের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন।

'এরপর যখন ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের কাফেলা মিসর থেকে রওয়ানা হলো, তৎক্ষণাৎ তার পিতা (মহান নবী ইয়াকুব আ.) বলে ওঠলেন! শুনছো তোমরা শুনতে পাচ্ছো, আমি যে ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি, তোমরা আমাকে পাগল বলো না, সত্য সত্য আমি তার গন্ধ পাচ্ছি।'

ইউসুফের গন্ধ! হাঁ তাই, কিন্তু তা কেমন করে হয়, এটা ছাড়া অন্য সব কিছু হতে পারে। এটা কেউ কি ভাবে ভাবতে পারে? এতো দীর্ঘ দিন পরে এটা কি করে সম্ভব যে, ইউসুফ বেঁচে থাকবে; তার আবার গন্ধ পাবে আজ এই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ!

কি আশ্চর্য কথা, এ বৃদ্ধ বলছে কিনা 'আমি অবশ্যই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি, তোমরা একথা শুনে হয়তো আমাকে পাগল বলবে– তাই না?' যদি আমাকে পাগল না বলো তাহলে তোমরা আমাকে অবশ্যই সত্যবাদী বলবে, দেখবে এটা ঠিক, আমি বহুদূর................. বহু যোজন দূর থেকে অদেখা এক গন্ধ পাচ্ছি, আর তাইই হচ্ছে ইউসুফের গন্ধ।

ঠিক যে সময়ে উটের বহর শহর ছেড়ে রওয়ানা হলো অবিকল সেই সময়েই ইয়াকুব নবী কি করে তাঁর গন্ধ পেলেন? কি করে তিনি বুঝলেন কোন স্থান থেকে এ কাফেলা রওয়ানা হয়েছে? একথার জওয়াব দিতে গিয়ে কোনো কোনো মোফাসসেরে কোরআন বলেছেন, এ শহর ছিলো মিসর শহর এবং ওই বৃদ্ধ ব্যক্তি এতো দূর থেকে ইউসুফের জামার গন্ধ পাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর একথার সপক্ষে প্রমাণ দেওয়ার মতো তাঁর কাছে কোনো কিছুই ছিলো না। অবশ্য এ কথার উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, কেনানের কোনো রাস্তার মোড় থেকে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার সময় হয়তো যখন ওদিকের কাফেলা এদিকে আসতে শুরু করলো, তখন হয়তো ইউসুফের জামার গন্ধ ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি পেতে শুরু করলেন।

অবশ্য, কোনো নবীর পক্ষে এ ধরনের কোনো মোজেযা (অলৌকিক কিছু ক্ষমতা) লাভ করাটা মোটেই কোনো অবোধ্য ঘটনা নয়। নবী ইয়াকুব (আ.)-এর জন্যে ইউসুফের মতো আর একজন নবীর কাছ থেকে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিলো না। এ সব ব্যাপারে আমরা যখন আল কোরআন হোক বা সহীহ হাদীসের কোনো রেওয়ায়াত হোক– কিছু জানতে পারি তখন সে বিষয়ে কোনো মাথা না ঘামিয়ে আমরা চুপ থাক টাকেই ভালো মনে করি, বিশেষ করে যখন এর বিরোধী কোনো হাদীস আমরা পাইনি। এ ব্যাপারে কোনো মোফাসসেরের মন্তব্যকেও আমরা কোনো গুরুত্ব দেই না।

কিন্তু ইয়াকুব (আ.)-এর আশেপাশে যারা ছিলো তাদের তো আর সেই ক্ষমতা ছিলো না যা ইয়াকুব (আ.)-এর 'রব'-এর আছে, সুতরাং ইয়াকুব (আ.) যেমন তাঁর ছেলে ইউসুফ (আ.)-এর গন্ধ পাচ্ছিলেন তা ওদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিলো না। সে জন্যে তারা বললো,

'আল্লাহর কসম, আপনি সেই পুরাতন গোমরাহীর মধ্যে এখনও পড়ে আছেন।'

অর্থাৎ ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে আপনার যে ভুল ধারণা যে, সে বেঁচে আছে এবং তার জন্যে এখনো অপেক্ষা করতে থাকা, অথচ সে তো কোথায় চলে গেছে! এতো বছর ধরে যার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই– সে নাকি আবার ফিরে আসবে!

কিন্তু দেখুন, সেই বিস্ময়কর ঘটনাই সংঘটিত হতে চলেছে, যার পেছনে আর একটি মহা বিস্ময়ও সংঘটিত হতে চলেছে।

'যখন সুসংবাদদাতা এসে গেলো, সে তার (ইউসুফের) জামাটি তাঁর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে তাঁর চোখ দু'টি ভালো হয়ে গেলো।'

এবার আমাদের সামনে আসছে জামার বিস্ময়। আসলে এটা ছিলো ইউসুফ (আ.)-এর জীবিত থাকার এক জ্বলজ্যান্ত দলীল এবং শীঘ্র তাঁর সংগে সাক্ষাত হওয়ার পূর্ব লক্ষণ। আর একটি বিস্ময় ছিলো, জামাটা চোখের ওপর পড়ার সাথে সাথে ঘোলা হয়ে যাওয়া চোখ দু'টি ভালো হয়ে গেলো। এইভাবে তাঁর চোখ ভালো হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিলো আর এক পরম বিস্ময় ...... সুতরাং এখানে ইয়াকুব (আ.) তাঁর রব থেকে পাওয়া রহস্য অনুসারে যা বলছিলেন তা কিছুতেই ওরা বুঝতে পারছিলো না।

তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে কি বলি নাই যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না?'

'ওরা বললো, হে আমাদের পিতা, আমাদের গুনাহ খাতার জন্যে আপনি ক্ষমা চেয়ে নিন, অবশ্যই আমরা দোষী ছিলাম।'

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইয়াকুব (আ.)-এর অন্তরে তাঁর ছেলেদের ব্যাপারে কষ্ট অবশ্যই থেকে গিয়েছিলো যা তিনি তাদের সামনে প্রকাশ করেননি, যদিও মীমাংসা ও আপস হয়ে যাওয়ার পর তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন বলে তিনি ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের জন্যে আমার রবের কাছে শীঘ্রই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করবো; নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল মেহেরবান।'

তাঁর কথার মধ্যে 'সাওফা' শব্দটি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর অন্তরে তেমনি এক ক্ষত রয়ে গিয়েছিলো যা ছিলো যে কোনো মানুষের জন্যে স্বাভাবিক (তিনি নবী থাকা সত্তেও মানুষও তো ছিলেন। কাজেই মানবসুলভ কিছু দুর্বলতা তো সেখানে থাকবেই)।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে পিতামাতার পুনর্মিলন

এরপর প্রসংগক্রমে আরও কিছু বিস্ময়ের বিবরণ আসছে; সময় ও স্থানের এই দীর্ঘ ব্যাপক ব্যবধানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্য।

'অতপর যখন তারা ইউসুফ (আ.)-এর কাছে উপনীত হলেন তিনি তার পিতামাতাকে নিজের একান্ত সান্নিধ্যে টেনে নিলেন ও বললেন (বাকি সবাইকে) তোমরা সবাই পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে মিসরে যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করো।.......... নিশ্চয়ই আমার রব যার জন্য খুশী তার জন্যে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়েল খবর সরবরাহ করেন। তিনিই মহাজ্ঞানী, তিনিই মহাবুদ্ধিমান। (আয়াত ৯৯-১০০)

আহ! কী চমৎকার সেই দৃশ্য যা সামনে আসছে। এতোগুলো বছর ও দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর, হতাশা ও হাল ছেড়ে দেয়ার পর, কঠিন দুঃখ ব্যথা ও সংকট সমস্যার পর, কঠিন পরীক্ষা ও বিপদে পতিত হওয়ার পর, আগ্রহ ও ক্লান্তিকর দুঃখ সহ্য হয়ে যাওয়ার পর, চরম দুশ্চিন্তা ও হতাশাগ্রস্ত হওয়ার পর আসছে আর এক মনোরম দৃশ্য। আহ! কী চমৎকার আনন্দঘন সেই দৃশ্য, যা এগিয়ে এলো বহু দুঃখ কষ্ট, হৃদয়ের চরম হতাশা ও ছটফটানির পর, যখন দুঃখ বেদনা খুশী মিলন ও অশ্রু বিজড়িত স্মৃতি সব এক সাথে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেলো।

কী মধুর, কী চমৎকার সেই মহা মিলনের দৃশ্য, যা সকল বিয়োগব্যথা বিদূরিত করে, সকল পাপ পংকিলতার গ্লানি মুছে দিয়ে সকল অপরাধের অবসান ঘটিয়ে ও চরম ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে ওই কঠিন ও দুঃখজনক অধ্যায়ের ইতি টেনে দিলো। জীবনের নতুন অর্থ এনে দিলো। আকণ্ঠ তাদের পান করালো নবজীবনের সুমধুর সুধা। আর এরই সাথে দেখুন প্রেমের নবী, সুন্দর, সুন্দর সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্যের এক অনুপম ছবি, মহান ব্যক্তিত্ব, বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রতিচ্ছবি, প্রিয় ইউসুফ নবী (আ.)-এর সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হয়ে থাকা এবং মুহূর্তের জন্যেও নিজ মালিককে ভুলে না যাওয়ার ওই মোহিনী দৃশ্য।

'তারপর যখন ওরা প্রবেশ করল ইউসুফের কাছে। তিনি তাঁর পিতা মাতাকে টেনে নিলেন নিজের কাছে এবং ভাইদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সবাই নিরাপদে প্রবেশ করো মিসরে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই পুরোপুরি নিরাপত্তা ও পরম পরিতৃপ্তির সাথে সেখানে অবস্থান করো।'

এ মহামিলনের মুহূর্তে মুগ্ধ নয়নে তিনি বাস্তবে সেই মধুর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেখতে লাগলেন। সে ব্যাখ্যা যখন তারই সামনে বাস্তবায়িত হয়ে গেলো তখন তার ভাইয়েরা শ্রদ্ধাবনতভাবে সেজদায় পড়ে গেলো তার সামনে এবং তাকে প্রাণঢালা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তার সামনে ঝুঁকে পড়লো, নিঃশেষে তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষের সকল গ্লানি মুছে গেলো মুছে গেলো সকল অহংকার দম্ভ ও ঘৃণার শেষ রেশটুকু। আর তিনি তার আব্বা আম্মাকে তার পাশে তার মহামূল্যবান রাজকীয় সিংহাসনে পরম ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে তুলে নিলেন, নিজ চোখে তার শিশু বেলায় দেখা স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখতে পেলেন– সাজদা করছে চাঁদ-সুরুজ আর এগারটি তারা তারই সামনে...........।

তিনি তার পিতা মাতাকে তুলে নিলেন সিংহাসনের ওপর। আর তারা সবাই তার সম্মানে শোকরগোযারীতে সাজদাবনত হয়ে গেলো, আর সেই মহা মুহূর্তেই তিনি বলে ওঠলেন! আমার পিতা দেখুন, এই হচ্ছে আমার সেই সুমধুর স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা ফেলে আসা অতীত দিনে আমি দেখেছিলাম। অবশ্যই আমার রব আমার সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত করেছেন।'

এরপর দেখুন, মহান আল্লাহর শোকরগোযার এ প্রিয় বান্দা কেমনভাবে তাঁর মালিকের নেয়ামতের কথা স্মরণ করছেন। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে,

'অবশ্যই তিনি এহসান করেছেন আমার ওপর তখন, যখন আমাকে তিনি কারাগার থেকে বের করে আনলেন। আর তোমাদের সেই সে সদূর বিয়াবান থেকে নিয়ে এলেন শয়তানের সেই কারসাজি বানচাল করে দিয়ে, যা সে রচনা করেছিলো আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে।

আজ এই চরম খুশীর মুহূর্তে বার বার তিনি স্মরণ করছেন আল্লাহ তায়ালার অসীম করুণার কথা। তাঁর সূক্ষ্ম তদবীরের কথা। কতো সুকৌশলে তিনি মরদুদ শয়তানের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে তার ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করলেন– তাঁর সেই সুমহান মেহেরবানীর কথা আজ তাঁর বার বার মনে পড়ছে।

'অবশ্যই আমার রব অতি কৌশলে সম্পাদন করেন সেই সকল কর্মকান্ডকে, যা তিনি করতে চান।'

তিনি তাঁর ইচ্ছা অতি সূক্ষ্মভাবে কৌশলের সাথে বাস্তবায়িত করেন, অতি সংগোপনে (যা বুঝার তিনি ছাড়া অন্যকারও ক্ষমতা নেই), যা মানুষ কখনো অনুভব করতে পারে না, বুঝতে পারে না যার বিন্দু বিসর্গও।

'নিশ্চয়ই তিনি, তিনিই জাননেওয়ালা, মহাবুদ্ধিমান।'

এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান প্রসংগে ইয়াকুব (আ.) ঠিক সে সময়েই মন্তব্য করেছিলেন যখন ইউসুফ (আ.) প্রথম এই স্বপ্নের কথা তাঁকে বলেছিলেন, যার বর্ণনা এ সূরার শুরুতে এসে গেছে।

'অবশ্যই তোমার রব জাননেওয়ালা, হেকমতওয়ালা।'

আলোচ্য কাহিনীর সমাপ্তি টানতে গিয়ে এমন ভাষা, এমন বর্ণনাভংগি এবং এমন শব্দাবলী চয়ন করা হয়েছে, এমন বাচনপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে ঘটনার শুরু ও শেষ একই সূত্রে গ্রথিত বলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

কথিত আছে, এই মিলনান্ত নাটকের যবনিকাপাত করতে গিয়ে শেষের দিকে প্রভাব বিস্তারকারী যে দৃশ্যাবলী আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে আমরা দেখছি ইউসুফ (আ.)-কে সাক্ষাতে সম্মিলনে, সুখের দিনে, খুশী ও জৌলুসে, রাজকীয় জাঁকজমকে ও বিলাসিতার মধ্যে, প্রাচুর্য ও নিরাপদ অবস্থায় সদা সর্বদা নিজ পাক পরওয়ারদেগারের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। তাঁর প্রশংসায়, তাঁর শোকরগোযারীতে তাঁর স্মরণে সদা সর্বদা তিনি মশগুল! রাজকীয় চাকচিক্যের মধ্যে থেকেও তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানে করার কাজে কোনো সময়ে ভাটা পড়তে দেন নি এবং দেখা গেছে, তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের মহান দিনগুলোতে, তার সুখ সমৃদ্ধি ও খুশীর সময়েও তিনি সব কিছু শেষে মরে যেতে হবে এই পরম সত্য কথা ভুলে যাননি, ভুলে যাননি সে অন্তিম মুহূর্তের কথা। এ জন্যে তার মুখ দিয়ে উচ্চারত হচ্ছে, তিনি তাঁর মাবুদের কাছে সদা সর্বদা প্রার্থনা করছেন যেন তার রব তাকে মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হিসাবে মৃত্যু দান করেন এবং তাকে ভালো লোকদের সাথে মিলিয়ে দেন।

'হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি অবশ্যই আমাকে এক অতি বিশাল বাদশাহী দিয়েছো এবং শিখিয়েছো আমাকে ঘটনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দুনিয়া আখেরাতে তুমি আমার বন্ধু-অভিভাবক, করো আমাকে মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে ভালো মানুষের সাথে মিলিয়ে দিন।

এই যে কথাটা- 'দিয়েছো আমাকে বিশাল বাদশাহী (একচ্ছত্র আধিপত্য), অর্থাৎ একাধারে তুমি আমাকে শাসন ক্ষমতা, মান মর্যাদা, ধন দৌলত, সম্পদ সম্পত্তি, সুখ সৌন্দর্য সব কিছুই দিয়েছো কোনো কিছুই আমাকে দিতে বাকি রাখনি, কিন্তু হে আমার মালিক, এগুলো তো সবই দুনিয়ার নেয়ামত।

'আর আমাকে আগত ঘটনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা শিখিয়েছো।'

অর্থাৎ কোন ঘটনার কি পরিণতি সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও দূরদর্শিতা এবং স্বপ্নের সঠিক তা'বীর- এগুলো তো তোমারই জ্ঞানগত নেয়ামত।

হে আমার পাক পরওয়ারদগার নিশিদিন আমি তোমার এসব নেয়ামতের কথা স্মরণ করে ধন্য হই, বার বার আমি এগুলোকে স্মরণ করি আর কৃতজ্ঞতাভরা মন নিয়ে তোমার দরবারে ঝুঁকে পড়ি।

'হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।'

তোমার কথা দ্বারা সৃষ্টি করেছো তুমি এসব কিছু, আর তোমার কুদরতী হাত দিয়েই তুমি পরিচালনা করে চলেছো এ সব কিছুকে, আর এসব কিছুর ওপর এবং আসমান যমীনের অধিবাসীদের ওপর রয়েছে তোমার পরিপূর্ণ ক্ষমতা.....................'

'তুমিই আমার বন্ধু অভিভাবক– দুনিয়ার বুকেও আখেরাতেও।'

সুতরাং তুমি আমার সাহায্যকারী ও সহযোগিতাদানকারী। ....

হে আমার মালিক, এসব তো তোমারই নেয়ামত। আর এসব কিছুর মূলে কাজ করে যাচ্ছে তোমারই অসীম কুদরত, তোমারই অপার ক্ষমতা।

হে আমার রব, আমার মেহেরবান প্রতিপালক, আমি চাই না তোমার কাছে কোনো ক্ষমতা, কোনো স্বাস্থ্য সৌন্দর্য, কোনো ধন দৌলত। এসব কোনো কিছুই আমি চাই না, হে আমার মনিব মালিক পরওয়ারদেগার– আমি চাই তোমার কাছে এসব থেকে আরো দীর্ঘস্থায়ী, আরো টেকসই, আরও মূল্যবান সম্পদ।

'মৃত্যু দাও আমাকে মুসলমান (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) হিসাবে, আর মিলিয়ে দিয়ো আমাকে ভালো লোকদের (নেক বান্দাদের) সাথে।

আর এমনি করেই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তার রাজকীয় পোশাক আশাক, জাঁকজমক, ক্ষমতা প্রতিপত্তি, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মানুষের সাথে মেলামেশার খুশী, পরিবার পরিজনদের সাথে যিন্দেগী যাপনের শান্তি সুখ, ভাই বেরাদার নিয়ে আমোদ ফুর্তির জীবনও ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আর তাঁর শেষ যে রূপ চেহারা প্রকাশিত হচ্ছে তা হচ্ছে নিসংগ একাকী এক ব্যক্তি, যে নির্জনে নিথরে তার মালিকের দরবারে কেঁদে কেঁদে আকুতি জানাচ্ছে যেন মৃত্যুদম পর্যন্ত সে ইসলামের ওপর টিকে থাকতে পারে এবং তার দরবারে যারা ভালো লোক হিসাবে হাযির হবে তাদের সাথে যেন সে শামিল হতে পারে।

তাহলেই তার পরিপূর্ণ সাফল্য আসবে, তাহলেই সে শেষ পরীক্ষায় কামিয়াব হবে।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اَفَاَمِنُوْۤا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ۚ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০২. (হে নবী,) এ (যে ইউসুফের কাহিনী– যা আমি তোমাকে শোনালাম, তা) হচ্ছে (তোমার) গায়বের ঘটনাসমূহের একটি, এটা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমেই জানিয়েছি, (নতুবা) তারা (যখন ইউসুফের বিরুদ্ধে) তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছিলো এবং তারা যখন তার বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তুমি তো সেখানে হাযির ছিলে না! ১০৩. (এ সত্ত্বেও) অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে যতোই তুমি অনুগ্রহই পোষণ করোনা, তারা কখনো ঈমান আনার মতো নয়। ১০৪. (অথচ) তুমি তো তাদের কাছ থেকে এ (দাওয়াত ও তাবলীগের) জন্যে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো না! তা ছাড়া এ (কোরআন) দুনিয়া জাহানের (অধিবাসীদের) জন্যে একটি নসীহত ছাড়া অন্য কিছু তো নয়।

রুকু ১২

১০৫. এ আকাশমন্ডলী ও যমীনে (আল্লাহর কুদরতের) কতো (বিপুল) পরিমাণ নিদর্শন রয়েছে, যার ওপর তারা (প্রতিনিয়ত) অতিবাহন করে, কিন্তু তারা তার প্রতি (ক্ষমাহীন) উদাসীন থাকে। ১০৬. তাদের অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে না, তারা তো (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শেরেকও করতে থাকে। ১০৭. তবে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, (হঠাৎ করে একদিন) তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার (সর্বগ্রাসী) আযাবের শাস্তি কিংবা আকস্মিক কেয়ামত আপতিত হবে, অথচ তারা (তা) জানতেও পারবে না! ১০৮. (হে নবী, এদের) তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি; আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাংগ সচেতনতার সাথেই (এ পথে) আহ্বান জানাই; আল্লাহ তায়ালা মহান, পবিত্র এবং আমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۭ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾ حَتّٰىٓ اِذَا اسْتَايْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاۗءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاۗءُ ۭ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۭ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

১০৯. তোমার আগে বিভিন্ন জনপদে যতো নবী আমি পাঠিয়েছিলাম, তারা সবাই (তোমার মতো) মানুষই ছিলো, আমি তাদের ওপর ওহী নাযিল করতাম; এরা কি আমার যমীন পরিভ্রমণ করেনি, (করলে অবশ্যই) তারা দেখতে পেতো, এদের পূর্বেকার লোকদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো; (সত্য কথা হচ্ছে,) আখেরাতের ঠিকানা তাদের জন্যেই কল্যাণময় যারা (নবীদের পথে চলে) তাকওয়া অবলম্বন করেছে; (পূর্ববর্তী মানুষদের পরিণাম দেখেও) তোমরা কি কিছু অনুধাবন করবে না? ১১০. (আগেও মানুষ নবীদের মিথ্যা সাব্যস্ত করতো,) এমনকি নবীরা (কখনো কখনো) নিরাশ হয়ে যেতো, তারা মনে করতো, তাদের (বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে, তখন (হঠাৎ করেই) তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাযির হলো, (তখন) আমি যাকে চাইলাম তাকেই শুধু (আযাব থেকে) নাজাত দিলাম; আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ হবে না। ১১১. অবশ্যই (অতীতের) জাতিসমূহের কাহিনীতে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে; (কোরআনের) এসব কথা কোনো মনগড়া গল্প নয়, বরং এ হচ্ছে তারই স্পষ্ট সমর্থন যে আসমানী কেতাব তাদের কাছে আগে থেকেই মজুদ রয়েছে, বরং (তাতে রয়েছে) প্রতিটি (মৌলিক) বিষয়ের বিস্তারিত (ও সঠিক) ব্যাখ্যা, (সর্বোপরি এতে রয়েছে) ঈমানদার মানুষদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

তাফসীর

আয়াত ১০২-১১১

ইউসুফ (আ.)-এর মূল ঘটনা এখানেই শেষ। এখান থেকে শুরু হচ্ছে মন্তব্য ও ব্যাখ্যার পালা। ওই ব্যাপারে সূরার ভূমিকায়ই কিছুই ইংগিত করেছিলাম। আমাদের এই মন্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে জীবন ও জগত সম্পর্কিত বেশ কিছু জানা অজানা তত্ত্ব তথ্যও স্থান পাবে। বিষয়গুলোকে আমি ধারাবাহিকভাবে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করবো।

যে জাতি ও জনগোষ্ঠীর মাঝে হযরত মোহাম্মদ (স.) লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের সমাজে ইউসুফ (আ.)-এর উক্ত ঘটনার কোনো চর্চা ছিলো না। এর মাঝে কিছু নিগূঢ় রহস্য রয়েছে। সে সম্পর্কে কেবল তারাই জানেন যারা সেগুলো ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মাঝে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু সে সকল ব্যক্তি এখন আর নেই। অতীতের বিশাল গহ্বরে তারা সবাই তলিয়ে গেছেন। আর এ জন্যেই সূরার গোড়াতেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি এই কোরআনের মাধ্যমে তোমাকে একটি সুন্দর কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি .... । (আয়াত ৩)

কোরআনের ঘটনা ও সৃষ্টিজগতে ঈমানের নিদর্শন

একই বক্তব্য সূরার শেষেও এসেছে।

অর্থাৎ যে ঘটনার অবতারণা এখানে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অজানা এক ঘটনা। এই ঘটনা তোমারও জানা ছিলো না। ওহীর মাধ্যমেই তোমাকে তা জানানো হয়েছে। এ সব ঘটনা আদৌ জানা ছিলো না বলেই ওহীর প্রয়োজন হয়। ওহীর মাধ্যমেই ঘটনার সকল বিবরণ তোমার সামনে তুলে ধরা হয়। ইউসুফ (আ.)-এর সৎভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে, তার পিতা মাতার বিরুদ্ধে এবং তাঁর ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে কি কি ষড়যন্ত্র করেছিলো, কি কি কূট চালের আশ্রয় নিয়েছিলো এ সব সম্পর্কে তুমি কিছুই জানতে না। ঠিক তেমনিভাবে ইউসুফ (আ.)-কে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে রমণীরা ও দরবারী লোকেরা তার সাথে কি ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ করেছিলো- সেগুলোও তুমি জানতে না। কারণ, তুমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলে না। কাজেই তোমাকে যা কিছু জানানো হচ্ছে তা ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এই ওহীই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের আকীদা বিশ্বাস ও অতীতে সংঘটিত ঘটনাবলী প্রমাণ করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা।

ওহীর সত্যতা, ঘটনার বিবরণ, এর প্রাসংগিক বিষয়াদি এবং হৃদয় আলোড়িত করার মত এর স্পর্শ ও প্রভাব- এ সব কিছুরই একটিমাত্র দাবী ছিলো, আর তা হচ্ছে, এই পবিত্র কোরআনকে বিশ্বাস করা, রসূলকে বিশ্বাস করা; যে রসূলকে তারা স্বচক্ষে দেখছে, তাঁর সম্পর্কে জানছে এবং তাঁর বক্তব্যও শুনছে। কিন্তু এতোকিছু সত্তেও তারা ঈমান গ্রহণ করছে না এবং বিশ্বাসও স্থাপন করছে না। এদের স্বভাব হচ্ছে এই যে, জগতময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন তারা স্বচক্ষে দেখেও যেন দেখছে না। এর মাধ্যমে প্রকৃত স্রষ্টার সন্ধানও তারা করছে না। এদের অবস্থা হচ্ছে অন্ধের মতো। এদের ভাগ্যে কঠিন আযাব ছাড়া আর কি আছে? এই আযাবই তাদের অতর্কিত ও আকস্মিকভাবে গ্রাস করে ফেলবে। এ কথাই নিম্নের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে। (আয়াত ১০৩-১০৭)

রসূলুল্লাহ (স.) আন্তরিকভাবেই কামনা করতেন যে, তাঁর জাতি ঈমান গ্রহণ করুক, তিনি যে সত্য ধর্ম প্রচার করছেন তা তারা গ্রহণ করুক এবং বিনিময়ে তারা ইহকাল ও পরকালের কঠিন শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাক। কারণ তিনি ছিলেন তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তিনি চাচ্ছিলেন না, তাঁর জাতির ভাগ্যে সেই কঠিন শাস্তি জুটুক যে শাস্তি মোশরেকদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরের খবর রাখেন এবং তাদের স্বভাব চরিত্র ও ধরন ধারণ সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। ফলে তিনি ভালো করেই জানেন, রসূলের একান্ত ইচ্ছা থাকলেও এ বিরাট সংখ্যক মোশরেক জনগোষ্ঠী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে না এবং ঈমানও তাদের ভাগ্যে জুটবে না। কারণ, ওপরে বর্ণিত আয়াতের বক্তব্য অনুসারে তারা আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন চোখে দেখেও তা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না; বরং অনেকটা উপেক্ষা করেই চলে। আর

যাদের মাঝে উপেক্ষার মনোভাব থাকে তারা কখনোই ঈমান লাভ করতে পারে না এবং জগৎময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খোদায়ী নিদর্শন থেকে আদৌ উপকৃত হতে পারে না।

তারা ঈমান গ্রহণ করুক আর না-ই করুক তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। কারণ তাদের ঈমানের পার্থিব কোনো বিনিময় তুমি তাদের কাছে কামনা করছে না। কোনো প্রকার বিনিময় ও পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদের হেদায়াতের জন্যে তুমি অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে চলেছো। অথচ যাদের জন্যে এই কষ্ট স্বীকার করা হচ্ছে তারাই চরম অবহেলা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে চলেছে। অদ্ভুত তাদের ব্যাপার স্যাপার ও আচার আচরণ। একথাই নিম্নের আয়াতটিতে বলা হয়েছে,

'অথচ তুমি তো তাদের কাছ থেকে এই (দাওয়াত ও তাবলীগের) জন্যে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো না! আর এই (কোরআন) দুনিয়া জাহানের (অধিবাসীদের) জন্যে একটি নসীহত বৈ কিছুই নয়। (আয়াত ১০৪)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিভিন্ন নিদর্শনের আলোচনা তাদের সামনে তুলে ধরে এ সবের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছো এবং তাদের জানিয়ে দিচ্ছো, এসব নিদর্শন গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে তুলে ধরা হয়েছে, নির্দিষ্ট কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা গোত্রের জন্যে নয়। তেমনিভাবে এসব নিদর্শন কেবল সক্ষম ও ধনবান লোকদের জন্যেও নয় যে, তা থেকে দুর্বল ও সম্পদহারা মানবগোষ্ঠী বঞ্চিত হবে; বরং এ সব নিদর্শন গোটা বিশ্ববাসীর জন্যেই তুলে ধরা হয়েছে। এ যেন খাবারের বিশাল দস্তরখান যা থেকে যে কেউ ইচ্ছা করলে খাবার গ্রহণ করতে পারে। এতে কারও জন্যে কোনো বাধা নিষেধ নেই। (আয়াত ১০৫)

আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর ওপরে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শনা জগৎময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলো দৃষ্টির নাগালের মধ্যেই রয়েছে। আসমান যমীনে মানুষ যে গুলো অহরহ প্রত্যক্ষ করছে। সকাল বিকাল সেগুলো দেখছে। দিনে ও রাতের প্রতিটি মুহূর্তে সে এগুলো উপলব্ধি করছে। এগুলো যেন সবাক ও স্বতস্ফূর্তভাবে মানুষকে তাদের পানে ডাকছে। সেগুলো দৃষ্টি ও অনুভূতির সমনে উন্মুক্ত ও প্রকাশ্য। হৃদয় মনে সাড়া জাগানোর মতো ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তারা এগুলো দেখেও যেন দেখে না, এ সবের আহ্বান শুনেও যেন শুনে না এবং এ সবের গভীর আবেদনও উপলব্ধি করতে পারে না।

প্রতিদিন সূর্য ওঠছে ও ডুবছে, সকলের অজান্তে ও নীরবে ছায়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে আবার কখনো সংকুচিত হচ্ছে। এগুলো লক্ষ্য করার বিষয়, ভেবে দেখার বিষয়। এই যে তরংগবিক্ষুব্ধ সমুদ্র, উচ্ছল ঝর্ণাধারা ও বহমান জলধারা-এ সব কিছুই লক্ষ্য করার বিষয়। এই যে বাড়ন্ত তরুলতা কোমল পুষ্পকলি, ফুটন্ত ফুল এবং শস্য শ্যামল মাঠ– এ সব কিছুই ভেবে দেখার বিষয়। এই যে শূন্যে পাখা বিস্তার করা পাখি, নদী বক্ষে সাঁতার কাটা মাছ, মাটির ওপর চলমান কীট-পতংগ ও সকল শ্রেণীর জীব জন্তু, এ সব কিছুই লক্ষ্য করা উচিত। এই যে কর্মব্যস্ততায় ভরা সকাল বিকাল এবং নীরবতা ও নিস্তব্ধতায় ঘেরা রাতের বেলা– এসব লক্ষ্য করার বিষয় এবং ভেবে দেখার বিষয়।

কারণ, এগুলো এমনই একটি মুহূর্তের জন্ম দেয় যখন মানব হৃদয় এই বিস্ময়কর জগতের নীরব আবেদন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এমন একটি মুহূর্ত তখন উপস্থিত হয় যা মনকে নাড়া দিতে যথেষ্ট, যা মনের মাঝে এক বিস্ময়কর চেতনা ও প্রভাব সৃষ্টি করে, কিন্তু তারা এসব কিছু দেখেও দেখে না। এসব থেকে তারা আদৌ কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে তাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই ঈমান জুটে না।

ঈমান এনেও মানুষ শেরেকে লিপ্ত হয়

এমন কি তাদের ভাগ্যে ঈমান জুটলেও তাদের অনেকেরই মনের মাঝে বিভিন্ন রূপে ও নানা আকৃতিতে শেরেক দানা বেঁধে থাকে। খাঁটি ও নির্ভেজাল ঈমানের জন্যে প্রয়োজন সার্বক্ষণিক সচেতনতা সতর্কতা, খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ভাবেই মনের মাঝে শয়তানী চিন্তা চেতনা দানা বেঁধে ওঠতে না পারে। মোমেনের সকল বিচার বিবেচনা, তার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং তার প্রতিটি কর্মকান্ড হবে আল্লাহকে লক্ষ্য করে, কেবল তাঁকেই কেন্দ্র করে; অন্য কাউকে নয়। খাঁটি ও নির্ভেজাল ঈমানের দাবী হচ্ছে, ব্যক্তির মনের ওপর এবং তার গোটা আচার আচরণের উপর কার কর্তৃত্ব চলবে, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা। ফলে মনের ওপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো শাসন ও কর্তৃত্ব চলবে না, জীবনে একমাত্র প্রভু ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী লা-শরীক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য ও দাসত্ব চলবে না। (আয়াত-১০৬)

ঈমান গ্রহণ করেও অনেকে শেরেকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আকীদা বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দিক থেকে শেরেক করছে। ঘটনা, বস্তু ও ব্যক্তির মূল্যায়নের দিক থেকে শেরেক করছে। লাভ লোকসান এবং মঙ্গল অমংগলে আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপায় উপকরণের প্রভাব স্বীকার করে শেরেক করছে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য শক্তির দাসত্ব স্বীকার করে শেরেক করছে। আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে মানব রচিত বিধান গ্রহণ করে শেরেক করছে। গায়রুল্লাহকে সকল আশা ভারসার আধার মনে করে শেরেক করছে। মানুষের প্রশংসা লাভের আশায় কোরবানী করে শেরেক করছে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো পার্থিব লাভ লোকসান সামনে রেখে জেহাদ করে শেরেক করছে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কৃপা বা অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে এবাদাত করে শেরেক করছে। আর এ কারণেই প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের মাঝে শেরেকের অস্তিত্ব পিপীলিকার বিচরণের চেয়েও অধিক গোপন।'(১)

এই গোপন বা অদৃশ্য শেরেকের বিষয়টি একাধিক হাদীসে এসেছে। যেমন,

ইমাম তিরমিযী ইবনে ওমর (রা.)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন–

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নাম নিয়ে কসম খাবে, সে শেরেক করবে।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ প্রমুখ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর রসূল এরশাদ করেছেন,

ঝাঁড়-ফুঁক ও তাবিজ গন্ডা এক ধরনের শেরেক।

ওক্ববা ইবনে আমের (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ উল্লেখ করেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

যে তাবিজ ধারণ করলো সে নিসন্দেহে শেরেকে লিপ্ত হলো।

আবু হোরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে আর এক হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, শেরেকের ব্যাপারে সকল শরীকদের তুলনায় আমি অধিক বিমুখ। কেউ কোনো আমল করে তাতে যদি অপর কাউকে আমার সাথে শরীক করে তাহলে আমি তাকেও ত্যাগ করি এবং তার শরীককেও।'

আবু সাঈদ ইবনে আবু ফাযালার বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'সকল সন্দেহের উর্ধ্বে যেদিন, এমন একটি দিনে যখন আল্লাহ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে একত্রিত করবেন তখন একজন ঘোষণাকারী

(১) হাফেজ আবু ইয়া'লা আল-মুসেলী কর্তৃক মা'ক্বাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত।

ঘোষণা দিয়ে বলবে, 'যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো আমল করতে গিয়ে শেরেকে লিপ্ত হয়েছে তারা যেন সেই গায়রুল্লাহর কাছে তাদের আমলের প্রতিদান কামনা করে। কারণ, আল্লাহ শেরেকের ব্যাপারে সকল শরীকদের তুলনায় অধিক বিমুখ।'

মাহমুদ ইবনে লাবীদের বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমাদের বেলায় সবচেয়ে মারাত্মক যে বিষয়টিকে আমি ভয় করি তা হলো ক্ষুদ্রতম শেরেক।' সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রসূল! শেরেক কাকে বলে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'রিয়া বা লোক দেখানো আমল।' কেয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ আমল নিয়ে উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ বলবেন, 'দুনিয়ায় যাদের দেখানোর জন্যে আমল করতে তাদের কাছে যাও। দেখো তাদের কাছে (তোমাদের আমলের) কোনো প্রতিদান আছে কিনা?'

এগুলোই হচ্ছে গোপন বা অদৃশ্য শেরেক। এগুলোর ব্যাপারে সব সময়ই সজাগ সতর্ক থাকতে হবে। নির্ভেজাল ও খাঁটি ঈমানের এটাই দাবী।

আর এক ধরনের শেরেক আছে যা দৃশ্যমান ও প্রকাশ্য। এই শেরেকের আওতায় পড়ে, জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কর্তৃত্ব ও দাসত্ব মেনে চলা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা– এটা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত একটি শেরেক, মানুষের সৃষ্টি করা বিভিন্ন পালা-পার্বণ ও আচার অনুষ্ঠানাদির অনুকরণ অনুসরণ করা, যে সকল পোশাক-পরিচ্ছদ শরীয়তসম্মত নয় বরং যা পরিধান করলে গোপন অংগের প্রতিটি ছাপ আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, এ জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ বা ফ্যাশনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া ইত্যাদি।

এ সবের দ্বারা যে গোনাহ হয় তা সাধারণত না-ফরমানীজনিত গোনাহর চেয়েও মারাত্মক ও ক্ষতিকর। কারণ এ সকল বিষয়ে একজন মানুষ আল্লাহর সুস্পষ্ট কোনো বিধান বা নির্দেশ লংঘন করে তাঁরই কোনো মাখলুকের সৃষ্ট এক বিশেষ সামাজিক নিয়ম নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। কাজেই এটা কোনো সাধারণ গোনাহ নয়; বরং এক প্রকারের শেরেক। কারণ, এর দ্বারা খোদায়ী বিধানবিরুদ্ধ কোনো বিষয়ের প্রতি আনুগত্য প্রমাণিত হয়। আর এটা নিসন্দেহে একটা মারাত্মক ব্যাপার। সে কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তাদের অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, তারা (আল্লাহর সাথে) শেরেক করতেই থাকে। (আয়াত ১০৬)

যদিও বক্তব্যটি রসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগের আরববাসীদের লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও সেটার আওতায় পরবর্তী সকল যুগের ও সকল স্থানের লোকেরাও এসে যায়।

জীবন ও জগতকে কেন্দ্র করে আল্লাহ পাকের এই যে অসংখ্য নিদর্শনাবলী, এগুলোকে যারা অবহেলা উপেক্ষা করে চলছে, তারা আর কিসের অপেক্ষায় আছে? তারা কি চায়?

তবে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে যে (হঠাৎ করে একদিন) তাদের ওপর আল্লাহর সর্বগ্রাসী আযাবের শাস্তি কিংবা আকস্মিক কেয়ামত আপতিত হবে, অথচ তারা জানতেও পারবে না! (আয়াত ১০৭)

এই আয়াতে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা মূলত ওই শ্রেণীর লোকদের অনুভূতি ও বিবেককে নাড়া দেয়ার জন্যে এবং তাদের গাফলতির সুখ নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলার জন্যেই করা হয়েছে, যেন এই গাফলতির চরম পরিণতির ব্যাপারে তারা সজাগ সতর্ক হতে পারে। কারণ, খোদায়ী আযাব কখন তাদের গ্রাস করে ফেলবে তা কেউ বলতে পারবে না। আল্লাহর আযাব দিন

তারিখ ঘোষণা করে আসে না। তার আগমন ঘটে আকস্মিকভাবে, তড়িৎ গতিতে। এমনও হতে পারে যে, কেয়ামতের ভয়ংকর মুহূর্তটি তাদের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে এবং তাদের অজান্তেই এক সময় তাদের ওপর আঘাত হানবে। অদৃশ্য জগতে কি ঘটছে বা ঘটবে তা তো সজাগ সচেতন ব্যক্তিরাই জানে না। কাজেই যারা গাফেল, যারা উদাসীন, তারা কি করে তা জানবে এবং তার অমংগল থেকে নিজেকে রক্ষা করবে।

জাহেলী সমাজে মিশে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া চলে না

নবুওতের সাক্ষ্য বহনকারী কোরআনের আয়াত এবং জীবন ও জগতকে ঘেরা খোদায়ী নিদর্শনাবলী স্বচক্ষে দেখেও যারা দেখছে না, জেনেও যারা বুঝছে না; বরং তারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিভিন্ন ধরনের শেরেকী কাজে লিপ্ত হচ্ছে, আর তারা সংখ্যায়ও অধিক। কাজেই এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সত্য-অনুসারীরা সে পথেই থাকবেন। সে পথ থেকে তাঁরা বিচ্যুত হবেন না। সে নির্দেশই নীচের আয়াতে দেয়া হয়েছে।,

'বলুন, এটাই হচ্ছে আমার পথ।'

অর্থাৎ একক ও সহজ সরল পথ, যে পথে কোনো বক্রতা নেই। যে পথে কোনো সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই,

(হে নবী, এদের) তুমি (স্পষ্ট করে) বলে দাও, এই হচ্ছে আমার পথ। আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি, আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাংগ সচেতনতার সাথেই (এই পথের আহ্বান জানাই), আল্লাহ তায়ালা মহান পবিত্র এবং আমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (আয়াত ১০৮)

অর্থাৎ আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত ও আলোকপ্রাপ্ত। আমরা আমাদের পথ ভাল করেই জানি ও চিনি। সে পথে আমরা পূর্ণ সতর্কতা ও সজাগ দৃষ্টি নিয়েই চলি। কাজেই সে পথে চলতে গিয়ে আমরা হোঁচট খাই না, দোটানায় পড়ি না, থমকেও দাঁড়াই না। কারণ, আমরা সন্দেহমুক্ত, ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকারী। এই ঈমান ও বিশ্বাসই আমাদের পথপ্রদর্শক। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করি না। কাজেই মোশরেকদের থেকে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক।

অর্থাৎ আমি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব ধরনের শেরেক থেকে মুক্ত। এটাই আমার পথ ও আদর্শ। যার ইচ্ছা সে তা অনুসরণ করতে পারে। যদি কেউ তা অপছন্দ না করে তাহলে তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তো এই সরল পথই অনুসরণ করে চলবো।

যারা আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকে তাদের মাঝে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকতে হবে। ঘোষণা দিয়ে তারা মানুষকে জানিয়ে দেবে, তারা ভিন্ন এক জাতি। তারা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের আকীদা বিশ্বাসের সাথে এদের আকীদা বিশ্বাসের কোনো মিল নেই। যাদের মত ও পথ, ভিন্ন, যাদের নেতৃত্বও ভিন্ন। ফলে একই সমাজে বাস করা সত্তেও তাদের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তারা পরস্পরের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায় না। জাহেলী সমাজের মাঝে বিলীন হয়ে গিয়ে যারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, তাদের সেই ডাকের কোনো সার্থকতা নেই, আদৌ কোনো মূল্য নেই; বরং গোড়াতেই ঘোষণা দিয়ে মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে, তারা জাহেলী মতবাদের ধারকদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জনগোষ্ঠী, তাদের সামাজিক বন্ধনের মূলে রয়েছে এক বিশেষ আকীদা বিশ্বাস ও ইসলামী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য। জাহেলী সমাজ থেকে নিজেদের পৃথক করতেই হবে। সাথে সাথে নিজেদের নেতৃত্বকেও জাহেলী সমাজের নেতৃত্ব থেকে পৃথক করে নিতে হবে।

জাহেলী সমাজে বিলীন হয়ে গিয়ে জাহেলী নেতৃত্বের অধীনে জীবন যাপন করলে তাদের আকীদার শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের দাওয়াতী কাজের প্রভাবও খর্ব হবে এবং তাদের নতুন আদর্শের যে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারতো সেটাও সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে।

এই বাস্তবতা কেবল রসূলের যুগের মোশরেকদের মাঝে দাওয়াতী কাজের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং যখনই জাহেলী মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে এবং মানব সমাজকে গ্রাস করে নেবে, তখনই এই বাস্তবতার প্রয়োজন দেখা দেবে। মৌলিক উপাদান এবং স্বতন্ত্র রূপরেখার দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত কোনোভাবেই অন্যান্য জাহেলিয়াত থেকে ভিন্ন নয়, যুগে যুগে ইসলামী দাওয়াতকে যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

জাহেলী সমাজে বিলীন হয়ে গিয়ে, জাহেলী পারিপার্শ্বিকতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে ইসলামী দাওয়াতকে এক বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে পৌছাবে বলে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা এই আকীদা বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কেই অজ্ঞ এবং মানুষের মনকে কিভাবে নাড়া দিতে হয় সে সম্পর্কেও অজ্ঞ। আল্লাহদ্রোহী মতবাদের যারা ধারক ও প্রচারক, তারা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় ও বোধ বিশ্বাস মানুষের সামনে খোলাখুলিভাবে তুলে ধরে। তাহলে যারা ইসলামী মতাদর্শের ধারক ও প্রচারক, তারা কেন নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরবে না? কেন তারা নিজেদের পৃথক মত ও পথের কথা ঘোষণা দিয়ে মানুষকে জানাবে না? কারণ তাদের মতাদর্শ অন্যান্য সকল জাহেলী মতাদর্শ থেকে ভিন্ন।

এখন অন্য একটি প্রসংগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। সেটা হলো, রেসালাত ও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর শেষ পরিণতির প্রসংগ। রেসালাত প্রসংগে বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন, মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের ব্যাপারটি নতুন বা আজগুবি কোনো ব্যাপার নয়; বরং তাঁর পূর্বেও নবী রসূলরা এই ধরাপৃষ্ঠে মানুষের হেদায়াতের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। অতীতে যে সকল জাতি তাদের প্রতি প্রেরিত রসূলদের অস্বীকার করেছে তাদের সবাইকে করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের সেই ভয়াবহ ও করুণ পরিণতির ইতিহাস আজও পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নিচের আয়াতে এ প্রসংগেই বলা হয়েছে।

তোমার আগে বিভিন্ন জনপদে যতো নবী আমি পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই (তোমার মতো) কিছু সংখ্যক মানুষই ছিলো, আমি তাদের ওপর ওহী নাযিল করতাম। এরা কি আমার যমীন পরিভ্রমণ করেনি, (করলে অবশ্যই) তারা দেখতে পেতো যে, এদের পূর্বেকার লোকদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো (যারা আমার মানুষরূপী সে নবীদের অস্বীকার করেছিলো। সত্য কথা হচ্ছে,) আখেরাতের ঠিকানা তাদের জন্যেই কল্যাণময়, যারা (নবীদের পথে চলে) তাকওয়া অবলম্বন করেছে, (পূর্ববর্তী এই মানুষদের পরিণাম ফল দেখেও) তোমরা কি কিছু অনুধাবন করবে না? (আয়াত ১০৯)

সেসব অতীত ঘটনার নিদর্শনগুলোর দিকে তাকালে মানুষের অন্তর কেঁপে ওঠে। এমনকি যারা পরাক্রমশালী, তাদের অন্তরও। কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে যদি কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের অতীত দিনগুলোতে ফিরে যায় তাহলে সেখানে দেখতে পাবে এক জীবন্ত জনগোষ্ঠীকে– যারা দিব্যি চলছে, ফিরছে, আসছে, যাচ্ছে, আশংকা করছে, আশা, কামনা আকাংখা করছে, আর সেই জনগোষ্ঠীই হঠাৎ করে নিথর নিস্তেজ হয়ে গেলো, তাদের সকল চিহ্ন ওঠে গেলো, ধরাপৃষ্ঠ থেকে তারা বিলীন হয়ে গেলো। আর এরই সাথে সাথে তাদের সকল চিন্তা চেতনা, তাদের মতাদর্শ, তাদের চলন বলন সব কিছুই মুহূর্তের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। এই করুণ পরিণতির বিষয়টি

এভাবে কেউ যদি চিন্তা করে তাহলে সে যতোই পাষাণ হৃদয়ের মানুষ হোক না কেন তার মন না গলে পারবে না। আর এ জন্যেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পবিত্র কালামের বিভিন্ন জায়গায় বিগত জাতিগুলোর ঘটনা উল্লেখ করেছেন যেন তা থেকে মানুষ শিক্ষা নেয় ও সত্য পথের সন্ধান পায়।

তোমার আগে বিভিন্ন জনপদে যতো নবী আমি পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই (তোমার মতো) কিছু সংখ্যক মানুষই ছিলো, আমি তাদের ওপর ওহী নাযিল করতাম। এরা কি আমার যমীন পরিভ্রমণ করেনি, (করলে অবশ্যই) তারা দেখতে পেতো যে, এদের পূর্বেকার লোকদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো (যারা আমার মানুষরূপী সে নবীদের অস্বীকার করেছিলো। সত্য কথা হচ্ছে,) আখেরাতের ঠিকানা তাদের জন্যেই কল্যাণময়, যারা (নবীদের পথে চলে) তাকওয়া অবলম্বন করেছে, (পূর্ববর্তী এই মানুষদের পরিণাম ফল দেখেও) তোমরা কি কিছু অনুধাবন করবে না? (আয়াত ১০৯)

অর্থাৎ আমি মানুষ জাতির মধ্য থেকেই নবী ও রসূল নির্বাচন করেছি। তারা কেউ ফেরেশতাও ছিলেন না অথবা অন্য কোনো মখলুকও ছিলেন না। তারা তোমার মতোই নগরে বসবাসকারী মানুষ ছিলেন, মরুভূমির কোনো বাসিন্দা ছিলেন না। ফলে তারা ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং নরম ও ভদ্র। দাওয়াত ও হেদায়াতের গুরুদায়িত্ব পালনে তারা ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তোমার রেসালাতের ব্যাপারটিও খোদায়ী সেই নিয়মেরই অধীন। কাজেই তুমি একাধারে একজন মানুষও এবং রসূলও। অন্যান্য রসূলদেরর ন্যায় তোমার প্রতিও আমি ওহী নাযিল করছি।

পৃথিবী ভ্রমণ করে তারা দেখুক তাদের পূর্বের জাতিগুলোর ভয়াবহ পরিণতি। এতে করে তারা বুঝতে পারবে, তাদের পরিণতিও তেমনটিই হতে পারে। ওদের ভাগ্যে যা জুটেছে এদের ভাগ্যেও তাই জুটতে পারে।

অর্থাৎ জাগতিক জীবনের তুলনায় পারলৌকিক জীবনই উত্তম। কারণ, জাগতিক জীবন নশ্বর আর পারলৌকিক জীবন অবিনশ্বর।

অর্থাৎ বিগত জাতিগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর ঐশী বিধান কি ছিলো সে বিষয়ে তোমরা চিন্তা ভাবনা করছো না কেন? তোমাদের বোধশক্তি কি লোপ পেয়ে গেছে? আজ যদি তোমরা বিগত জাতিসমূহের ভয়াবহ পরিণতির ঘটনা বিবেচনায় রাখতে তাহলে অস্থায়ী আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে চিরস্থায়ী আরাম আয়েশের পথই অবলম্বন করতে।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের কঠিনতম কিছু মুহূর্ত

এর পর আলোচনায় আসছে রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের কঠিনতম মুহূর্তগুলোর, যার সম্মুখীন তাঁকে রসূলকে তাঁর নবী জীবনের বিভিন্ন ধাপে হতে হয়েছে। সেই মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর অমোঘ অলংঘনীয় নিয়মমাফিক গায়েবী সাহায্যও এসেছে। নিচের আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে–

এমনকি অনেক সময় নবীরা নিরাশ হয়ে যেতো ....। (আয়াত-১১০)

এক মর্মান্তিক চিত্র যার মাঝে ফুটে উঠেছে নবী জীবনের সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা, আরও ফুটে ওঠেছে কুফরী, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের মোকাবেলা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট। এই সংকটময় মুহূর্তে দিনের পর দিন তারা আল্লাহকে ডাকছেন, তাঁর সাহায্য কামনা করছেন, কিন্তু তাদের দোয়া খুব সামান্যই কবুল করা হচ্ছে। কালক্রমে বাতিলের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে ইসলামের অনুসারীরা শক্তিতে দুর্বল এবং সংখ্যায়ও দুর্বল হচ্ছে।

এ ছিলো খুবই সংকটপূর্ণ মুহূর্ত। কারণ, বাতিল শক্তি ক্রমেই ক্ষমতাধর হচ্ছিলো, প্রভাবশালী হচ্ছিলো, মারমুখো হয়ে ওঠছিলো এবং সর্বোপরি তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওঠছিলো। এই করুণ অবস্থায় সকল রসূল আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবায়নের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন, কিন্তু ওয়াদার বাস্তবায়ন তখনও তারা দেখতে পাচ্ছিলেন না। ফলে তাদের মনে নানা ধরনের সন্দেহ সংশয় দানা বেঁধে ওঠছিলো। তবে কি তাদের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করা হয়েছিলো? তবে কি তারা বিজয়ের মিথ্যা আশা হৃদয়ে পোষণ করে আসছিলেন? এ জাতীয় নানা ধরনের প্রশ্ন তখন তাদের মনে উঁকি মারছিলো।

একজন রসূলের জীবনে এই জাতীয় পরিস্থিতি তখনই দেখা দেয় যখন তিনি সংকট সমস্যার সর্বশেষ প্রান্তে গিয়ে উপনীত হন সেখানে পৌঁছে কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া তো দূরে থাক তার কল্পনাও সে করতে পারে না।

এই কঠিন সংকটময় মুহূর্তের একটা চিত্র (সূরা বাক্বারায় ২১৪ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই পর্যায়ের আরও) কয়েকটি আয়াতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেগুলো পড়লে আপনার গা নিশ্চয়ই শিউরে ওঠবে, আপনি তখন সত্যিকার চিত্র অনুধাবন করতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন, কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে একজন নবীর মনে এ ধরনের আশংকা দেখা দিতে পারে।

ঠিক এই চরম মুহূর্তেই আল্লাহর বিশেষ সাহায্য নবী রসূলগণের জন্যে ধরাপৃষ্ঠে নেমে আসে। নিম্নের আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে–

(আগেও মানুষ নবীদের মিথ্যা সাব্যস্ত করতো,) এমনকি নবীরা (কখনো কখনো মানুষদের ঈমান আনার সম্ভাবনা থেকে) নিরাশ হয়ে যেতো এবং (আল্লাহর আযাবের প্রতিশ্রুতিতে) লোকেরা তাদের মিথ্যাবাদীও ভাবতে শুরু করতো, তখন হঠাৎ করেই তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাযির হতো। (প্রতিশ্রুত আযাব এসে হাযির হলে) আমি যাকে চাইলাম তাকেই শুধু আযাব থেকে নাজাত দিলাম। আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আযাব কেউই রোধ করতে পারে না। (আয়াত ১১০)

দাওয়াত ও তাবলীগের বেলায় এটাই চিরন্তন নিয়ম বা খোদায়ী বিধান। এই মহান দায়িত্ব পালন করতে গেলে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হবে। বিভিন্ন সমস্যা সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। যখন সকল শক্তি-সামর্থ নিঃশেষ হয়ে পড়বে, সকল প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটবে, সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই আসবে আল্লাহর গায়েবী মদদ। তখনই আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা। ফলে যারা বাঁচার তারা বাঁচবে আর যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হবে। যালেমদের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মযলুমরা মুক্তি পাবে আর অত্যাচারী ও পাপীরা ধ্বংস হবে। আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে সেদিন কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না, সাহায্য করতে পারবে না।

কেন এই নিয়ম? কারণ এর ফলে খোদায়ী মদদ কোনো সস্তা বস্তুতে পরিণত হবে না এবং দাওয়াতী কাজও কোনো তুচ্ছ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না। খোদায়ী মদদ যদি এতোই সহজলভ্য হতো তা হলে প্রতিদিনই নতুন নতুন মোবাল্লেগের সাথে আমাদের সাক্ষাত ঘটতো যাদের দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে কোনো কিছুরই কোরবানী দিতে হতো না, অথবা দিলেও তা হতো খুবই নগণ্য। সত্যের দাওয়াত ও প্রচার কাজ কোনো হেলা-খেলার বস্তু হতে পারে না। কারণ এই দাওয়াতী কাজের মূল বিষয় হচ্ছে মানব জাতির আদর্শ ও জীবন বিধান। কাজেই এই মহান ও পবিত্র কাজটিকে কপট ও নকল মোবাল্লেগদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। কেননা কপটদের পক্ষে দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুভার বহন করা সম্ভব নয়। সে জন্যেই তারা কপটতার আশ্রয় নেয়, মোবাল্লেগ হওয়ার ভান করে। তাই কোনো কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হলেই তাদের আসল

রূপ প্রকাশ পায়। আর যারা সত্যিকার মোবাল্লেগ, নিষ্ঠাবান, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, কেবল তারাই সকল বাধা বিপত্তি ও সকল যুলুম অত্যাচারের সামনে অটল থাকতে পারে। তারা কখনও বিপদের সম্মুখীন হলে দাওয়াতী কাজ ত্যাগ করে চলে যায় না। এমনকি খোদায়ী মদদের ব্যাপারে হতাশায় পেয়ে বসলেও তারা দাওয়াতী কাজ থেকে কখনো পিছপা হয় না।

আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করার বিষয়টি স্বল্পমেয়াদী কোনো ব্যবসা বাণিজ্য নয় যে, লাভ হলে তা চলবে আর লোকসান হলে তা ত্যাগ করে অন্য ব্যবসা ধরতে হবে; বরং খোদাদ্রোহী সমাজে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার অর্থই হলো এক কঠিন গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেয়া। কারণ, এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জনবল ও ধনবলের অধিকারী তাগুতী শক্তির সম্মুখীন হতে হবে, জনসাধারণের হাসি ঠাট্টা হযম করতে হবে। অনেক সময় জনসাধারণই তাদের প্রভাবিত করতে পারে, তাদের বিভ্রান্ত করতে পারে, তাদের বুঝাতে পারে যে, তোমরা এই দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে নিজেদের সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ উল্লাস থেকে বঞ্চিত করছো। এই ধরনের প্রলোভন ও বিভ্রান্তি তাদের এড়িয়ে যেতে হবে। কাজেই যারা এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে যাবে তাদের মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে, এই কাজ বড়ই কঠিন। বিশেষ করে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরোধিতার মুখে এই দায়িত্ব পালন করা তো আরও কঠিন। এ কারণেই দুর্বল ও অসহায় সাধারণ দল প্রথম দিকে এই দাওয়াতে সাড়া দেয় না; বরং গোটা সমাজ থেকে কেবল নির্দিষ্ট একটি দলই এই দাওয়াতে সাড়া দেয়। কারণ কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব দ্বীনের স্বার্থে সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করা, বিসর্জন দেয়া। এই শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা সমাজে সব সময়ই কম থাকে, কিন্তু যখন তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অব্যাহত জেহাদের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের ফয়সালা আসে, কেবল তখনই সাধারণ মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে যোগ দেয়।

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয়

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা হচ্ছে বেদনাবহুল ও মর্মন্তুদ, কূপের অন্ধকার গহ্বরে, মিসর অধিপতির গৃহে এবং সর্বোপরি কারাগারে তিনি যে সকল মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলোর প্রতিই কিছুটা ইংগিত করা হয়েছে এই সূরায়। তবে শেষ পরিণতি সব সময়ই খোদাভীরু লোকদের জন্যে কল্যাণকর হয়। আর এটা আল্লাহরই ওয়াদা ও অমোঘ বিধান। এই ওয়াদা ও বিধানের আদৌ কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। রসূলদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা এরই কিঞ্চিৎ নমুনা। এ সকল ঘটনা বুদ্ধিমান ও বিবেকবান লোকদের শিক্ষণীয় বিষয়। অপর দিকে এর দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবসমূহের সত্যতাও প্রমাণিত হয় এবং সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হয়, পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবসমূহের সাথে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর কোনোই সম্পর্ক ছিলো না। কাজেই তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা বানোয়াট কোনো কেসসা কাহিনী নয়। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্য ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ, মিথ্যা দ্বারা কখনো অপর মিথ্যার সত্যতা প্রমাণিত হয় না এবং তা কখনো মানুষকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। তদ্রূপ মিথ্যা কখনো মোমেনের হৃদয়ে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে না। এ কথাই নীচের আয়াতে বলা হয়েছে,

অবশ্যই (অতীতের) জাতিসমূহের কাহিনীতে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে, (কোরআনে বর্ণিত) এসব কোনো মনগড়া গল্প নয়, বরং এ হচ্ছে তারই স্পষ্ট সমর্থন যে আসমানী কেতাব তাদের কাছে আগে থেকেই মজুদ রয়েছে, বরং (ক্ষেত্রবিশেষে তাতে রয়েছে) প্রতিটি

বিষয়ের বিস্তারিত (ও সঠিক) ব্যাখ্যা। (সর্বোপরি এসব বর্ণনায়) ঈমানদার মানুষদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত। (আয়াত ১১১)

আর এ ভাবেই সূরার সূচনা ও তার সমাপ্তির মাঝে আমরা সাযুজ্য সামঞ্জস্য খুঁজে পাই। তদ্রূপ ঘটনার সূচনা ও সমাপ্তির মাঝেও একটা মিল খুঁজে পাই। একটা অদ্ভুত মিল দেখতে পাই ঘটনার প্রথম ভাগের বক্তব্য ও শেষ ভাগের বক্তব্যের মাঝে। ঘটনার মধ্যভাগে যে বক্তব্য এসেছে সেটাও পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবদিক থেকে এই বক্তব্য অত্যন্ত সার্থক। বক্তব্যের ভাষা ও বর্ণনা অত্যন্ত চমৎকার এবং হৃদয়গ্রাহী। ফলে ঘটনা অবতারণার দ্বারা কাংখিত উদ্দেশ্য লক্ষ্য সাধিত হয়েছে। তাছাড়া বক্তব্যের সত্যতা যথার্থতা এমন ভাষায় ও ভংগিতে প্রকাশ করা হয়েছে যার ফলে তা উঁচুমানের সাহিত্য গুণেও ভূষিত হয়েছে।

সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে। কারণ, ঘটনার ধরন প্রকৃতিই এমন যে, তা একটি সূরার মাঝেই বর্ণিত না হলে সুন্দর হতো না। ঘটনাটি হচ্ছে একটা স্বপ্নের ন্যায়, যা ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছিলো। কাজেই ধারাবাহিকতা ও ঘটনার পরম্পরা রক্ষা করা না হলে তার আসল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হতো। অন্যান্য নবী রসূলদের বিচিত্র ঘটনাবলীর খন্ড খন্ড চিত্র পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা বিলকিসের ঘটনার সাথে বর্ণিত হয়েছে। সোলায়মান (আ.)-এর জীবনের অন্যসব ঘটনা অন্যখানে আলোচিত হয়েছে। তদ্রূপ মারইয়াম (আ.)-এর জন্ম সংক্রান্ত ঘটনার একটা অংশ অথবা ঈসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনা অথবা নূহ (আ.)-এর তুফানের ঘটনার বিভিন্ন অংশ একাধিক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা ছিলো একটা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। তাই এই ঘটনাটির বর্ণনা একই স্থানে, একই সূরায় এবং একই পর্বে সমাপ্ত হওয়াটাই ছিলো বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তায়ালা এ সূরার সূচনায় যথার্থই বলেছেন–

(হে নবী) আমি তোমাকে এই কোরআনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি– যা আমি তোমার কাছে ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি। অথচ এর আগে (এ কাহিনী সম্পর্কে) তুমি ছিলে সম্পূর্ণ বেখবর লোকদের একজন।

সূরা আর রা'দ

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আমি অনেক সময় পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমার সীমিত মানবীয় বিশ্লেষণ ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহর কালামকে স্পর্শ করতে ভয় পাই। বিশেষত এই সূরাটা সূরা আনয়ামের মত জ্বালাময়ী হওয়ার কারণে নিজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে এটিকে স্পর্শ করতে আমার ভয়ই লাগে।

কিন্তু তথাপি আমি নিরুপায়। আমরা এমন একটা প্রজন্মের সদস্য, যাদের কাছে কোরআনের বক্তব্য, তার উপস্থাপিত জীবন বিধান এবং তার মেযাজ ও স্বভাব প্রকৃতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা একান্ত জরুরী। কেননা কোরআন যে পরিবেশে নাযিল হয়েছিলো, এ প্রজন্মের মানুষ তা থেকে বহু দূরে অবস্থিত। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে কোরআন নাযিল হয়েছিলো তা রয়েছে তাদের নাগালের বাইরে। তাদের চেতনা ও অনুভূতিতে কোরআনের প্রকৃত মর্মার্থ অনেকটা অস্বচ্ছ ও ঝাঁপসা হয়ে এসেছে এবং তার পরিভাষাগুলোর প্রকৃত অর্থও তাদের দৃষ্টিতে বিকৃত হয়ে গেছে। একদিকে কোরআন ও তার আলোয় উদ্ভাসিত ইসলামী পরিবেশ থেকে এ প্রজন্মের দূরত্ব এভাবে বেড়ে চলেছে, অপরদিকে যে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করতে কোরআন নাযিল হয়েছিলো, তার সাথে তার অন্তরংগতা শুধু বাড়ছেই না; বরং সে সেই জাহেলিয়াতের মধ্যেই নিমজ্জিত আছে। যে প্রজন্মের কাছে কোরআন সরাসরি নাযিল হয়েছিলো, তাদের সাথে বর্তমান প্রজন্মের আরো একটা বড় পার্থক্য এই যে, ওই প্রজন্ম কোরআনকে সাথে নিয়ে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো, কিন্তু এ প্রজন্ম সে ধরনের লড়াই করে না। অথচ এ লড়াই ও সক্রিয় বিরোধিতা ছাড়া কোরআনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ঘরের কোণে বসে এ কোরআনের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা যায় না। জাহেলিয়াত উৎখাত ও কোরআনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সংগ্রাম করে এমন মর্দে মোমেন ছাড়া আর কেউ কোরআনের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে কখনো সক্ষম হয় না।

এসব কারণেই কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গেলেই ভয়ে আমার মন দুরু দুরু করে, আর হাত কাঁপে।

আমার চেতনায় ও উপলব্ধিতে কোরআন যে ভাবের উজ্জীবন ঘটায় এবং যে প্রেরণা সঞ্চারিত করে, তা যথাযথভাবে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কোরআন থেকে যা বুঝি আর জনগণকে যা বুঝাই, তাতে সব সময় বিরাট একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছে বলে আমি অনুভব করি।

আমি এখন আমাদের এই প্রজন্ম ও যে প্রজন্ম কোরআনকে সরাসরি গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য গভীরভাবে উপলব্ধি করি। কোরআন তাদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করেছিলো এবং এর ভাব, উদ্দেশ্য, ইশারা ইংগিত ইত্যাদি সব কিছুই তারা সরাসরিভাবে কোরআন থেকে গ্রহণ করেছিলো। তাই তারা এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলো সরাসরিভাবে। তারা জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়েছিলো। এভাবেই সীমাবদ্ধ পার্থিব জীবনে তারা সেই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলো, যা অলৌকিক ঘটনার মতো প্রতীয়মান হয়েছিলো। তারা নিজ দেশে, তাদের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশে এবং পরিশেষে সমগ্র বিশ্বের চিন্তা, কর্ম, মূল্যবোধ ও ভাবাবেগের জগতে এক সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করেছিলো। এমনকি বিশ্ব ইতিহাসের গতি পর্যন্ত তারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে পেরেছিলো এবং সারা বিশ্ব ও বিশ্ববাসীকে আল্লাহর বিধানের আওতায় নিয়ে এসেছিলো।

তাদের এই বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটতো সরাসরি কোরআনের শক্তি ও প্রেরণার উৎস থেকে। আর কোরআনেরই চেতনা ও মূল্যবোধ অনুসারে তারা নিজেদের গড়ে তুলতো।

কিন্তু আজ আমরা জীবন, জগত, মূল্যবোধ ও সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে মানুষের মতামত এবং ধ্যান ধারণা অনুসারে নিজেদের গড়ে তুলি। অক্ষম ও নশ্বর মানুষেরা কে বলে ও কে কি ধারণা পোষণ করে, আমরা তার অনুসরণ করি।

এরপর আমরা এ সব মানবীয় চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের দিকে দৃষ্টি দেই। কোরআন নাযিল হওয়ার সময়কার সেই প্রজন্মের জীবনে ও পারিপার্শ্বিক জগতে সংঘটিত বিপ্লবের দিকে এবং তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি এ সব চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের আলোকে। ফলে ওই বিপ্লবের প্রেরণা, কারণ ও ফলাফল নির্ণয়ে ভুল করি। কেননা তারা ছিলো কোরআনের উপাদানে তৈরী এক অপূর্ব সৃষ্টি। তারা মানব রচিত মতবাদ ও মানবীয় চিন্তাধারা দ্বারা তৈরী ছিলো না। তাই তাদের কর্মকান্ড ও অবদানকে মানবীয় চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধ দ্বারা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

আমি 'যিলালিল কোরআন' পাঠকদের সতর্ক করছি, এই তাফসীর পাঠ করেই যেন তারা কোরআনের উদ্দেশ্য সাধন করে ফেলেছেন বলে মনে না করেন। এটা তারা পড়বেন শুধু এজন্যে যে, এ দ্বারা তারা আসল কোরআনের কাছাকাছি চলে যেতে পারবেন এবং আসল কোরআন আয়ত্তে এনে তার ছায়া (যিলাল) থেকে মুক্তি লাভ করবেন। এ জন্যে নয় যে, আসল কোরআনের পরিবর্তে শুধু কোরআনের ছায়ার নীচেই (যিলালিল কোরআন) চিরকাল বসে থাকবেন। আসল কোরআনের সন্ধান পেতে হলে তাদের অবশ্যই কোরআনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করতে হবে এবং কোরআনের নেতৃত্বে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

সূরা আর রা'দের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে এই ক'টা প্রাসংগিক কথা না বলে পারলাম না। সূরা আররা'দ কতোবার পড়েছি তার হিসেবও আমার কাছে নেই। তথাপি যখনই পড়ি, মনে হয় যেন নতুন পড়ছি। আসলে কোরআনের এটাই বৈশিষ্ট্য। আপনি কোরআনের প্রতি যতোখানি মনোযোগ দেবেন, কোরআন আপনাকে সেই অনুপাতেই তার আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিতরণ করবে। যতোবার আপনি খোলা মন নিয়ে কোরআন অধ্যয়ন করবেন, ততোবারই সে আপনাকে নিজের আলো, ঔজ্জ্বল্য, প্রেরণা ও উদ্দীপনা প্রদান করবে। প্রতিবারই আপনার কাছে তা নতুন প্রতীয়মান হবে, যেন সবেমাত্রই তার সাক্ষাত পেলেন এবং ইতিপূর্বে পড়েনওনি, শোনেনওনি এবং তা নিয়ে কোনো তৎপরতা চালাননি।'

সূরা আর রা'দ একটা বিস্ময়কর সূরা। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র একই সুর।(১) একই ছন্দ ও একই গতি লক্ষণীয়, যা মানুষের মনমগয ও চেতনাকে বিচিত্র ধরনের আকার আকৃতি, ছায়া, দৃশ্য ও প্রেরণা দিয়ে ভরে তোলে, যা মানব সত্তাকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে ধরে যে, সে নিজেকে রকমারি দৃশ্য, আকৃতি, আবেগ, অনুভূতি ও উপলব্ধির এক বিরাট সমাবেশের মধ্যে উপস্থিত দেখতে পায়। এ সব দৃশ্য মানুষের মনকে ভিন্ন ভিন্ন জগতে ও ভিন্ন ভিন্ন যুগে টেনে নিয়ে যায়। তাকে করে তোলে জাগ্রত, সচেতন, বুদ্ধিমান এবং চারপাশে বিরাজমান দৃশ্যাবলী ও উদ্দীপনাময় ঘটনাবলীর প্রতি সংবেদনশীল।

এ সূরার ভাষা ও বর্ণনাকে ভাষা ও বর্ণনা না বলে হাতুড়ির আঘাত, ধাক্কা ও ঝাঁকুনি বলাই সমীচীন। এর দৃশ্যাবলী, চিত্রাবলী, গীতিময়তা এবং অনুভূতিতে প্রচ্ছন্ন তরংগ সৃষ্টিকারী যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা বাক্যগুলোর নিরিখে বলা যায়, এটা একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী সূরা।

(১) কোরআনের সূরের মূর্ছনা সৃষ্টির উপকরণ একাধিক। কোথাও একই শব্দের অক্ষরসমূহের উচ্চারণের বৈচিত্র, কোথাও একাধিক শব্দের পারস্পরিক সূরের সাদৃশ্য, কোথাও শব্দের শেষের টানের সাদৃশ্য, ইত্যাদি। যেমন ইউমিনুন, ইউকেনুন, খালেদুন এবং ইকাব, নাহার, মোতায়াল ইত্যাদি।

অন্য সব মক্কী সূরার মত এর প্রধান আলোচ্য বিষয়ও আকীদা-বিশ্বাস।(২) এতে বলা হয়েছে, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ এবং আল্লাহই একমাত্র রব বা প্রভু। তাই দুনিয়া আখেরাত উভয় জায়গায় একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য ও দাসত্ব করতে হবে। সাথে সাথে ওহী, আখেরাত ও অন্যান্য অদৃশ্য তত্ত্বেও বিশ্বাস করতে হবে।

কিন্তু এই একক বিষয়টাও সব মক্কী ও মাদানী সূরায় একই পদ্ধতিতে বারংবার উপস্থাপিত হয়নি; বরং প্রতিবার নতুন নতুন ভংগিতে এবং নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

এ সব আলোচ্য বিষয়কে এরূপ নিরুত্তাপ ও ঠান্ডাভাবে তুলে ধরা হয়নি যে, কয়েকটা শব্দের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করা হলো এবং শেষ হয়ে গেলো, যেমন অন্যান্য মানব রচিত মনস্তাত্ত্বিক বিষয় তুলে ধরা হয়; বরং এগুলোকে একটা বিশেষ প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হয়। সেই প্রেক্ষাপট হলো আজব সামগ্রীতে পরিপূর্ণ এ বিচিত্র বিশ্বজগত। এসব আজব ও বিস্ময়কর সামগ্রী হলো আলোচিত তত্ত্বসমূহের প্রমাণ এবং মানুষের উন্মুক্ত ও প্রাজ্ঞ উপলব্ধির সহায়ক নিদর্শন। এ সব অদ্ভুত ও বিচিত্র উপাদানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই এবং এগুলো কখনো পুরনো হয় না; বরং এগুলো চির নতুন ও চির নবীন থাকে। কেননা এগুলো প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য উদঘাটন করে, আর অতীতে উদঘাটিত তথ্যকেও নবোদঘাটিত তথ্যের আলোকে নতুন বলে মনে হয়। তাই সূরার আলোচিত এ বিষয়গুলো বিশ্বজগতের বিচিত্র ও চির নতুন সামগ্রীর মেলায় চিরঞ্জীব থেকে যায়।

এ সূরা মানুষের মনকে বিশ্বের বিভিন্ন পরিমন্ডলে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং তার কাছে সমগ্র বিশ্বজগতকে তার বিভিন্ন চমকপ্রদ দৃশ্য সহকারে তুলে ধরে। তুলে ধরে স্তম্ভহীন আকাশকে, সুনির্দিষ্ট মেয়াদের গতিপথে প্রদক্ষিণরত সূর্য ও চাঁদকে, পালাক্রমে আসা রাত ও দিনকে, তুলে ধরে অটল অনড় পর্বত ও প্রবহমান নদীনালা, ফল ও ফুলের বাগান, শস্য খামার, বিচিত্র রং আকৃতি ও স্বাদের খেজুরের বাগান, পাশাপাশি অবস্থানরত একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত ক্ষেত খামার, আশা নিরাশা মিশ্রিত মেঘের বিদ্যুতের ঝলকানি, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগানরত মেঘের গর্জন, বিনীত ভীত ফেরেশতা, মৃত্যু সম্ভাবনাময় বজ্রপাত, ভারি মেঘমালা, প্রবল বৃষ্টি, পানিরাশির ওপরের ফেনা এবং তার নীচে বিদ্যমান মানুষের উপকারী উপাদান ইত্যাদি সমন্বিত এই মহাবিশ্বকে।

অতপর মানুষের মন যেদিকেই রওনা হয়, এ সূরা তাকে সেদিকেই ধাওয়া করে। ধাওয়া করে তাকে সাবধান করে দেয়, আল্লাহর সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক জ্ঞানের আওতার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। প্রত্যেক পলাতক, অগন্তুক, প্রকাশ্যে চলাচলকারী ও গোপনে চলাচলকারী কেউই সে জ্ঞানকে ফাঁকি দিতে পারে না। প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীর মনের কথা পর্যন্ত তিনি জানেন। যে অদৃশ্য রহস্য কেউ জানে না, আল্লাহ তা জানেন। এমনকি গর্ভবতীর গর্ভে কী লুকিয়ে আছে এবং জরায়ুর অভ্যন্তরে সন্তান বাড়ছে না জরায়ু থেকে বের হচ্ছে তাও তিনি জানেন।

মহাবিশ্বের গোপন ও প্রকাশ্য বৃহৎ শক্তির প্রকৃত অবস্থাকে এ সূরা মানুষের উপলব্ধির কাছাকাছি নিয়ে আসে, তা সে যতোই সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল হোক, দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হোক। মানুষের কল্পনাশক্তির আয়ত্তাধীন এই বিষয়গুলো এতো ভয়ংকর যে, তা ভাবতেও হৃদয় কাঁপে। অত্যন্ত জীবন্ত, গতিশীল ও প্রভাবশালী দৃশ্যাবলীর আকারে এর বহু উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন কেয়ামতের দৃশ্য, আযাব ও সুখের দৃশ্য, উভয় ক্ষেত্রে মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া, অতীত জাতিগুলোর ধ্বংস থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং তাদের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বক্তব্যসমূহ ইত্যাদি।

---

(২) দু'একটা বর্ণনায় মাদানী বলা হলেও সূরাটা মক্কী। এর বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, বর্ণনাভংগি, সার্বিক আলোচনার ধরন ইত্যাদি দ্বারা এর মক্কী হওয়াটাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

এ হলো সূরার বিষয়বস্তু এবং তার মহাজাগতিক পরিমন্ডল সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এ ছাড়া এর বিস্ময়কর বাচনভংগিগত বৈশিষ্ট্য তো রয়েছেই। সুতরাং যে প্রেক্ষাপটে এ সূরার বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা হলো প্রাকৃতিক জগত এবং প্রকৃতিতে ও মানব সত্ত্বায় বিদ্যমান তার বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর প্রেক্ষাপট। এর একটা বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতি রয়েছে।

সেই পরিস্থিতি কিছু পরস্পর বিরোধী দৃশ্যাবলীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে। যেমন আকাশ, পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য এবং রাত ও দিন। এ ছাড়া নানাবিধ বস্তু ও তার ছায়া, বড় বড় পাহাড় পর্বত ও নদীনালা, ক্ষয়িষ্ণু ফেনা ও স্থিতিশীল পানি, পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী ভূখন্ডসমূহ, সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন খেজুরের বাগান ইত্যাদি। তাই এসব পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য সূরার সকল জিনিসে গতিতে, গুণবৈশিষ্ট্যে ও ফলাফলে সমভাবে চালু রয়েছে। এতে করে সূরার অদৃশ্য ও তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর বিরোধের সাথে দৃশ্যমান ও বস্তুগত বিষয়গুলোর বিরোধে সমন্বয় ঘটবে এবং সামগ্রিক সমন্বয় বিরাজ করবে। এ জন্যে আল্লাহর আরশের ওপর অধিষ্ঠানের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে সূর্য চন্দ্রের বশীভূতকরণকে (প্রথমটি তাত্ত্বিক ও দ্বিতীয়টি বস্তুগত), জরায়ু থেকে সন্তান বের হওয়ার বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে জরায়ুর ভেতরে বিকাশ লাভ করাকে (প্রথমটা দৃশ্যমান ও দ্বিতীয়টা অদৃশ্য), যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে কথা বলে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে গোপনে কথা বলে তার বিপরীতে (একটা দৃশ্যমান ও অপরটা অদৃশ্য), আকাশের বিদ্যুৎ চমকানিতে যে ভয় পায় তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে আশান্বিত হয় তার বিপরীতে, যে রাতের আঁধারে গুপ্তভাবে চলাচল করে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে দিনদুপুরে প্রকাশ্যে চলে তার বিপরীতে, বজ্রের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠকে উল্লেখ করা হয়েছে ফেরেশতাদের ভয়ভীতি সহকারে তাসবীহ পাঠের বিপরীতে, আল্লাহর পক্ষে হকের দাওয়াতকে উল্লেখ করা হয়েছে শরীকদের পক্ষে বাতিলের দাওয়াতের বিপরীতে, উল্লেখ করা হয়েছে জ্ঞানী ব্যক্তিকে অন্ধের বিপরীতে, আহলে কেতাবের মধ্য থেকে যারা কোরআন পেয়ে আনন্দিত তাদের উল্লেখ করা হয়েছে কোরআনের অংশবিশেষ অস্বীকারকারীদের বিপরীতে এবং আল্লাহর কেতাবকে হুবহু মান্য করার বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে তার অংশবিশেষ বিকৃত করাকে। এভাবে দৃশ্যমান জিনিস ও তৎপরতাকে অদৃশ্য তত্ত্বসমূহের বিপরীতে উল্লেখ করার মাধ্যমে বাচনভংগিতে সার্বিক সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

বাচনভংগিতে সমন্বয় সৃষ্টির আরো একটা উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, যেহেতু আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদ, বিদ্যুৎ ও বজ্র, বজ্র ও বৃষ্টি, জীবন ও উদ্ভিদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ বিশেষ, তাই সেই প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে জরায়ুতে প্রচ্ছন্ন প্রাণীসমূহকে এবং তারই সাথে আলোচিত হয়েছে জরায়ু থেকে বহির্গত ও জরায়ুতে বিকাশমান প্রাণী সত্তাকে। আর জরায়ু থেকে সন্তানের বহির্গমন ও তার অভ্যন্তরে সন্তানের বিকাশকে সমন্বিত করা হয়েছে নদ নদী খাল বিলে পানির প্রবাহ ও উদ্ভিদের জন্মের সাথে। নিসন্দেহে এটা কোরআনের অতি চমকপ্রদ বাচনিক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত।

যেসব কারণে আমি সূরা রা'দ ও অনুরূপ কয়েকটি সূরার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভয়ে প্রকম্পিত হই এবং আমার সীমিত মানবীয় বিশ্লেষণ ক্ষমতা দিয়ে তা স্পর্শ করতে শংকিত হই, এ হচ্ছে তার একটা কারণ।

তবে নতুন প্রজন্মের চাহিদা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাখ্যা ও তাফসীরের দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হচ্ছে। কেননা এ প্রজন্ম কোরআনী পরিবেশে জীবন যাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তাই আল্লাহর সাহায্য কামনা করে এই বন্ধুর পথে অগ্রসর হলাম। আল্লাহ যেন আমার সহায় হন।

সূরা আর রা'দ

আয়াত ৪৩ রুকু ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ① اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ② وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ③ وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম-রা। এগুলো হচ্ছে (আল্লাহর) কেতাবের আয়াত এবং যা কিছু তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা (সবই) সত্য, যদিও অধিকাংশ মানুষই এর ওপর ঈমান আনে না। ২. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা) যিনি আসমানসমূহকে কোনোরকম স্তম্ভ ছাড়াই উঁচু করে রেখেছেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং তিনি সুরুজ ও চাঁদকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; (গ্রহ তারকার) সব কিছুই একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে; তিনিই সব কাজের (পরিকল্পনা ও) নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি (তাঁর কুদরতের) সব নিদর্শন (তোমাদের কাছে) খুলে খুলে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা (কেয়ামতের দিন) তোমাদের মালিকের সাথে দেখা করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে পারো। ৩. তিনিই (তোমাদের জন্য) এ যমীন বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী বানিয়ে দিয়েছেন; (সেখানে) আরো রয়েছে রং বেরংয়ের ফল ফুল— তাও তিনি বানিয়েছেন (আবার) জোড়ায় জোড়ায়, তিনি দিনকে রাত (-এর পোশাক) দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; অবশ্যই এসব কিছুর মাঝে তাদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে যারা (সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করে। ৪. যমীনে (আবার) রয়েছে বিভিন্ন অংশ, কোথাও (রয়েছে) আংগুরের

أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي
أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾ وَيَقُولُ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ
قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا

বাগান, (কোথাও আবার) শস্যক্ষেত্র, কোথাও (আছে) খেজুর, তাও (কিছু হয়তো) এক শির বিশিষ্ট (একটার সাথে আরেকটা জড়ানো), আবার (কোনোটি আছে) একাধিক শির বিশিষ্ট, (অথচ এর সব কয়টিতে) একই পানি পান করানো হয়। তা সত্ত্বেও আমি স্বাদে (গন্ধে) এক ফলকে আরেক ফলের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি, (আসলে) এসব কিছুর মধ্যে সে সম্প্রদায়ের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। ৫. (হে নবী,) যদি (কোনো কথার ওপর) তোমার আশ্বর্যান্বিত হতে হয়, তাহলে আশ্চর্য (হবার মতো বিষয়) হচ্ছে তাদের সে কথা (যখন তারা বলে), একবার মাটিতে পরিণত হবার পরও কি আমরা আবার নতুন জীবন লাভ করবো? এরা হচ্ছে সেসব লোক যারা তাদের মালিককে অস্বীকার করে, এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের গলদেশে (কেয়ামতের দিন) লৌহ শৃংখল থাকবে, এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ৬. এরা তোমার কাছে (হেদায়াতের) কল্যাণের আগে (আযাবের) অকল্যাণই ত্বরান্বিত করতে চায়, অথচ এদের আগে (আযাব নাযিলের) বহু দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে; এতে সন্দেহ নেই, তোমার মালিক মানুষের ওপর তাদের (বহুবিধ) যুলুম সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, কিন্তু তোমার মালিক শাস্তিদানের বেলায়ও কঠোর। ৭. যারা (তোমার নবুওত) অস্বীকার করে তারা বলে, তার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (দৃশ্যমান) নিদর্শন কেন নাযিল হয় না? (তুমি তাদের বলো,) তুমি তো হচ্ছো (আযাবের) একজন সতর্ককারী (রসূলমাত্র)! আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই (এমনি) একজন পথপ্রদর্শক আছে।

রুকু ২

৮. প্রতিটি গর্ভবতী নারী (তার ভেতরে) যা কিছু বহন করে চলেছে এবং (তার) জরায়ু (সন্তানের) যা কিছু বাড়ায় কমায়, তার সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন; তাঁর কাছে প্রতিটি

تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ
الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ
بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ
يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ
مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ
الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ
الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ
الْمِحَالِ ﴿١٣﴾ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ

বস্তুরই একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে। ৯. তিনি দেখা অদেখা সব কিছুই জানেন, তিনি মহান, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। ১০. তোমাদের মাঝে কোনো লোক আস্তে কথা বলুক কিংবা জোরে বলুক, কেউ রাতের (অন্ধকারে) আত্মগোপন করে থাকুক কিংবা দিনে (আলোর মাঝে) বিচরণ করুক, এগুলো সবই তাঁর কাছে সমান। ১১. (মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন,) তার জন্যে আগে পেছনে একের পর এক (আসা ফেরেশতার) দল নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তাকে হেফাযত করে; আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে; আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির জন্যে কোনো দুঃসময়ের এরাদা করেন তখন তা রদ করার কেউই থাকে না– না তিনি ব্যতীত ওদের কোনো অভিভাবক থাকতে পারে! ১২. তিনিই তোমাদের বিদ্যুতের (চমক) দেখান, তা (মানুষের মনে যেমন) ভয়ের (সঞ্চার করে), তেমনি বহু আশারও (সঞ্চার করে) এবং তিনিই (পানি) সঞ্চয়িনী মেঘমালা সৃষ্টি করেন। ১৩. আর (মেঘের নিষ্প্রাণ) গর্জন (যেমন) তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, তেমনি (সপ্রাণ) ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি (আকাশ থেকে) বজ্রপাত করান, অতপর যার ওপর চান তার ওপরই তিনি তা পাঠান, অথচ এ (না-ফরমান) ব্যক্তিরা (এতো কিছু সত্ত্বেও) আল্লাহ তায়ালার (অস্তিত্বের) প্রশ্নে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তিনি তাঁর কৌশলে (ও মাহাত্ম্যে) অনেক বড়ো; ১৪. (তাই) তাঁকে ডাকাই হচ্ছে সঠিক (পন্থা); যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে, তারা (জানে, তাদের ডাকে এরা) কখনোই সাড়া দেবে না, (এদের উদাহরণ হচ্ছে)

لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا
دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿১৪﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۩ (সাজদা) ﴿১৫﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ
الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿১৬﴾ أَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ

যেমন একজন মানুষ, (যে পিপাসায় কাতর হয়ে) নিজের উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে এ আশায় যে, পানি (তার মুখে) এসে পৌঁছুবে, অথচ তা (কোনো অবস্থায়ই) তার কাছে পৌঁছুবার নয়, কাফেরদের দোয়া (এমনিভাবে) নিষ্ফল (ঘুরতে থাকে)। ১৫. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তারা সবাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করে চলেছে, (এমনকি) সকাল সন্ধ্যায় তাদের ছায়াগুলোও (তাদের মালিককে সাজদা করছে)। ১৬. (হে নবী, এদের) তুমি জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক কে? তুমি (তাদের) বলো, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, (আরো) বলো, তোমরা কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরকে নিজেদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছো, যারা নিজেদের কোনো লাভ লোকসান করতে সক্ষম নয়; তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, কখনো অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান হয়, কিংবা অন্ধকার ও আলো কি কখনো সমান হয়? অথবা এরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করে নিয়েছে যে, তারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো (কিছু) বানিয়ে দিয়েছে, যার কারণে সৃষ্টির ব্যাপারটি তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে; তুমি তাদের বলো, যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী! ১৭. আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলেন, এরপর (নদী নালা ও তার) উপত্যকাসমূহ তাদের নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হলো, অতপর এ প্লাবন (আবর্জনার) ফেনা বহন করে (ওপরে) নিয়ে এলো; (আবার) যারা অলংকার ও যন্ত্রপাতি বানানোর জন্যে (ধাতুকে) আগুনে উত্তপ্ত করে, (তখনো) কিন্তু তাতে এক ধরনের আবর্জনা ফেনা (হয়ে) ওপরে ওঠে আসে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা

يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

হক ও বাতিলের উদাহরণ দিয়ে থাকেন, অতপর (আবর্জনার) ফেনা এমনিই বিফলে চলে যায় এবং (পানি-) যা মানুষের (প্রচুর) উপকারে আসে তা যমীনেই থেকে যায়; আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের জন্যে) এভাবেই (সুন্দর) দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করে থাকেন; ১৮. যারা তাদের মালিকের এ আহ্বানে সাড়া দেয় তাদের জন্যে মহা কল্যাণ রয়েছে; আর যারা তাঁর জন্যে সাড়া দেয় না (কেয়ামতের দিন তাদের অবস্থা হবে), তাদের পৃথিবীতে যা কিছু (সম্পদ) আছে তা সমস্ত যদি তাদের নিজেদের (অধিকারে) থাকতো, তার সাথে যদি থাকতে আরো সমপরিমাণ (ধন সম্পদ), তাহলেও (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) তারা তা (নির্দ্বিধায়) মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে দিতো; এরাই হবে সেসব (হতভাগ্য) মানুষ যাদের হিসাব হবে (খুব) কঠিন, জাহান্নামই হবে ওদের নিবাস; কতো নিকৃষ্ট সে নিবাস!

তাফসীর

আয়াত ১-১৮

একটা সাদামাটা আকীদাগত বিষয় দিয়ে সূরার সূচনা হচ্ছে। সেটি হলো, ওহীযোগে এ কেতাব প্রেরিত হয়েছে এবং এ কেতাবে সম্পূর্ণ সত্য, খাঁটি ও নির্ভুল বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর একত্ব, আখেরাতে বিশ্বাস এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততা ও সৎকাজ ইত্যাদির ভিত্তি। কেননা কোরআনের মাধ্যমে যিনি মানুষকে আদেশ দেন তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন এবং কোরআন আল্লাহর কাছ থেকেই ওহীযোগে এসেছে এই অকাট্য সত্য থেকেই ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধানের উৎপত্তি।

'আলিফ-লাম-মীম-রা, এগুলো কেতাবের প্রতীক............' অর্থাৎ কোরআনের প্রতীক। অথবা এর অর্থ হলো, এই অক্ষরগুলো প্রমাণ করে, এ কেতাব আল্লাহর কাছ থেকে ওহীযোগে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা এ কেতাব এসব বর্ণমালা দিয়ে রচিত হওয়া থেকে বুঝা যায়, তা আল্লাহর ওহীরই অংশ। কোনো সৃষ্টির রচিত কেতাব নয়।

'আর তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সত্য।'

অর্থাৎ আগাগোড়া অবিমিশ্র সত্য। এর সাথে বাতিলের কোনো সংমিশ্রণ নেই। এতে আদৌ কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। ওই অক্ষরগুলো প্রমাণ করে যে, এ কেতাব সত্য ও শুদ্ধ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাযিল হয় তা সন্দেহাতীতভাবেই সত্য হয়ে থাকে।

'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।' (আয়াত ১)

অর্থাৎ এ কেতাব যে ওহীযোগেই নাযিল হয়েছে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না। আর এই বিশ্বাস বা ঈমান থেকে যে আল্লাহর একত্ব, আল্লাহর একক আনুগত্য, আখেরাত বিশ্বাস ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততা এবং সদাচরণের উৎপত্তি হয়, তাতেও অধিকাংশ মানুষের কোনো আস্থা বা বিশ্বাস জন্মে না।

এই উদ্বোধনী আয়াত সমগ্র সূরার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরে এবং এর সব কটি বিষয়ের দিকে ইংগিত করে। তাই এর পরবর্তী আয়াত থেকে প্রকৃতির সেইসব নিদর্শন ও বিস্ময়সমূহের পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে, যা স্রষ্টার সীমাহীন ক্ষমতা, বিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। এসব নিদর্শন প্রমাণ করে, আল্লাহর এই বিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যেরই স্বতস্ফূর্ত দাবী এই যে, মানুষকে সুপথ প্রদর্শনের জন্যে ওহী আসা প্রয়োজন এবং মানুষের কৃতকর্মের হিসাব ও প্রতিফল দেয়ার জন্যে তার পার্থিব জীবনের পর আরো একটা জীবন প্রয়োজন। আর আল্লাহর ওই সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতার স্বাভাবিক দাবী এই যে, মানুষকে তিনি প্রথম বারে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেইভাবে দ্বিতীয় বারও তাকে এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পুন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন।

আকাশ পৃথিবী ও সৃষ্টি সম্পর্কে কোরআনের তথ্য

পরবর্তী আয়াত থেকে আকাশ, পৃথিবীর বিভিন্ন দৃশ্য ও জীবন যাপনের বিভিন্ন উপকরণের ছবিও তুলে ধরা হয়েছে স্রষ্টার সুনিপুণ তুলির আঁচড়ে। অতপর এতো বড় বড় নিদর্শনাবলীর পরেও কাফেররা কিভাবে পুনরুত্থান অস্বীকার করে, আযাব দ্রুত নিয়ে আসতে বলে এবং নিত্য নতুন অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর বায়না ধরে, তাদের কাজের ওপর কঠোর বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে–

'তিনিই আল্লাহ, যিনি দৃশ্যমান আকাশকে খুঁটি ছাড়াই স্থাপন করেছেন। (আয়াত ২-৭)

'আকাশ' বলতে যা-ই বুঝানো হোক না কেন এবং এই শব্দ দ্বারা যে যুগে যে অর্থ প্রকাশ করা হোক না কেন, এ জিনিসটা চোখের সামনেই দৃশ্যমান। মানুষ যদি তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তাহলে তার কাছে এটা এক মহাবিস্ময় বলে প্রতীয়মান হবে। কেননা তা যথার্থই কোনো খুঁটি বা স্তম্ভ ছাড়ই শূন্যের ওপর ঝুলে আছে।

সৃষ্টি জগতের দুটি স্থানে এভাবে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি জাগিয়ে তোলা হয়েছে। এটা আসলে মানবীয় চেতনায় প্রথম অনুভূতির পরশ। মানুষ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বুঝতে পারে যে, এতো বড় আকাশ কোনো স্তম্ভ ছাড়া শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি স্তম্ভের ওপর তুলে রাখাও একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। মানুষ সবচেয়ে বড় যে জিনিসটাকে স্তম্ভ ছাড়া বা স্তম্ভের সাহায্যে উঁচু করে রাখতে পারে তা হলো কোনো ভূখন্ডের একটা সংকীর্ণ কোণে স্থাপিত সেই ক্ষুদ্র ও হালকা কাঠামো, যার আয়তন ওই কোণের চেয়ে বড় নয়। এরপর লোকেরা ওই কাঠামোটা কতো বড়, কতো মযবুত এবং কতো শক্তিশালী, তা নিয়ে আলোচনা করে। অথচ একেবারেই বিনা স্তম্ভে আকাশের মতো এতো বিশাল কাঠামোটা যেভাবে উঁচু করে রাখা হয়েছে, সেটা যে মানুষের তৈরী ওই ক্ষুদ্র কাঠামোর চেয়ে কতো বড় ও কতো উঁচু, তা তারা ধারণাও করতে পারে না। আর তা এতো মযবুত যে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

এ গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যমান বস্তু আকাশের পরই উল্লেখ করা হচ্ছে দৃষ্টি ও কল্পনার নাগালের বাইরের অদৃশ্য বস্তু আরশের কথা,

'অতপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হলেন।'

বস্তুত আরশ হলো সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতা সীমাহীন কিন্তু কোরআনের নির্ধারিত নিয়মে এই সীমাহীন জিনিসকে সীমাবদ্ধ আকারে পেশ করা হয়েছে, যাতে মানুষ তা অনুধাবন করতে পারে।

এটা কোরআনের অলৌকিক বর্ণনাভংগির আরো একটা নমুনা। প্রথমে আকাশের দৃশ্যমান ও সীমিত উচ্চতা, তারপরে আরশের অকল্পনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর সীমাহীন উচ্চতার পরেই আসছে সূর্য ও চাঁদের বশীভূতকরণের বিষয়টি। মানুষের দৃষ্টির আওতাভুক্ত উচ্চতাকে তার সমস্ত বিরাটত্বসহ মহান আল্লাহর অনুগত ও বশীভূত করা হয়েছে।

এখানে একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই, মহাশূন্যের দৃশ্যমান উচ্চতাকে অজানা অদৃশ্য জগতের এক সীমাহীন উচ্চতার পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্রকে। নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহকে এবং রাত ও দিনকে, যা পরস্পরের বিরোধী বা পরস্পর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ অবধি চলে।'

প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে একটা চিহ্নিত সীমারেখা পর্যন্ত চলে। সূর্য ও চাঁদের এই চলাচল দ্বারা তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে বছরে একবার ও দিনে একবার প্রদক্ষিণ করাও বুঝায়, তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে অন্য কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রদক্ষিণও বুঝায়, যা দৃশ্যমান এই প্রাকৃতিক জগতে কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে।

'কর্মকান্ড পরিচালিত করেন।'

অর্থাৎ মহাবিশ্বের যাবতীয় কর্মকান্ড তিনি এমন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করেন যে, সূর্য ও চন্দ্রকে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করান, বড় বড় জ্যোতিষ্ককে মহাশূন্যে ঝুলন্ত ও কর্মতৎপর রাখেন এবং তারা কোনো অবস্থাতেই সেই মেয়াদ ও নিয়মশৃংখলা লংঘন করে না, এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এক মহাকুশলী পরিচালক।

'আয়াতগুলো তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখো।' অর্থাৎ তাঁর সুষ্ঠু জগত পরিচালনার একটা দিক এই যে, তিনি তার আয়াতগুলো সুবিন্যস্ত ও সুসমন্বিত করেন এবং প্রত্যেকটা আয়াতকে তার জগত পরিচালনার লক্ষ্যেই উপযুক্ত সময়ে বর্ণনা করেন। আশা করা যায়, আয়াতগুলোকে এরূপ সুবিন্যস্ত দেখে তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে দৃঢ় আস্থাশীল থাকবে। এর মধ্যে প্রাকৃতিক জগতের আয়াত তথা নিদর্শনাবলীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো মহান স্রষ্টার সুনিপুণ হাত সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছে, যেগুলোকে কোরআন এমনভাবে চিত্রিত করেছে যে, তা থেকে মহান আল্লাহর নৈপুণ্যই প্রমাণিত হয় এবং যেগুলো দ্বারা বুঝা যায়, মানুষের ইহকালীন জীবনের পর মহান স্রষ্টার কাছে তার ফিরে যাওয়া একান্তই অপরিহার্য অবধারিত, যাতে তিনি তার কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ও প্রতিফল দিতে পারেন। এভাবে প্রথম সৃষ্টির যৌক্তিকতা জানা যায়।

এরপর পরম কুশলী আল্লাহর সুনিপুণ শিল্পী হাত আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে এবং তার প্রথম চিত্রটি অংকন করে এভাবে,

তিনিই সেই আল্লাহ যিনি পৃথিবীকে সুপ্রশস্ত করেছেন, তাতে নদনদী ও পাহাড় পর্বত তৈরী করেছেন ....। (আয়াত ৩)

পৃথিবীর আকৃতি যেমনই হোক না কেন, তাকে যে আল্লাহ লম্বা ও প্রশস্ত করেছেন, এ হলো তাঁর প্রথম শৈল্পিক কর্ম। এরপর তিনি নদনদী ও পাহাড় পর্বতের ছবি এঁকেছেন। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে সুসমন্বিতভাবে অংকিত হয়ে গেছে সুপ্রশস্ত সৃষ্টির সার্বিক রূপরেখা।

এই সব সার্বিক রূপরেখার সাথে সুষমভাবে অবস্থান করছে পৃথিবীর আরো কিছু সৃষ্টি। এগুলোর মধ্যে উদ্ভিদ অন্যতম। আল্লাহ বলেন,

'প্রত্যেক ফলের মধ্যে আল্লাহ জোড়া সৃষ্টি করেছেন।' আর একটা জোড়া রয়েছে দিন ও রাতে। 'রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন।'

এর মধ্যে প্রথম দৃশ্যটায় এমন একটা তথ্য রয়েছে যা মানব জাতি কেবলমাত্র সাম্প্রতিক কালেই জেনেছে। সেই তথ্যটা হলো, উদ্ভিদসহ যাবতীয় প্রাণী নর ও নারীর সমন্বয়ে গঠিত। এমনকি যে সকল উদ্ভিদ সম্পর্কে ধারণা করা হতো যে, তার কোনো পুরুষ লিংগ নেই, তাদের সম্পর্কেও সম্প্রতি জানা গেছে, তারা দুই লিংগেরই সমষ্টি। এ সব উদ্ভিদের পুরুষসুলভ অংগ প্রত্যংগ ও স্ত্রীসুলভ অংগ প্রত্যংগ একটি ফুলে একত্রিতভাবে অথবা তার কান্ডে আলাদা আলাদাভাবে অবস্থান করছে। এই নব আবিষ্কৃত সত্য আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তার উদ্রেক করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যটাও অর্থাৎ রাত ও দিনের পালাক্রমে আগমন এবং একটা কর্তৃক অন্যটাকে আচ্ছন্ন করার চমকপ্রদ ব্যবস্থা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। রাতের আগমন ও দিনের তিরোধান এমন একটা প্রাকৃতিক ঘটনা, যা মানুষের অনুভূতিতে সম্প্রীতির ভাব জাগিয়ে তোলে। এই নৈমিত্তিক ঘটনার সবচেয়ে বিস্ময়কর সুফল এই যে, তা মানুষের মন থেকে বিষাদ ও একঘেঁয়েমি দূর করে দেয়। মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কমন্ডলীর সুশৃংখল ও সুনিপুণভাবে কক্ষপথ প্রদক্ষিণের ব্যবস্থাও প্রকৃতির বিধান নিয়ে বিশ্বজগত পরিচালনাকারী সৃজনশীল শক্তিকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আল্লাহ বলেন, 'এ সবের মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।'

অনুরূপভাবে, আমরা এখানে প্রকৃতির পরস্পর বিরোধী শৈল্পিক দৃশ্যগুলো পর্যালোচনা করবো। পর্বতমালা ও নদনদী, এক ফলের জোড়ার সাথে অন্য ফলের জোড়া, রাত ও দিন এবং পৃথিবী ও আকাশের দৃশ্যের মাঝে যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান, তা তুলে ধরা হয়েছে এখানে। আর এই পরস্পর বিরোধী দৃশ্য দুটি মহাবিশ্বের বিশাল প্রাকৃতিক জগতের পরিপূরক।

পরবর্তী আয়াতে মহান স্রষ্টার সুনিপুণ শৈল্পিক হাত পূর্ববর্তী বড় বড় দৃশ্যাবলীর চেয়ে সূক্ষ্ম দৃশ্যাবলী এঁকেছে। 'আর পৃথিবীতে রয়েছে সন্নিহিত ভূখন্ডসমূহ, আংগুরের বাগান সমূহ ....।' (আয়াত ৪)

'পৃথিবীতে বিদ্যমান এসব দৃশ্য আমরা সচরাচর অনেকেই দেখি, কিন্তু এসব অনেকের মধ্যে তেমন কোনো চিন্তা ভাবনার উদ্রেক করে না বা তত্ত্বানুসন্ধানের আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। শুধু যাদের মন স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছলতা এবং মহাবিশ্বের সাথে সংযোগের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের মধ্যেই চিন্তা ভাবনার উদ্রেক করে। কেননা মানুষ মহাবিশ্বেরই অংশ। মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা ও পুনরায় মহাবিশ্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াই তার শেষ পরিণতি।

'পৃথিবীতে সন্নিহিত ভূখন্ডসমূহ রয়েছে ....।'

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভূখন্ড রয়েছে। পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ বা সমভাবাপন ভূখন্ড হলে ভূখন্ডসমূহ 'একটা ভূখন্ড' হতো। কোনো ভূখন্ড রয়েছে ভালো ও উর্বর, কোনোটা নির্জলা ও শুকনো, কোনোটা অনুর্বর, আবার কোনোটা পাথুরে। এসব ব্যবধান কোথাও শ্রেণীগত, কোথাও মাত্রাগত এবং কোথাও গুণগত। আবার কোনো কোনো ভূখন্ড জনশূন্য, কোনোটা জনাকীর্ণ। কোনো ভূখণ্ড উপেক্ষিত ও ফসলহীন, কোনো ভূখন্ড সজীব শস্য শ্যামল। আবার কোনোটা তৃষ্ণাতুর ও সেচ প্রত্যাশী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত ভূখন্ডই পৃথিবীতে পরস্পরের প্রতিবেশী।

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো। এরপর আরো বিশদ বিবরণ আসছে সৃষ্টি জগতের,

'আংগুরের বাগানসমূহ, ফসলের ক্ষেত ও খেজুরের বাগানসমূহ, এখানে তিন ধরনের উদ্ভিদের বিবরণ দেয়া হলো, আংগুর, খেজুর ও তরিতরকারি ইত্যাদি। এ দ্বারা আসলে রকমারি উদ্ভিদ বুঝানো হচ্ছে।

খেজুরের বাগানও দু'রকমের। একক কান্ডবিশিষ্ট ও দুই বা ততোধিক কান্ডবিশিষ্ট খেজুরের গাছ। এ সবই একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে থাকে এবং একই মাটিতে জন্মে। অথচ বিভিন্ন স্বাদের।

'এর কোনোটা অপরটার চেয়ে ভালো স্বাদসম্পন্ন।'

বিচক্ষণ স্রষ্টা, সর্বময় ইচ্ছা ও ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কে এত সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ সৃজনের কাজে সক্ষম?

একই ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের রকমারি স্বাদ উপভোগ করেনি এমন আমাদের মধ্যে কে আছে? কোরআন আমাদের মনমগযকে এদিকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন এদিকে মনোযোগ দিয়েছে? এ দ্বারা কোরআন চির নতুন থেকে যায়। কেননা সে মহাবিশ্বে ও মানব সত্ত্বায় বিরাজমান দৃশ্যাবলী দ্বারা মানুষকে নিত্যনতুন অনুভূতির স্বাদ গ্রহণ করাচ্ছে। মানুষ তার সীমিত আয়ুষ্কালে এসব দৃশ্যের সংখ্যা গুনে শেষ করতে পারবে না। এগুলো অফুরন্ত অগণিত।

'এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

এ পর্যায়ে এসে তৃতীয় বারের মতো আমরা থমকে দাঁড়াই এবং পর্যবেক্ষণ করি সন্নিহিত বিচিত্র রকমের ভূখন্ডসমূহ, রকমারি স্বাদ ও আকৃতির খেজুর গাছসমূহ এবং রকমারি ফল ফসল, আংগুর ও খেজুরের মধ্যকার বৈচিত্র্য।

পরবর্তী আয়াত এই বিশাল বিশ্বের দিগ দিগন্তে বিচিত্র সফর সম্পন্ন করে বিস্ময় প্রকাশ করছে সেসব মানুষের প্রতি, যাদের মন মহাবিশ্বের এতো সব নিদর্শন দেখেও ওঠে না। যাদের বিবেক উচ্চকিত হয় না এবং এর পশ্চাতে কোনো বিজ্ঞ স্রষ্টার তৎপরতা তাদের চোখে পড়ে না। যেন তাদের বিবেক ও মন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। তাই ওই সমস্ত নিদর্শনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে তা অগ্রসর হয় না। আল্লাহ তায়ালা সূরার ৫ নং আয়াতে বলেন,

তুমি যদি অবাক হয়ে থাকো, তবে তাদের এই কথাটাই অধিকতর বিস্ময়কর যে, ...' (আয়াত ৫-৬)

বস্তুত এমন মহাবিস্ময়কর জগত সৃষ্টির পর এ কথা জিজ্ঞেস করা খুবই আশ্চর্যজনক যে, 'আমরা মাটি হয়ে যাওয়ার পর আবার আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে নাকি?'

যিনি এই বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এমন নিখুঁতভাবে পরিচালনা করছেন, তিনি মানুষকে নতুন করে সৃষ্টি করতেও সম্পূর্ণ সক্ষম। যারা একে অসম্ভব মনে করে তারা আল্লাহর

সাথে কুফরী করে এবং এটা তাদের মন ও বিবেকের ওপর পরাধীনতার শৃংখল হয়ে চেপে রয়েছে। বস্তুত তাদের কুফরীর শাস্তিই হলো এই শেকল পরা। আর এভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে বিবেকের শেকল ও ঘাড়ের শেকলের মধ্যে। এর পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কেননা মানুষের যে সব উপাদানের জন্যে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করে থাকেন, সেগুলোকে সে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। দুনিয়ায় তারা অধোপতনকে বেছে নিয়েছে। তাই আখেরাতে তারা দুনিয়ার জীবনের চেয়েও নিকৃষ্ট জীবন লাভ করার মাধ্যমে তার প্রতিফল ভোগ করবে। কেননা তারা নিজেদের চিন্তা চেতনা ও অনুভূতিকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে নিকৃষ্ট জীবনকেই বেছে নিয়েছিলো।

এসব লোক আখেরাতে তাদের পুনরুজ্জীবনে বিস্ময় প্রকাশ করে। তাদের এ বিস্ময়ই একটা বিস্ময়! ওরা তোমাকে তাড়াতাড়ি আযাব আনতে বলে। অথচ তাদের উচিত ছিলো আল্লাহর রহমত ও হেদায়াত চাওয়া।

ওরা তোমার কাছে ভালো না চেয়ে মন্দ চায়।'

বিশ্ব প্রকৃতিতে তথা আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর যে নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সে গুলোর দিকে যেমন তাদের দৃষ্টি নেই, তেমনি অতীতের যে জাতিগুলো আল্লাহর আযাব চেয়েছিলো এবং তা পেয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, তাদের কথাও তারা স্মরণ করে না। তাই তা থেকে তারা কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

'অথচ তাদের পূর্বে অনেক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত অতিবাহিত হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ তারা তাদের পূর্ববর্তী মানুষের পরিণতিরও খবর রাখে না, যা খুবই শিক্ষাপ্রদ ছিলো।

'তোমার প্রভু অপরাধী মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।'

কেননা তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তাই তিনি তাদের জন্যে ক্ষমার দরজা খুলে রাখেন, যাতে তারা তাওবার মাধ্যমে প্রবেশ করে। তবে যারা গুনাহর কাজ করেই যেতে থাকবে এবং তাওবার দরজায় প্রবেশ করবে না, তাদের জন্যে তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও।

'আর তোমার প্রভু কঠোর শাস্তিদাতা।'

এখানে আয়াতে আল্লাহর ক্ষমাকে শাস্তির আগে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই নির্বোধরা যে হেদায়াতের আগে শাস্তি চায় তার বিপরীতে এর উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় আল্লাহ তাদের কতো কল্যাণ চান, আর তারা নিজেদের জন্যে কতো অকল্যাণ চায় এবং উভয়ের মধ্যে কতো পার্থক্য! আর এর মাধ্যমে চেনা যায় তাদের বুদ্ধির বিকৃতি, হৃদয়ের অন্ধত্ব এবং নৈতিক অধোপতন, যা মানুষকে জাহান্নামের যোগ্য করে তোলে।

অতপর কাফেরদের কার্যকলাপে আরো বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। যারা বিশ্ব প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শন বুঝতে না পেরে আরো একটা নিদর্শন চায়, তাদের ওপর আল্লাহ বিস্ময় প্রকাশ করেন। চারদিকে এতো নিদর্শনের ছড়াছড়ি, অথচ তাদের আরো একটা নিদর্শন চাই!

'তারা বলে, রসূলের ওপর একটা নিদর্শন নাযিল হোক .... ' আসলে তারা অলৌকিক ঘটনা চায়। অথচ অলৌকিক ঘটনাবলী রসূলের কাজ নয় এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যও নয়। আল্লাহ যখন জরুরী মনে করেন কেবল তখনই তা তার রসূলের কাছে পাঠান। 'তুমি তো কেবল সতর্ককারী।'

অর্থাৎ তোমার ক্ষমতা তোমার পূর্ববর্তী নবীদেরই মতো। আল্লাহ তাঁর রসূলদের পাঠান জনগণের হেদায়াতের জন্যে। 'প্রত্যেক জাতিরই একজন পথপ্রদর্শক থাকে।'

আর অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটানোটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন :

প্রকাশ্য গোপন সবই আল্লাহ জানেন

এখানে এসে সমাপ্ত হলো প্রকৃতির রাজ্যের নিদর্শনাবলীর বিবরণ ও তা নিয়ে মন্তব্য। এরপর মানুষের মন, ভাবাবেগ ও প্রাণীদের নিয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে।

'আল্লাহ জানেন, প্রত্যেক নারী তার গর্ভে কী ধারণ করে' .... (আয়াত ৮-১১)

আলোচ্য আয়াতগুলোর ভাষা ও বক্তব্য এতো শাণিত যে, মানুষের চেতনাকে হতবুদ্ধি ও দিশেহারা করে দেয়।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে যে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ছবি আঁকা হয়েছে, যে মোহনীয় সুর ও ছন্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী রয়েছে, আল্লাহর সীমাহীন অদৃশ্য জ্ঞানের যে বিবরণ রয়েছে, তা লক্ষ্য করার মতো, মাতৃগর্ভের সন্তান, অন্তরে লুকানো গুপ্ত তথ্য, রাতের অন্ধকারে পরিচালিত তৎপরতা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে চলাচলকারী প্রতিটি প্রাণী সম্পর্কে তাঁর নির্ভুল জ্ঞানের যে বর্ণনা রয়েছে, তার সবই মানুষের অনুভূতিকে স্থবির ও অসাড় করে দেয়। দুনিয়ার যাবতীয় গুপ্ত তথ্য আল্লাহর তীব্র জ্ঞানের রশ্মিতে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় এবং আল্লাহর নিযুক্ত প্রহরীরা তার মনের প্রতিটি ইচ্ছা ও কল্পনাকে পর্যন্ত সংরক্ষণ করে। বস্তুত এই অনুভূতি মানুষকে আতংকিত করে আল্লাহরই কাছে আশ্রয় নিতে ও তাঁরই কাছে নিরাপত্তা চাইতে বাধ্য করে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই জানে যে, আল্লাহর এই সার্বিক জ্ঞানের উল্লেখ মানুষের অনুভূতিতে যতোটুকু প্রভাব বিস্তার করে, পৃথক পৃথকভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত এক একটি জিনিস সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানের উল্লেখ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে, যেমন আলোচ্য আয়াতগুলোতে কয়েকটা সুনির্দিষ্ট জিনিসের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নের আয়াতটি লক্ষ্য করুন এবং ভাবুন, এ ক্ষেত্রে মৌলিক তত্ত্ব অপেক্ষা সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব কতোখানি জোরদার প্রভাব বিস্তার করে!

'প্রত্যেক গর্ভবতী স্বীয় গর্ভে যা ধারণ করে, জরায়ু যা সংকুচিত ও বিকশিত করে, তা আল্লাহ জানেন। সব জিনিসই তাঁর কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে।' (আয়াত-৮)

শহরে, গ্রামে, পাহাড়ে পর্বতে, জংগলে লোকালয়ে, যেখানে যত গর্ভবতী নারীর (যে কোনো প্রাণীভুক্ত) অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়, তাদের সকলের গর্ভস্থ সন্তান ও তার হালহাকীকত এবং গর্ভে সংকুচিত কিংবা বর্ধিত ও বিকশিত রক্তের প্রতিটি ফোঁটা সম্পর্কে আল্লাহ সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জ্ঞান রাখেন।

অনুরূপভাবে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও যে ব্যক্তি গোপনে কথা বলে .... তারা সবাই সমান'। (আয়াত নং ১০) এ আয়াতেও মৌলিক তত্ত্ব অপেক্ষা সুনির্দিষ্ট তথ্য কতো বেশী প্রভাব বিস্তার করে ভেবে দেখুন। এখানে শুধু আল্লাহ সকল অদৃশ্য তথ্য জানেন– এই মৌলিক সত্য না বলে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, এই বিশাল বিশ্ব প্রকৃতিতে দিনে বা রাতে গোপনে কথা বলে বা প্রকাশ্যে কথা বলে, গোপনে চলাচল করে বা প্রকাশ্যে চলাচল করে, এমন প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ সমভাবে ওয়াকিফহাল।

এ বিস্ময়কর সৃষ্টি জগতের বিশাল প্রান্তরে প্রথমোক্ত তথ্যগুলোর প্রভাব হৃদয়ের গভীরে, অদৃশ্য জগতে ও অজানা রহস্যের ক্ষেত্রে শেষোক্ত তথ্যগুলোর প্রভাব অপেক্ষা অধিক প্রগাঢ়, শাণিত ও জোরদার নয়; বরং তুলনা করলে দেখা যাবে উভয়টিই সমান প্রভাব ও কার্যকারিতার অধিকারী।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে কিছু কিছু চমকপ্রদ চিত্র ও অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেছে, যা আমি এখানে আলোচনা করতে চাই।

প্রথমে ৮ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন। গর্ভে লুকিয়ে থাকা বস্তুর সংকোচন ও বৃদ্ধি সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানের বিবরণ দেয়ার পর মন্তব্য করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে। পরিমাণ শব্দটার সাথে সংকোচন ও বৃদ্ধি শব্দ দুটোর সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। আর এই পুরো ব্যাপার বিষয়গতভাবে পুনসৃষ্টি তথা আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন তা আকৃতিগতভাবে নদনদীতে 'পরিমিত' পানির প্রবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ব্যাপারটা পরবর্তী একটা আয়াতে আসছে। অনুরূপভাবে সমগ্র সূরায় যে তুলনামূলক ও পরস্পর বিরোধিতামূলক বিষয়ের প্রাধান্য রয়েছে, সংকোচন ও বৃদ্ধিতেও তা বিদ্যমান।

'দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, বড় ও মহান।'

এখানে 'কবীর' (বড়) ও 'মুতাআ'ল' (মহান) এই শব্দ দু'টো পাঠকের অনুভূতিতে সুস্পষ্ট ছাপ ফেলে, কিন্তু সেই ছাপ অন্য কোনো শব্দ দিয়ে চিত্রিত করা খুবই কঠিন। বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টি প্রতিটি বস্তু বা প্রাণীর কিছু না কিছু খুঁত আছে, যা তাকে ছোট ও অসম্পূর্ণ বানিয়ে দেয়। তাই আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে, জগতের কোনো বিষয়কে বা কাজকে যথার্থ কবীর বা 'বড়' বলা চলে না। শুধু আল্লাহর উল্লেখ দ্বারাই যে এর অর্থ খানিকটা কমে যাবে তা নয়। 'মুতাআল' (মহান) শব্দটাও তদ্রূপ। বস্তুত এই দু'টো শব্দের ব্যাখ্যায় আমি তেমন কিছু বলতে পারলাম না। অন্যান্য মোফাসসেররাও বলতে পারেননি।

'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি গোপনে বা প্রকাশ্যে কথা বলে .... সবাই সমান।' (আয়াত ১০)

এ আয়াতেও বৈপরীত্য স্পষ্ট। সারেব (চলাচলকারী) শব্দটা নিয়ে আমরা একটু চিন্তাভাবনা না করে পরি না। এর ভাবার্থটা এর শাব্দিক অর্থের অনেকটা বিপরীত। এর ভাবার্থ হলো গোপনীয়তা বা গোপনীয়তার কাছাকাছি। 'সারেব' শব্দের অর্থ গমনকারী হলেও এর ভেতরে যে বিশেষ ধরনের গতি রয়েছে, গোপনীয়তার বিপরীতেও সেটাই প্রতিপাদ্য। শব্দে বিদ্যমান সুরের পেলবতা ও তার ছাপই এখানে প্রতিপাদ্য, যাতে আয়াতের মূল বক্তব্য ম্লান হয়ে না যায়। সেই মূল বক্তব্য হলো, গোপন, সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন গর্ভ সংক্রান্ত আল্লাহর জ্ঞান, গোপন রহস্য, রাতের অন্ধকারে লুকানো ব্যক্তি ও দৃষ্টির অন্তরালের লেখক ফেরেশতারা সংক্রান্ত। তাই এমন শব্দ চয়ন করা হয়েছে যা গোপনে চলাচলকারীর বিপরীত অর্থ বুঝায়, তবে মৃদুভাবে, সূক্ষ্মভাবে এবং প্রায় গোপনীয়ভাবে।

'তার কিছু লেখক রয়েছে ....।' (আয়াত-১১)

যে সমস্ত রক্ষক ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি তৎপরতা লেখার কাজে ব্যস্ত রয়েছে, যা আল্লাহর হুকুমেই সংঘটিত হয়ে থাকে, এখানে আয়াতে তাদের যে সর্বোচ্চ গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে তা এই যে, তারা আল্লাহর আজ্ঞাবহ এবং আল্লাহর হুকুমে চলে। সুতরাং আমরাও তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবো না যে, তারা কারা কেমন, কিভাবে প্রহরার কাজ করে ও কোথায় থাকে। গোপনীয়তা, ভীতি ও প্রহরার যে পরিবেশ প্রেক্ষাপট এখানে আয়াতে রয়েছে, তা নষ্ট করবো না। কেননা সেটাই এখানে কাংখিত এবং তারই উল্লেখ এখানে রয়েছে পরিকল্পিতভাবে। আলোচনার পরিবেশ সম্পর্কে যে ওয়াকিফহাল, সে এই রহস্যঘেরা পরিবেশ প্রকাশ করে বিকৃত করতে ভয় পায়।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ তারা স্বয়ং নিজের অবস্থা পরিবর্তন না করে।'

অর্থাৎ মানুষ নিজেদের মধ্যে কেমন পরিবর্তন ঘটায় তা দেখার জন্যে আল্লাহ তাঁর আজ্ঞাবহ প্রহরীদের নিয়োজিত করেন। অতপর সেই অনুপাতে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেন।

মানুষ নিজেদের কাজ, চরিত্র, সামাজিক অবস্থা ও চিন্তাধারা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার সমৃদ্ধি কিংবা দুরবস্থা, সম্মান কিংবা লাঞ্ছনা এবং মহত্ত্ব কিংবা হীনতা দূর করেন না। তাদের চিন্তা ও কর্মের পরিবর্তন অনুপাতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন, যদিও আল্লাহ তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানেন। তাদের নিজেদের মধ্যে আনীত পরিবর্তন অনুসারেই পরবর্তী সময়ে তিনি তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান।

এটা এমন একটা সত্য, যা মানুষের ওপর কঠিন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে। এটাই আল্লাহর রীতি এবং এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। মানুষের ওপর আল্লাহর কী ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে সেটা মানুষেরই তৎপরতার ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার আচরণ দ্বারা কিভাবে আল্লাহর রীতি ও ইচ্ছা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে তার আলোকেই তার ওপর আল্লাহর রীতি কার্যকর হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন। আল্লাহর এ বাণী শুধু মানুষের দায় দায়িত্বই নিরূপণ করে না, বরং সেই সাথে আল্লাহর এই সৃষ্টির প্রাপ্য সম্মানও নির্ধারণ করে। সে নিজের তৎপরতা দ্বারাই নিজের ওপর আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের হাতিয়ারে পরিণত হোক এটাই আল্লাহর কাম্য।

আয়াতের প্রথমাংশে মূলনীতি বর্ণনা করার পর শেষাংশে বর্ণনা করা হচ্ছে কিভাবে আল্লাহ মানব সমাজের অধপতন ঘটান। কেননা আয়াতের বক্তব্য অনুসারে তারা নিজেরাই প্রথমে নিজেদেরকে অধোপতনের দিকে নিয়ে যায় ও তার যোগ্য বানায়। অতপর আল্লাহ তাদের অধোপতন ঘটানোর ইচ্ছা করেন ও সিদ্ধান্ত নেন। আল্লাহ বলেন,

'আর যখন আল্লাহ কোনো জাতির পতন ঘটাতে চান তখন তা রোধ করার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহ ছাড়া মানুষের আর কোনো অভিভাবক নেই।' (আয়াত-১১)

আয়াতে এখানে শুধু অবনতির দিকটা তুলে ধরা হয়েছে। উন্নয়নের দিকটা বাদ দেয়া হয়েছে। কেননা এ আলোচনা তাদের প্রসংগেই এসেছে, যারা উন্নয়নের আগে অবনতি কামনা করে ও তার জন্যে তাড়াহুড়া করে। ইতিপূর্বে তাদের জানানো হয়েছে, আল্লাহ আযাব দেয়ার চেয়ে ক্ষমা করা অগ্রগণ্য মনে করেন। তাদের উদাসীনতা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলেছেন। এখানে তিনি শুধু খারাপ পরিণতিটা তুলে ধরছেন মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে। তিনি বলছেন যে, তারা যখন নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আমার আযাবের যোগ্য হয়ে যাবে, তখন তা থেকে তাদের কেউ ঠেকাতে পারবে না। তাদের রক্ষা করার মতো কোনো অভিভাবকও থাকবে না।

আল্লাহর সৃষ্টি ক্ষমতার বর্ণনা

এরপর ১২ নং আয়াত থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, মনের আবেগ, তার প্রতি সমন্বিত প্রতিক্রিয়া, ভীতি, মিনতি, চেষ্টা সাধনা, অন্তরের সচেতনতা ও সতর্কতার বর্ণনা!

'তিনিই, সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের বিজলী দেখান ভীতি ও আশা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে .... (আয়াত ১২-১৬)

মেঘ, মেঘের গর্জন, বিজলী– এ সবই সুপরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য। মাঝে মাঝে যে এর সাথে বজ্রপাত হয় তাও সর্বজনবিদিত। এ জিনিসগুলো মানুষের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যারা এ সব জিনিসের প্রকৃতি জানে তাদের মনেও এবং যারা আল্লাহ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না তাদের মনেও।

আয়াতে এসব ক'টা জিনিসকে একত্রিত করা হয়েছে। তদুপরি সংযোজন হয়েছে ফেরেশতা, ছায়া, তাসবীহ, সাজদা, ভীতি, আশা, সঠিক অব্যর্থ দোয়া ও অগ্রহণযোগ্য দোয়া। এর সাথে

আরো একটা অবস্থা দেখানো হয়েছে, সেটা হলো, সেই ব্যক্তির, যে কাকুতি মিনতি করে দু'হাত বাড়িয়ে মুখ হাঁ করে পানি চায়, যাতে এক কাতরা পানি হলেও পান করতে পারে।

এ সব জিনিস আয়াতে নেহায়াত কাকতালীয়ভাবে একত্রিত হয় না। এগুলো একত্রিত হয় শুধু এ জন্যে যেন দৃশ্যের ওপর তার ছাপ পড়ে, ভীতি, আশা, বিনয় আকুতিপূর্ণ পরিবেশে এগুলো সমবেত হয়, আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লাভ এবং ক্ষতির একমাত্র ক্ষমতা শেরেকের সর্বাত্মক প্রত্যাখ্যান শেরেকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কীকরণ যেন এখানে প্রতিফলিত হয়।

'তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের বিজলী দেখান তোমাদের মধ্যে ভয় ও আশা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।'

অর্থাৎ তিনিই তোমাদের এই প্রাকৃতিক উপাদানটা দেখান। আল্লাহর সৃজিত মহাবিশ্বের স্বভাব প্রকৃতি ও রীতিনীতির আওতায়ই এটা বিশেষ পন্থায় তৈরী হয়েছে। আল্লাহ একে বিশেষ চরিত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এই বিশ্ব প্রকৃতিরই অংশ বিজলী, যা তিনি তোমাদের তাঁর প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে দেখান। তাই এটা দেখে তোমরা ভয় পাও। কেননা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই স্নায়ুমন্ডলীকে কাঁপিয়ে তোলে। তা ছাড়া এটা কখনো বজ্রের রূপ ধারণ করে, আবার কখনো তা হয়ে ওঠে সর্বনাশা বন্যার প্রতীক। অভিজ্ঞতা থেকেই তোমরা এটা শিখে থাকো। কখনো আবার তোমরা একে কেন্দ্র করে আশান্বিত হয়ে ওঠ এর পেছনে কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করে। কেননা এরপর অনেক সময় মুষলধারে বৃষ্টি হয়, যা নির্জীব মাঠকে সজীব করে এবং নদ নদীতে পানি আনে।

'এবং ভারী ভারী মেঘমালা তৈরী করেন।'

'সাহাব' জাতিবাচক নাম। এর বহুবচন 'সাহাবাতুন'। বস্তুত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি ও বিন্যাসে আল্লাহ যে নিয়ম কানুন অনুসরণ করেন সেই নিয়ম কানুন অনুসারেই মেঘমালা তৈরী ও বৃষ্টি হয়। আল্লাহ যদি সৃষ্টিজগতকে এভাবে সৃষ্টি না করতেন তাহলে মেঘও তৈরী হতো না এবং বৃষ্টিও হতো না। কিভাবে মেঘ তৈরী হয় এবং কিভাবে বৃষ্টি হয়, সেটা জানতে পারলেই এই প্রাকৃতিক উপাদানটার গুরুত্ব, ভয়াবহতা ও তাৎপর্য হ্রাস পায় না। এটা একটা সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই প্রক্রিয়াটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টি করেনি। যে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বিধি এই প্রাকৃতিক উপাদানকে পরিচালিত করে তার প্রয়োগে আল্লাহর কোনো বান্দার কোনো অবদান নেই। এটা শুধু আল্লাহর একক কৃতিত্ব। অনুরূপভাবে এ সৃষ্টিজগতে কেউ নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেনি এবং তার প্রাকৃতিক বিধানও সে রচনা করেনি।

রা'দ বা মেঘের গর্জন হলো বৃষ্টি বিজলী ইত্যাদির তৃতীয় উপাদান। রা'দ বা মেঘের গর্জন কেমন কানফাটা শব্দ তা আমরা সবাই জানি। এটা আল্লাহর সৃজিত প্রাকৃতিক বিধানের অন্যতম অংগ। তা তার প্রকৃতি ও কার্যকারণ যাই হোক না কেন। এটা হলো, বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর কর্মতৎপরতার প্রতিধ্বনি। যে মহাশক্তি গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা ও গুণগান। যে কোনো সুন্দর ও নিখুঁত সৃষ্টিই তার ধারণকৃত সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে তার স্রষ্টার প্রশংসা করে থাকে। এ কথাও বলা যায়, 'ইউসাব্বেহু' (গুণগান করে) শব্দটার শাব্দিক অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মেঘমালা সত্যিই সত্যিই আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে। মানুষ যখন বিশ্ব রহস্যের অতি সামান্যই জানে, এমনকি তার নিজের রহস্যও খুব কম জানে, তখন স্বয়ং আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির অজানা রহস্য সম্পর্কে আমাদের যা কিছু অবহিত করেন তা আমাদের সর্বান্তকরণে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কোরআনের অন্যান্য স্থানে যে শৈল্পিক বর্ণনাভংগি অনুসরণ করা হয়েছে, তদনুসারেই এখানে মেঘমালার গর্জনকে আল্লাহর গুণগান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানকার দৃশ্যটা একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণীসুলভ দৃশ্য। এতে আল্লাহর ভয়ে তাসবীহ জপনারত ফেরেশতারাও রয়েছেন। তবে আল্লাহর আহ্বান এবং শরীকদের আহ্বানও রয়েছে। এতে পানির দিকেও হাঁ করে পানিকে আহ্বানের দৃশ্যও রয়েছে। এহেন এবাদাতময় ও কর্মময় দৃশ্যে মেঘের গর্জন একটা জীবিত প্রাণীর আকারে স্বীয় শব্দ দ্বারা দোয়া ও তাসবীহে অংশ গ্রহণ করে।

এরপর মেঘ, মেঘের গর্জন ও বিজলীর উল্লেখ সম্পর্কিত ভীতিময় পরিবেশ পূর্ণতা লাভ করে বজ্রের উল্লেখ দ্বারা, যা আল্লাহ যাকে চান তাকেই আঘাত করে। বজ্র হচ্ছে এমন একটা প্রাকৃতিক জিনিস, যা বিশ্ব প্রকৃতিকে বর্তমান আকারে বিন্যস্ত করার ফলে জন্ম লাভ করেছে। এই বজ্র দিয়ে আল্লাহ মাঝে মাঝে সেসব লোককে আঘাত করেন, যারা নিজেদের চরিত্র বিনষ্ট করে, ফলে আল্লাহ স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের আর সময় দেয়া যায় না। সময় দেয়াতে কোনো কল্যাণ নেই। তাই তারা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মেঘের গর্জন, বিজলী ও বজ্রের সমাবেশে তৈরী এই ভয়াল পরিবেশেও যখন মেঘমালা ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে তাসবীহ পাঠ করে, ঝড়ঝঞ্ঝাও আল্লাহর গযবের প্রতীক হয়ে নামে, তখনও এক শ্রেণীর মানুষ মহান আল্লাহর সীমাহীন শক্তি এবং পরাক্রম নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহকে নিয়ে বিতর্ক করে। অথচ তিনি মহা প্রতাপশালী।' (আয়াত-১৩)

বস্তুত মহান আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রম সম্পর্কে যখন মেঘ, বজ্র, ফেরেশতা ইত্যাদি সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি সোচ্চার থাকে, তখন আল্লাহকে নিয়ে যারা বিতর্ক বিরোধে লিপ্ত হয়, তাদের দুর্বল শব্দ এই পরিবেশে স্বভাবতই বিলীন হয়ে যায়।

যারা আল্লাহকে নিয়ে বিতর্ক করে ও শরীকদের ডাকে, তাদের ডাক ভুয়া ও বাতিল। একমাত্র আল্লাহর ডাকই সত্য ও সঠিক। আল্লাহর আহ্বান ছাড়া আর যতো আহ্বান আছে, তা কেবল দুঃখ দুর্দশাই বাড়ায়। আল্লাহ তাই বলেন,

'তারই রয়েছে সত্য ও সঠিক আহ্বান ....।' (আয়াত-১৪)

এখানে যে দৃশ্যটা দেখানো হয়েছে, তা সবল, সরব, সোচ্চার, সক্রিয় ও আবেগময়। এখানে বলা হয়েছে যে, হকের দাওয়াত একটাই, সে দাওয়াতই গ্রহণযোগ্য। সেটা হলো আল্লাহর দাওয়াত, আল্লাহর দিকে মনোযোগ, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, তাঁরই সাহায্য, করুণা ও হেদায়াত কামনা। এ ছাড়া বাদবাকী সব দাওয়াতই ব্যর্থ, বাতিল ও ভুয়া, দেখতে পাচ্ছো না, আল্লাহ ছাড়া অন্যদের যারা ডাকে তাদের অবস্থা? তাদের অবস্থা তো সেই ব্যক্তির মতো, যে দুদর্শাগ্রস্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে হাঁ করে পানিকে ডাকে যেন পানি এসে তার মুখে ঢুকে যায়। অথচ পানি আসতে অক্ষম। ঠিক তদ্রূপ যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকে, তাদের ডাকাডাকি বৃথা হতে বাধ্য।

'কাফেরদের আহ্বান ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়েই পারে না।'

কী পরিবেশে এক ফোঁটা পানিও এই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পায় না, তাও লক্ষণীয়। সেটা হচ্ছে পানিভর্তি মেঘমালা ও বজ্র নিনাদের পরিবেশ, যা স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হয়।

একদিকে যখন এসব বিফল মনোরথ মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের খোদা হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের কাছে বিভিন্ন রকমের প্রার্থনা ও আশা পোষণ করে, তখন সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর

কাছে নতিস্বীকার করে, তার হুকুম পালন করে, তার নিয়ম নীতির আনুগত্য করে ও তার ইচ্ছা বাবস্তবায়িত করে। যারা ঈমানদার তারা করে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে, আর যারা ঈমানদার নয় তারা করে বাধ্য হয়ে। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে এবং আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে কখনো কেউ যেতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা আল্লাহর জন্যেই সাজদা করে' .... (আয়াত-১৫)

যেহেতু পটভূমিকা দোয়া ও এবাদাতের, তাই এ আয়াতে সাজদা শব্দটা দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছার আনুগত্য বুঝানো হয়েছে, যা দাসত্বের সর্বোচ্চ প্রতীক। এরপর আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু এবং প্রাণীর ছায়াকেও সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ছায়া তা যা সকালে ও বিকালে ঢলে পড়ে। ছায়াগুলোকে যদিও বস্তু ও প্রাণীর আওতাধীন সাজদাকারী বলা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা স্বতন্ত্রভাবেও সাজদাকারী তথা আল্লাহর হুকুমের অনুগত। অন্য কথায় বলা যায়, মহাবিশ্বের প্রত্যেক প্রাণী ও বস্তু দ্বিগুণ সাজদা এবং আনুগত্য করে। নিজেও করে, আবার তার ছায়াও করে। ছায়া তো বস্তু ও প্রাণীরই অধীন, কিন্তু ব্যর্থকাম মানুষ তথা অবাধ্য ও কাফেররা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের এবাদাত আনুগত্য করে।

এই বিস্ময়কর পরিবেশ ও পটভূমিতে তাদের কাছে বিভিন্ন বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন করা হয়েছে ১৬ নং আয়াতে।

বলা হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান সকল সৃষ্টি যখন ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছার অটুট শৃংখলে আবদ্ধ, তখন তাদের জিজ্ঞেস কর, আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু কে? এ প্রশ্নের জবাব আশা করা হচ্ছে না। কেননা আয়াত নিজেই এর জবাব দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে শুধু এই যে, তারা যখন স্বচক্ষেই দেখেছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু কে, তখন এই জবাবটা উচ্চারিত সত্য হিসাবে নিজ কানে শ্রবণও করুক। 'তুমি বলো, আল্লাহ।' পুনরায় জিজ্ঞেস কর, তবুও কি তোমরা তাকে বাদ দিয়ে এমন সব অভিভাবক গ্রহণ করছো, যার লাভ ক্ষতি কোনোটাই করার ক্ষমতা নেই? প্রশ্নটা আসলে অসন্তোষ প্রকাশের জন্যে করতে বলা হয়েছে। কেননা তারা কার্যতই আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে মনিবরূপে গ্রহণ করেছে। সুতরাং বিবাদটা পরিষ্কার। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যটা সুস্পষ্ট। তবুও জিজ্ঞেস করতে বলা হচ্ছে। হক ও বাতিলের পার্থক্য অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের পার্থক্যের মতো এবং আলো ও অন্ধকারের পার্থক্যের মতো। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান শব্দ দু'টো যথাক্রমে কাফের ও মোমেনের প্রতীকী শব্দ। তাদের অন্ধত্বই তাদের সেই দিব্য সত্য দেখতে দেয় না, যা আকাশ ও পৃথিবীর সবাই অনুভব করে। আলো ও অন্ধকার শব্দ দু'টো দ্বারা মোমেন ও কাফেরদের অবস্থার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। অন্ধকারে যেমন পথঘাট ও জিনিসপত্র দেখা যায় না, তেমনি কুফরীর অন্ধকারেও সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

পুনরায় জিজ্ঞেস করতে বলা হচ্ছে, তাদের মনগড়া প্রভুরা কি আল্লাহর সৃষ্টির মত কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছে যে, ওদের চোখে আল্লাহর সৃষ্টি ও ওদের সৃষ্টি একাকার হয়ে গেছে? ফলে তারা কি চিনতে পারছে না কোন্‌টা আল্লাহর এবং কোনটা ওদের মনগড়া প্রভুদের সৃষ্টি, সে রকম হলে তো তাদের অন্যান্য প্রভু মানা ক্ষমার যোগ্য। কেননা তা হলে বুঝা যাবে, আল্লাহর সৃজন ক্ষমতাটা ওদের মধ্যেও খানিকটা রয়েছে। এটা যার মধ্যে থাকে সে এবাদাত পাওয়ার যোগ্য হয়, আর যার মধ্যে থাকে না সে হয় না।

এই শেষোক্ত প্রশ্নটা একটা নির্মম বিদ্রূপ বিশেষ। কেননা তারা দিব্য চোখেই দেখতে পায় যে, পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহরই সৃষ্টি এবং সব মনগড়া প্রভু কিছুই সৃষ্টি করেনি। এগুলো কোনো

কিছুরই স্রষ্টা নয়, বরং সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের উপাসনা ও আনুগত্য করে। বস্তুত বিবেকবান মানুষ যে এতো নীচে নেমে যেতে পারে তা ভাবাই কষ্টকর।

যেহেতু এই সত্য সম্পর্কে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই, তাই এই প্রশ্নের পর তার সরাসরি জবাব দেয়া হয়েছে।

'বলো, আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই একক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।'

বস্তুত আল্লাহর একক সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং সর্বময় ক্ষমতা ও প্রতাপের মালিক হওয়া তাঁর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের প্রতীক। এভাবেই আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার বিবাদটা মেটানো হয় শুরুতে আকাশ ও পৃথিবীর সবাই ও তাদের ছায়া ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আল্লাহকেই সাজদা করে এই কথা ঘোষণা করার মাধ্যমে। আর শেষে আকাশ ও পৃথিবীর সবাই যে তাঁর প্রতাপ ও পরাক্রমের কাছে নতিস্বীকার করে– একথা বলার মাধ্যমে বিবাদটা মেটানো হয়। ইতিপূর্বে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ভীতি ও আশার বশে বিজলী, বজ্র ও ফেরেশতাদের তাসবীহ ও হামদের কথা। এতোসব ভয়ভীতি শুধু সেই লোক অগ্রাহ্য করতে পারে, যার মন অন্ধকারে থাকতে থাকতে একেবারেই বিকৃত ও অন্ধ হয়ে গেছে এবং যার ধ্বংস আসন্ন।

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে বাচনভংগিতে যে বৈপরীত্য তুলে ধরা হয়েছে, তা একটু সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। ভীতি ও আশার মাঝে, 'ভারী মেঘমালা' ও হালকা বিজলীর মাঝে এবং মেঘের গর্জনে আল্লাহর প্রশংসা ও ফেরেশতাদের তাসবীহর মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। আরো বৈপরীত্য রয়েছে হকের দাওয়াত ও ব্যর্থ পৌত্তলিক আহ্বানের মাঝে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে, আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীর ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সাজদা এবং আনুগত্যের মাঝে, বস্তুসমূহ ও তার ছায়ার মাঝে, সকাল ও বিকালের মাঝে, অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের মাঝে, অন্ধকার ও আলোর মাঝে, মহাপ্রতাপশালী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও মনগড়া সেই শরীকদের মাঝে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না এবং কোনো লাভ ক্ষতিতে যাদের কোনো হাত নেই। এভাবে সূরার বাদবাকী অংশে চমকপ্রদ ভংগিতে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

এরপর ১৭ নং আয়াতে সত্য ও মিথ্যা, স্থায়ী আহ্বান ও যে আহ্বান বাতাসের সাথে সাথে ফুরিয়ে যায় এবং প্রশান্ত কল্যাণ ও স্ফীত অকল্যাণের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। যে উদাহরণটা এখানে দেয়া হয়েছে তাতে অদ্বিতীয় আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রতিফলন ঘটেছে। এটা সেইসব প্রাকৃতিক বস্তুর অংগীভূত, যার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

'তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন ....' (আয়াত-১৭)

আকাশ থেকে পানি বর্ষণের মাধ্যমে নদ নদী খাল বিল ভরে যাওয়া ইতিপূর্বে বর্ণিত পানিভরা মেঘ, বিজলী ও বজ্রের পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটা দিক, যার আওতায় সূরার আলোচ্য বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। এটা মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। পানিতে নদ নদী, খাল বিলগুলো প্রয়োজন ও ধারণ ক্ষমতা অনুপাতে পূর্ণ হওয়া থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সব কিছু পরিচালনা করেন এবং পরিমিতভাবে করেন। এটাও সূরার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। আল্লাহ মানুষের সেসব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা থেকে নিছক নমুনা স্বরূপ এই উদাহরণ দিয়েছেন, যা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না।

আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে তা দ্বারা পৃথিবীর জলাশয়গুলো ভরে যায়। এই পানি স্রোতের আকারে বয়ে যায়। ফলে তার ওপর ফেনারাশির সৃষ্টি হয়। এই ফেনার আড়ালে কখনো পানি

অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ফেনা যতই ফুলে ফেঁপে বড় হোক না কেন, তা আবর্জনারূপেই গণ্য হয় এবং তার নীচে প্রশান্তভাবে অবস্থান করে, কিন্তু ফেনার নীচে লুকিয়ে থাকা এই শান্ত পানিই কল্যাণ ও জীবনের প্রতীক। অনুরূপভাবে ধাতব পদার্থের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটে। ধাতব পদার্থ যথা সোনা রূপা ইত্যাদি দিয়ে অলংকার, তৈজসপত্র ও অন্যান্য উপকারী জিনিস বানানো হয়। বানানোর সময় এই সব ধাতুর নিকৃষ্ট উপাদান বাইরে বেরিয়ে আসে এবং আসল ধাতুকে তা কখনো কখনো ঢেকে ফেলে, কিন্তু এতদসত্তেও তা নিকৃষ্ট উপাদান, যা টেকসই হয় না। ধাতুটাই পরিচ্ছন্ন হয় ও টেকসই হয়।

মানব জীবনে এ হচ্ছে হক ও বাতিলের উদাহরণ। বাতিল খুব ফুলে ফেঁপে দ্রুত বৃহৎ আকার ধারণ করে, কিন্তু যতোই বড় হোক তা নিকৃষ্ট পদার্থ। অচিরেই তা দূরে নিক্ষিপ্ত হয় ও বিলীন হয়ে যায়। আর সত্য প্রশান্তভাবে টিকে থাকে যুগ যুগ কাল ধরে। সময় সময় কারো কাছে মনে হয় যে, সত্য উধাও হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যই চিরস্থায়ী হয় জীবনদায়ী পানি ও নিখাদ ধাতুর মতো এবং তা চিরদিন মানুষের উপকার সাধন করতে থাকে।

'এভাবেই আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে থাকেন।' আর এভাবেই আল্লাহ বিভিন্ন দাওয়াত, আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিণাম নির্ধারণ করেন, এভাবেই বিভিন্ন আকীদা ও আদর্শের এবং কথা ও কাজের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ একক, মহাপরাক্রমশালী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সব কিছুর খবর রাখেন, হক, বাতিল, স্থিতিশীল ও অস্থিতিশীল সব কিছুর নিয়ন্তা।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দাওয়াত গ্রহণ করে, তার তো কল্যাণ ও মংগলের শেষ নেই। আর যারা তা গ্রহণ করে না তারা এমন বিপদের সম্মুখীন হবে, যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সে নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে, কিন্তু সে সুযোগ সে পাবে না। তার হিসাব নিকাশই তার অশুভ পরিণাম ডেকে আনবে। তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। ১৮ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

সূরার রীতি অনুসারে আল্লাহর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের পাশাপাশিই দেয়া হয়েছে গ্রহণকারীদের বিবরণ। এক দলের শাস্তির পাশাপাশি আর এক দলের পুরস্কারের বিবরণ। জাহান্নামের পাশাপাশি জান্নাতের বিবরণ।

যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য, সে কি করে এমন ব্যক্তির মতো হবে, যে (এসব কিছু দেখেও) অন্ধ! মূলত বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (আয়াত ১৯)

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ

রুকু ৩

১৯. সে ব্যক্তি কি জানে যে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য, সে কি করে এমন ব্যক্তির মতো হবে যে (এসব কিছু দেখেও) অন্ধ (হয়ে থাকে); একমাত্র বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, ২০. (এরা সেসব লোক) যারা আল্লাহর সাথে (আনুগত্যের) চুক্তি মেনে চলে এবং কখনো প্রতিশ্রুতি ভংগ করে না, ২১. এবং আল্লাহ তায়ালা যেসব (মানবীয়) সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রেখে চলে, যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে, আরো যারা ভয় করে (কেয়ামতের) কঠোর হিসাবকে; ২২. যারা তাদের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে (বিপদ মসিবতে) ধৈর্য ধারণ করে, যথারীতি নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে– গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, যারা (নিজেদের) ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) দূরীভূত করে, তাদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম, ২৩. (সে তো হচ্ছে) এক চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা নিজেরা (যেমনি) প্রবেশ করবে, (তেমনি) তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও (প্রবেশ করবে), জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে (তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে) ফেরেশতারাও তাদের সাথে ভেতরে প্রবেশ করবে, ২৪. (তারা বলবে, আজ) তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা যে পরিমাণ ধৈর্য ধারণ করেছো (এটা হচ্ছে তার বিনিময়), আখেরাতের ঘরটি কতো উৎকৃষ্ট! ২৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহর সাথে (এবাদাতের) প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে, যেসব সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে, (সর্বোপরি আল্লাহর)

أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ

الدَّارِ ۝٢٥ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝٢٦ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْٓ

اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝٢٧ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۚ اَلَا بِذِكْرِ

اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝٢٨ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ

وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝٢٩ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ

لِّتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۚ قُلْ هُوَ

رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝٣٠

যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) অভিশাপ এবং তাদের জন্যেই রয়েছে (আখেরাতে) নিকৃষ্ট আবাস। ২৬. আল্লাহ তায়ালা যার জীবনোপকরণে প্রশস্ততা দিতে চান তাই করেন, আবার যাকে তিনি চান তার রেযেক সংকীর্ণ করে দেন; আর এরা এ বৈষয়িক জীবনের ধন সম্পদের ব্যাপারেই বেশী উল্লসিত হয়, অথচ আখেরাতের তুলনায় এ পার্থিব জীবন (কিছু ক্ষণস্থায়ী) জিনিস ছাড়া আর কিছুই হবে না।

রুকু ৪

২৭. (হে নবী,) যারা (তোমার নবুওত) অস্বীকার করে তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো (অলৌকিক) নিদর্শন পাঠানো হলো না কেন; তুমি (এদের) বলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে বিভ্রান্ত করেন এবং তাঁর কাছে পৌছার পথ তিনি তাকেই দেখান যে (নিষ্ঠার সাথে তাঁর) অভিমুখী হয়, ২৮. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং আল্লাহর যেকেরে তাদের অন্তকরণ প্রশান্ত হয়, জেনে রেখো, আল্লাহর যেকেরই অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে; ২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে যাবতীয় সুখবর ও শুভ পরিণাম। ৩০. (অতীতে যেমন আমি নবী রসূল পাঠিয়েছি) তেমনি করে আমি তোমাকেও একটি জাতির কাছে (নবী করে) পাঠিয়েছি, এর আগে অনেক কয়টি জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে, (নবী পাঠিয়েছি) যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সে (কেতাব) পড়ে শোনাতে পারো, যা আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি, (এ সত্ত্বেও) তারা অনন্ত করুণাময় আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে; তুমি তাদের বলো, তিনিই আমার মালিক, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, (সর্বাবস্থায়) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি, তাঁর দিকেই (আমার) প্রত্যাবর্তন।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۗ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۗ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ قُلْ سَمُّوْهُمْ ۗ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ

৩১. যদি পাহাড়সমূহকে কোরআন (-এর অলৌকিক ক্ষমতা) দিয়ে গতিশীল করে দেয়া হতো, কিংবা যমীন বিদীর্ণ করে দেয়া হতো, অথবা তার মাধ্যমে যদি মরা মানুষকে দিয়ে কথা বলানো যেতো (তবুও এ না-ফরমান মানুষগুলো ঈমান আনতো না), কিন্তু আসমান যমীনের সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই (হাতে); অতপর ঈমানদাররা কি (একথা জেনে) নিরাশ হয়ে পড়লো যে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে সমগ্র মানব সন্তানকেই হেদায়াত দিতে পারতেন; এভাবে যারা কুফুরের পথ অবলম্বন করেছে তাদের কোনো না কোনো বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, কিংবা তাদের (নিজেদের ওপর না হলেও) আশপাশে তা আপতিত হতে থাকবে, যে পর্যন্ত না (তাদের জন্য) আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত (আযাবের) ওয়াদা সমাগত হয়; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কখনোই প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

রুকু ৫

৩২. (হে নবী,) তোমার আগেও নবী রসূলদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে, অতপর আমি (প্রথমে) তাদের (কিছু) অবকাশ দিয়েছি যারা কুফরী করেছে, এরপর আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি; কতো কঠোর ছিলো আমার আযাব! ৩৩. যিনি প্রত্যেকটি মানুষের ওপর তাঁর দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত রাখেন যে, সে মানুষটি কি পরিমাণ অর্জন করেছে (তিনি কি করে অন্যদের মতো হবেন)? ওরা আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছে; (হে নবী, এদের) তুমি বলো, ওদের নাম তো তোমরা বলো, অথবা তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে এমন (শরীকদের) সম্পর্কে খবর দিতে চাচ্ছো, এ যমীনে যাকে তিনি জানেনই না অথবা এটা কি তাদের কোনো মুখের কথা মাত্র? (আসল কথা হচ্ছে,) যারা কুফরী করেছে তাদের চোখে তাদের এই প্রতারণাকে শোভন করে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার পথ (পাওয়া) থেকে তাদের অবরোধ করে রাখা হয়েছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার জন্যে পথের দিশা দেখানোর (আসলেই) কেউ নেই। ৩৪. এদের

عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَاۤ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا

জন্যে দুনিয়ার জীবনেও অনেক শাস্তি আছে, তবে আখেরাতে যে আযাব রয়েছে তা তো নিসন্দেহে বেশী কঠোর, (মূলত) আল্লাহ (-এর ক্রোধ) থেকে তাদের বাঁচাবার মতো কেউ নেই। ৩৫. পরহেযগার লোকদের সাথে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে (যেমন একটি বাগান), তার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; তার ফলফলারি এবং সে বাগানের (গাছসমূহের) ছায়াসমূহও চিরস্থায়ী; এসবই হচ্ছে তাদের পরিণাম, যারা (দুনিয়ায়) তাকওয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে, কাফেরদের পরিণাম হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন। ৩৬. (হে নবী,) যাদের আমি (ইতিপূর্বে) কেতাব দান করেছিলাম তারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাতে বেশী আনন্দ অনুভব করে, এই দলে কিছু লোক এমনও আছে যারা এর কিছু অংশ অস্বীকার করে; তুমি (এদের) বলো, আমাকে তো আল্লাহর এবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি (আরো) আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি তাঁর সাথে কোনো রকম শরীক না করি; আমি তোমাদের সবাইকে তাঁর দিকেই আহবান করছি, তাঁর দিকেই (আমার) প্রত্যাবর্তন। ৩৭. (হে নবী,) আমি এভাবেই এ বিধান (তোমার ওপর) আরবী ভাষায় নাযিল করেছি (যেন তুমি সহজেই বুঝতে পারো); তোমার কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যে জ্ঞান এসেছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর সামনে তোমার কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না– না থাকবে (তোমাকে) বাঁচাবার মতো কেউ!

রুকু ৬

৩৮. (হে নবী,) তোমার আগেও আমি (অনেক) রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে আমি স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিও বানিয়েছিলাম; কোনো রসূলের কাজ এটা নয় যে, আল্লাহর

وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ

كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ مَا

نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا

الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ

وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

অনুমতি ছাড়া একটি আয়াতও সে পেশ করবে; (মূলত) প্রতিটি যুগের জন্যেই (ছিলো এক) একটি কেতাব। ৩৯. আর (সেসব কিছুর মাঝে থেকে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চান তা বাতিল করে দেন এবং যা কিছু ইচ্ছা করেন তা (পরবর্তী যুগের জন্যে) বহাল রেখে দেন, মূল গ্রন্থ তো তাঁর কাছেই (মজুদ) থাকে। ৪০. (হে নবী,) যে (আযাবের) ওয়াদা আমি এদের সাথে করি তার কিছু অংশ যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, কিংবা (তার আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, তাহলে (তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না, কেননা,) তোমার কাজ হচ্ছে (আমার কথা) পৌছে দেয়া, আর আমার কাজ হচ্ছে (তাদের কাছ থেকে তার যথাযথ) হিসাব (বুঝে) নেয়া। ৪১. এরা কি দেখতে পায় না যে, আমি (তাদের) যমীন চার দিক থেকে (আস্তে আস্তে) সংকুচিত করে আনছি; আল্লাহ তায়ালা (যা চান সে) আদেশ জারি করেন, তাঁর সে আদেশ উল্টে দেয়ার কেউই নেই, তিনি হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর। ৪২. যারা এদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে তারা (বড়ো বড়ো) ধোকা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলো, কিন্তু যাবতীয় কলা-কৌশল তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; (কেননা) তিনিই জানেন প্রতিটি ব্যক্তি (কখন) কি অর্জন করে; অচিরেই কাফেররা জানতে পারবে আখেরাতের (সুখ) নিবাস কাদের জন্যে (তৈরী করে রাখা হয়েছে)। ৪৩. (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, (তারা) বলে, তুমি নবী নও, তুমি ওদের বলে দাও, আমার এবং তোমাদের মাঝে (আমার নবুওতের সাক্ষ্যের ব্যাপারে) আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, উপরন্তু যার কাছে (পূর্ববর্তী) কেতাবের জ্ঞান আছে (সেও এ ব্যাপারে সচেতন)।

তাফসীর

আয়াত ১৯-৪৩

এই মহাবিশ্বের আদিগন্ত বলয়ে পরিব্যাপ্ত যে বিশাল সৃষ্টিকুল, অজানা অদেখা জগতের মধ্যে বিরাজমান এবং মানুষের অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অযুত প্রাণের অসংখ্য বিস্ময়কর অভিব্যক্তি, যার অতি সামান্য কিছুর বর্ণনাই এখানে এসেছে। এ সূরাটির শুরুতে এসব দৃশ্যের প্রতি সযত্ন দৃষ্টিপাত ও সশ্রদ্ধ পরিক্রমার পর গভীর আবেগে আমরা প্রবেশ করছি সূরাটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেখানে, আল্লাহ প্রদত্ত যৌক্তিকতার মাপকাঠি হাতে নিয়ে জ্ঞান গবেষণা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সৃষ্টি রাজ্যের মধ্যে অসংখ্য রহস্য জীবন্ত ছবির মতো আমাদের সামনে ভেসে ওঠছে। এসব কিছুর সাথে আমরা আরো দেখতে পাই ওহী, রেসালাত, তাওহীদি বিশ্বাস ও শেরেক, আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্যে কাফেরদের দাবী এবং পরকালীন জীবনে (মোশরেকদের জন্যে) শাস্তির ধমকিকে ত্বরান্বিত করার জন্যে কাফেরদের দারুণ ব্যস্ততা প্রদর্শন......... এসব বিষয়ে সূরাটির মধ্যে এক নতুন ধরনের আলোচনা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

এখানে পর্যালোচনা শুরু হচ্ছে 'ঈমানের' প্রকৃতি এবং 'কুফরী'র বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে। প্রথমটি হচ্ছে জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় অন্ধত্ব। এরপর এক এক করে মোমেন ও কাফেরদের প্রকৃতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং পৃথক পৃথকভাবে জানানো হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা, কেয়ামতের বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে একটি দৃশ্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, বর্ণনা এসেছে মোমেনদের পুরস্কৃত করা ও কাফেরদের শাস্তি দেয়া সম্পর্কে। দুনিয়াতে কার জন্যে কি ভাবে রেযেক প্রশস্ত করা হয় এবং কিভাবে এই রেযেকের দরজা সংকুচিত করা হয় তার বর্ণনা এসেছে। জানানো হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে যারা মোমেন তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে পরিতৃপ্ত হয়। আরও জানানো হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে কাফেরদের দাবী অনুসারে আল কোরআন দ্বারা পাহাড়কে স্থানচ্যুত করে (চালিয়ে) দিতে পারতেন, মাটিকে কোরআন দ্বারা খন্ডিত করতে পারতেন, এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির কথা বলার ব্যবস্থাও করে দিতে পারতেন; কিন্তু তাতে কি হতো? কোরআনের এসব অলৌকিক ক্ষমতা দেখলেও কি ওইসব কাফেররা ঈমান আনতো?

এ বিষয়ে ইংগিত করার পর জানানো হয়েছে যে, কাফেরদের কৃতকর্মের ফল হিসাবে হয়ত তাদের ওপর নেমে আসবে আঘাতের পর আঘাত, অথবা তাদের পাশেই কোনখানে নাযিল হবে কঠিন আযাব। এরপর তাদের মনগড়া মাবুদদের প্রতি তাদের ঘৃণা, ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, আলোকপাত করা হয়েছে প্রাচীনপন্থী হঠকারীদের তৎপরতা সম্পর্কে। পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমান্বয়ে কি ভাবে ভাংগন ধরছে সে বিষয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। অবশেষে যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর রেসালাতকেই অস্বীকার করার দুঃসাহস করেছে তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এ প্রসংগের আলোচনা শেষ করা হয়েছে। তাদের চিন্তা করতে আহ্বান করা হয়েছে তাদের শেষ পরিণতির কথা- যা অবশ্যই তারা তাদের আচরণ সামনে নিয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে।

সূরাটির শুরুর একাংশে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন আযাবের বর্ণনা। এসব ঘটনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে চেতনার ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। অবশ্য এগুলো সঠিকভাবে বুঝার ক্ষমতা সবার একই প্রকার নয়, বুঝ শক্তির বিভিন্নতায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে এ কথাগুলো বুঝতে পারে। রহস্য ভান্ডার এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সবার দৃষ্টির সামনে সমানভাবে খোলা থাকলেও তার থেকে সবাই একই প্রকার শিক্ষা

নেয় না, নিতেও পারে না। সূরাটির দু'টি অধ্যায়, যার একটা অপরটার সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত এবং প্রত্যেকটি অন্তরকে একই বিষয় একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে উজ্জীবিত করে।

একজন মোমেনের গুণাবলী ও তার সফলতা

প্রথম বিষয়টিই হচ্ছে ওহীর বিষয়, এই বিষয়টি নিয়েই গোটা সূরার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান এ অধ্যায়ে নতুন এক আংগিকে বিষয়টি পেশ করা হয়েছে। .... বলা হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি জানে, তোমার কাছে যা কিছু নাযেল হয়েছে তা (সবই) সত্য, সে ব্যক্তি কি ওই ব্যক্তির সমান যে জানে নাই (আসলে জানা না থাকায় সে অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে,) অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করে তারা– যারা বুদ্ধির অধিকারী।'

যে ব্যক্তি জানে আর যে ব্যক্তি জানে না– এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো তুলনাই হতে পারে না। যে ব্যক্তি জানে না সে তো চোখ থাকতেও অন্ধ– এটা তো সুস্পষ্ট ও অতি সহজ কথা যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞান কখনও সমান নয়, যেমন সমান নয় আলো ও আঁধার, একটা আর একটার বিপরীত! তবুও এভাবে তুলনা করে তাদের বুদ্ধি বিবেক ও মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে, যারা এই সহজ কথাটা চিন্তা করছে না। এ সহজ কথাটা চিন্তা না করার কারণ দু'টি; এক. স্বার্থান্বেষী মহল নিজ নিজ স্বার্থের কারণে এতই অন্ধ হয়ে যায় যে, সহজ সরল কথাটাও তাদের মাথায় ঢোকে না। দুই. স্বার্থপর লোকেরা, সাধারণ লোকদের, নিজেদের স্বার্থের কারণে বিভ্রান্ত করে এবং এ সহজ কথাটা যাতে চিন্তা না করে তার জন্যে তার মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়– এ জন্যেই এই অতি সহজ যুক্তিটাকেই জনগণের সামনে পেশ করে তাদের চিন্তা করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ সহজ যুক্তির মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম চিন্তা নেই, নেই কোনো অতিরঞ্জন বা রং মাখানো কথা, যার কারণে যে কোনো সাধারণ লোক এ সহজ যুক্তি বুঝবে এবং ওই স্বার্থান্বেষী মহলকে চিহ্নিত করে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে। এমন সহজ যুক্তি একজন অন্তরের অন্ধ ছাড়া অন্য কারো কাছে গোপন থাকতে পারে না। মানুষ এ দৃষ্টিতেও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক. চোখওয়ালা (যারা জ্ঞানের চোখ রাখে), তারা জানে কোনটা সঠিক এবং কোনটা বেঠিক। আর একদল হচ্ছে জ্ঞানান্ধ, তারা জানে না সত্য কোনটা, মিথ্যা কোনটা। এমনভাবে তাদের চোখের ওপর পর্দা পড়ে রয়েছে যে, তারা দেখেও দেখে না এবং সঠিক চেতনা তাদের কাজ করে না, অন্তরের দুয়ার তাদের রুদ্ধ হয়ে গেছে– সঠিক চিন্তা সেখানে প্রবেশের পথ পায় না। তাদের আত্মার মধ্যে সঠিক বুঝ কিছুতেই স্থান পায় না, যার কারণে সত্যের মূল উৎস থেকে তারা বহু দূরে থাকে।

'অবশ্যই, বুদ্ধির অধিকারী যারা, তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে।'

এ জন্যে এরশাদ হয়েছে, 'যাদের দান করা হয়েছে সুস্থ বুদ্ধি– তাকে দেয়া হয়েছে বহু কল্যাণ।'

-এ বোধসম্পন্ন ব্যক্তি তারা যাদের আছে সুস্থ বুদ্ধি ও সত্যকে গ্রহণ করার মতো সত্য সচেতন অন্তর, তারা যুক্তি প্রমাণ সহকারে সবকিছু বুঝতে চায় এবং এ জন্যে চিন্তা করে।

আর এ চিন্তা করার প্রবণতাই হচ্ছে ওই বুদ্ধিমানদের প্রথম গুণ এবং তারা নিম্নোক্ত গুণাবলীরও অধিকারী হয়,

'যারা আল্লাহর সাথে করা চুক্তি রক্ষা করে (এবং কোনো সময়েই তাঁর কাছে দেয়া ওয়াদা ভংগ করে না)।'

আর অবশ্যই একথা সত্য যে, আল্লাহর সাথে করা চুক্তির আওতায় সকল প্রকার চুক্তিই পড়ে এবং আল্লাহর কাছে প্রদত্ত ওয়াদাও সাধারণভাবে প্রযোজ্য এমন একটি গুণ, যার মধ্যে শামিল রয়েছে অন্য সকল প্রকার ওয়াদা। আর সব চুক্তির বড় চুক্তি, যার অন্তর্ভুক্ত অন্য সকল প্রকার চুক্তি, তা হচ্ছে ঈমান (আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস এবং তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার ওপর পূর্ণ আস্থা); আর সব থেকে বড় চুক্তিই হচ্ছে তাই যা অন্য সকল চুক্তিকে তার আওতাধীনে নিয়ে আসে, আর তা হচ্ছে ঈমানের দাবী অনুসারে আল্লাহর যাবতীয় হুকুম পালন করা।

ঈমানের এই যে চুক্তি, এটা যেমন পুরাতন তেমনি নতুন। এতো পুরাতন যে সকল সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই এটা আল্লাহর সাথে করা চুক্তি। এ ঈমান সরাসরি জড়িত এক আল্লাহর সাথে, যাঁর ইচ্ছায় গোটা সৃষ্টির অস্তিত্ব বাস্তবে এসেছে। যিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, যাঁর ইচ্ছা সর্বত্র ক্রিয়াশীল .... একমাত্র তিনিই সবার মালিক মনিব। তিনি আদম (আ.) থেকে সবাইকে সৃষ্টি করে তাদের সবার কাছ থেকে আনুগত্যের ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং সেদিন সবাই সাগ্রহে ও খুশীর সাথে একমাত্র তাঁর হুকুম পালন করার ওয়াদা করেছিলো ..... তারপর তিনি রসূলদের পাঠিয়ে তাদের কাছে আনুগত্যের ওয়াদা করার জন্যে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সে ওয়াদা একেবারে প্রথম বারের ওয়াদা ছিলো না; বরং সে ওয়াদা ছিলো তাদের ভুলে যাওয়া ওয়াদার নবায়ন এ আহ্বান ছিলো তাদের পেছনের ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দেয়ার নামান্তর এবং তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়া যে, তারা কার হুকুম পালন করবে, পরিষ্কার করে তাদের জানিয়ে দেয়া যে, আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে গোটা যিন্দেগীতে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা এবং একমাত্র তাঁর আইন গোটা জীবনে বাস্তবায়িত করা এবং তিনি ছাড়া অন্য সবার অন্ধ আনুগত্য থেকে জীবনকে মুক্ত করা– তার সাথে ছিলো সর্বপ্রকার ভালো কাজ ও ভালো ব্যবস্থা করার ওয়াদা এবং একমাত্র মহান আল্লাহর দিকে সকল ব্যাপারে ঝুঁকে থাকা, যাঁর কাছে সর্বপ্রথম আনুগত্যের ওয়াদা সে করেছিলো।

এরপর আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা ও চুক্তির সামঞ্জস্য রেখে মানুষের সাথে যাবতীয় চুক্তির সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। মানুষের সাথে এ চুক্তি বলতে রসূলের সাথে হতে পারে বা অন্য কোনো মানুষের সাথেও হতে পারে, আত্মীয় স্বজন বা পাড়া পড়শীর সাথে আবার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত দলের লোকজনের সাথেও হতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষা করে সে পর্যায়ক্রমে সকল চুক্তিই রক্ষা করে, কারণ চুক্তি রক্ষা করা হচ্ছে একটি ফরয। আর যে ব্যক্তি প্রথম চুক্তি করে এবং আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছে তা পূরণ করে, সে পর্যায়ক্রমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল পর্যায়ে সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় চুক্তি রক্ষা করে বা করতে পারে, কেননা এ সকল চুক্তিই প্রথম চুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি যাবতীয় চুক্তি করার মাধ্যমে বিশ্বস্ত থাকে সে জীবনের সব ব্যাপারেই সবার সাথে বিশ্বস্ত থাকতে পারে এবং তার জীবন হয় সুবিন্যস্ত ও সকল দিক দিয়েই সুষম; এর সর্বশেষ ফল হচ্ছে, জীবনের সবদিকে শান্তি। এই মৌলিক কথাটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে নীচের আয়াতাংশে,

'আর যারা সেই সম্পর্ক রক্ষা করে যা রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে নিকৃষ্ট হিসাব দেয়াকে।'

এভাবে সংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা যতো জনের সাথে এবং যতো বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সে নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যারা সকল সম্পর্ক রক্ষা করে, তারা

তো আল্লাহরই নির্দেশ পালন করে এবং আল্লাহর নির্দেশমতো সবার সাথে সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে আল্লাহরই সাথে তারা সম্পর্ক স্থাপন করে। এভাবে আল্লাহর বিধানমতো চলা এবং এসব হুকুম মানার সময় কোনো প্রকার ব্যতিক্রম না করলে আল্লাহরই আইন মানা হয়। এখানে সংক্ষেপে আল্লাহর হুকুম মানার কথা বলা হয়েছে। কোন কোন হুকুম মানা হবে, তার কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেয়নি বা সে নির্দেশগুলোর কথা পৃথক পৃথকভাবেও বলা হয়নি। কারণ এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে আলোচনা অযথা বহু দীর্ঘায়িত হতো যা করার কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর পথে দৃঢ়তার সাথে এমনভাবে টিকে থাকার কথা বলা যার মধ্যে কোনো সময় কোনো নড়চড় হবে না এবং কোনো প্রকার বিরতি না দিয়ে সাধারণভাবে জীবনের সকল ব্যাপারেই আল্লাহর আনুগত্য করার জন্যে শিক্ষা প্রদান করা, মানুষের মধ্যে এমন মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলা যা সহজে ভেংগে যাবে না .... এভাবে আল্লাহর প্রতি মানুষের অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ আনুগত্যবোধ পয়দা করার ব্যাপারে এ আয়াতগুলো বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেছে। এটা সম্ভব হওয়ার অন্য আরও কারণ হচ্ছে, 'আর তারা তাদের রবকে ভয় করে এবং নিকৃষ্ট হিসাব দান সম্পর্কেও প্রচন্ড ভয় রাখে।' অর্থাৎ তারা আল্লাহর ভয় এবং এমন মন্দ পরিণতির আশংকা করে যা সেই কঠিন সাক্ষাতের দিনে অপরাধীদের চরমভাবে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। তারা অবশ্যই এমন সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী যারা হিসাব দিবস আসার বহু পূর্বেই কি হিসাব দেবে তা নিয়ে চরমভাবে উদ্বিগ্ন।

এই প্রসংগে এখানে তাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

'আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় জীবনের সকল ব্যাপারে সবর করে চলেছে।'

সবরের বহু প্রকারভেদ আছে এবং সবরের বহু দাবীও আছে। এক প্রকার সবর হচ্ছে ওয়াদা পূরণ ও চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে অবিচল থাকা- এই অবিচলতা প্রদর্শন করবে তারা কাজ, জেহাদ, দাওয়াতী কাজ, এজতেহাদী কাজ এবং এজতেহাদের মাধ্যমে এ ধরনের আরও বহু কষ্টের মধ্যে অবিচলভাবে থেকে নীতি ও আদর্শ দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে। আর এক প্রকার সবর হচ্ছে সুখ দুঃখে, সম্পদে সংকটে সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুম পালন করা। আর অবশ্যই এটা সত্য কথা যে, প্রভুর নেয়ামত লাভ করে খুব কম লোকই সবর করে, অর্থাৎ নিজ দায়িত্ব পালনে অবিচলিত থাকে, অহংকারে অস্থির হয়ে যায় না বা আল্লাহর না-শোকরীও করেন না, কিন্তু প্রকৃত মোমেন তারা যাদের সাথে মানুষ যখন নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করে, হঠকারিতাপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে নানা প্রকার জটিলতা ও সংকট সৃষ্টি করে, তখনো তারা সবর করে ...... এভাবে জীবনে যখন নানা প্রকার দুঃখ বেদনা সংকট সমস্যা দুশমনের দুশমনী আসে তখন এসব কিছুর মোকাবেলা করতে গিয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ মোমেনরা মোটেই বিচলিত হয় না; বরং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ধীরস্থিরভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে চলে। মানুষের কোনো কথার পরওয়া তারা করে না কে বলল, এরা ঘাবড়ে গেছে আর কে বললো, এরা সবর করেছে- অথবা কারো নিন্দা বা কারো প্রশংসার পরওয়া তাদের নেই। তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রেরণার উৎস হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষপ্রাপ্তির আকাংখা। এমনকি সবর করলে পৃথিবীর এ জীবনে লাভ হবে কিংবা পেরেশান হলে এখানে কোনো দুঃখ দূর হবে, এসব চিন্তাও তারা করে না, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় সবর করে। কোনো কাজ সম্পাদিত হোক, কোনো কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হোক, সেখানেও সে দেখে আল্লাহ কি চান এবং তার আত্মতৃপ্তিতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট কি না।

'তারা নামায কায়েম করে'

অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমেই তারা তাদের মালিকের সাথে চুক্তির জীবনে পদার্পণ করে, কিন্তু এটাও সত্য কথা যে, নামায প্রকাশ্যভাবে আদায় করা এবং প্রকাশ্যভাবে কায়েম করা সে ফরয জানে, কারণ এটাই ইসলামের প্রথম রোকন এবং ওয়াদা পূরণের প্রথম প্রমাণ বান্দার পক্ষে এটাই আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ার বহির্প্রকাশ, আর যেহেতু বান্দা এবং মনিবের মধ্যে এটাই সম্পর্কের প্রকাশ্য দলিল। এ জন্যে এর মধ্যে অন্য কোনো কথা বা সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই।

'আর তারা খরচ করে গোপনে ও প্রকাশ্যে সেই ধন সম্পদ থেকে যা আমি (মহান আল্লাহ), তাদের দিয়েছি।'

এটা ওই সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তির অন্তর্গত, যার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দিয়েছেন এবং ওই ওয়াদার অন্তর্ভুক্তও বটে যা আল্লাহর সাথে করা হয়েছে, তবে এখানে আরও একটা অতিরিক্ত বিষয় আছে, যা একটু খেয়াল করলেই আমরা বুঝব, আর তা হচ্ছে এই খরচ করার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে; আল্লাহর পথে থাকার কারণে এবং আল্লাহর হুকুম পালন করার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে এ সুসম্পর্ক, যার প্রভাব পড়ে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে; আর এর দ্বারা মানুষের অন্তরের পবিত্রতা হাসিল হয়, যেহেতু দানকারী দানের কারণে কৃপণতার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি লাভ করে, আবার গ্রহণকারীরা অন্তরে সম্পদশালীদের প্রতি সাধারণভাবে যে বিদ্বেষ থাকে, তার থেকে রেহাই পায় (কারণ দানকারীর প্রতি স্বভাবতই এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধ নিজের অজান্তেই গড়ে ওঠে। আর এর সুদূরপ্রসারী ফল হচ্ছে, সামাজিক জীবনের এক দিক ও বিভাগ তখন পরস্পরিক মহব্বত বিনিময় ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে সমাজের সদস্যবৃন্দ হয়ে ওঠে দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য দরদ সহানুভূতি অনুভব করতে থাকে। গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করার তাৎপর্য হচ্ছে, যখন গোপনে কাউকে দান করা হয় তখন গ্রহীতার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না এবং তার মধ্যে সাহস, কর্মপ্রেরণা ও আত্মমর্যাদাবোধ অটুট থাকে। প্রকাশ্য দানে যে নেয় সে মনে মনে ছোট হয়ে যায়। অপরপক্ষে প্রকাশ্য দানেরও একটি ভালো দিক আছে; অপরের জন্যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়, শরীয়তের আইন চালু হওয়া ও মান্য করার নযির স্থাপিত হয়। সুতরাং জীবনের ওপর এ দু'টি অবস্থারই বিশেষ বিশেষ কিছু অবদান আছে।

'আর যারা মন্দের পরিবর্তে ভালো ব্যবহার করে।'

একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পারস্পরিক ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই মোমেন দল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে কোনো মন্দ আচরণের পরিবর্তে ভালো ব্যবহার করে। একথার আর এক উদ্দেশ্য হচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনের কর্মক্ষেত্রে মানুষের সাথে বৈষয়িক ও ব্যবহারিক আদান প্রদান হয়-সেখানে কারো পক্ষ থেকে কোনো দুর্ব্যবহার বা বাড়াবাড়ি যদি হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত মন্দ ব্যবহারের প্রতিশোধ না নিয়ে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে 'ভালো' দিয়েই তার প্রতিদান দেয়। এ কাজটাকে কোনো দ্বীনী কাজ বলে সাধারণভাবে মনে করা হয় না, অথচ আল্লাহ তায়ালা গোটা জীবনের জন্যে যে পূর্ণাংগ ব্যবস্থা দিয়েছেন, অবশ্যই এই আচরণ তারই একটা অংশ। কেননা এ উত্তম প্রতিদানের মাধ্যমে শয়তানের কারসাজি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা ও সম্পর্ক নষ্ট করে তাদের মধ্যে দুশমনী পয়দা করা– এ অসদুদ্দেশ্য বিফল করে দেয়া হয়। এ সদাচরণের দ্বারা মানুষের সদগুণাবলীর প্রসার ঘটে, সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং সবাই মিলে এক সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

এখানে এ ছোট্ট আয়াতাংশের মাধ্যমে গোপন ইংগিতে বলা হচ্ছে যে, মোমেনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা মন্দ ব্যবহারের শোধ নেয় ভাল ব্যবহার দ্বারা এবং যখনই এ ধরনের পরিস্থিতি আসে তখনই আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী লাভের উদ্দেশ্যে তারা এ সুযোগ গ্রহণ করে, যেহেতু তারা জানে ও বিশ্বাস করে যে, এহেন ব্যবহার দ্বারা একাধারে বিরোধীদের মধ্যে ভালো ভাবের উদয় হবে এবং আল্লাহর রহমতও লাভ করা যাবে। এ ধরনের ব্যবহারের ফল হিসাবে তারা দুনিয়ার বৈষয়িক কোনো লাভ চায় না, না থাকে তাদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের কোনো আকাংখা! যখন কোনো অন্যায় বা মন্দ আচরণ সংঘটিত হয়, তখন তা দমন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং তখন ভালো ব্যবহার দ্বারা তা দমন হবে না বলেই মনে হয়; কিন্তু এটা অবশ্যই ঠিক, মন্দের পরিবর্তে যখন ভালো ব্যবহার করা হবে তখন উক্ত মন্দ ব্যবহার আরও বেড়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ পাবে না।

ভালো দিয়ে মন্দের অবদমন করা

অবশ্যই এটি বুঝা যায় যে, অন্যায়কে ভালো দিয়ে সুন্দরভাবে দমন করে ভালোর প্রসার ঘটানো সম্ভব। তবে এ কাজটা শুরু করতে হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

এখানে আরেকটা ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ায় যদি কেউ কোনো ভালো এবং মানুষের কল্যাণকর কিছু করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে এবং মানুষের মন্দ আচরণের প্রতিদান ভালো কিছু দ্বারাই দিতে হবে (একথার মধ্যে আর একটি কথা আপনা থেকেই এসে যায় যে, ভালো করতে গেলে ক্ষমাশীল ও ত্যাগী হতে হবে, নচেৎ মন্দের জওয়াব ভালো দ্বারা দেয়া সম্ভব হবে না)। এ কাজ করতে গিয়ে নিজের আশা আকাংখা বা লোভ লালসা ও উচ্চাকাংখা অবশ্যই দমন করতে হবে। অবশ্যই এটা কঠিন কাজ, কিন্তু এসব কাজ তাদের জন্যে সহজ হয়ে যাবে যারা এ জীবনের ওপর আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দান করবে। তারা মনে প্রাণে মন্দকে যে কোনো মূল্যে দমন করতে চাইবে। নিজেদের বাহাদুরী এবং নিজেদের উচ্চ আশা পূরণ করার জন্যে ব্যস্ত থাকবে না।

দু'জনের মধ্যে যখন কোনো প্রতিযোগিতা দেখা দেবে তখন মন্দের পরিবর্তে ভালো করার প্রবণতাকে বিজয়ী বানাতে হবে। এ প্রতিযোগিতা কোনো দ্বীনী কাজের মধ্যে শুধু নয় সাধারণভাবে লেনদেনের ব্যাপারেও এ প্রতিযোগিতা হয় (যদিও পূর্ণাংগ দ্বীনের আওতাভুক্তিই হচ্ছে প্রদান লেনদেন)। অবশ্য নিজের প্রাধান্য বিস্তারকারী, উচ্চাভিলাষী যারা, তাদের কঠোরভাবে দমন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই এবং যারা দুনিয়ায় বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হবে তাদেরও চরমভাবে মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু আল কোরআনে যাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে তারা কারা সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। এখানে সমাজের বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে, যেন তারা একত্রিত হয়ে নির্ধারণ করে সেই শ্রেণীর মানুষদের যাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করলে সমাজের কল্যাণ এবং উপকার হবে।

'ওরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের জন্যে রয়েছে পরকালের ঘর। এসব ঘর হচ্ছে চিরস্থায়ী বাগবাগিচাসমূহ, যাতে তারা ও তাদের নেককার বাপ-দাদার স্ত্রীরা এবং সন্তানরা প্রবেশ করবে। আর সেথায় ফেরেশতারা প্রবেশ করবে সকল দরজা দিয়ে, তারা তাসলীম জানাতে জানাতে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলবে; আপনারা যে বরাবর সবরের পরিচয় দিয়েছিলেন, এ জন্যে আপনাদের প্রতি রইলো হাজার হাজার সালাম। সুতরাং (ভেবে দেখুন) কী চমৎকার হবে সেসব পরকালীন ঘর।'

'তারাই' থাকবে সেই সমুন্নত স্থানে, তাদের জন্যেই রয়েছে সেসব পরম পরিণতির ঘর। তা হচ্ছে, তাদের বাস করার জন্যে চিরস্থায়ী বাগবাগিচায় পরিপূর্ণ বাসস্থানসমূহ।

এইসব বাগবাগিচার মধ্যে তাদের সাথে মিলিত হবে তাদের নেককার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানরা এবং সেখানে তারা তাদের যোগ্যতা ও অধিকার নিয়েই প্রবেশ করবে, কিন্তু সেখানে সকলকেই একত্রিত করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে এবং তাদের বন্ধু বান্ধবদেরও তাদের সাথে মিলিত করে দেয়া হবে– এটা হবে আর এক ধরনের স্বাদ, যা তাদের অন্তরের আনন্দ আরও আরও বাড়িয়ে দেবে।

তাদের এই সম্মিলনে এবং পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে ফেরেশতাদের আগমন ঘটবে। এ আনাগোনা চলতেই থাকবে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'সকল দরজা দিয়ে তারা প্রবেশ করবে।'

এ প্রসংগের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফেরেশতারা দলে দলে এসে মোমেনদের সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। এরই বর্ণনা কালামে পাকে আসছে, 'তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্যে সালাম, সালাম– হাজার সালাম, বড়ই চমৎকার তোমাদের আখেরাতের এ ঘর।'

এ হবে এক আনন্দ মেলা। যেখানে উপর্যুপরি আগমন ঘটবে ফেরেশতাদের। যারা তাদের অভিনন্দন জানাতে থাকবে এবং সম্মান প্রদর্শন করবে।

কাফেরদের গোয়ার্তুমি ও তাদের পরিণতি

এর পাশেই থাকবে আর একটি দল। যারা মোটেই (জীবনে) কোনো বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি। এ বুদ্ধির সদ্ব্যবহার না করায় সেদিন তারা স্মরণ করবে। সকল ব্যাপারে তাদের অবস্থা বুদ্ধিমানদের বিপরীত হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'আর যারা আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা ভংগ করছে শক্তভাবে চুক্তি করার পর, আল্লাহ তায়ালা যে সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন সে সম্পর্ক তারা কেটে দিচ্ছে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করছে, তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঘর।

এরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আইন ভংগ করে মনগড়া ব্যবস্থামতো যা খুশী তাই করে চলেছে এবং বলছে যে, তারা শ্বাশত প্রাকৃতিক আইন মানে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা প্রকৃতির আইন অমান্য করে আল্লাহর সাথে করা সকল প্রকার চুক্তির বরখেলাপ করছে। এভাবে যারা বাস্তবে আল্লাহর আইন অমান্য করে চলেছে তাদের প্রথম চুক্তির কোনো কথা মনে নেই এবং এ জন্যে তাদের সাথে দেয়া সে চুক্তির কোনো মূল্যই আল্লাহর কাছে নেই। এরাই সবরের পরিবর্তে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করছে নানা প্রকার অশান্তি। এরা নামায ও গোপনে প্রকাশ্যে আল্লাহর পথে খরচ করার পরিবেশ ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং ভালোর জবাব দিচ্ছে মন্দ দিয়ে। এর ফলে পৃথিবীতে শান্তির পরিবর্তে চতুর্দিকে অশান্তি বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ছে ।

'ওরাই', হাঁ ওরাই আল্লাহর রহমত থেকে দূরে, বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে– বিতাড়িত হয়েছে আল্লাহর করুণার নযর থেকে। 'তাদের জন্যই রয়েছে লা'নত।' আর যেখানে তাদের জন্যে ব্যবস্থা ছিলো মান সম্ভ্রম ও অভিনন্দনের, সেখানে তারা নিজেরা খরিদ করে নিয়েছে নিজেদের কার্যকলাপ ও ব্যবহার দ্বারা ধিক্কার ও বিতাড়ন। ওদেরই জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঘর।

কত নিকৃষ্ট যে হবে ওদের ওই ঘর তার বর্ণনা দেয়ার কোনো ভাষা নেই এবং আসলে তার কোনো প্রয়োজনও নেই। সাফল্য ও পুরস্কারের বিপরীত বিফলতা ও আযাব হবে তাদের পরিণতি! এরা সেসব ব্যক্তি, যারা দুনিয়ার জীবন ও ক্ষণস্থায়ী ভোগ-ঐশ্বর্যের নানা সামগ্রী নিয়ে খুশী ছিলো। তারা আখেরাতের জীবন সম্পর্কে চিন্তাও করেনি এবং বুঝতেও চায়নি ওই অবশ্যম্ভাবী জীবনের

অপরিহার্যতা সম্পর্কে। পারকালীন সেই জীবনের চিরস্থায়ী শান্তি ও কল্যাণের কোনো কামনা তারা করেনি। তারা একথাও কোনো সময় হিসাব করেনি যে, আল্লাহ তায়ালাই রেযেক বন্টন করেন, কাউকে প্রচুর দেন, আবার কাউকে তিনি কম দেন। সুতরাং বুঝতে হবে যে, অবশ্য অবশ্যই রেযেক সবই তাঁর হাতে এবং সকল বিষয় তিনিই সমানভাবে পরিচালনা করেন। যদি তারা আখেরাতের যিন্দেগী চাইত এবং সেই যিন্দেগীতে সফলতা লাভ করার জন্যে কাজ করতো, তাহলে তারা যে দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হতো তা নয়, বরং আখেরাতের পুরস্কারের সাথে দুনিয়াতেও তারা কিছু না কিছু পেতো। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা প্রশস্ত করেন রেযেক যার জন্যে ইচ্ছা তার জন্যে এবং তিনিই সংকুচিত করেন এই রেযেক যার জন্যে ইচ্ছা করেন তার জন্যে; আর অবশ্যই আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ .... ।'

সত্য সম্পর্কে আলেম ও জাহেলদের পার্থক্য

আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলের কাছে যা নাযিল হয়েছে তা যে সত্য সে সম্পর্কে যে জানে আর যে জানে না, এ দুই ব্যক্তির মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তার ওপর আলোচনা ইতিমধ্যে এসে গেছে। সুতরাং এখন ওসব অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা আসছে যারা সত্য-সন্ধিৎসু না হওয়ার কারণে সত্য সন্দর্শনে অন্ধ আর এ কারণেই তারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের নিদর্শনাবলী দেখতে পায় না এবং তাদের কাছে আল্লাহর পাক পবিত্র এ কালামও তাঁর পরিচয় জানার জন্যে যথেষ্ট নয়। তারা আরও নিদর্শন দেখতে চায়। এতদসম্পর্কিত অনুরূপ কিছু বর্ণনা সূরাটির গোড়ার দিকেও এসেছে। সেখানে জানানো হয়েছে যে, রসূল (স.) আল্লাহর কোনো অলৌকিক শক্তি দেখানোর জন্য প্রেরিত হননি এবং জোর করে কাউকে শিক্ষা দেয়াও তাঁর কাজ নয়; বরং তিনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, অর্থাৎ আল্লাহকে চেনার জন্যে এবং তাঁর ক্ষমতা জানার জন্যে প্রকৃতির মধ্যে যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, অন্তর্দৃষ্টি, সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তির জন্যে তাই যথেষ্ট, তবুও দুনিয়ার মায়া-মোহে পড়ে থাকার কারণে মানুষ সেগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায় না, তাকানোর সুযোগ পায় না। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে পাঠান সেসব বিষয় স্মরণ করানোর জন্যে, সেগুলোর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য এবং পরবর্তীকালে কি হবে তা ভুলে থাকার পরিণতি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করার জন্যে, অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর এখতিয়ার তো একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি যখন যাকে চান দেখান, এটা তাঁর নিজের ব্যাপার। তিনি এখানে সৃষ্টিকুলের যে বর্ণনা পেশ করেছেন তার মধ্যে হেদায়াত গ্রহণ করার জন্যে বুদ্ধির অধিকারী যারা এবং যারা তাদের বুদ্ধি কাজে লাগায়, তাদের জন্যে বিস্তর নিদর্শন রয়েছে। তিনি হেদায়াত গোমরাহীর কারণগুলো জানিয়ে দিচ্ছেন, আর তার পাশাপাশি ওইসব অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করছেন যা আল্লাহর স্মরণে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে। সেসব অন্তরে কোনো দুশ্চিন্তা নেই বা ঈমান আনার জন্যে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের দাবীও তাদের নেই, যেহেতু তাদের নিকট আল কোরআনই হচ্ছে এক পরম বিস্ময়– এ কোরআন অন্তরের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। এমনকি যারাই এ কোরআনের আয়াতগুলো একবার শোনে তাদের কাছে মনে হয় এ পবিত্র কালাম পড়ে ফুঁক দিলে পাহাড়গুলো এগিয়ে চলে আসবে, পৃথিবী খন্ডিত হয়ে যাবে এবং তার মধ্যে এমন শক্তি আছে যার দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে পর্যন্ত কথা বলানো সম্ভব, এমন সজীবতা এবং প্রাণপ্রবাহ আছে যার দ্বারা আরও বহু খেদমত পাওয়া যেতে পারে। আর যারা কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর দাবী করে, আযাব নিয়ে আসার দাবী করে,

তাদের সাথে তারা কথা বলতে চায় না, তাদের সম্পর্কে মোমেনদের হতাশ হতে বলে, যেসব আযাব এসেছে তা থেকে শিক্ষা নিতে বলে এবং ওই সব ঘটনা থেকেও শিক্ষা নিতে বলে যা মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

'আর কাফেররা বলে কেন সে তার রবের কাছ থেকে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসে না। বলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহ করেন এবং হেদায়াত করেন তাকে যে তাঁর দিকে মন রুজু করে। তারাই ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণেই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে। হাঁ, একমাত্র আল্লাহর স্মরণেই তো অন্তরগুলো পরিতৃপ্ত হয়। যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে তাদের জন্যে রয়েছে খুশী ও সুন্দর পরিণতি।

'এমনি করেই, আমি মহান আল্লাহ পাঠিয়েছি তোমাকে এক জাতির মধ্যে যার পূর্বে বহু জাতি গুজরে গেছে। যাতে করে তুমি তাদের সেই জিনিস পড়ে শোনাও যা আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তোমার কাছে নাযেল করেছি, অথচ ওরা মহা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে। বলো, তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া নেই কোনো মা'বুদ, তাঁর ওপরেই আমি ভরসা করছি এবং তাঁর কাছেই (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে।

আর যদি......... তাহলে বলো কেমন হবে পরিণতি? (৩১-৩২)

ওদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর জওয়াব হচ্ছে, এসব নিদর্শন দেখিয়েও যে ওদের ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে,তা কখনোই নয়, আসলে আন্তরিকভাবে তারা ঈমান আনতেই প্রস্তুত নয়। ওদের মনের মধ্যে রয়েছে অন্য কথা, এটা ওটা বলে ঈমান আনা থেকে দূরে সরে থাকা। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে ভুল পথের দিকে এগিয়ে দেন এবং পথ দেখান তাকে যে পথ পেতে চায়।'

সুতরাং বুঝা গেলো, আল্লাহ তায়ালা তাদেরই সঠিক পথ দেখান যারা সে পথ পাওয়ার ইচ্ছা করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হেদায়াত পাওয়ার জন্যে আল্লাহর দিকে মন রুজু করাই হচ্ছে শর্ত। যে মন আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকবে সেই মনের মধ্যে সঠিক পথের দিশা প্রবেশ করবে। এর দ্বারা একথাও বুঝা গেলো, যারা আল্লাহর দিকে মন রুজু করবে না, তাদের সামনে সত্যের পক্ষে হাজারো দলীল পেশ করা হোক না কেন তারা তা গ্রহণ করবে না বা গ্রহণ করতে পারবে না। সত্য পাওয়ার জন্যে যেমন নিজের মধ্যে যোগ্যতা থাকতে হবে, তেমনি সত্য পাওয়ার জন্য ইচ্ছা আগ্রহ ও চেষ্টাও শর্ত হিসাবে কাজ করে। আর যে অন্তরের মধ্যে কোনো ক্রিয়াই নেই, সে অন্তর সত্যপ্রাপ্তি থেকে বহু বহু দূরে পড়ে থাকে।

আল্লাহর স্মরণ মোমেনের হৃদয়ে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়

এরপর মোমেনের সুন্দর সমুজ্জ্বল চেহারার চিত্র আঁকা হচ্ছে। মোমেন সে পরিতৃপ্ত ব্যক্তি যে শান্ত-শিষ্ট শান্তিপ্রিয়, সদা সর্বদা খুশী, সকল অবস্থায় অবিচল ও মহব্বতপূর্ণ। এরশাদ হচ্ছে,

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে।'

পরিতৃপ্ত হয়েছে এই অনুভূতির কারণে যে, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। প্রতিবেশীর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে এবং তাদের দরদ মহব্বত ও সহানুভূতি প্রদর্শনের কারণে এক নিরাপত্তাবোধ তাদের মধ্যে জমে গেছে। নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত এই জন্যে যে, তারা একদম একাকী নয় এবং তাদের পথ কোন পেরেশানীতে ভর্তি নয়, তারা সৃষ্টির সব কিছুর ভোগ ব্যবহার করে বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে তারা সঠিক চেতনা রাখে। তারা অত্যন্ত সচেতনভাবে নিশ্চিন্ত সকল প্রকার আক্রমণ থেকে এবং সব

ধরনের দুঃখ থেকে, আর তারা মনে করে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো মন্দ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। বিপদ-আপদ যাই আসুক না কেন, সে অবস্থায় তারা বিচলিত হয় না; বরং অবিচল থাকে তারা সকল প্রতিকূলতায় এবং তাঁরই মেহেরবানীতে হেতাদায়াতের পথে থাকার কারণে, জীবন ধারণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তার মধ্যে থাকায় তারা নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'হাঁ আল্লাহর স্মরণেই (মোমেনদের) অন্তরসমূহ নির্লিপ্ত-নিশ্চিন্ত-পরিতৃপ্ত থাকে।'

এই নিশ্চিন্ততা ও পরিতৃপ্তি মোমেনদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ থাকার কারণেই সম্ভব হয়। এটাই হচ্ছে যিন্দেগীর পরিতৃপ্তি, অন্তরের গভীরে প্রোথিত থাকে এই তৃপ্তি, তারাই এটা পায় যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে এবং তাদের গোটা অস্তিত্ব আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস (ঈমান)-এর রংয়ে এমনভাবে রঞ্জিত যে, তাদের কোনো অবস্থাই বিচলিত করতে পারে না; কাজেই তারা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কে জড়িত– এ সম্পর্ক তারা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে, কিন্তু এ সম্পর্কে যারা বুঝে না তাদের কোনো ভাষা দিয়ে এ কথা তারা বুঝাতে পারে না। কারণ এটা তো কোনো কথা নয়– এটা হচ্ছে অন্তরের এক বিশেষ অবস্থা– এটা অন্তরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়, সেখানেই এটা লালিত পালিত ও মযবুত হয়। অবশেষে এ বিশ্বাস তাকে যাবতীয় ভয়-ভীতির উর্ধ্বে তুলে তাকে নির্লিপ্ত-পরিতৃপ্ত করে দেয়– এনে দেয় তার হৃদয়ে অনাবিল শান্তির অনুভূতি। আর তখন সে অনুভব করে যে, সৃষ্টির বুকে সে একা নয়, বান্ধববিহীন নয়। আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে সৃষ্টির লীলাভূমি। সবাই তো এক আল্লাহর, তিনিই সবার সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা, তাঁরই বান্দা ও অনুগত বান্দা হওয়ার কারণে সবাই তার প্রতি দরদী সহানুভূতিশীল। আল্লাহর মোমেন বান্দা মযবুত করে ধরে রেখেছে সেই শক্ত রশি যা বেঁধে রেখেছে গোটা সৃষ্টির বস্তুনিচয়কে, যা ছড়িয়ে রয়েছে তার চতুর্দিকে, আর সবাই আল্লাহর সৃষ্টি হওয়ার কারণে সত্যবাদী ও সত্যানুসারী।

এ পৃথিবীর প্রকৃতির মধ্যে কোথাও কেউ এমন হতভাগা নেই যে আল্লাহ তায়ালার সাথে তার মহব্বতের সম্পর্ক বিঘ্নিত করতে পারে। নেই পৃথিবীতে গতিশীল এমন কেউ বা এমন কিছু, যা সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে কারণ তার অর্থ দাঁড়াবে, যে মজবুত রশি ধরে রাখার কারণে সৃষ্টিকর্তার সাথে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে, তার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা। সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জানে না, কেন এ ধরার বুকে সে এসেছে, কেন সে গতিশীল রয়েছে এবং কেন তারা জীবনে পরস্পর সহযোগিতা করে চলেছে? নেই এমন হতভাগা কেউ যে চলমান এ সৃষ্টির বুকে সৃষ্টিকুলের সবাইকে দুশমন মনে ভয় করে, কারণ তার ও সৃষ্টিকুলের সবার মধ্যে যে গোপন সম্পর্ক রয়েছে তা অবশ্যই সে অনুভব করে। আর নেই এমন কেউ যে নির্জন মরুর বুকে নিঃসংগ ও একাকী অবস্থায় পালিয়ে বেড়াতে চায়, কোনো সাহায্যকারী ছাড়া কোনো পথপ্রদর্শক ছাড়া এবং কোন পরিচালক ছাড়া একেবারেই একাকী নিজ বুদ্ধিতে চলতে চায়, এমন কেউও নেই।

জীবনে এমনও কিছু মুহূর্ত আসে যখন মানুষ নিঃসংগ ও মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যায়, আর সে একমাত্র আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাঁর সহায়তার ওপর নিজেকে সোপর্দ করে সে নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। এ সময় যতোই শক্তিশালী, যতোই দৃঢ়চেতা, যতোই শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী সে হোক না কেন, সে বড়ই সংকট বোধ করে, সে সময় আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই তার থাকে না। এমন সময় একমাত্র মোমেনের হৃদয়ই আল্লাহকে স্মরণ

করার কারণে অন্য কারো পরওয়া করে না এবং সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন হয়ে যায়; এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'হাঁ, আল্লাহর স্মরণেই নির্লিপ্ত ও প্রশান্ত হয়ে যায় মন।'

এহেন আল্লাহমুখী ও আল্লাহনির্ভর জনগোষ্ঠীই হচ্ছে আল্লাহর দিকে রুজুকারী, তারা আল্লাহকে স্মরণ করার কারণেই পরিতৃপ্ত নিশ্চিন্ত হতে পারে, যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের শেষ পরিণতি সুন্দর করে তোলেন এবং যতো বেশী তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকবে এবং যতো বেশী জীবনের কাজগুলো সুন্দর করবে, ততো বেশী তাদের হৃদয়ে নেমে আসবে নিশিন্ততা, পরিতৃপ্তি, নিরুদ্বিগ্নতা ও নির্ভাবনা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে সম্মান, সৌন্দর্য ও সুন্দর পরিণতি।

'তূবা' কুবরা-র সম পদবাচ্য, যার অর্থ দাঁড়ায় প্রাধান্য, মান সম্ভ্রম বা প্রভাব-প্রতিপত্তি। আল্লাহর দিকে রুজুকারী যারা, দুনিয়ায় তাদের মান সম্মান (যা মরণের পরে টিকে থাকে) বাড়ার সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে, তাদেরই জন্যে রয়েছে উত্তম ও চমৎকার প্রত্যাবর্তন স্থান।

অপরদিকে যারা 'নিদর্শন নিদর্শন' করে পাগল তারা জীবনে শান্তি পায় না, পায় না তৃপ্তি, স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা ও ঈমানের মজা। হয়রান পেরেশান হয়ে তারা জীবনভর আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার নিদর্শন দেখার জন্যে দাবী করে ফেরে এবং বার বার দাবী করে অলৌকিক শক্তি ও মোজেযা দেখানোর।' হে রসূল আমার, এমন তো নয় যে, তুমিই প্রথম এ শিক্ষা নিয়ে এসেছো, যার কারণে ওদের কাছে এটা একটা নতুন বা অভিনব জিনিস মনে হতে পারে। ইতোপূর্বে কতো জাতি এসেছে গেছে এবং এসেছে তাদের কাছে বহু রসূল। এতদসত্তেও যদি ওরা তোমার কথায় কান না দেয়, অবজ্ঞাভরে তোমার থেকে দূরে সরে যায় , সে অবস্থায় তোমার কাজ হচ্ছে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এমনি করে তোমাকে পাঠিয়েছি, আমি মহান আল্লাহ, একটি জাতির মধ্যে গুজরে গেছে ইতিপূর্বে বহু বহু জাতি, যাতে করে তুমি পড়ে শোনাও তাদের কাছে কেতাব, যা আমি মহান আল্লাহ পাঠিয়েছি তোমার কাছে ওহীস্বরূপ, কিন্তু তারা অস্বীকার করছে দয়াময় আল্লাহকে। বলো (হে রসূল,) তিনি আমার প্রতিপালক, নেই তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, সর্বময় কর্তা, বাদশাহ আইনদাতা আর কেউ, তাঁর ওপরেই ভরসা করেছি আমি এবং তাঁর কাছেই রয়েছে সবার প্রত্যাবর্তনস্থল।'

কাফেরদের আচরণ ও কোরআনের বৈশিষ্ট্য

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তারা অস্বীকার করছে দয়াময় আল্লাহকে যাঁর করুণারাশি ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে, যাঁর স্মরণেই অন্তরে নেমে আসে পরিতৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা এবং তাঁর মেহেরবানীর কথা মনকে ছেয়ে ফেলে। সুতরাং হে নবী আমার, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে, শুধু তাদের নিকট সেই সব আয়াত পড়ে শোনানো, যা আমি মহান আল্লাহ নাযিল করেছি তোমার কাছে, আর এই কাজের জন্যই তো তোমাকে আমি পাঠিয়েছি। এরপর যদি ওরা তোমার কথা শুনতে ও মানতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের কাছে ঘোষণা করে দাও যে, তোমার ভরসা একমাত্র আল্লাহর ওপরই রয়েছে, আর (তোমার দায়িত্ব পালন শেষে) তুমি তাঁর কাছেই ফিরে যাবে, তিনি ছাড়া অন্য কারো দিকে তোমার খেয়াল করার কোনো প্রয়োজন নেই।

অবশ্যই এটা স্পষ্ট কথা যে, তোমাকে আমি মহান আল্লাহ পাঠিয়েছি যাতে করে তুমি ওদের কাছে এই কোরআন পড়ে শোনাও, পড়ে শোনাও এই মহাবিস্ময়কর, সদা সর্বদা পঠিতব্য মহাগ্রন্থ আল কোরআন, এখন ওদের দাবী অনুযায়ী যদি এই কোরআন দ্বারা পাহাড়কে চালিয়ে দেয়া হতো, কোন যমীনকে খন্ডিত করে দেয়া যেতো, অথবা যদি কোন মৃতকে যিন্দা করে তোলা হতো, তাহলে হয়তো ওদের বিবেচনায় এ গ্রন্থ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বা প্রভাব বিস্তারকারী হতো, কিন্তু তবুও আল্লাহকে বুঝার জন্যে, তাঁর শক্তি-ক্ষমতা, অলৌকিক ও অস্বাভাবিক নিদর্শনাবলী দেখানোর ওদের দাবী শেষ হয়ে যেতো না এবং ওরা ঈমানও আনত না (যেমন করে পূর্ববর্তী উম্মতদের এমন বহু নিদর্শন দেখানো সত্তেও তারা ঈমান আনেনি এবং চেয়ে দেখো এসব কথার বাস্তব সাক্ষী আহলে কেতাবরা এখনও বর্তমান রয়েছে)। এ মহা পবিত্র ভাষণ যিন্দা দিল জনগণের কাছে এসেছে। এতদসত্তেও যদি ওরা এ পাক কালামের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে বুঝতে হবে, ওদের সম্পর্কে মোমেনদের হতাশ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে; তবুও মিথ্যা দোষারোপকারী এবং কালামুল্লাহকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী দলের লোকদের দাওয়াত দিতে থাকতে হবে যতোদিন না তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার ওয়াদা সত্যে পরিণত হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যদি কোরআন দ্বারা পাহাড়কে চালিয়ে দেয়া হতো .... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা খেলাফ করেন না।' (আয়াত-৩১)

অবশ্য এটা বাস্তব সত্য কথা, কোরআন দ্বারা পাহাড় সঞ্চালন করা, যমীনকে খন্ডিত করা বা মুর্দাকে যিন্দা করা থেকেও আরো বড় কাজ সংঘটিত হয়েছে। নবী কারীম (স.) যখন কোরআনুল কারীম পড়েছেন, এই পঠনই শ্রোতাদের মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছে, এমন প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছে তাদের হৃদয়কে যে, যে কোন শ্রোতাই প্রভাবিত হয়েছে। যারা একবার খেয়াল করে এ পাক কালাম শুনেছে, তারা আর এর প্রভাববলয় থেকে সরে যেতে পারেনি– আকণ্ঠ পান করেছে এবং অমিয় সুধা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। এভাবে এই কোরআনের আওয়ায এবং এর শিক্ষা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিয়েছে– সৃষ্টি করেছে মানবেতিহাসে নতুন এক অধ্যায়।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এটা নিজস্ব ও অনবদ্য এক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে এর দাওয়াত ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যার মধ্যে, এ বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রয়েছে এর আলোচ্য বিষয়াবলীর মধ্যে এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগের মধ্যে। অবশ্যই এ পাক কালাম অভিনব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। অলৌকিক শক্তি প্রভাব ও সৌন্দর্যের ভান্ডার, এ পাক কালামের মজা সেইই পায় যার উন্নতমানের রুচি-বোধ, প্রখর আস্বাদন শক্তি, এ রহস্য ভান্ডার থেকে চয়ন করার মতো প্রবল বোধশক্তি, সত্যকে বুঝার ও দেখার মতো তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং এ মহা জ্ঞানগর্ভ কথার গভীরে পৌঁছানোর মতো হৃদয়ের প্রশস্ততা রয়েছে। যে উদ্দেশ্যে এ মহা বিস্ময়কর গ্রন্থ নাযিল হয়েছে তা অনুধাবন করার মতো যথাযথ যোগ্যতা তাদের রয়েছে যারাই এ পাক কালামের সাক্ষাত পেয়েছে, যাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে এ মহাবাণী, তারা এমন এক মহা ময়দানে পরিভ্রমণ করেছে যা পাহাড়-পর্বত থেকে অনেক উন্মুক্ত, অনেক বেশী প্রশস্ত। এ মহাগ্রন্থ হচ্ছে বিশ্বের অজানা অচেনা অসংখ্য জনগণের বিস্মৃত ইতিহাস, মহাকালের বুকে মুছে যাওয়া দেশের অজানা অনেক কথা। এ কালাম বহু জনপদের উত্থান পতন ও তার কারণসমূহের খবর দিয়েছে, পরিক্রমণ করিয়েছে, সীমাহীন পার্বত্যাঞ্চল ও দেশ বিদেশে, কঠিন শিলা থেকে আরও বহু কঠিন পাথরের আবরণীতে। আর এটা সহজেই বুঝার কথা যে, সে শিলা হচ্ছে সেই জগদ্দল পাথর, যা যুগের পর যুগ ধরে

মানুষের সুস্থ বুদ্ধির ওপর ভীষণভাবে চেপে বসে ছিলো, তার স্বাভাবিক যুক্তি বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে রহিত করে রেখেছিলো যা অজ্ঞানতার সেই কঠিন পর্দা অপসারিত করেছে যার অন্ধকার আবরণে ঢাকা থাকায় (বিবেকবর্জিতভাবে) মানুষ মানুষের গোলামী করেছে, স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির পায়ে লুটিয়ে পড়ে মানবতাকে লাঞ্ছিত করেছে। তারপর এ পবিত্র কালাম এসে অগণিত অসংখ্য মানুষের মুর্দা দিলকে যিন্দা করেছে, এটা ছিলো মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা থেকে আরও অনেক কঠিন-এসব মুর্দা দিল নিয়ে কতো কতো আত্মগর্বী অহংকারী জাতি গাছপালা, পশু পাখি ও মাটি-পাথরের গড়া মূর্তির বেদীমূলে অবলীলাক্রমে আত্মনিবেদন করেছে, কিন্তু আল কোরআন এসে হিংস্র-নিষ্ঠুর ও বর্বর আরববাসীর অশান্ত উচ্ছৃংখল ও দুঃসহ জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। এ কঠিন ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসা কিসের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, কিসে কোন সে সোনার কাঠির ছোঁয়া পাপাচারী হঠকারী জাতির চিন্তা চেতনার মোড় ঘুরে গেলো? কিসে তাকে অজ্ঞানতার অন্ধত্ব থেকে সাদরে তুলে এনে সোনার মানুষে পরিণত করলো, কিসের প্রচন্ড আঘাতে ওই নিকষ কালো জাহেলিয়াতের পর্দা ছিন্ন ভিন্ন করে স্বর্ণযুগের সূচনা করলো? নয় কি সে এই মহামোহিনী গ্রন্থের সুমধুর বাণী, নয় কি তা এ পাক কালামের ছায়াতলে গড়ে ওঠা সাহাবায়ে কেরামের বলিষ্ঠ পদধ্বনি, নয় কি তা নবীকুল শিরোমণির পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব মানবতার জীবন বিধান ও সকল প্রকার গোলামী থেকে চূড়ান্তভাবে মুক্তি পাওয়ার মহাবাণী? অবশ্যই, এ পাক কালাম ঘুমন্ত মানবতাকে জাগিয়ে তুলেছে, তাদের চোখের ধাঁধা অপসারিত করেছে, তাদের ভুলে যাওয়া ইতিহাস স্বরণ এবং যিন্দা করে দিয়েছে, তাদের মুর্দা দিলকে জীবন্ত করে দিয়েছে।

'বরং সব কিছুই আল্লাহর, তিনিই মালিক সকল সৃষ্টির।'

কোরআন নাযিল হওয়ার সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তীকালে যদি কোনো জাতির অন্তর কোরআনের কথায় প্রভাবিত না হয়, সে অবস্থায় সেই মোমেনরা, যারা আল কোরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর জন্যে নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে, তারা হতাশ হয়ে গেলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না, তখন তাদের পক্ষে এ বিষয়টিকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়াই হবে বরং ভালো। আল্লাহ তায়ালা চাইলে সকল মানুষকে একই প্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন করতে পারতেন এবং চাইলে সবাইকে হেদায়াত দিতে পারতেন, যেমন ফেরেশতামন্ডলীর সবাইকে সঠিক পথপ্রাপ্ত বানিয়েছেন, কিন্তু তিনি তা চাননি, সবাইকে একইভাবে হেদায়াত করেননি এবং তাঁর হুকুম বলে সবার জন্যে হেদায়াত গ্রহণ বাধ্যতামূলকও বানাননি; বরং তিনি যে বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার জন্যে তাকে এভাবে মযবুতও করেননি।

অতএব, মোমেনদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য মানুষদের আহ্বান জানাতে থাকা। আর যখন আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মতকে শাস্তি দিতে গিয়ে একেবারে মূলোৎপাটিত করে ছেড়েছেন, মুহাম্মাদুর রসূল (স.)-এর আগমনের পর কোনো উম্মতকে ওইভাবে ধ্বংস করবেন না বলে যখন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন, তখন তারা গ্রহণ করুক আর নাই করুক, তাদের দাওয়াত দিয়েই যেতে হবে।

'অথবা তাদের বাড়ীর কাছাকাছি আযাব নাযিল হবে।'

ওপরের কথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চাইছেন যে, তোমরা তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখ এবং ছেড়ে দাও তাদের যেন তারা আযাবের ভয়ে পেরেশান হয়ে থাকে এবং যে কোনো মুহূর্তে আযাব এসে যাবে– সদা সর্বদা এই অস্থিরতার মধ্যে কালাতিপাত করে।

'চলতে থাকুক তাদের এই অবস্থা তাদের সম্পর্কে আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা না আসা পর্যন্ত।'

যিনি নিজেই তাদের সকল নেয়ামত দান করেছেন এবং তাদের নির্ধারিত জীবন যাপন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার ওয়াদা করেছেন। কাজেই যতো অন্যায় ও বাড়াবাড়িই তারা করুক না কেন, উক্ত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকবেই। এটাই আল্লাহর ওয়াদা।

'নিশ্চয়ই, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না।'

তাদের জীবন সমাপ্ত হওয়ার জন্যে নির্ধারিত যে সময় রয়েছে তা যখন আসার তখন তা আসবেই, ওয়াদা করা সময়ে আসবেই আসবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আজ বিভিন্ন উদাহরণ আমাদের সামনে হাযির আছে এবং অতীতের জাতিসমূহের কর্মকান্ড, সত্য বিরোধিতা ও তার পরিণতির বিবরণের মধ্যে বর্তমানের জাতিসমূহের জন্যে বহু শিক্ষাও রয়ে গেছে। রয়েছে হুঁশিয়ারী এবং তাদের সতর্ক হওয়ার সময় দেয়ার কথা। এরশাদ হচ্ছে, 'আর তোমার পূর্বে বহু রসূলকে উপহাস বিদ্রূপ করা হয়েছে, সে সময় আমি কাফেরদের কিছু দিনের জন্যে ঢিল দিয়েছি, তারপর তাদের পাকড়াও করেছি (এবং চূড়ান্ত আযাব দান করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি, দেখো) কেমন হয়েছে তাদের পরিণতি।'

এ এমন একটা প্রশ্ন, যার জওয়াবের প্রয়োজন নেই। যে পরিণতি তাদের হয়েছে, সে সম্পর্কে বহু যুগ ধরে পার্শ্ববর্তী ও পরবর্তীকালের লোকদের মাঝে আলোচনা হতে থেকেছে।

এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে তা হচ্ছে শরীকদারদের বিষয় (যাদের আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতায় অংশীদার বানানো হয়েছে)। ওদের বিষয়ে সূরার প্রথম অধ্যায়ে একইভাবে কিছু ইংগিত করা হয়েছে। ঘৃণাপূর্ণ বা তীর্যকভাবে কথাটা এখানে তোলা হয়েছে। কারণ আল্লাহর ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান এটা কে না দেখছে– এতদসত্তেও তাঁর ক্ষমতায় অপর কাউকে অংশীদার বানাতে চাওয়াটা কত বড় অপরাধ তা যে কোনো লোকই বুঝতে পারে। এজন্যে তাদের বলা হচ্ছে, এ দুনিয়ায় তারা যা করে করুক এবং দুনিয়াটাকে মনের মতো ভোগ করে নিক। এ সময়টা পার হয়ে গেলেই দুনিয়াতেই এই মিথ্যা রচনাকারীদের জন্যে নির্ধারিত আযাবের ছবি তাদের সামনে ভেসে ওঠবে। তারপর তো রয়েছে আখেরাতের আযাব যা হবে আরও সাংঘাতিক আরও কঠিন। এ আযাব সংঘটিত হবে মোত্তাকীদের সাক্ষাতে, যারা নিরাপদ অবস্থানে এবং শান্তিতে থাকবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি (ভালো মন্দ) যা কিছু উপার্জন করেছে তার ওপর দৃষ্টি রাখার মতো সদা সর্বদা কে দাঁড়িয়ে আছে? (কেউ নয়, আল্লাহ ছাড়া।) ওরা আল্লাহর ক্ষমতার সাথে যাদের অংশীদার খাড়া করেছে– (তারা কি পারবে এ কাজ করতে?)....... নেই ওদের জন্যে আল্লাহর (আক্রোশ) থেকে বাঁচানেওয়ালা কেউ ....'

মোত্তাকীদের জন্যে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে এমন বাগিচা, যার নীচু ও পাশ দিয়ে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, যার মধ্যে ফলমূল ও খাদ্যবস্তু থাকবে সব সময়েই এবং ছায়াও থাকবে চিরস্থায়ীভাবে। যারা সদা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, সেসব জান্নাতী পরিণতিতে পাবে এ বাসস্থান আর কাফেরদের পরিণতি হবে দোযখ..........'

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর পরিদর্শক, তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর সদা-সর্বদা কড়া দৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন। গোপনে বা প্রকাশ্যে যে যা করছে সবই তাঁর নখদর্পণে রয়েছে, কিন্তু আল কোরআনে আল্লাহর এই তদারকির কথাটা এমন চমৎকারভাবে বলা হয়েছে যা শোনার সাথে সাথে মনের ওপর দাগ কেটে যায় এবং ভয়ে মানুষের গা কাঁপতে থাকে।

তাহলে কে সেই সত্ত্বা যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনের ওপর তদারকি করার জন্যে সদা-সর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে?

অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, তার সমস্ত কাজ দেখাশুনা করার জন্যে সদা সর্বদা এক অতন্দ্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে এবং যখন যা কিছু সে করছে সবই তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে। তিনি কে? অবশ্যই তিনি আল্লাহ ছাড়া কেউ নন। অন্য কারো এ ক্ষমতা নেই যে, সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ দেখতে পাবে এবং রেকর্ড করে রাখতে পারবে। এ কথা যদি প্রকৃতপক্ষে মানুষ বুঝত তাহলে কি তার গোটা দেহ কাঁপতে থাকতো না? আল কোরআন যেভাবে কথাটা ব্যক্ত করেছে তাতে পাঠকের হৃদয়ে এভাবে দাগ কাটে এবং সমঝদার পাঠক ভয়ে কাঁপতে থাকে।

এখন দেখতে হবে, আপনি আমি আমরা কয়জন মানুষ এমন আছি যারা আল কোরআন অধ্যায়ন করেছি, কয়জন বুঝে পড়ছি এবং কয়জন আছি আমরা এ হিসাব করি যে, আল্লাহ তায়ালা সদা-সর্বদা আমাদের কাজের তদারক করছেন এবং তাঁর কাছে হিসাবের সেই মহাদিনে সব কিছুর পুংখানুপুংখরূপে হিসাব দিতে হবে, আমাদের কয়জনের শরীরে আল্লাহর তদারকির অনুভূতি কম্পন সৃষ্টি করে। আসলে আধুনিকতা আমাদের গোটা অস্তিত্বের ওপর যে প্রভাব ফেলে চলেছে তার থেকেও অনেক অনেক বেশী আল্লাহর তদারকির অনুভূতি আমাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

এটাই কি ঠিক? মানুষ কি মনে করে তাদের সকলেই কারো নযরে আছে? তাই যদি হবে তাহলে কেমন করে তারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়? এতে বুঝা যায়, মুখে তারা যাই বলুক না কেন তাদের বাস্তব কাজ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর তদারকি এবং তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে এসবের কোনোটাই সঠিকভাবে বিশ্বাস করে না।

'আর বানিয়ে নিয়েছে তারা আল্লাহর জন্যে বহু অংশীদার।'

'প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করছে (ভালো বা মন্দ), তার ও তার সেসব উপার্জন তিনি তদারক করে চলেছেন প্রতি মুহূর্তে; তাঁর থেকে কোনোটা দূরে সরে যায় না এবং কোনোটা হারিয়েও যায় না। '

'বলো, ওদের নাম বলো!' ওরা অজানা, অচেনা– ওরা বিস্মৃতির গহ্বরে লুকায়িত নাম ওদের ছিলো এক সময়ে, কিন্তু ওদের কথা বলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওদের নেই কোনো নাম-নিশানা। পৃথিবীর আর দশ জনের মতো ওরা বিস্মৃতির সাগরে ডুবে গেছে।

'অথবা তোমরা কি জানাচ্ছো তাঁকে এমন কিছু এই পৃথিবীর মধ্যে, যার খবর তাঁর কাছে নেই? ছিঃ! ভাবতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না, তোমরা মানুষ, তোমরা কি এমন কিছু যা আল্লাহ তায়ালা জানেন না? তোমরা কি জানতে পারছো যে, পৃথিবীতে কতো শত সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আছে, আর তারা আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে রয়েছে? এটা একটা প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে ওরা এর কল্পনা করতেও সাহস করে না, এতদসত্ত্বেও তারা বর্তমানের ভাষায় কথা বলছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, সকল ক্ষমতার মালিক তো একজনই হতে পারে। ভাগাভাগি হলে তো আর সকল ক্ষমতার মালিক হওয়া গেলো না। ওরা বলে, ওরা আল্লাহকে ভয় করে, তবুও আরও কেউ ক্ষমতাধর আছে বলে ওরা দাবী করে।

'অথবা ওরা বাহ্যিক ভাসাভাসা ও জেনে বুঝে অসার কথাবার্তা বলছে'

ওইসব মাবুদদের কথা ওরা ভাসাভাসাভাবে বলছে, ওদের এসব বাজে কথার পেছনে কোনো দলীল নেই। তাহলে কি ওই মেকী মাবুদের কথা যা ওরা বলে একটা বাজে কথা, যা মানুষ এমনিতেই বলে– যে কথার পেছনে নেই কোনো যুক্তি, নেই কোনো প্রমাণ। এই বাজে কথাটি পরবর্তী কথা দ্বারা ঘৃণাভরা শব্দে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে,

'বরং, কাফেরদের কাছে তাদের ওই ষড়যন্ত্রমূলক কথাটাকে সুন্দর করে তোলা হয়েছে, আর যাকে আল্লাহ তায়ালা সঠিক পথে চলতে দেন না, তার জন্যে কোনো পথপ্রদর্শক নেই।'

এখন সমস্যা হচ্ছে যে, এ সব মানুষ আল্লাহর নবীকে এবং তাঁর আনীত আল্লাহর কেতাবকে অস্বীকার করেছে এবং ঈমানের দলীল প্রমাণসমূহ গোপন করে রেখেছে, আর তারা নিজেদের মনকে সত্যের পক্ষে যাবতীয় দলীল প্রমাণ গ্রহণ করা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে। যার কারণে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী ফয়সালা হয়ে গেছে। তাদের মন সত্য সন্দর্শনে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ায় এবং সত্যের অনুভূতি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলায় তাদের জানাচ্ছে যে, তারা সঠিক পথেই আছে; আর তারা সত্য বিরোধিতায় যে তৎপরতা চালাচ্ছে এবং সত্যের বাতি চিরতরে নিভিয়ে দেয়ার জন্যে যে চক্রান্ত করছে তা কোনো অন্যায় কাজ নয়; বরং তারাই সঠিক কাজ করছে। অর্থাৎ তারা এতোদূর অভিশপ্ত হয়ে গেছে যে, তাদের বিবেক মরে গেছে এবং প্রকৃতি প্রদত্ত সত্যানুভূতিরূপ নেয়ামত থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে গেছে। এইভাবে তারা সাফল্যের সঠিক পথ থেকে বহু বহু দূরে সরে গেছে, সুতরাং তাদের আর কেউ হেদায়াত করতে পারবে না; কারণ গোমরাহীর কারণ যারা সৃষ্টি করবে তাদের ওপর আল্লাহর নিয়ম চালু হওয়া বন্ধ থাকবে না। এসব সত্যবিমুখ অন্তর, যারা সত্য থেকে ফিরে গেছে, তাদের জন্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে সর্বপ্রকার আযাব,

'তাদের জন্যে আযাব রয়েছে দুনিয়ার যিন্দেগীতে।'

একথা দ্বারা বুঝা গেলো, তাদের এ জীবনে নানা প্রকার দুঃখ আঘাত স্পর্শ করেছে আর সরাসরি আযাব তাদের ওপর নাযিল না হলেও নিকটবর্তী এলাকাসমূহে যখন কোনো শাস্তি নেমে এসেছে, তখন প্রতি মুহূর্তে ওই শাস্তি এদিকেও আসার আশংকায় অন্তর প্রাণ তাদের সদা-সর্বদা পেরেশান হয়ে থেকেছে। এসব যদি নাও হয়, ঈমান থাকার ফলে যে শান্তি, যে নিশ্চিন্ততা মনের মধ্যে বিরাজ করে, তার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে মনের মধ্যে যে অস্থিরতা বিরাজ করে তা তাদের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে দেয়, তাদের আহার নিদ্রা সব কিছুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, জীবন তাদের যেন এক নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা হয়ে যায়। সর্বোপরি রয়েছে, এ জীবন শেষে তারা কোথায় যাবে সে চিন্তা, কি হবে, সেখানেও নেই সান্ত্বনা, নেই কোনো আশা ভরসা, নিজেদের কৃতকর্মের কারণে অন্তরের মধ্যে কোনো দাবী পয়দা হয় না; বরং শুধু হতাশা আর হতাশার দীর্ঘশ্বাস তাদের ঘিরে রাখে। একথাই বলা হয়েছে নীচের আয়াতাংশে,

আর অবশ্যই আখেরাতের আযাব (কষ্ট ও শাস্তি) আরও কঠিন।'

মানুষের দুশ্চিন্তা ও পরপারের যিন্দেগীতে কি হবে তার কোনো সীমা পরিসীমা করতে না পারার অবস্থায় তাদের ছেড়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, 'নেই তাদের জন্যে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার কেউ।'

অর্থাৎ, তাঁর পাকড়াও যখন এসে যাবে তখন একটু দরদ একটু সহানুভূতির কথা শোনানোর জন্যে কেউ এগিয়ে আসবে না। যখন তাদের ওপর আযাব নাযিল হয়ে যাবে তখন কোথাও কেউ তাদের বাঁচানোর মতো থাকবে না ....।

ওপরে যাদের কথা বলা হলো এদের বিপরীত দ্বিতীয় দল হচ্ছে মোত্তাকী (আল্লাহভীরু) লোকদের দল। এই মোত্তাকী গোষ্ঠী ঈমান ও যাবতীয় নেক কাজ করার মাধ্যমে নিজেদের আল্লাহ প্রদত্ত কষ্ট থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তারা নিরাপদ হয়ে গেছে আযাব থেকে; বরং এসব নিরাপত্তার ঊর্ধ্বে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন।

'মোত্তাকীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন তার উদাহরণ হচ্ছে, ... এমন মনোরম বাগিচা যার পাদদেশে প্রবাহমান থাকবে ছোট ছোট নদী, এ বাগিচার ফলমূল খাদ্য খাবার কখনও শেষ হয়ে যাবে না, এর সুশীতল ছায়ারও কোনো অবসান হবে না।'

এ জান্নাতের ভোগ সামগ্রী ও আরাম আয়াসের চিত্র এভাবে আঁকা হয়েছে– অনন্ত অসীম ওই জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য সম্ভার থাকবে সেখানে চিরদিন। এ অফুরন্ত ফলমূল ও যাবতীয় নেয়ামতের আশ্বাস বাণী মোমেনদের জন্যে এ জীবনের দুঃখ কষ্ট ও সংকট সমস্যার বোঝা লাঘব করে দেয়, ছড়িয়ে দেয় মনের পর্দার ওপর পরম প্রশান্তি। যাবতীয় দুঃখ কষ্ট, যা দুনিয়ার জীবন নিয়ে ব্যস্ত পাপাচারীদের জন্যে নেমে আসবে, তার বিপরীতে আল্লাহভীরু নেক লোকদের জন্যে সকল প্রকার চিরস্থায়ী নেয়ামতভরা জান্নাতের আশ্বাস রয়েছে। পরিশেষে ওই জান্নাত এবং এ আযাব ওদের ও এদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত অবধারিত– এর কোনো নড়চড় নেই। এরশাদ হচ্ছে, 'তাকওয়া যারা অবলম্বন করেছে তাদের পরিণতি হচ্ছে ওই জান্নাত, আর কাফেরদের পরিণতি হচ্ছে দোযখ।'

তাওহীদ ও রেসালাত

আলোচনার ধারায় এগিয়ে চলেছে ওহী ও তাওহীদ একই সাথে। এ দু'টি বিষয়ের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে কোরআন ও রসূল (স.) সম্পর্কে আহলে কেতাবদের দৃষ্টিভংগির। রসূলকে জানানো হয়েছে, তাঁর কাছে যা কিছু নাযিল হয়েছে তাই-ই হচ্ছে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কথা এবং এ কথাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ কেতাব কোনো নতুন কথা আনেনি; বরং অবিকল সেসব কথা সেসব শিক্ষাই এনেছে যা নিয়ে এসেছিলো পূর্ববর্তী কেতাবসমূহ, আর (পূর্ববর্তী কেতাবগুলো পরিবর্তিত হওয়ার কারণে) এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত কেতাব, (সব কিছু ছেড়ে) এর দিকেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে, যেহেতু মানুষ কর্তৃক পরিবর্তিত ও ভুলে ভরা সংস্করণগুলো থেকে সকল যুক্তিতে বেশী গ্রহণযোগ্য একই শিক্ষা সম্বলিত এই আল কোরআন যা আল্লাহ কর্তৃক সকল মানুষের হেদায়াতের জন্যে প্রেরিত ও অনুমোদিত হয়েছে এবং যিনি নাযিল করেছেন এই কেতাব, সেই মহান আল্লাহ কর্তৃকই অন্য সকল কেতাব নাকচ ও পরিত্যক্ত হয়েছে। এ কেতাবে বর্ণিত এই মহান দ্বীন গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। এ মহান কেতাবে পূর্ববর্তী কেতাবসমূহের মধ্যে নাযিল করা সকল জরুরী বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং বাদ দেয়া হয়েছে সেগুলো, যেগুলো আল্লাহ তায়ালা নিজেই বাদ দিতে চেয়েছেন। সুতরাং রসূল মোহাম্মদ (স.)-কে অবশ্যই সে কথার ওপর থাকতে হবে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর নাযিল করেছেন। তিনি কিছুতেই ছোট-বড় যে কোনো বিষয়ে আহলে কেতাবদের খেয়াল খুশীর আনুগত্য করতে পারেন না। এখন ওরা যদি কোনো নিদর্শন দেখাতে বলে, তো ওদের সাফ সাফ বলে দিতে হবে, নিদর্শন বা মোজেযা প্রদর্শন আল্লাহর নিজের ব্যাপার, তাঁর (রসূলের) কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়া।

'আর যাদের, আমি মহান আল্লাহ দিয়েছিলাম কেতাব .... এখন তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পৌঁছে দেয়া, আর আমার কাজ হচ্ছে হিসাব নেয়া।' (আয়াত ৩৬-৪১)

অবশ্য আহলে কেতাবদের মধ্যে সত্যবাদী ও সত্যপন্থী একটি দল আছে, সে দলটি তাদের দ্বীনের ওপর নিষ্ঠার সাথে টিকে আছে। এ দলটি তাদের দ্বীনের মূল বিষয়গুলো এ মহান কেতাব আল কোরআনের মধ্যে পাচ্ছে, তারা দেখতে পাচ্ছে তাদের নিজেদের কেতাবে এবং অন্যান্য যেসব আসমানী কেতাব তারা অধ্যয়ন করেছে, সবগুলোর মধ্যে সাধারণভাবে যে বিষয়টি তারা

দেখেছে তা হচ্ছে 'তাওহীদ', অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সব কিছুর মালিক, বাদশাহ, আইনদাতা ও শাসনকর্তা। একমাত্র তাঁর সামনেই মাথা নত করতে হবে এবং তাঁর হুকুমমতোই জীবন যাপন করতে হবে। সকল কেতাবের মধ্যেই তকদীর সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। এসব কথা বিবেচনায় তারা দেখতে পাচ্ছে, সকল কেতাবধারী জাতি একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ বুঝ পেয়ে তারা খুশী হয়ে গেছে এবং ঈমান আনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খুশী হওয়া বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, সত্যের সন্ধান পেয়ে তাদের সুন্দর অন্তর পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। আর তাদের মনটা আরও বড় হয়ে গেছে এটা দেখে যে, এ নতুন কেতাব তো তাদের কেতাবের কথাগুলোকেই সত্যায়িত করছে।

'আবার ওই সব দলের মধ্যে কোনো কোনোটা এ কেতাব অস্বীকারও করছে।'

ওইসব দল বলতে আহলে কেতাব ও মোশরেকদের বিভিন্ন দল উপদল বুঝানো হয়েছে। .... এখানে ঠিক কোন দলটি অস্বীকার ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে তা বলা হয়নি। কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা এ কেতাবকে উপেক্ষা করছে তাদের কথার জওয়াব দান করা।

'বলো, অবশ্যই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করি (নিরংকুশভাবে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর হুকুম মেনে চলি) এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি (তাঁর শক্তি ক্ষমতায় অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ না জানি)।'

অর্থাৎ নিরংকুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্য করতে হবে একমাত্র তাঁর এবং তাঁর (হুকুম পালন করার) দিকেই মানুষকে ডাকতে হবে। আর একমাত্র তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সেসব ব্যক্তির কাছে ইসলামের পূর্ণাংগ জীবন বিধান পেশ করতে, যারা আল কোরআনের কোনো কোনো কথা মানতে অস্বীকার করছিলো। কারণ তাদের জানানো প্রয়োজন ছিলো যে, ইসলাম গ্রহণ করা, কোরআন মানা এবং রসূল (স.)-কে মানলেই শুধু হবে না; বরং এটা মানতে হবে যে, মোহাম্মদ (স.) গোটা মানব জাতির জন্যে প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি এনেছেন সমগ্র মানব জাতির গোটা জীবনের জন্যে সকল দিক থেকেই পূর্ণাংগ এক ব্যবস্থা। একমাত্র এ ব্যবস্থাই পূর্ণাংগ, অর্থাৎ এ কেতাবই সকল মানুষের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে। অতএব, সবাইকে এ কেতাবের মধ্যে বর্ণিত সকল ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। যেহেতু এ কেতাব আল্লাহর প্রেরিত, যেহেতু মোহাম্মদ আল্লাহর হুকুমেই এ কেতাবের মধ্যে বর্ণিত নির্দেশাবলী তাঁরই শেখানো পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত করছেন, এ জন্যে এ পদ্ধতির সবটুকুই নির্ভুল, সবটুকুই গ্রহণ করতে হবে; এর কোনো এক অংশ বাদ দেয়া বা কোনোটা ত্রুটিপূর্ণ মনে করার কোনো অধিকার নেই কোনো মানুষের। আরও বুঝতে হবে, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি বিধান অন্যান্য বিধানের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে, সবগুলো বিধান বাস্তবায়িত করলেই এর সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য, এর কার্যকারিতা এবং এর সার্বিক সুফল পাওয়া যাবে। অন্যথায় বাঞ্ছিত ফল পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আহলে কেতাবদের কাছে এ মহান দ্বীনের পূর্ণাংগ ছবিটা পেশ করতে বলা হয়েছে, তাতে যে মানবে মানবে, আর যে না মানবে তার জন্যে কিছুই করার নেই। আরও জানাতে বলা হয়েছে, এ কেতাবের মাধ্যমে যে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা মানুষকে দেয়া হয়েছে তাই-ই হচ্ছে আল্লাহর সর্বশেষ হুকুম, তাঁর হুকুম সম্বলিত এ গ্রন্থ সর্বশেষ আসমানী কেতাব হিসাবে এসেছে এবং এ কেতাব এসেছে স্বয়ং আল্লাহর কাছে থেকে আরবী ভাষায়। সুতরাং এ কেতাবের নিজস্ব ভাষা আরবীতেই পঠিত ও প্রচারিত হতে হবে। অর্থ বুঝার ও বুঝানোর জন্যে এর তর্জমা ও তাফসীর হতে থাকলে কোনো সময় এর মূল ভাষা বাদ দিয়ে অন্য কোনো ভাষায়

(স্বাধীনভাবে) এর তর্জমা ও তাফসীর করা চলবে না, যাতে তর্জমা ও তাফসীরের মধ্যে কোনো মতভেদ দেখা দিলে এর মূল ভাষার সাথে মিলিয়ে নেয়া যায়। এর জন্যেই আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন,

'আর এমনি করেই আমি মহান আল্লাহ নাযিল করেছি একে আরবী বিধান হিসাবে।'

তোমার কাছে 'এল্‌ম' (সঠিক জ্ঞান) এসে যাওয়ার পর যদি তুমি ওদের লাগামহীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করো তাহলে জেনে রেখো, তোমার জন্যে থাকবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বন্ধু বা অভিভাবক এবং কোনো বাঁচানেওয়ালা।'

অতএব, নিশ্চিত ও ধ্রুব সত্য যে, যা তোমার কাছে এসেছে তাই-ই চূড়ান্ত সত্য, তাই-ই চূড়ান্ত জ্ঞান, আর বিভিন্ন দলের লোকেরা তাদের যেসব মনগড়া কথা বলছে, যেসব কথার পেছনে কোনো সঠিক যুক্তি বা সর্বগ্রাহ্য কোনো দলীল নেই, অথবা নেই কোনো নিশ্চিত জ্ঞান। রসূলুল্লাহ (স.)-কে সতর্ক করতে গিয়েই কথাটা বলা হয়েছে, যেন তিনি কোনো সময়, কারো কোনো কথায় নমনীয় না হয়ে যান। কারো কথা বা মত অনুযায়ী দ্বীনের কোনো কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এমন কি রসূল (স.) নিজেও দ্বীনের কোনো কিছু পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন না, অবশ্য রসূল (স.)-এর জন্যে এর প্রশ্নই আসে না। যেহেতু তিনি তো নিজেকে আল্লাহর অনুগত বান্দা বলেই জানেন এবং সর্বতোভাবে আল্লাহর অনুগত ও সর্বোচ্চ বিশ্বস্ত বলেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিশ্ববাসীর পরিচালক বানিয়েছেন এবং এতো বড় দায়িত্ব দিয়েছেন যা আর কাউকে দেননি। এক্ষেত্রে সর্বোপরি কথা হচ্ছে, তাঁর প্রাণ আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ।

আর যখন এ প্রশ্ন তোলা হয় যে, তিনি তো একজন মানুষ। এর জবাবে প্রথম কথা হচ্ছে, যতো রসূল প্রেরিত হয়েছেন সবাই মানুষই ছিলেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি মহান আল্লাহ অবশ্যই তোমার পূর্বে বহু রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের দিয়েছি স্ত্রী পরিবার পরিজন।'

আবার যখন এ প্রশ্ন তোলা হয় যে, তাঁকে তো কোনো মোজেযা বা অলৌকিক কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি, তো এর জওয়াব হচ্ছে, এ বিষয়টিতে তাঁর বলার কিছু নেই।, যেহেতু তিনি নিজে তো কোনো কিছু আনেননি। কোনো ক্ষমতা তাঁর নয়, এটা পুরোপুরি আল্লাহর ব্যাপার। তিনি নিজেই বলছেন, 'কোনো রসূলের কোনো সাধ্য নেই আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো নিদর্শন দেখানোর, কোনো মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করার।'

কোনো অলৌকিক ক্ষমতা (মোজেযা) দেয়ার প্রয়োজন হলে অথবা আল্লাহ তায়ালা চাইলে তিনি নিজেই তার ব্যবস্থা করেন।

আবার এ প্রশ্ন যখন তোলা হবে যে, এ রসূল ও তাঁর পূর্ববর্তী রসূলগণের মধ্যে ছোটখাট অনেক বিষয়ে যে মতভেদ আছে এর কারণ কি এবং আহলে কেতাবদের কাছে যেসব কেতাব আছে সেগুলোর সাথে আল কোরআনের মিল নেই কেন? এর জওয়াব হচ্ছে, 'প্রত্যেক যামানার জন্যে কেতাব এসেছে এবং এটাই হচ্ছে শেষ কেতাব।'

এ বিষয়ে আল্লাহর কথা,

'প্রতিটি সময়কালের জন্যে কোনো না কোনো কেতাব প্রেরিত হয়েছে। এ কেতাবের মধ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা যেটুকু ইচ্ছা মুছে ফেলেন এবং যেটুকু তিনি চান কায়েম রাখেন, আর (চূড়ান্ত কথা হচ্ছে) তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কেতাব।'

তারপর তিনি অতীতের কেতাবের মধ্য থেকে যেটুকু অকার্যকর বলে মুছে ফেলতে চেয়েছেন এবং পরবর্তীকালের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে যা রাখতে চেয়েছেন তা রেখেছেন, আর তাঁর কাছেই তো রয়েছে আসল কেতাব (যা পাঠিয়েছেন সেসব তো ওই আসল কেতাব থেকেই গৃহীত!) যখন যেখানে যতোটুকু দরকার তিনি বুঝেছেন, পাঠিয়েছেন। কোথায় কতোটুকু দেয়া প্রয়োজন তা তিনিই জানেন, সেভাবেই দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু রেখেছেন, অপ্রয়োজনীয় মনে করে হয়তো কিছু কিছু তিনি মুছেও দিয়েছেন। এসব ব্যাপারে একমাত্র তিনিই সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তাঁর এই নিয়ন্ত্রণ কাজে কারো কোনো হাত নেই, কারো আপত্তি জানানোরও কোনো অধিকার নেই।

আবার রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রেরিত কিছু কিছু অংশ ফেরত নিয়েছেন, অথবা তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত যা রাখার তা রেখেছেন, এই কিছু তুলে নেয়া এবং কিছু রাখার কারণে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ হতে কোনো অসুবিধা হয়নি, রেসালাতের কাজে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্ব বিস্তারের কাজে কোনো পার্থক্য আসেনি। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'আর (হে রসূল), তোমাকে যা দেবো বলে ওয়াদা করেছি তার থেকে কিছু দেখিয়ে দেই, অথবা তোমাকে যদি মৃত্যু দিয়ে দেই (তাতে তোমার তো কোনো অসুবিধা নেই) তোমার কাজ হচ্ছে পৌঁছে দেয়া। আমার কাজ হচ্ছে হিসাব নেয়া।'

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

এ চূড়ান্ত কথা জানিয়ে দেয়ার পর দাওয়াতের প্রকৃতি ও দাওয়াতদানকারীদের কাজ সম্পর্কে আর কোনো জটিলতা থাকে না। 'দাঈ ইলাল্লাহ'– আল্লাহর পথে আহ্বানকারী যারা আছে তারা প্রত্যেক পরিবেশে ও প্রত্যেক পর্যায়ে তাদের বুঝমতো দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু চাইবেন ততোটুকুই তারা করতে পারবেন। এর বেশী শত চেষ্টা করলেও তারা কিছু করতে পারবেন না। এ জন্যে আন্দোলনের কাজ চালাতে গিয়ে তাদের ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই বা তারা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, একথা মনে করাও ঠিক নয়। সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা সত্তেও যখন তারা দেখবে তাদের কাজের গতি মন্থর হয়ে যাচ্ছে, কাজের প্রচার প্রসার আশানুরূপ হচ্ছে না বা বিজয়ের কোনো আশা বহু দূরেও দেখাচ্ছে না এবং পৃথিবীর বুকে দ্বীনের পতাকা সমুন্নত করার প্রয়াসীদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নযরে পড়ছে না, সে অবস্থায় তাদের বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই। তারা তো দাওয়াতদানকারী মাত্র এবং তাদের পরিচয় আল্লাহর কাছে দাওয়াতদানকারীই রয়েছে ও থাকবে।

আল্লাহর শক্তিশালী হাত অবশ্যই সময়মতো সক্রিয় হয়ে ওঠবে এবং দাওয়াতের প্রভাব অবশ্যই আশেপাশে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহর এই মযবুত হাতই অভাবমুক্ত ও শক্তিশালী জাতিদের তাঁর কাজ করানোর জন্যে এগিয়ে নিয়ে আসবেন ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন এই (সত্য বিরোধী) জাতির অহংকার সীমা ছাড়িয়ে যাবে, কুফরীর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুবে এবং সর্বত্র তারা অশান্তি ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেবে, তখন তাদের শক্তি সামর্থ, সরঞ্জাম সব কিছু তিনিই তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন এবং তাদের আবদ্ধ করে দেবেন পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের মধ্যে, আর তাদের মহাশক্তিধর ও তাদের সীমাহীন সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পর তিনি তাদেরকে তাদের সব কিছুকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সংকুচিত করে

দেবেন। আর এভাবে যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের হতাশার দিন ঘনিয়ে আনার ফয়সালা করে ফেলবেন, তখন সেই সিদ্ধান্ত রদ করার মতো আর কেউ থাকবে না, আর এটা নিশ্চিত, অবশ্যই খুব শীঘ্র এটা হতে চলেছে।(১)

এরশাদ হচ্ছে, 'ওরা কি দেখছে, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ, চতুর্দিক থেকে ওদের ভূমি কমিয়ে নিয়ে আসছি, আর আল্লাহ তায়ালাই ফয়সালা করবেন, তার ফয়সালা রদ করার মতো কেউ নেই; আর আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'

অতীতের লোকদের থেকে ওরা বেশী ষড়যন্ত্রকারী নয়, নয় তারা আরও বেশী পলিসিবাজ..... কিন্তু তাদেরও আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও করেছেন, তিনিই সকল চক্রান্ত নস্যাৎকারী এবং অপতৎপরতা সামাল দেয়ার যোগ্য ও সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক।

'আর ওদের পূর্ববর্তীরা বহু ষড়যন্ত্র করেছে, আল্লাহ তায়ালাও উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণকারী, তিনি জানেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি উপার্জন করে এবং শীঘ্রই কাফেররা জানতে পারবে কার জন্যে রয়েছে আখেরাতের পরিনণতি।'

সূরাটি শেষ হচ্ছে কাফেরদের রেসালাত অস্বীকার করার ঘটনা দিয়ে, সূরাটি শুরু হয়েছিলো রেসালাত প্রতিষ্ঠিত করার কথা দিয়ে, এভাবে শুরু ও শেষ এই দুই প্রান্তের সম্মিলন ঘটেছে সূরাটির মধ্যে। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে নিজের সাক্ষ্যদানকেই যথেষ্ট বানিয়েছেন। .... আর তিনিই তো সেই সত্ত্বা যাঁর কাছে এ কেতাব এবং অন্যান্য কেতাব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

আর কাফেররা বলে, তুমি কোনো রসূল নও; বলো, তোমাদের এবং আমার মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; আর তাঁর কাছেই রয়েছে আল কেতাবের জ্ঞান।'

সূরা রা'দ-এর সার সংক্ষেপ

এখন সূরাটির আলোচনা সমাপ্তি পর্যায়ে এসে গেছে। যা কিছু ইতিমধ্যে আমরা সূরাটির মধ্যে দেখতে পেয়েছি তাতে আমাদের কাছে মনে হয়েছে, এ সূরাটিতে মানুষের মনের পর্দায় ভেসে ওঠবে সৃষ্টির বহু রহস্য। এর মধ্যে উল্লেখিত সৃষ্টি রহস্যাবলী আমাদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে, আর পরিশেষে আমাদের অন্তরকে টেনে নিয়ে গেছে এ কথার দিকে যে, সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সূরাটি শুরু হয়েছিলো এ কথা দিয়ে এবং শেষও হচ্ছে এ একই কথার ওপরে। আর দুনিয়ার যতো ঝগড়া- সবই এই কথা মানা না মানার ওপর। এরপর আর কোনো কথা থাকে না।(২)

---

(১) এ আয়াতাংশের নির্দিষ্ট অর্থ এটাই সে সব বাজে অর্থ নয় যা কোরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারীরা করে চলেছে। তারা বলছে, এ আয়াতের মধ্যে পৃথিবীর কিনারাগুলো কেটে যাওয়ার কথা বলতে বুঝানো হয়েছে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যে ভাংগন সব সময়ই চলছে, এ কথার অর্থ সেটা হতে পারে, অথবা নিরক্ষীয় অঞ্চলের মাটির মধ্যে অনেক সময় ফাটল ধরে সেটা হতে পারে। এই ধরনের অনেক বাজে কাল্পনিক কথা বলা হয়। আল কোরআনের বর্ণনার মধ্যে আলোচ্য বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়। সুতরাং যারা এই আয়াত বুঝতে গিয়ে জটিলতা অনুভব করবে, তাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং বৈজ্ঞানিক বাজে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে কোরআনের প্রাসংগিক অর্থ বুঝে তৃপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর এই যে কথা- 'অমান ইন্দাহু ইলমুল কেতাব'-এর তাফসীরে কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে- এ কথা হচ্ছে, আহলে কেতাবদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিলো তাদের কথা। তারা বলেছিলো, এ হচ্ছে আল কোরআন। আল্লাহ তায়ালাও তাদের স্বীকৃতির সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ইতিপূর্বে বলেছেন, 'আর যাদের আমি কেতাব দিয়েছিলাম, তারা খুশী হয় সেসব জিনিসের জন্যে যা তোমার কাছে নাযিল হয়েছে তোমার রবের কাছ থেকে। মক্কায় থাকাকালে এ ঘটনা ঘটেছিলো, মদীনাতেও ঘটেছিলো আহলে কেতাবদের এই খুশী হওয়ার ঘটনা। এই রেওয়ায়াতগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয় আমরা অস্বীকার করতে পারি না, যেহেতু আয়াতটির উদ্দেশ্য এটিই।

এরপর খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাই, সঠিক পথে চলার জন্যে এবং ইসলামের স্বচ্ছ আকীদা বুঝার জন্যে কিছু অত্যুজ্জ্বল চিহ্ন। আল কোরআনে বর্ণিত জীবন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে এই আকীদা বিশ্বাসের ওপরেই। এখন এসব পথ চিহ্নগুলো জানার হক আদায় হবে যদি আমরা ওই হক পথে টিকে থাকি এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্যসমূহ পালন করি। হায়, আমরা আত্মগর্বী মানুষ, কেন এমন হয় না যে, এ সূরার মধ্যে বর্ণিত কথাগুলো সঠিকভাবে আমাদের মনে দাগ কাটবে এবং আমরা যে সময়টা জীবনে পেয়েছি তার সঠিক ব্যবহার করে জীনকে বাঞ্ছিত সমাপ্তির পর্যায়ে পৌছে দেবো।

সূরাটির মধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ওই সকল উজ্জ্বল পথচিহ্নের দিকে ইশারা করেছি। কাজেই আশা করি, আমরা সাধ্যমতো এমন কিছু পদক্ষেপ নেবো, যা আমাদের সুদীর্ঘ পথ চলার কাজে সহায়ক হবে ...... আর আল্লাহ তায়ালাই আমাদের প্রকৃত সহায়।

নিশ্চয়ই সূরাটির শুরু, এর মধ্যে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় এবং এতে যেসব বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সে সব কিছু একত্রিত করে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এর মধ্যে বর্ণিত বিষয়গুলোর বেশীর ভাগই আমাদেরকে জানাচ্ছে, এ সূরাটি রসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কায় অবস্থানকালের শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে একে মাদনী সূরা বলে উল্লেখ করলেও আমরা তা মেনে নিতে পারি না এ জন্যে যে, এর মধ্যে মোশরেকদের তরফ থেকে শক্তি ক্ষমতার প্রমাণস্বরূপ বার বার অলৌকিক কিছু নিদর্শন দেখানোর দাবী জানানো হয়েছে। মক্কার কোরায়শরাই যেহেতু রসূল (স.)-কে অস্বীকার করছিলো, তাঁর নবুওত অমান্য করার জন্য নানা প্রকার বাহানা তালাশ করছিলো, অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবী জানাচ্ছিলো। এ জন্যে সূরাটি মক্কী হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক। তারা রসূলুল্লাহকে বার বার সেই আযাব নিয়ে আসার জন্যে জলদি করছিলো যার ভয় তিনি তাদের দেখাচ্ছিলেন। এসব হামলা চালিয়ে তারা রসূলুল্লাহকে অস্থির করে তুলেছিলো, তাঁকে ঘাবড়ে দেয়ার কাজে লেগেছিলো, সত্যের পথে তাঁর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার পরীক্ষা করছিলো। এ সকল পরীক্ষার মোকাবেলায় রসূলুল্লাহ (স.) সত্যের দিকে দৃঢ়তার সাথে আহবান জানিয়েই চলেছিলেন, আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাদের বুঝানোর জন্যে প্রাকৃতিক দিকগুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন এবং বার বার ওইগুলোর দিকে তাকাতে বলছিলেন এবং তাকাতে বলছিলেন তাদের নিজেদের অস্তিত্বের দিকেও; আরও তাদের দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা করছিলেন অতীতের সে সকল জাতির দিকে, যাদের ওপর গযব নাযিল হয়েছিলো এবং এলাকার পর এলাকা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। প্রাকৃতিক বিষয়াদি থেকে নিয়ে মানবেতিহাস ও তাদের নিজেদের মধ্যে লুকায়িত অসংখ্য রহস্যাদির দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এসবের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে চিন্তা করতে তিনি তাদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন, যেহেতু এসব কিছুই গভীর রহস্যে ভরা।

এসব উদাহরণ পেশ করে রসূলুল্লাহ (স.) তাদের বলিষ্ঠভাবে জানাচ্ছিলেন যে, অবশ্যই একমাত্র এই কেতাবই সত্য। এই কেতাবই কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এ কেতাব অস্বীকার করা, একে মিথ্যা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা, এর প্রভাববলয়কে সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস, এর দাওয়াত গ্রহণে বিলম্ব করা এবং এর দিকে দাওয়াতদান বাধাগ্রস্ত ও কঠিন বানিয়ে দেয়ার তৎপরতা– এসব কিছু মিলে ওই মহাসত্যকে থামাতে পারবে না, এর আলোর ছটা থেকে মানুষকে বেশী দিন দূরে রাখা যাবে না, এর সম্মোহনী আকর্ষণ থেকে

সত্যসন্ধিৎসু মানুষের গণ মিছিল রোধ করা যাবে না, বদলে দেয়া যাবে না চিরন্তন মহাসত্যকে, যা নিয়ে আল আমীন মোহাম্মদের আগমেন ঘটেছিলো। তাই জানানো হচ্ছে,

'ওসবই হচ্ছে কেতাবের নিদর্শনাবলী, আর যা কিছু নাযিল হয়েছে তোমার কাছে তোমার রবের পক্ষ থেকে (হে রসূল), তাই-ই প্রকৃত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।'

কল্যাণ লাভের পূর্বে তারা অকল্যাণকর (শাস্তির) বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হচ্ছে..... অবশ্যই তুমি ভীতি-প্রদর্শনকারী মাত্র, আর প্রত্যেক জাতির জন্যে রয়েছে (কোনো না কোনো) এক হেদায়াতকারী (পথপ্রদর্শক)। (আয়াত ৬-৭)

'তার তরেই রয়েছে সত্যের আহ্বান ...... আর কাফেরদের ডাক তো হচ্ছে গোমরাহীর দিকে।' (আয়াত ১৪-১৫)

'এভাবেই আল্লাহ তায়ালা সত্য ও মিথ্যার উদাহরণ দিচ্ছেন ....।'

.... এভাবেই আল্লাহ তায়ালা উদাহরণ দিয়ে থাকেন (সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝানোর জন্যে)। (আয়াত ১৬-১৭)

'তোমার কাছে যা কিছু নাযিল হয়েছে তাকে যে সত্য বলে জানে সে কি ওই ব্যক্তির মতো যে (না জানার কারণে) জ্ঞানান্ধ! অবশ্য বুদ্ধির অধিকারী যারা, তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। (আয়াত ১৯) আর কাফেররা বলছে!, কেন তার রবের কাছ থেকে কোনো নিদর্শন নাযিল হয় না.......।'

.......................আল্লাহর স্মরণেই পরিতৃপ্ত হয় মন। (আয়াত ২৭-২৮)

'এমনি করেই তো আমি মহান আল্লাহ পাঠিয়েছি তোমাকে এক জাতির মধ্যে .... তিনি ছাড়া মাবুদ কেউ নেই, তাঁর ওপরেই আমরা ভরসা করেছি, আর তাঁর কাছেই রয়েছে ফিরে যাওয়ার জায়গা, আর যাদের আমি (মহান আল্লাহ) কেতাব দিয়েছিলাম, তারা খুশী তাই দেখে যা তোমার কাছে নাযিল হয়েছে......... নেই তোমার জন্যে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে কোনো বন্ধু সহায়ক বা কোনো বাঁচানেওয়ালা।'

'আর যদি আমি (মহান আল্লাহ) দেখাই তোমাকে সেসব জিনিসের কিছু অংশ যার ওয়াদা তোমার কাছে করেছি, অথবা তোমাকে মৃত্যু দান করি, তাতে তোমার চিন্তার কিছু নেই। তোমার কাজ তো পৌঁছে দেয়া মাত্র, আর আমার কাজ হিসাব নেয়া।' (আয়াত ৪০)

'আর কাফেররা বলছে, তুমি কোন রসূল বলো, তোমাদের এবং আমার মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। আর তাঁর কাছেই তো আছে মূল কেতাবের জ্ঞান।' (আয়াত ৪৩)

এভাবেই আমরা উপরোল্লিখিত অংশে সেসব আয়াতগুলো দেখতে পাচ্ছি যা আমরা ওই সব মোশরেক লোকের মোকাবেলায় পেশ করতে পারি, যারা রসূলুল্লাহ (স.) এর বিরোধিতা করে চলেছিলো এবং কোরআনের আওয়ায থামিয়ে দেয়ার জন্যে তৎপরতা চালাচ্ছিলো।

তারপর এইসব বিরোধিতা এবং ওই সকল বাধা বিঘ্ন ভাংবার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের গৃহীত ব্যবস্থা, এমন এক পরিবেশের ছবি তুলে ধরেছে, যা প্রমাণ করছে যে, এটি অবশ্যই মক্কী সূরা।

এরপর মক্কার ওই বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে কাজ করার সময় রসূলুল্লাহকে যে কষ্ট স্বীকার করে নিতে হয়েছিলো, মোশরেকদের উপহাস বিদ্রূপ, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার হীন চক্রান্ত এবং তাঁর জীবন বিপন্ন করার জন্যে যে গোপন ষড়যন্ত্র চলছিলো, দাওয়াতী কাজ আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ করছিলো না এবং সকল সম্ভাবনার দরজা যেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিলো, এহেন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ, যেন তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার চালিয়ে যান এবং বলিষ্ঠ

কণ্ঠে মানুষকে জানাতে থাকেন, কোনো মাবুদ (বাদশাহ, মনিব, আইনদাতা) আল্লাহ ছাড়া নেই, তিনিই সারাবিশ্বের মালিক, প্রভু প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো মনিব নেই, তিনিই চূড়ান্ত ও জবরদস্ত বাদশাহ, একচ্ছত্র অধিপতি; আর সকল মানুষকেই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে, হয় বেহেশত, না হয় দোযখ, কোনো একটাতে যেতেই হবে। আর সেই পরকালই হচ্ছে সকল সত্যের বড় সত্য, যা মোশরেকরা স্বীকার করতে চায় না এবং এই বিশ্বাস তারা সম্মিলিতভাবে ধরে রাখতে চায় .... এ জন্যই আল্লাহ পাক চান যেন তাঁর রসূল ওদের ওই লাগাম ছাড়া ইচ্ছার পায়রবী না করেন। ওরা চায় তিনি সত্যের মধ্য থেকে কিছু গোপন করে যান অথবা এর ঘোষণা দিতে বিলম্ব করেন, তাহলেই ওরা তাঁকে মেনে নেবে এবং তাঁর ওপর খুশী হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে সতর্ক করা হচ্ছে, যদি তিনি ওদের কাছে নমনীয় হন, ওদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন এবং তাঁর কাছে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও যদি ওদের কথামত চলতে শুরু করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁকে আল্লাহ তায়ালা কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন।

আল্লাহর দিকে দাওয়াতদানকারীদের জন্যে এবং আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যারা সচেতনভাবে এগিয়ে এসেছে, তাদের অতীতে যেসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং এখনও মোকাবেলা করতে হচ্ছে, তাদের কর্মপদ্ধতি বরাবর একটিই ছিলো। এর মধ্যে পুনরায় চিন্তা ভাবনা করার বা এজতেহাদ করার কোনো অধিকার আল্লাহর বান্দাদের নেই, কোনোক্রমেই এ ব্যাপারে শৈথিল্য দেখানো জায়েয নয়। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, প্রকাশ্যভাবে এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া, এ মহাসত্যের কোনো একটা অংশও গোপন না রাখা, কোনো যুক্তিতেই বিলম্ব না করা, তাতে পথ যতো কন্টকাকীর্ণ হোক না কেন, যতোই বিপদের ঝুঁকি থাকুক না কেন! আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশ গোপন করা বলতে দ্বিধা করা বা বিলম্বিত করা উদ্দেশ্য। এটা মোটেই কোনো হেকমত বা বুদ্ধিমত্তার দাবী নয়। কারণ পৃথিবীর তাগুত (ক্ষমতাধর বিদ্রোহী শক্তি) এ দ্বীনের প্রচার প্রসার পছন্দ করে না, অথবা যারা প্রকাশ্যভাবে এ দ্বীনের ঘোষণা দেয় তাদের কষ্ট দেয়। অথবা এ দ্বীনের ধারক বাহক হওয়ার কারণে তাদের বিরোধিতা করে, অথবা তারা ষড়যন্ত্র করে নিজের স্বার্থের জন্যে অথবা দাওয়াতদানকারীর স্বার্থের জন্যে আর এর কোনোটাই জায়েয নয়। অর্থাৎ দাওয়াতদানকারীরা দ্বীনের মৌলিক বিষয় গোপন করে যাবে অথবা সঠিক কথা বলতে বিলম্ব করবে, অথবা কোনো প্রতীকী উদাহরণ দেয়া বা চারিত্রিক, ব্যবহারিক, সাংস্কৃতিক অথবা মনস্তাত্ত্বিক এমন কিছু গ্রহণ করা জায়েয নয় যার দ্বারা আল্লাহদ্রোহী শক্তিবর্গ নমনীয় হয়ে যায় এবং তাদের ক্রোধ প্রশমিত হয় যদিও তারা আল্লাহর একত্ব। সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা স্বীকার করে নেয়। এরপর আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে, তাঁর কথামত চলতে হবে, তাও যদি স্বীকার করে এবং একমাত্র তাঁর সামনে নতি স্বীকার করে ও তাঁর হুকুম মেনে নেয়।

এটা অবশ্যই এই বিশ্বাস গ্রহণ ও তা বাস্তবায়িত করার জন্যে এক আন্দোলনের জীবন্ত ব্যবস্থা; আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর জীবন ব্যবস্থা, যেমন আমাদের সব মানুষের নেতা মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর হুকুমে অবিরাম দাওয়াতী কাজ করে গেছেন। সুতরাং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর পক্ষে এ পথ পরিত্যাগ করা কিছুতেই চলবে না। আর তার জন্যে নবী (স.)-এর পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিও গ্রহণ করা চলবে না। আমরা এই কর্তব্য পালন করলেই আশা করতে পারবো যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন বাস্তবায়িত করার পথ রচনা করে দেবেন।

এখন মনে রাখতে হবে, দাওয়াতী কাজ করার কোরআনে বর্ণিত পদ্ধতি ছবির মতো ফুটে ওঠেছে হাদীস শরীফে, যা আল্লাহর সেই কেতাব থেকেই গৃহীত, যা আমরা তেলাওয়াত করছি, আর যা আমরা উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে দেখতে পাচ্ছি। আর এই গোটা বিশ্ব প্রকৃতিই মানব জাতিকে শিক্ষার জন্যে এক বিশাল গ্রন্থ, যার প্রতি পাতায় লিখিত রয়েছে সৃষ্টিকর্তার মহিমার কথা, রয়েছে সেথায় আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার অসংখ্য নিদর্শন, তাঁর কুদরত এবং পরিচালনার খবর সবখানে লিখিত রয়েছে, যেমন করে পেছনের কেতাবদ্বয়ের মধ্যে মানবেতিহাসের মৌলিক কথাগুলো সংরক্ষিত হয়েছে, পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে এর মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা, কুদরত ও ব্যবস্থাপনার প্রমাণ এমনভাবে, যেন মনে হয় সেগুলো কোরআনের কথাই বলছে। এসব কিছু মানুষের সামনেই রয়েছে। এসব থেকেই মানুষ জীবনের সর্ববিভাগের কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। যেহেতু এসব তার অনুভূতি, তার অন্তর এবং বিবেককে আকর্ষণ করে!

এটিই সেই সূরা, যার মধ্যে পাওয়া যায় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এই মহাগ্রন্থের প্রতিটি পাতায় লিখিত আল্লাহর মহিমারাশি। অংকিত রয়েছে এই মহাগ্রন্থে তাঁর অসংখ্য নিদর্শন, যা কোনো বিদগ্ধজনকে অভিভূত করার জন্যে যথেষ্ট। যেমন, আলিফ-লাম-মীম, এগুলো হচ্ছে আল কেতাব মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আয়াত। আর তোমার রবের কাছ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সবই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেগুলো বিশ্বাস করে না।'

'আল্লাহ সেই মহান সত্ত্বা, যিনি উপরে তুলে রেখেছেন আকাশমন্ডলীকে বিনা খুঁটিতে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ .... এর মধ্যে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে ওই জাতির জন্যে যারা বুঝ শক্তিকে কাজে লাগায়।' (আয়াত ২-৪)

এ আয়াতগুলোতে গোটা বিশ্বের দৃশ্যাবলী একত্রিত হয়ে ফুটে ওঠেছে। এর ফলে এ আয়াতগুলোর মধ্যে যেন গোটা সৃষ্টিকে দেখা যাচ্ছে, যেন সেগুলো আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে কথা বলছে, কথা বলছে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে, তার গড়ে ওঠা সম্পর্কে, তার জন্যে পূর্ণ নির্ধারিত সকল বিষয় (তাকদীর) সম্পর্কে এবং তার বিশাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। তারপর ওই জাতি সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে, যারা এসব দৃশ্য দেখছে, এরপরও পুনরুত্থান সম্পর্কে নানা প্রকার সংশয় প্রকাশ করছে এবং অস্বীকার করছে ওহীকে, যেহেতু অহী সেই সত্য বিষয়টা জানাচ্ছে যা তাদের খুব কাছাকাছিই রয়েছে .... এতো কাছে যে, সব সময়েই এইসব দৃশ্য বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান।

'আর তুমি যদি (ওদের কেয়ামত অস্বীকার করায়) বিস্মিত হও, তাহলে (প্রকৃতপক্ষে) ওদের এ কথাই বিস্ময়কর, আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো তখন আমরা কি পরিণত হবো নতুন এক সৃষ্টিতে? আসলে ওরাই তো ওদের রবকে অস্বীকার করেছে আর ওরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের গলায় শেকল বা লোহার হাঁসুলি পরানো থাকবে, ওরাই হবে দোযখবাসী, সেখানেই থাকবে তারা চিরদিন।' (আয়াত-৫)

'তিনিই তো সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের বিদ্যুতের চমক দেখান, যা দেখে তোমাদের ভয় লাগে, আবার আশারও সঞ্চার হয়, তিনি সৃষ্টি করেন পানি বোঝাই মেঘ এবং তাঁর প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে মেঘ গর্জে ওঠে, ভীত সন্ত্রস্ত থাকে তাঁরই ভয়ে আর তিনিই বজ্রপাত ঘটান, অতপর যাকে খুশী তাকে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত করেন .... ।'

বিশ্ব সৃষ্টির এ পাতাটা তিনি তুলে ধরছেন যাতে ওই হতভাগা জাতির বিষয়টি তুলে ধরে মানুষের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করেন যারা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কেই তর্ক বিতর্ক করে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানাতে চায়। অথচ তাঁর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্যের নযির

তারা নিয়তই দেখতে পাচ্ছে, দেখছে তারা গোটা সৃষ্টিকে তাঁর আনুগত্য করতে, আরো তারা দেখতে পাচ্ছে, এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যেই রয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা, আর সৃষ্টি কাজ, তাদের কর্ম সম্পাদন এবং তাদের ভাগ্য নির্ধারণ ইত্যাদির যাবতীয় কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারো নেই। এমন সময় তিনি বজ্রপাত ঘটিয়ে যাকে চান ক্ষতিগ্রস্ত করেন .... যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রকার কূট তর্কে লিপ্ত থাকে, অথচ তিনি কঠোরভাবে তাঁর কৌশল কার্যকর করেন .... বলো, আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক পরম শক্তিমান বিজয়ী সবার ওপর। (আয়াত ১৩-১৬)

আর এমনি করে গোটা বিশ্ব রূপান্তরিত হয়ে যায় আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তির নিদর্শনে, যা দেখে ঈমান মযবুত হয়। এসব দৃশ্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের সাথে যেন কথা বলতে থাকে, গভীরভাবে তাদের মনে চেতনা জাগায়, এসব প্রাকৃতিক সুষমা আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতা ও সৌন্দর্য এবং করুণার প্রতীক হয়ে হাযির হয় সারা বিশ্বের সকল মানুষের সামনে এবং সব কিছুর মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা চমৎকারভাবে জানায়।

এরপর প্রকৃতির পাতায় লেখা রয়েছে যেসব তথ্য তার সাথে যোগ হয়েছে মানবেতিহাসের পাতাগুলো। সেখানে দেখা যায় আল্লাহর ক্ষমতা, তাঁর আধিপত্য, তদারকি শক্তি, তাঁর বিজয়ী রূপ, তাঁর নির্ধারিত সিদ্ধান্ত এবং জীবনের জন্যে তাঁর ব্যবস্থাপনা। বলা হচ্ছে,

'আর ওরা তোমার কাছে কিছু পাওয়ার পূর্বে জলদি করছে মন্দটার জন্যে, অথচ ইতিপূর্বে সংঘটিত শাস্তির বহু উদাহরণ তাদের সামনে রয়ে গেছে।'

'আর আল্লাহ তায়ালা জানেন যা প্রত্যেক নারী বহন করে ....

.... আর নেই তাদের জন্যে তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক।' (আয়াত ৮-১১)

'আল্লাহ তায়ালাই প্রশস্ত করেন রেযেক যার জন্যে ইচ্ছা তার জন্যে এবং তিনিই সংকুচিত করেন, আর ওরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে খুশী হয়ে গেছে, কিন্তু দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় অবশ্যই অতি তুচ্ছ। (আয়াত ২৬)

'আর কাফেরদের প্রতি তাদের কৃতকর্মের আযাব নাযিল হতে থাকবেই ....

.... সুতরাং কেমন হবে তাদের পরিণতি?' (আয়াত ৩১-৩২)

ওরা কি দেখছে না যে, আমি (মহান আল্লাহ) সংকুচিত করে ফেলছি পৃথিবীকে তার কিনারাসমূহ থেকে? আর আল্লাহ তায়ালাই ফয়সালা করে দেবেন, তাঁর ফয়সালা রদ করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি খুব জলদিই হিসাব গ্রহণকারী, (আয়াত ৪১)

'আর ওদের পূর্ববর্তীরা ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু আল্লাহর কাছেই রয়েছে সকল কিছুর তদবীর। প্রত্যেক ব্যক্তি কি উপার্জন করে তা তিনি জানেন, আর শীঘ্রই কাফেররা জানতে পারবে কার জন্যে রয়েছে আখেরাতের ঘর।' (আয়াত ৪২)

এমনি করে আল কোরআনের কর্মসূচী মানুষের ইতিহাসের মধ্যে এসব সাক্ষ্য প্রমাণ একত্রিত করে রেখেছে এবং এগুলোকে আল্লাহ তায়ালা প্রভাব সৃষ্টিকারী হিসাবে ব্যবহার করেন এবং এ সবের দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করেন। এ সব ঘটনা গোটা মানব জাতির জন্যে শিক্ষা ও পথনির্দেশক হিসাবে রয়ে গেছে।

আর আমরা আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে এমন চমৎকার এক পদ্ধতির ওপরে আছি যা সর্বাধিক যুক্তিপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ কথায় পরিপূর্ণ। এ দাওয়াত সাধারণভাবে মানবমন্ডলীর কাছে পেশ করা হচ্ছে। এ দাওয়াতের মধ্যে কোনো একটি দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো হয়নি

এবং কোনো শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যে তাকে বলা হয়নি; বরং গোটা মানব জাতিকে তার গোটা চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান, বুঝ শক্তি, তার অনুভূতি ও বিবেক বুদ্ধি সব কিছু ব্যবহার করেই এ দাওয়াত সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে।

আর মহাগ্রন্থ এই আল কোরআন, অবশ্য অবশ্যই পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে সজ্জিত হয়ে বিশ্ব মানবতাকে তার জীবনের সামগ্রিক ও সর্বাত্মক কল্যাণের দিকে আহবান জানানোর জন্যে এসেছে। বস্তুত এ কেতাব সবার জন্যেই এক দাওয়াতের কেতাব, যার ওপর নির্ভর করেই আল্লাহর পথে আহ্বানকারীরা নিরন্তর কাজ করে চলেছে। অন্য কোনো কিছু দ্বারা নয় বা অন্য কোনো উপায়েও নয়, সরাসরি এ পাক পবিত্র কালাম এসব যুক্তি দ্বারাই মানুষকে সত্য সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। অবশ্য এখন এই আহ্বানকারীকে জানতে ও শিখতে হবে যে, মানুষকে কিভাবে দাওয়াত দিলে সে তা গ্রহণ করতে পারবে এবং তার মনে এ দাওয়াত প্রভাব বিস্তার করবে। মানুষের ঝিমিয়ে পড়া অন্তরকে কিভাবে জাগিয়ে তোলা যাবে, তার পদ্ধতি তাকে শিখতে হবে, জানতে হবে মুর্দা দিলকে কিভাবে যিন্দা করা যায়।

কোরআন নাযিল করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা, যিনি গোটা মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা, যিনি তাঁর সৃষ্টির প্রকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত আছেন, তিনি জানেন তার জীবনের গিরি সংকটগুলো, আরো জানেন তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে। এ জন্যে 'দাঈ ইলাল্লাহ'– আল্লাহর পথে আহবানকারীদের কাজ হবে, আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি অনুসারে সর্বপ্রথম মানুষকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পর্কে বুঝানো। এরপর মানুষকে বলতে হবে যে তিনিই সবার পালনকর্তা, শাসনকর্তা, বাদশাহ ও আইনদাতা। একইভাবে কোরআনের পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের অন্তরে তাদের রবের সঠিক মর্যাদা ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে করে এসব অন্তর একমাত্র আল্লাহর সামনে তাদের আনুগত্যের মাথা নত করে দেয় এবং একমাত্র তাঁকেই তাদের মালিক মনিব পালনকর্তা বাদশাহ ও আইনদাতা হিসাবে মেনে নেয়।

আল্লাহর সাথে বন্দেগীর সম্পর্ক স্থাপন এবং শেরেকের সকল কাজ থেকে দূরে সরে আসা, এটাই আল্লাহর সাথে বান্দার প্রথম পরিচয়। রেসালাত কি ও রসূলের কাজ কি তা আল কোরাআনই মানুষকে বলে দেবে। ইতিপূর্বে আহলে কেতাবদের কাছে আগত কেতাবে এতেকাদ বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে যে কথাগুলো এসেছিলো তার মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন করে ফেলা হয়েছে। যার ফলে আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং নবুওতের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে এসব আহলে কেতাব বিভ্রান্তির সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, বিশেষ করে নাসরানী বা খৃষ্টানদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি এসেছে বেশী। তারা আল্লাহর উলুহিয়্যাত (সার্বভৌমত্ব) এবং রবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব ও পালন কর্তৃত্ব)-এর অনেক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য খসিয়ে এনে ঈসা (আ.)-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করেছে তাদের অনেকের মধ্যেও অনুরূপভাবে উপরোক্ত গুণগুলো এসে গেছে বলে মনে করা হয়েছে।

একমাত্র নাসরানীদের মধ্যেই এই গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে তাই-ই নয়; বরং পৌত্তলিকদের অনেকের মধ্যে একই ধরনের বিভ্রান্তি এসেছে। এরপর নবুওত সম্পর্কেও বিভিন্ন ধারণা বিরাজ করেছে, কখনো নবুওত ও যাদুকে এক বানানো হয়েছে, কেউ কেউ নবুওত এবং কাশফের মাধ্যমে গায়েবের খবর আসাকে এক করে ফেলেছে, আবার কেউ কেউ নবুওতকে জ্বিন ও গোপন আত্মার সাথে এক করে উভয়কে একই জিনিস বলেছে।

এসব ধ্যান ধারণার অনেকগুলোই ছিলো আরব পৌত্তলিকদের নিজস্ব রচিত। এ কারণেই তাদের মধ্যে কেউ কেউ রসূলের কাছে গায়েবের খবর জানতে চেয়েছে। কেউ কেউ আবার দাবী জানিয়েছে যেন তাদের জন্যে তিনি সুনির্দিষ্ট ও অত্যাশ্চর্য বা অলৌকিক কিছু বস্তুগত জিনিস বানিয়ে দেন, যেমন অনেকে নবী (স.)-কে যাদুকর বলতো, কখনো বলতো পাগল, অর্থাৎ জ্বিনদের সাথে সম্পর্কিত কোনো শক্তির অধিকারী, কেউ কেউ তাঁর সাথে ফেরেশতা থাকার দাবী করতো। এ ধরনের নানা প্রকার বাজে দাবী ও বাজে কল্পনা জড়িয়ে ছিলো আরব পৌত্তলিকদের সাথে, যাকে তারা নবুওত মনে করতো!

নবী এবং নবুওতের প্রকৃতির যথার্থ ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মাবুদ তথা লা-শরীক আল্লাহর পরিচিতি, তাঁর আনুগত্যের সঠিক রূপরেখা, গোটা সৃষ্টি জগতের সাথে তার সম্পর্কের ধরন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা এবং ব্যাখ্যাও এ পবিত্র কোরআনে স্থান পেয়েছে। এটা সন্দেহাতীত সত্য যে, নবী-রসূলরা আল্লাহরই মখ্‌লূক এবং তাঁরই নেক বান্দা। তাঁরা মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রজাতি নন। মাবুদ হওয়ার মত কোন বৈশিষ্ট্যই তাদের মাঝে নেই। ভূত-প্রেত বা জ্বিন পরীদের রহস্যময় জগতের সাথেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশ লাভ করেন তা ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমনকি আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ ব্যতীত অলৌকিক কোন ঘটনার অবতারণা করার মত ক্ষমতাও তাদের নেই। তারা মানুষ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। তবে আল্লাহ পাক তাদের নবী ও রসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন। কাজেই তারা মানুষই থাকবেন এবং অন্যান্য মখলূকের ন্যায় তারাও আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করেই চলবেন।

এই সূরার মধ্যে নবুওত ও রেসালাতের প্রকৃত পরিচয়ের কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। নবী ও রসূলদের দায়িত্বের সীমারেখা সম্পর্কিত আলোচনাও এসেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মন মস্তিস্ককে সকল প্রকার পৌত্তলিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত করা। তদ্রূপ মানুষের মন মস্তিষ্ককে সেই সকল পৌরাণিক কাহিনীর কবল থেকেও মুক্ত করা, যা ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছে।

কোরআনের এই দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট বক্তব্য মোশরেক সম্প্রদায়ের বাস্তব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলো। এটা কেবল আদর্শিক বিতর্ক বা দার্শনিক (পৌরাণিক) আলোচনা ছিলো না; বরং এটা ছিলো একটা আন্দোলন, বাস্তবতার সাথে যার গভীর সম্পর্ক ছিলো। একটা বাস্তব পরিস্থিতি ও নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে বাস্তব লড়াই ছিলো এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে নবুওত রেসালাতের প্রকৃতি এবং নবী-রসূলদের ক্ষমতার সীমারেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, একজন নবীর দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে সতর্ক করা এবং আল্লাহর বাণী তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয় তা পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া। অলৌকিক কোন ঘটনা দেখানো তার কাজ নয়। এ জাতীয় কাজ আল্লাহর নির্দেশ ও সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে সম্ভবও নয়। কারণ তিনি তো আল্লাহরই একজন বান্দা। আল্লাহই হচ্ছেন তার প্রভু। তার কাছেই তিনি দায়বদ্ধ। তাঁরই হাতে তার জীবন মরণ ও শেষ পরিণতি। একজন নবী মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নন। অন্যান্য মানুষের ন্যায় তিনিও বিয়ে করছেন, সংসার ধর্ম পালন করছেন, বংশ বিস্তার করছেন। মানবীয় স্বভাব ধর্মের সকল প্রয়োজন ও চাহিদাও মিটাচ্ছেন, সাথে সাথে আল্লাহর আনুগত্য এবং দাসত্বও করছেন। একজন অনুগত বান্দা হিসাবে যা যা করণীয় ও পালনীয় তিনি তা সবই করে যাচ্ছেন।

এ সুস্পষ্ট ও জ্বাজ্বল্যমান বক্তব্যের মাধ্যমে অতীতের সকল কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা ও অলীক বিশ্বাসের অবসান ঘটে। সাথে সাথে নবী-রসূলদের কেন্দ্র করে অতীতে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো সেগুলোরও অবসান ঘটে। উল্লেখ্য, এইসব ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই খৃষ্টধর্ম তার মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পৌত্তলিকতার আবর্তে পতিত হয়। অথচ এটা ছিলো একটা খোদায়ী সত্য ধর্ম। যে ধর্মে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর একজন বান্দা ও রসূল ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর নির্দেশেরই অধীন। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন অলৌকিক ঘটনাই পেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

বিষয়টি আরো গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্যে আমাদের নিচের আয়াতটির বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

এই বক্তব্য কেবল একজন রসূলকে উদ্দেশ্য করেই দেয়া যেতে পারে, যে রসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেন এবং মানব জাতির মাঝে সঠিক আকীদা বিশ্বাস প্রচার করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এই আকীদা বিশ্বাসের মূল বিষয় হচ্ছে, এই দ্বীনের কোন একটি বিষয়ও রসূলের নিজের পক্ষ থেকে নয়, এই দাওয়াতী কাজের শেষ পরিণতির বিষয়টিও তার আওতাধীন নয়, তার দায়িত্ব কেবল জানিয়ে দেয়া, মানুষকে হেদায়াত করার মালিকও তিনি নন; বরং হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। রসূলের জীবদ্দশায় আল্লাহর ওয়াদা পূরণ করা হোক বা না হোক, তাতে রসূলের মূল দায়িত্বে কোনোই হেরফের হবে না। কারণ, তাঁর দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেয়া, মানুষকে জানিয়ে দেয়া। বাকী তাদের শেষ বিচার বা পরিণতি আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত থাকবে। মোট কথা, একজন নবীর দায়িত্বের ধরন ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট এবং তার দায়িত্বের সীমারেখাও নির্ধারিত। দাওয়াত ও তাবলীগসহ সকল বিষয়েরই চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল।

আর এর মাধ্যমেই মোবাল্লেগ বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী সঠিক পদ্ধতির শিক্ষা লাভ করতে পারবে। আর এ পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে, দাওয়াতী কাজের ফলাফলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা যাবে না। মানুষের হেদায়াতের ব্যাপারেও তাড়াহুড়া করা যাবে না। এমনকি সত্য গ্রহণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে এ ব্যাপারেও কোনো তাড়াহুড়ার প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। এ কথা বলা তাদের জন্যে শোভা পাবে না যে, অসংখ্য মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলাম, কিন্তু খুব সামান্যসংখ্যকই আমাদের সে ডাকে সাড়া দিলো। অথবা এ কথা বলাও চলবে না যে, আমরা অনেক ধৈর্য ধরেছি, কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায়ই আল্লাহ যালেমদের পাকড়াও করলেন না। এসব কথা উচ্চারণ করা কোনো মোবাল্লেগের জন্যে শোভা পায় না। কারণ তার দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহর বাণী বা নির্দেশ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া, এর বেশী নয়। বাকী দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের বিচারের ভার কোনো বান্দার ওপর ন্যস্ত নয়; বরং এই বিচারের ভার আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত থাকবে। কাজেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও দাসত্ব প্রদর্শন করে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একজন মোবাল্লেগের উচিত, সকল বিষয়ের ফয়সালার ভার আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দেয়া।

আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই কারণেই এখানে রসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওতী দায়-দায়িত্ব কেবল দাওয়াত ও তাবলীগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। জেহাদের নির্দেশ তাঁকে এই পর্যায়ে দেয়া হয়নি। তবে দাওয়াত ও তাবলীগের পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এর দ্বারাই এই ইসলাম ধর্মের আন্দোলনের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। এই ধর্মের প্রতিটি বিধান ও নির্দেশ গতিশীল এবং দাওয়াত ও তাবলীগের বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ।

তদুপরি এ বাস্তবতাকে কেন্দ্র করেই সেগুলো আবর্তিত। এই বিষয়টি বর্তমান যুগের স্বঘোষিত পন্ডিতদের গবেষণায় উপেক্ষিত হয়েছে। কারণ তারা পেশাদার গবেষক, ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় কোনো কর্মী নন। কাজেই কোরআনী বিধান ও নির্দেশাবলীর প্রেক্ষাপট তাদের জানার কথা নয়। তদ্রূপ উক্ত নির্দেশাবলীর সম্পর্ক এই ইসলামী আন্দোলনের সাথে কতটুকু সেটাও তাদের জানার কথা নয়।

'(হে নবী,) যে (আযাবের) ওয়াদা আমি এদের সাথে করি তার কিছু অংশ যদি (তোমার জীবৎকালে) আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই কিংবা (আগেই) তোমাকে মৃত্যু দেই, তাহলে (উদ্বিগ্নতার কিছু নেই), তোমার কাজ তো পৌঁছে দেয়া, আর আমার কাজ তোমার পৌঁছানো কথা অমান্যকারীদের যথাযথ হিসাব নেয়া।'

অনেকেই কোরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন। এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, একজন মোবাল্লেগের দায়িত্ব দাওয়াত ও তাবলীগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এই দায়িত্ব পালন করার পর তার আর কোনো দায়-দায়িত্ব বাকী থাকে না, কিন্তু জেহাদের দায়িত্ব কার ওপরে বর্তাবে? এ ব্যাপারে তাদের কি কোনো ধারণা আছে? আমি জানি না, এ ব্যাপারে তাদের চিন্তা ভাবনা কি?

অন্য দিকে আবার কিছুসংখ্যক লোক আছে যারা এ জাতীয় আয়াতের ওপর ভিত্তি করে জেহাদকে বাতিল করে দেয় না বটে, কিন্তু জেহাদের বিষয়টি সীমাবদ্ধ করে ফেলে। তারা একথা বুঝতে আদৌ চেষ্টা করে না যে, উক্ত আয়াতগুলো মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে যখন জেহাদ ফরয করা হয়নি। সাথে সাথে তারা ইসলামী আন্দোলনের গতি প্রকৃতির সাথে কোরআনী বিধানের গভীর যোগসূত্রের ব্যাপারটাও বুঝতে চেষ্টা করে না। কারণ একটাই, আর তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে ওই সকল লোকের কোন সংস্রব নেই। তারা তো কেবল ঘরে বসে বই পুস্তকের পাতায় ইসলামী আন্দোলন খোঁজে এবং ইসলামকে জানার চেষ্টা করে, এই জ্ঞান ঘরে বসে লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ, এটা আরাম কেদারায় বসে থাকা লোকদের ধর্ম নয়।

দাওয়াত ও তাবলীগই হচ্ছে একজন রসূলের মূল দায়িত্ব। একইভাবে পরবর্তীতে যারা দাওয়াতী কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করবে তাদেরও মূল দায়িত্ব এটাই থাকবে। কারণ, এ দাওয়াত ও তাবলীগই হচ্ছে জেহাদের প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে একজন মোবাল্লেগ মানুষকে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি আহবান করবে, অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আপাতত স্থগিত রাখবে। সে প্রথমেই মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর প্রভুত্ব ও আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোর জ্ঞান দান করবে। মানুষকে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য ও দাসত্বের শিক্ষা দেবে। গায়রুল্লাহকে ত্যাগ করে একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর নির্দেশ ও হুকুম মেনে চলারই শিক্ষা দেবে। ঠিক এই পর্যায় এসেই একজন মোবাল্লেগকে জাহেলী ও বাতেল শক্তির প্রচন্ড বিরোধিতা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হয়। তখন বাতিল শক্তি নির্যাতন চালিয়ে এবং শক্তি প্রয়োগ করে দাওয়াতী কাজে বাঁধার সৃষ্টি করবে, মোবাল্লেগের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে, আর তখনই আসে জেহাদের পালা, প্রতিরোধের পালা। আর এটাই হচ্ছে সঠিক দাওয়াতী পদ্ধতির স্বাভাবিক পরিণতি ও ফলাফল। এই বাস্তব বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে নিম্নের আয়াতটিতে। এটাই হচ্ছে সঠিক পন্থা, এর বাইরে নয়। (আল ফোরকান ৩১)

এরপর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। আর সেটা হলো, মানুষের গতিবিধি ও আচার আচরণের সাথে তার শেষ পরিণতি ও চূড়ান্ত ফলাফলের সম্পর্ক কি? বিষয়টি খোলাসা করে বুঝানোর জন্যে বলা হচ্ছে, মানুষের নিজস্ব কর্মের মাধ্যমেই

আল্লাহর ইচ্ছার বহির্প্রকাশ ঘটে, সাথে সাথে একথাও বলা হচ্ছে, প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর অমোঘ বিধান বা তকদীর অনুযায়ীই ঘটে থাকে, আলোচ্য সূরায় বেশ কিছু আয়াত আমরা দেখতে পাই যার আলোকে এই গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি, আয়াতগুলো নিচে বর্ণিত হলো।

(মানুষ যে অবস্থায়ই থাক না কেন) তার জন্যে আগে পেছনে একের পর এক (আসা ফেরেশতার) দল নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তাকে হেফাযত করে। (এই অনুপম প্রক্রিয়া সত্ত্বেও এটা ঠিক যে,) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির (নৈতিক অবক্ষয়ের) জন্যে (তাদের ওপর) কোনো বিপদ পাঠাতে চান তখন তা রদ করার কেউই থাকে না, না তিনি ব্যতীত ওদের কোনো সাহায্যকারী থাকতে পারে! (আয়াত ১১)

যারা তাদের মালিকের এই আহ্বানে সাড়া দেয় তাদের জন্যে মহাকল্যাণ রয়েছে, আর যারা তাদের ডাকে সাড়া দেয় না (তাদের সমস্ত কিছুই বরবাদ হয়ে যাবে, কেয়ামতের দিন তাদের অবস্থা হবে), তাদের পৃথিবীতে যা কিছু (সম্পদ) আছে তা সমস্ত যদি তাদের নিজেদের (অধিকারে) থাকতো– তার সাথে যদি থাকতো আরো সমপরিমাণ (ধন সম্পদ), তাহলেও (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) তারা তাকে (নির্দ্বিধায়) মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে দিতো। এরাই হবে সে সব (হতভাগ্য) মানুষ যাদের হিসাব হবে, জাহান্নামই হবে ওদের নিবাস। কত নিকৃষ্ট সে আবাস! (আয়াত ১৮)

'(হে নবী,) যারা (তোমার নবুওত) অস্বীকার করে, তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো (অলৌকিক) নিদর্শন পাঠানো হলো না কেন, তুমি (এসব লোককে) বলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে (এসব অযথা কথায় ফেলে) বিভ্রান্ত করেন এবং তার কাছে পৌঁছার পথ তিনি তাকেই দেখান যে (তার) অভিমুখী হয়।' (আয়াত ২৭)

'যদি কোরআন (-এর বরকত) দিয়ে পাহাড়কে গতিশীল করা যেতো, কিংবা যমীনকে বিদীর্ণ করা যেতো, অথবা (তা দিয়ে) যদি মরা মানুষের সাথে কথা বলা যেতো (তবুও এই নাফরমান মানুষগুলো ঈমান আনতো না), কিন্তু (তেমনটি কখনোই হবার নয়), আসমান যমীনের সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে, অতপর ঈমানদাররা (যারা কাফেরদের দাবীর সামনে অলৌকিক কিছু আশা করছিলো তারা একথা মেনে) কি নিরাশ হয়ে পড়লো যে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে সমগ্র মানব সন্তানকেই হেদায়াত দিতে পারতেন। এভাবে যারা কুফুরের পথ অবলম্বন করেছে তাদের (নিজেদের কর্মফল হিসেবে) কোনো না কোনো বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, কিংবা তাদের (নিজেদের ওপর না হলেও) আশপাশে তা আপতিত হবেই, যে পর্যন্ত না (তাদের জন্যে) আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত (আযাবের) ওয়াদা সমাগত হয়। আল্লাহ তায়ালা কখনোই প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।' (আয়াত ৩১)

'প্রত্যেক মানুষের ওপর যিনি তার দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত রাখেন যে সে (নিজের আমল দিয়ে) কি পরিমাণ অর্জন করেছে, (এ পর্যায়ে তিনি কি তাদের সমান হতে পারেন যাদের) ওরা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে রেখেছে। (হে নবী, এদের) তুমি বলো, ও(শরীক)-দের নাম তো বলো (যে ওরা কাবা?) অথবা তোমরা কি আল্লাহকে এমন (শরীকদের) সম্পর্কে খবর দিতে চাচ্ছো যাকে তিনি জানেনই না যে, (ওরা) যমীনে (কোথায় রয়েছে) অথবা এটা কি তাদের কোনো মুখের কথাই মাত্র? (যার ভেতরে কোনো সঠিক বক্তব্য নেই, আসল কথা হচ্ছে,) যারা কুফরী করেছে

তাদের চোখে তাদের এই প্রতারণাকে শোভন করে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পথ থেকে তাদের অবরোধ করে রাখা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার জন্যে পথের দিশা দেখানোর (আসলেই) কেউ নেই।' (আয়াত ৩৩)

প্রথম আয়াতটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো জাতি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এবং বাস্তবধর্মী পন্থায় যখন নিজের গতিবিধি ও আচার আচরণের পরিবর্তন সাধন করতে উদ্যোগী হয়, কেবল তখনই সেই পরিবর্তনে আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালা কার্যকর হয়। কাজেই কোনো জাতি যেমনটি পরিবর্তনের জন্যে সচেষ্ট হবে, উদ্যোগী হবে, আল্লাহর ইচ্ছা ফয়সালাও তেমনটিই হবে। তাদের কৃতকর্মের জন্যে যদি আল্লাহ তাদের ক্ষতি সাধন করতে চান, তাহলে আল্লাহর সেই ইচ্ছার সামনে কেউই বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। আল্লাহর হাত থেকে কেউ তাদের রক্ষাও করতে পারবে না। আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা কাউকে সাহয্যকারী এবং বন্ধু হিসেবেও পাবে না।

মানুষ যখন আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে এগিয়ে আসে, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের মংগলের জন্যে এগিয়ে আসেন, ফলে দুনিয়া বা আখেরাতে, অথবা উভয় ক্ষেত্রেই তাদের কামিয়াব করেন, তাদের মংগল সাধন করেন, আর যদি তারা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে আল্লাহও তাদের মংগলের জন্যে এগিয়ে আসেন না; বরং পরকালে তাদের কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে, অনেক অর্থ খরচ করেও সে হিসাব থেকে তারা রক্ষা পাবে না।

দ্বিতীয় আয়াতটির বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া না দেয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মানুষের নিজস্ব গতিবিধি ও কর্মকান্ডের ওপর। তাদের এই স্বাধীন গতিবিধি ও কর্মকান্ডের মাধ্যমেই আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে।

তৃতীয় আয়াতটির প্রথম অংশ দ্বারা বুঝা যায়, বিপথে পরিচালিত করার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা অবাধ ও নিরংকুশ, কিন্তু পরক্ষণেই একই কথা আবার বলা হয়েছে। (আয়াত ২৭)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাকেই হেদায়াত দান করেন যে তাঁর প্রতি এগিয়ে আসে, তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তিকে কখনো বিপথে পরিচালিত করবেন না যে তাঁর প্রতি ধাবিত হবে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দেবে। পক্ষান্তরে যে তাঁর প্রতি ধাবিত হবে না এবং তাঁর ডাকে সাড়া দেবে না, তাকেই আল্লাহ পথহারা করবেন, গোমরাহ করবেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন।

কাজেই বুঝা গেলো, হেদায়াত এবং গোমরাহী আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন, কিন্তু এই প্রতিফলন তখনই ঘটে যখন বান্দা নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে সচেষ্ট হয় এবং আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে সঠিক পথে চলার জন্যে চেষ্টা করে অথবা অবহেলা করে।

চতুর্থ আয়াতটির বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে গোটা মানব জাতিকে হেদায়াত দান করতে পারতেন। অন্যান্য আয়াতগুলোর বক্তব্যও সামনে রাখলে ব্যাপারটা বুঝতে সহজ হবে। আয়াতগুলোর মর্মার্থ হলো এই যে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে গোটা মানব জাতিকে হেদায়াত গ্রহণের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করতে অথবা হেদায়াত গ্রহণে তাদের সবাইকে বাধ্য করতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াত গ্রহণ বা বর্জন এ দুটো ক্ষমতাই দান করেছেন এবং সেভাবেই তাদের সৃষ্টি করেছেন। ফলে তিনি তাদের কেবল হেদায়াতের জন্যেই বাধ্য করেন না অথবা বিপথে পরিচালিত হতেও বাধ্য করেন না; বরং তিনি এ ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা দান করেছেন। ফলে তারা সত্য পথের বিভিন্ন নিদর্শন ও দলিল প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে ঈমানের আহবানে সাড়াও দিতে পারে অথবা তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারে।

পঞ্চম আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, যারা কাফের তাদের সামনে তাদের চক্রান্তকে মোহনীয় করে দেখানো হয়েছে এবং তাদের সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ জাতীয় আয়াতের বক্তব্যকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার ফলেই ইসলামী চিন্তা ও দর্শনের ইতিহাসে সেই বহুল আলোচিত 'জাবরিয়া' মতবাদ নামে পরিচিত বিতর্কের উৎপত্তি ঘটে। অথচ সবগুলো আয়াতের বক্তব্য একত্রে দেখলে উক্ত বিষয়টির একটা পূর্ণাংগ চিত্র ও ধারণা আমরা পেতে পারি। আর সেটা হলো এই যে, কাফেরদের চক্রান্তকে মোহনীয়রূপে দেখানো বা তাদের সঠিক পথ থেকে দূরে রাখা এসব কিছুর পেছনে একটিই কারণ বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে, কুফরী মতবাদ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর আহ্বানে সাড়া না দেয়া। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কাফেররা নিজেদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সেভাবেই পরিচালিত করেছেন যেভাবে তারা পরিচালিত হতে চেয়েছে, আর সে কারণেই তাদের সামনে অসুন্দরকে সুন্দররূপে দেখানো হয়েছে এবং সরল পথের পরিবর্তে তাদের বিপথে পরিচালিত করা হয়েছে।

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রায় সব দল ও গোষ্ঠীর মাঝেই বিতর্ক দেখা দেয়। তাই বিষয়টি সম্পর্কে আরো দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। এটা অনস্বীকার্য যে, মানুষের নিজস্ব গতিই তারা চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে না। কারণ, চূড়ান্ত পরিণতি বা ফলাফল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর এ বিশেষ তাকদীর অনুযায়ীই জগতের সকল ঘটনা ঘটে থাকে। এই তাকদীরের মাধ্যমেই আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে, তাঁর চূড়ান্ত অভিপ্রায়ের বাস্তবায়ন ঘটে। এই সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন, (আল কামার ৪৯)

'নিসন্দেহে আমি প্রত্যেক বস্তুকে তার নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।'

কাজেই গোটা জাগতিক নিয়ম কোনো যান্ত্রিকতার অধীন নয়, তদ্রূপ উপায় উপকরণ ও এদের ফলাফল উভয়টিই আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ যখন নিজের জন্যে কোনো পথ অবলম্বন করে তখন এর মাধ্যমে সে আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটায়। তবে এই ইচ্ছার প্রতিফলন এবং এর বাস্তব ফলাফল ততোটুকুই হবে যতোটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখে দিয়েছেন। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতটিতে বলেছেন,

'প্রতিটি গর্ভবতী নারী (তার ভেতরে) যা কিছু বহন করে চলেছে এবং (তার সন্তান উৎপাদনের) জরায়ু (সন্তানের ব্যাপারে) যা কিছু বাড়ায় কমায় তার সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন। তার কাছে প্রতিটি বস্তুরই একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে।' (আয়াত ৮)

আলোচ্য সূরার প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করার পর একজন মানুষ বুঝতে পারবে যে, এই জগতে তার স্থান কি এবং তার দায়িত্বের পরিধি কি? সে আরো বুঝতে পারবে যে, গোটা জগতে কেবল মানুষই এমন একটি জাতি, যার গতিবিধি ও আচার আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। আর এ কারণেই তার দায় দায়িত্বের পরিধিও ব্যাপক এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগতের তুলনায় তার মান-মর্যাদাও অধিক।

আলোচ্য সূরাতে একটি বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করা হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, কুফরী মতবাদ গ্রহণ করা এবং এ সত্য ধর্মের আহ্বানে সাড়া না দেয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান থাকে। যেমন, মনুষ্যত্বের বিকৃতি, সত্য গ্রহণ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিলুপ্তি এবং সহজাত নিয়ম থেকে মানবীয় প্রকৃতির বিচ্যুতি। কাজেই সুস্থ বিবেক ও স্বাভাবিক মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী একজন মানুষের সামনে যখন সত্যের দাওয়াত কোরআনের পদ্ধতি ও নিয়ম অনুযায়ী পেশ করা হবে, তখন সে তাতে সাড়া দেবেই এবং সেই সত্যকে সে বিশ্বাস করবেই, তার প্রতি সে ঈমান

আনবেই। কারণ, স্বভাবগতভাবেই একজন মানুষ সত্যকে তার হৃদয়ের গভীরে স্থান দিয়ে থাকে। তার স্বভাবধর্মই তাকে এটা করতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু যখন কোন মানুষ এই সত্য উপেক্ষা করবে বা প্রত্যাখ্যান করবে, তখন বুঝতে হবে, তার মাঝে চারিত্রিক বিপর্যয় ঘটেছে। আর এই চারিত্রিক বিপর্যয়ই তাকে বিপথগামী করছে এবং পরিণামে তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভাগী করে তুলছে। এ বিষয়টির প্রতিই আল্লাহ তায়ালা ইংগিত করে বলেছেন। (আল আরাফ ১৪৬)

'আমি অচিরেই তাদের আয়াত থেকে ফিরিয়ে দেবো, যারা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে গর্ব অহংকার করে, আর যদি তারা প্রতিটি মোজেযা দর্শন করে তবু ঈমান আনে না, তারা কল্যাণ মংগলের পথ দেখলেও তা গ্রহণ করে না, যদি তারা বক্র পথ দেখে তবে তাই গ্রহণ করে, এটা এ জন্যে যে, তারা আমার আয়াতগুরোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তা থেকে উদাসীন অমনোযোগী থেকেছে।'

আলোচ্য সূরায় কুফুর এবং ঈমানের বেশ কতগুলো নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, কুফুরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে অন্ধত্ব বা দৃষ্টিশক্তিহীনতারূপে। আর ঈমান ও হেদায়াতকে আখ্যায়িত করা হয়েছে দৃষ্টি ও বিবেকের সুস্থতা হিসাবে। কাজেই যাদের দৃষ্টি সুস্থ ও বিবেক সুস্থ, কেবল তারাই জগতময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খোদায়ী নিদর্শনের মর্ম বুঝতে পারে এবং এর পেছনে যে সত্য লুক্কায়িত রয়েছে তাও উদ্ঘাটন করতে পারে। এই বাস্তব কথাই নিচের আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য, সে কি করে এমন ব্যক্তির মতো হবে– যে (এসব কিছু দেখেও) অন্ধ! মূলত বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

(এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা আল্লাহর সাথে (তাদের আনুগত্যের) চুক্তি মেনে চলে এবং কখনো (নিজেদের এই) প্রতিশ্রুতি ভংগ করে না এবং আল্লাহ তায়ালা যেসব (মানবীয়) সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রেখে চলে, নিজেদের মালিককে ভয় করে, আরো যারা ভয় করে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ আযাবকে এবং যারা তাদের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে (বিপদ মসিবতে) ধৈর্য ধারণ করে, যথারীতি নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে প্রাণ খুলে) খরচ করে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, যারা (নিজেদের) ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ)-কে দূরীভূত করে। নিসন্দেহে আখেরাতের ভালো ঘর তাদের জন্যেই (রেখে দেয়া হয়েছে)। (আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২)

(হে নবী) যারা (তোমার নবুওত) অস্বীকার করে, তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো (অলৌকিক) নিদর্শন পাঠানো হলো না কেন, তুমি (এসব লোককে) বলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে (এসব অযথা কথায় ফেলে) বিভ্রান্ত করেন এবং তার কাছে পৌঁছার পথ তিনি তাকেই দেখান যে (তার প্রতি) অভিমুখী হয়।

(তারা হচ্ছে এমন লোক) যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং আল্লাহর যেকেরে তাদের অন্তকরণ প্রশান্ত হয়, জেনে রেখো, আল্লাহর যেকের দিয়েই অন্তর প্রশান্ত হয়। অতএব যারা (আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের (জন্যে আখেরাতে) রয়েছে যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎকৃষ্ট আবাস (ব্যবস্থা)। (আয়াত ২৭, ২৮ ও ২৯)

তিনিই (তোমাদের সুবিধার জন্যে) এই যমীনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী বসিয়ে (এক অপূর্ব ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে) দিয়েছেন। (সেখানে) আরো রয়েছে রং বেরংয়ের

ফল ফুল– তাও বানিয়েছেন (আবার) জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাতের (পোশাক দ্বারা) আচ্ছাদিত করেন, অবশ্যই এসব কিছুর মাঝে তাদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে যারা (মহান সৃষ্টি সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করে। (আয়াত ৩)

(ভেবে দেখো,) যমীনে তার বিভিন্ন অংশ রয়েছে (যদিও তার একাংশ আরেকাংশের সাথে সংলগ্ন, কিন্তু উৎপাদন ও অন্যান্য দিক থেকে তা একটার চেয়ে আরেকটা সম্পূর্ণ ভিন্ন), কোথাও (রয়েছে) আংগুরের বাগান (কোথাও আবার রয়েছে) শস্যক্ষেত্র, কোথাও (আছে) খেজুর, তাও (কিছু হয়তো) এক শির বিশিষ্ট (একটার সাথে আরেকটা জড়ানো), আবার (কোনোটি আছে) একাধিক শির বিশিষ্ট খেজুর (যা একটার চাইতে আরেকটা সম্পূর্ণ আলাদা, অথচ ভাবনার বিষয় হচ্ছে এই যে), এগুলো সব একই পানি দ্বারা উৎকর্ষিত হয়। তা সত্ত্বেও আমি স্বাদে (গন্ধে) একই ফলকে আরেক ফলের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি, (আসলে) এসব কিছুর মধ্যে সে সম্প্রদায়ের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। (আয়াত ৪)

এসব আয়াতের বক্তব্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা এতসব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখে সত্যের সন্ধানলাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহর সাক্ষ্য অনুযায়ী তারা অন্ধ, বিবেক শূন্য ও বুদ্ধিহীন। চিন্তা করার বা অনুধাবন করার মতো যোগ্যতা ও শক্তি তাদের মাঝে নেই। পক্ষান্তরে যারা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে, তারাই হচ্ছে বুদ্ধিমান ও বিবেকবান। কেবল তাদের মনই আল্লাহর স্মরণে যেকেরে শান্তি পায়। সত্যের সন্ধান পেয়ে কেবল তাদের মনই শীতল হয়, শান্ত হয়।

যারাই এ সত্য ধর্ম অস্বীকার করবে এবং যারাই রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রচারিত পূর্ণাংগ ইসলামী আদর্শকে উপেক্ষা করবে, তাদের বেলায়ই আল্লাহর উপরোক্ত বাণীর সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণিত হবে, অর্থাৎ এ জাতীয় লোকেরা অন্তর্দৃষ্টিহীন, বিবেকশূন্য, বিচার বুদ্ধি রহিত। তারা এ সৃষ্টি জগতের নীরব আহ্বান ও ইংগিত বুঝতে সক্ষম নয়। গোটা সৃষ্টি জগত যে একমাত্র মহান আল্লাহরই গুণগানে সদা লিপ্ত এবং তাঁরই একত্ববাদ, অপার কুদরত, সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সাক্ষ্য দিচ্ছে, সেটাও উপলব্ধি করার মত দিব্যদৃষ্টি তাদের নেই।

যারা এই সত্য বিশ্বাস করে না তারা যখন স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষ্য অনুযায়ী অন্ধ বলে প্রমাণিত, তখন কোনো মুসলমানের পক্ষেই এ কথা চিন্তা করা ঠিক হবে না যে, ওই সকল লোকেরা আল্লাহর রসূলকে রসূল এবং কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করে। কারণ দৃষ্টিশক্তিহীন বা কোনো অন্ধ লোকের কাছ থেকে জীবন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের দিকনির্দেশনা আশা করা চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক, বিশেষ করে যখন বিষয়টির সম্পর্ক মানবজীবন, সামাজিক ও আদর্শিক মূল্যবোধ বা রীতি নীতি ও আচার আচরণের সাথে হবে। কারণ, এসব বিষয় জীবন ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই এ পরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির দিকনির্দেশনা দান কোনো দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

অনৈসলামিক চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি এমনই হওয়া উচিত। তবে ফলিত বিজ্ঞানের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূলের এই বাণীকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেছেন,

অর্থাৎ তোমাদের জাগতিক বা ব্যবহারিক জীবনের বিষয়াদি তোমরাই ভালো জান, কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাসী, আল্লাহর সত্য ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মুসলমানের জন্যে আদৌ উচিত হবে না, একজন খোদাদ্রোহী বা সত্য ধর্মে অবিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার সব ধরনের

চিন্তা, মতবাদ ও বক্তব্য নির্বিচারে মেনে নেয়া। কারণ এ জাতীয় মানুষতো আল্লাহর সাক্ষ্য অনুযায়ী অন্ধ। কাজেই আল্লাহর সাক্ষ্য একজন মুসলমান কিভাবে অস্বীকার করবে? আল্লাহর সাক্ষ্য অস্বীকার করার পর কোনো মুসলমান কি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করতে পারবে?

ইসলামী জীবন বিধানের বিষয়গুলোকে এভাবেই আপসহীন মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করতে হবে, এর নির্দেশাবলী এবং বক্তব্যকেও কঠোরভাবে গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো শিথিলতার অর্থ হবে খোদ ঈমান আকীদার ব্যাপারেই শিথিলতা প্রদর্শন করা। এটা আবার কখনও আল্লাহর সাক্ষ্য রদ করার মাধ্যমে প্রকাশ্য কুফরী কাজের অন্তর্ভুক্তও হতে পারে।

এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে, কিছু লোক নিজেদের মুসলমান হিসাবে দাবী করে। অথচ জীবন বিধান তারা গ্রহণ করছে এমন কিছু লোকের কাছ থেকে যাদের স্বয়ং আল্লাহ অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর পরও তারা নিজেদের মুসলমানই মনে করে!

ইসলামকে হাল্কাভাবে বা তুচ্ছভাবে দেখার কোনো অবকাশ নেই। এর কোনো বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শনেরও সুযোগ নেই। এর প্রতিটি বক্তব্য এবং প্রতিটি নির্দেশ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কেউ এর ব্যাপারে আপসহীনতা, এর নির্দেশ ও বিধানের ব্যাপারে চরম একনিষ্ঠতা ও প্রত্যয়ের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার প্রয়োজনীয়তা এতে আদৌ নেই।

জাহেলী যুগের ধ্যান ধারণা একজন মুসলমানের মন মস্তিষ্কে চেপে বসুক এটা কখনো হতে পারে না। এই জাতীয় জাহেলী ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে একজন মুসলমান নিজের আদর্শ উদ্দেশ্য বিজাতীয় জীবন দর্শনের মাঝে খুঁজতে যাবে, এটা কি ভাবে সম্ভব? কারণ, সে তো ভাল করেই জানে যে, রসূলের আদর্শই সত্য আদর্শ, আর যারা এটা সত্য বলে স্বীকার করে না তারা অন্ধ। কাজেই এই অন্ধের অনুসরণ করা, তার কাছ থেকে দিকনির্দেশনা লাভ করা কখনো যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অন্যথায় এর দ্বারা আল্লাহর সাক্ষ্যকেই অস্বীকার করা হবে।

ইসলামের যেসব পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচ্য সূরায় স্থান পেয়েছে, তার মধ্য থেকে সর্বশেষ পরিচয়টির প্রতি এখন আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। আর সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবনে যে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় দেখা দেয় তার মাঝে এবং সত্য, সুন্দর ও মংগলের বার্তাবাহী আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন বিধান অস্বীকার করার মাঝে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যারা আল্লাহ নির্ধারিত স্বভাবধর্মকে স্বীকার করে না, যারা সত্যের আহ্বানে সাড়া দেয় না, যারা ওই সত্যকে চরম সত্য বলে জানে না, তারাই পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। পক্ষান্তরে যারা এই সত্যের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং এই সত্যকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে, কেবল তারাই পৃথিবীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। তাদের বদৌলতেই জীবন পরিচ্ছন্নতা লাভ করে, সৌন্দর্য মন্ডিত হয়। নিচের আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে,

'যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য, সে কি করে এমন ব্যক্তির মতো হবে যে (এসব কিছু দেখেও) অন্ধ! মূলত বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা আল্লাহর সাথে (তাদের আনুগত্যের) চুক্তি মেনে চলে এবং কখনো (নিজেদের এই) প্রতিশ্রুতি ভংগ করে না এবং আল্লাহ তায়ালা যেসব (মানবীয়) সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রেখে চলে, নিজেদের মালিককে ভয় করে, আরো যারা ভয় করে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ আযাবকে এবং যারা তাদের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে (বিপদ মসিবতে) ধৈর্য ধারণ করে, যথারীতি নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে প্রাণ

খুলে) খরচ করে– গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, যারা (নিজেদের) ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ)-কে দূরীভূত করে, নিসন্দেহে আখেরাতের ভালো ঘর তাদের জন্যেই (রেখে দেয়া হয়েছে)।' (আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২)

'এবং তাদের বলবে আজ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা (দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে) যে পরিমাণ ধৈর্য ধারণ করেছো (এটা হচ্ছে তারই বিনিময়), এই আখেরাতের ঘর কতো উৎকৃষ্ট! (আয়াত ২৪)

মানুষের জীবনে ততোদিন পর্যন্ত সংশোধন ও মংগল আসতে পারে না যতোদিন পর্যন্ত এর নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বের ভার বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী লোকদের হাতে ন্যস্ত না হবে। যারা হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর আনীত ধর্মকে সত্য বলে স্বীকার করে, আল্লাহর বিধান মেনে চলে, আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা পূরণে তৎপর হয়। কারণ আদি পিতা আদম (আ.) এবং তার বংশধররা এ মর্মে আল্লাহর সামনে অংগীকার করেছিলো যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত বন্দেগী করবে, তারই সত্য ধর্ম মেনে চলবে, অন্য কারো নির্দেশ মানবে না। কেবল তাঁরই বিধি নিষেধ মেনে চলবে। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলবে। তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে, তাঁর হিসাব নিকাশের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকবে। ফলে প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ ও প্রতিটি চিন্তা চেতনায় তাদের মাঝে পরকালের হিসাব নিকাশের ভয় জাগ্রত থাকবে। সত্যের ওপর অটল অবিচল থাকতে গিয়ে যেসব দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে সেগুলো হাসিমুখে সহ্য করে নেবে। নামায কায়েম করবে, আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করবে। অসুন্দরকে সুন্দরের মাধ্যমে, অমংগলকে মংগলের মাধ্যমে এবং শত্রুতাকে বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রতিহত করবে।

এই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ব্যতীত পার্থিব জীবন কখনও মংগলময় ও কল্যাণময় হতে পারে না। কারণ এ বিচক্ষণ নেতৃত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। ফলে সে গোটা সমাজ জীবনকে সেই হেদায়াত এবং আদর্শের আলোকেই পরিচালিত করে ও গড়ে তোলে। কাজেই মানব জীবনের কল্যাণ কখনও ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট নেতৃত্বের মাধ্যমে সাধিত হতে পারে না। কারণ, এই নেতৃত্ব রসূলুল্লাহর আদর্শকে পরম সত্য ও অনুসরণীয় বলে বিশ্বাস করে না। ফলে আল্লাহর মনোনীত ও পছন্দনীয় জীবন বিধানের পরিবর্তে অন্যান্য মত এবং পথকেই তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এই মানব সমাজের জন্যে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কখনই উপযুক্ত হতে পারে না। কারণ এসব তন্ত্রমন্ত্র সেসব লোকের মস্তিষ্ক প্রসূত যাদের আল্লাহ তায়ালা অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মাঝে আল্লাহর দ্বীনের মর্মবাণী ও রসূলের আদর্শের বাস্তবতা উপলব্ধি করার মতো যোগ্যতা এবং অন্তর্দৃষ্টি কোথায়? তাদের মাঝে তো এই বোধটুকুও নেই যে, আল্লাহর দ্বীনে পরিবর্তনেরও কোনো সুযোগ নেই এবং তা থেকে দূরে সরে থাকারও কোনো অবকাশ নেই। তাদের এ কথাও জানা নেই যে, এই মানব জীবনের মংগল আমলাতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বা গণতন্ত্রের মাঝে নিহিত নয়। কারণ এসব তন্ত্র ও মতবাদ সত্যের আলো বঞ্চিত লোকদের সৃষ্টি, যারা নিজেদের আল্লাহর প্রতিভূ মনে করে। নিজেদের মনগড়া তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে তারা মানব জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। আল্লাহ যা বলেননি তা করার জন্যে মানুষকে বাধ্য করছে। তাদের মনগড়া বিধি বিধানের প্রতি মানুষের নিশর্ত আনুগত্যলাভে বল প্রয়োগ করছে। ফলে আনুগত্য ও দাসত্ব আল্লাহর পরিবর্তে তাদের জন্য নির্ধারিত হচ্ছে।

এই বিংশ শতাব্দীতে নব্য জাহেলিয়াতের যে সয়লাব গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে নিচ্ছে, সেটা দ্বারাও পবিত্র কোরআনের পূর্বের বক্তব্যেরই সত্যতা প্রমাণিত হয়। আজ সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ,

সাম্যবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অথবা স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নামে যে নৈরাজ্যপূর্ণ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এসব কিছুর পেছনে ওই অন্ধ বা সত্যের আলো বঞ্চিত লোকদেরই কারসাজি রয়েছে। তারা আল্লাহর সত্য বিধান এবং রসূলের অনিন্দ্য আদর্শ উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া মতবাদ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে দেশ, জাতি ও সমাজ সত্য আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।

একজন মুসলমান– যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রসূলের আদর্শকে হক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে কখনও খোদাদ্রোহী কোন মতবাদ, কোনো আদর্শ বা জীবন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি সব ক্ষেত্রেই সে একটিমাত্র আদর্শই মেনে নেয় যে আদর্শ আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় ও নেক বান্দাদের জন্যে মনোনীত করেছেন।

এটা আমাদের সকলেরই জানা থাকা উচিত যে, মানব রচিত যে কোনো আদর্শ, ব্যবস্থা বা বিধানের বৈধতা ও যথার্থতা স্বীকার করে নেয়ার অর্থই হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি সার্বিক আনুগত্যের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসা। কারণ, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ বা সার্বিক আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলের আনুগত্য ত্যাগ করে কেবল তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করে নেয়া।

মানব রচিত আদর্শ বা বিধানের স্বীকৃতি ইসলামের মৌলিক ধারণার পরিপন্থী হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব সেসব লোকের হাতে ন্যস্ত করারও নামান্তর যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেও তা রক্ষা করে না, আত্মীয়তার সম্পর্কও ঠিক রাখে না এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। ফলে পৃথিবীব্যাপী যে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা বিরাজ করছে তা এই অন্ধ বিবেকহীন নেতৃত্বেরই ফল।

যুগে যুগে মানবতা অভিশপ্ত হয়েছে, অন্ধ ও বিবেকশূন্য লোকদের ভুল নেতৃত্বের ফলে বিভিন্ন মত ও পথের বেড়াজালে আটকে পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছে, হতাশায় হাবুডুবু খেয়েছে। কারণ, যারা এই বিভ্রান্তি ও হতাশার মূল নায়ক তারা দার্শনিক, চিন্তাবিদ, আইনবিদ ও রাজনীতিবিদদের আলখেল্লা পরে সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে। ফলে মানবতা কখনই শান্তির মুখ দেখেনি, কখনো তার কাংখিত মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। আর এই একই কারণে এ পৃথিবীর বুকে অল্প কিছুদিন ব্যতীত আল্লাহ ও রসূলের আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও কখনো গড়ে ওঠেনি।

আলোচ্য আয়াতের এই বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করলাম। পূর্ণাংগ ও বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। যা হোক, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে ইসলামের সহজ সরল পথ আঁকড়ে থাকার তাওফীক দান করুন। আল্লাহই প্রকৃত হেদায়াতের মালিক, তিনি হেদায়াত দান না করলে আমরা কেউই হেদায়াত লাভ করতে পারতাম না। কাজেই লাখ শোকর তাঁর মহান দরবারে।

সূরা ইবরাহীম

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সূরা ইবরাহীম একটা মক্কী সূরা এবং এর মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস যথা ওহী, রেসালাত, তাওহীদ, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হওয়া, হিসাব গ্রহণ ও কর্মফল দান ইত্যাদি, যা সাধারণত মক্কী সূরাগুলোতে আলোচিত হয়ে থাকে।

তবে এই সূরায় এ বিষয়গুলো ও তার মূল তথ্যাবলী তুলে ধরতে গিয়ে একটা বিশেষ ধরনের বাচনভংগি অবলম্বন করা হয়েছে। কোরআনের প্রত্যেকটা সূরারই বিশেষ ধরনের বাচনভংগি থাকে, যা দ্বারা তাকে অন্যান্য সূরা থেকে পৃথক করা ও চেনা যায়। সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভংগি, যে প্রেক্ষাপটে তার প্রধান প্রধান তথ্য আলোচিত হয় এবং এসব তথ্যের ধরন, যা সাধারণত অনুরূপ অন্যান্য সূরায় বিষয়গতভাবে পৃথক নয়, কিন্তু একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তা আলোচিত হয়– এগুলো দ্বারাও সেই বিশেষ সূরাটিকে চেনা যায়। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার কারণে ওসব আয়াতের তাৎপর্যও বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সূরার আকার আকৃতিও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ফলে তার কোনো দিক বিস্তৃত ও কোনো দিক সংকুচিত হয়ে যায়। এভাবে সূরায় 'শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য' আসার কারণে পাঠকের কাছে সূরাকে নতুন মনে হয়। 'শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য' পরিভাষাটা প্রয়োগ করছি এজন্যে যে, এটা কোরআনের বাচনভংগিতে যোজেযা বা অলৌকিক রূপবৈচিত্র্যের স্ফুরণ ঘটায়।

মনে হয়, এ সূরার নাম সূরাব সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। হযরত ইবরাহীম, যিনি নবীদের পিতা, পরম কল্যাণের প্রতীক, পরম কৃতজ্ঞ, আল্লাহর অনুগত, অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণ, তাঁরই নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আর যেসব পেক্ষাপট এই গুণাবলীর উপস্থিতির দিক থেকে বাঞ্ছিতও। সেগুলোও সূরার সামগ্রিক পরিবেশের অংগীভূত। এতে আলোচিত তথ্যসমূহ এবং বাচনভংগিও সূরার সার্বিক পরিবেশনার আওতাভুক্ত।

সূরাটায় একাধিক ইসলামী আকীদা বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্য থেকে দুটো প্রধান বিষয় সূরার সমগ্র আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিষয় দুটো সূরার মধ্যে আলোচিত হযরত ইবরাহীমের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ। বিষয় দুটো হলো, সকল যুগের নবী ও রসূলদের সমমতাবলম্বী হওয়া, তথা তাদের সকলের দাওয়াতের ঐক্য এবং স্থান কাল নির্বিশেষে আল্লাহর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যানকারী জাহেলিয়াতের বিরোধিতায় তাঁদের সকলের ঐক্যবদ্ধতা, মানুষের ওপর আল্লাহর অজস্র নেয়ামত দান ও শোকরের মাধ্যমে তার বৃদ্ধি এবং অধিকাংশ মানুষ কর্তৃক নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা। এই দুটো প্রধান বিষয় বা শিক্ষা ছাড়াও আরো অনেক বিষয় এ সূরায় আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এই দুটো বিষয় অন্য সমস্ত বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করেছে। সূরার ভূমিকায় এই বিষয়টার দিকেই আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আল্লাহর রসূল ও রসূলকে প্রদত্ত কেতাবের ভূমিকা তথা উদ্দেশ্য লক্ষ্য বর্ণনার মধ্য দিয়েই সূরার সূচনা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসা। (আয়াত ১)

এই একই বক্তব্য দিয়ে অর্থাৎ তাওহীদতত্ত্ব সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়েই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। (সর্বশেষ আয়াত)

আর এরই মাঝে স্মরণ করানো হয়েছে যে, মূসা (আ.)-কেও মোহাম্মদ (স.)-এর মতো একই ওহী ও কেতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো,

'আমি মূসাকে আমার আয়াতগুলো দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ....।' (আয়াত ৫)

আরো স্মরণ করানো হয়েছে যে, সকল রসূলেরই কাজ ছিলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।

'আমি প্রত্যেক রসূলকেই পাঠিয়েছি তাঁর জাতির ভাষায়, যাতে সে তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে ......।' (আয়াত ৪)

রসূলের কাজ, তার পাশাপাশি চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনাও এ সূরার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত রসূল যে মানুষ, সেই বাস্তবতাই তার কাজ নির্ধারণ করে। তিনি প্রচারক, ভীতি প্রদর্শক, উপদেশদাতা ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী বটে, কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তিনি কোনো অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারেন না। তিনি বা তার জাতি যখন চান তখন নয়, স্বয়ং আল্লাহ যখন চান তখনই তিনি অলৌকিক কিছু দেখাতে পারেন। অনুরূপভাবে রসূল তাঁর জাতিকে সুপথে চালিত করবেন না বিপথে চালিত করবেন, সেটাও তাঁর আয়ত্তাধীন থাকে না। আল্লাহর বানানো যে প্রাকৃতিক নিয়ম আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, মানুষের সুপথ ও কুপথে চালিত হওয়া সে নিয়মের সাথেই যুক্ত।

সকল জাতি নিজ নিজ জাহেলী যুগে অর্থাৎ তাদের কাছে নবী আসার আগে যুগে এই বিষয়েই আপত্তি তুলতো যে, মানুষ কেন রসূল হয়ে আসে। ১০ নং আয়াতে তাদের এই আপত্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর জবাবে নবী রসূলরা যে জবাব দিতেন, তাও উদ্ধৃত হয়েছে। (আয়াত ১১

সূরায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজটা শুধুমাত্র 'আল্লাহর ইচ্ছাতেই' সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক রসূল তাঁর জাতির কাছে দ্বীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেন। তারপর 'আল্লাহই যাকে চান হেদায়াত করেন, যাকে চান গোমরাহ করেন।'

এ সব বিবরণ দ্বারা রসূলের প্রকৃত পরিচয় স্বচ্ছভাবে ফুটে ওঠে। আর এই পরিচয় দ্বারাই জানা যায় রসূলের কাজ কী। নবীদের মানবীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর কোনো কিছুর সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এভাবে আল্লাহর একত্ব থেকে যায় সব রকমের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত, নির্ভেজাল ও খালেস।

অনুরূপভাবে সূরায় এই সত্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলদের সাথে ও তাঁর প্রতি সত্যিকারভাবে ঈমান আনয়নকারী মোমেনদের সাথে করা ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত করেন। পৃথিবীতে আল্লাহর সাহায্য ও খেলাফাতের দায়িত্ব দানের মাধ্যমে এবং আখেরাতে আল্লাহর অবাধ্যদের আযাব ও মোমেনদের সুখশান্তি প্রদানের মাধ্যমে এই ওয়াদা বাস্তবায়িত করা হয়। সূরায় এই মহাসত্যটি রসূল ও তার জাতির মধ্যে সংঘটিত সংঘাতের চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়। (আয়াত ১৩, ১৪ ও ১৫)

কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত ২৩ নং এবং ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে এ মহাসত্য তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৮, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং আয়াতেও উদাহরণের মাধ্যমে এটি তুলে ধরা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যে দুটি বিষয় সমগ্র সূরায় প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে এবং যা পরম অনুগত, মহা কৃতজ্ঞ ও নবীদের সুমহান পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীমের সাথে সুসমন্বিত, সেই বিষয় দুটোর প্রথমটা হলো, সকল রসূলের মতের ঐক্য, দাওয়াতের ঐক্য এবং জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। আর দ্বিতীয়টা হলো, সকল মানুষের ওপর আল্লাহর সাধারণ অনুগ্রহ এবং আল্লাহর প্রিয় মানুষদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ। এই দুটো বিষয় আমরা আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

প্রথম বিষয়টাকে সূরায় অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে ও চমকপ্রদ ভংগিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কোনো কোনো সূরায় এ বিষয়টা পৃথক পৃথকভাবে এক একজন নবীর দাওয়াতের ঐক্যের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক রসূল তার জাতির কাছে নিজের বক্তব্য দেন এবং আপন কর্তব্য সমাধা করেন। তারপর আরো একজন রসূল এবং তারপর আরো একজন রসূল আসেন। প্রত্যেকে একই বক্তব্য দেন, জাতির কাছ থেকে একই জবাব পান, তাতে প্রত্যাখ্যানকারীরা

অন্যদের মত পার্থিব শাস্তি পায়, আবার কোনো কোনো জাতি পৃথিবীতে কিছু সময় পায়, কেউ বা কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ পায়, কিন্তু শুরু থেকে প্রত্যেক রসূলকে চলন্ত ক্যাসেটের ন্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এর নিকটতম উদাহরণ সূরা আল আরাফ ও সূরা হুদ।

পক্ষান্তরে সূরা ইবরাহীম সকল নবীকে এক কাতারে এবং জাহেলিয়াতের অনুসারীদের আর এক কাতারে রেখে আলোচনা করেছে। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ঘটে, অতপর তা এখানেই শেষ হয়ে যায় না; বরং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আমরা দেখতে পাই যে, স্থান কালের ব্যবধান সত্তেও নবীদের অনুসারীরা ও জাহেলিয়াতের অনুসারীরা যেন একই ময়দানে সমবেত। স্থান ও কাল দুটো অস্থায়ী ও নশ্বর জিনিস। মহাবিশ্বে সবচেয়ে বড় সত্য হলো ঈমান ও কুফরী এবং তা স্থান কালের চেয়ে বড় দর্শনীয়। এ বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে ৯ থেকে ১৭ নং আয়াতে।

এখানে হযরত নূহ থেকে শুরু করে সকল প্রজন্ম ও সকল নবী একত্রিত হন, স্থান ও কালের ব্যবধান ঘুচে যায় এবং সবচেয়ে বড় সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সেটি এই যে, নবী ও রসূলরা সবাই একই বাণী বহন করে এনেছেন, তাদের কাছে অজ্ঞ লোকেরা সব সময় একই আপত্তি তুলে ধরে, মোমেনদের আল্লাহ সাহায্য করেন। সৎ লোকদের তিনি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন এবং অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করেন, স্বৈরাচারী বলদর্পীদের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা এবং তাদের আযাব ভোগ করা অবধারিত। এখানে রসূল (স.)-এর সাথে সূরার ১ নং আয়াতে উদ্ধৃত উক্তি এবং হযরত মূসার সাথে আল্লাহর ৫ নং আয়াতে উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে একটা অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায়।

ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার সংঘাত দুনিয়াতেই শেষ হয় না; বরং আখেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যেমন ২১ থেকে ২৩ নং আয়াত। ৪২ ও ৪৩ নং আয়াত এবং ৪৬ থেকে ৫০ নং আয়াতে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত আয়াত ইংগিত দিচ্ছে যে, ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার সংঘাত একই সংঘাত, যা দুনিয়া থেকে শুরু হয় ও আখেরাতে গিয়ে শেষ হয়। এর একটা অপরটার পরে আসে।

অনুরূপভাবে যে সকল উদাহরণ দুনিয়াতে শুরু হয় ও আখেরাতে শেষ হয়, তা উভয় পক্ষের মধ্যকার সংঘাতের আলামতগুলো ও তার ফলাফল পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করে। কালেমায়ে তাইয়েবা তথা উত্তম কথা উত্তম বৃক্ষের মতো। আর এই উত্তম বৃক্ষ হলো নবুয়তের বৃক্ষ, ঈমানের বৃক্ষ ও কল্যাণের বৃক্ষ। পক্ষান্তরে খারাপ কথা হলো খারাপ গাছের মতো। আর খারাপ গাছ জাহেলিয়াতের গাছ, বাতিলের গাছ, মিথ্যা অন্যায় ও আগ্রাসনের গাছ।

দ্বিতীয় সত্যটা হলো আল্লাহর নেয়ামত, তার শোকর ও নাশোকরী সংক্রান্ত। এটাও সমগ্র সূরার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে এবং সূরার সর্বত্র এর ছাপ ও রেশ ছড়িয়ে রয়েছে।

আল্লাহ সমগ্র মানব জাতিকে দুনিয়ার জীবনে যে নেয়ামতসমূহ দিয়েছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষ মোমেন হোক বা কাফের হোক, সৎ হোক বা অসৎ, পাপী হোক বা পুণ্যবান অনুগত হোক বা অবাধ্য– সবার জন্যেই আল্লাহ অসংখ্য নেয়ামত বরাদ্দ করেছেন। এটা আল্লাহর বিরাট দয়া, করুণা ও উদারতা যে, তাঁর মোমেন, পুণ্যবান ও অনুগত বান্দাদের ন্যায় কাফের ফাসেক এবং অবাধ্য লোকদেরও পৃথিবীতে বহু নেয়ামত বিতরণ করেছেন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই সমস্ত নেয়ামতকে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল ও সুপ্রশস্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন দৃশ্যের অভ্যন্তরেও বিস্তৃত করেছেন। এসব নেয়ামতের বিবরণ ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতে রয়েছে। এ ছাড়া সূরার প্রথম আয়াতে মানুষের হেদায়াতের জন্যে রসূল ও কেতাব প্রেরণকেও একটি নেয়ামত হিসেবে তুলে ধরেছেন, যা অন্যান্য বস্তুগত নেয়ামতের সমান অথবা তার চেয়ে বড়। বস্তুত নূর বা আলো মহাবিশ্বে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। এখানে নূর বলতে সেই বৃহত্তর আলো বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মানব সত্ত্বা বিশেষত

তার হৃদয় মন ও অন্তর্নিহিত সত্ত্বা আলোকিত হয়। আর এটাই ছিলো হযরত মূসা ও অন্য সকল নবীর কাজ।

নবীরা যে মানুষকে তাদের গুনাহ মাফ করানোর জন্যে ডাকেন, এটাও নূরের মতোই একটা নেয়ামত।

নেয়ামত সংক্রান্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটেই হযরত মূসা তার জাতিকে তাদের নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। দেখুন (৬ নং আয়াত) এই পটভূমিতে আল্লাহ রসূলদের কাছে প্রদত্ত নিজের সেই ওয়াদার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন, যা ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে তাদের ভবিষ্যত বিজয় ও সাফল্যের আভাস দেয়।

এটাও আল্লাহর এক বিরাট ও বিশাল নেয়ামত।

শোকর দ্বারা নেয়ামত বৃদ্ধির তথ্যও বর্ণিত হয়েছে ৭ নং আয়াতে। সেই সাথে ৮ নং আয়াতে জানানো হয়েছে যে, মানুষ শোকর না করলেও আল্লাহর কিছু আসে যায় না এবং তিনি তাদের শোকরের মুখাপেক্ষী নন। আরো বলা হয়েছে যে, মানুষের সাধারণত আল্লাহর নেয়ামতের যেমন শোকর করা উচিত তেমন করে না। (আয়াত ৩৪ দেখুন।)

কিন্তু যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং তার ফলে তাদের হৃদয়ের চোখ খুলে যায়। তারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে ও আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করে। এগুলোতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্যে শিক্ষা রয়েছে।

এ ধৈর্য ও শোকরের সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। আল্লাহর পবিত্র কাবা ঘরের সামনে বসে তিনি বিনীতভাবে যে দোয়া করছিলেন তা এ সবর ও শোকরের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ৩৫ থেকে ৪১ নং আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন।

আর যেহেতু আল্লাহর নেয়ামত, নেয়ামতের শোকর ও না-শোকরীর বিবরণ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়, তাই এর বিভিন্ন ছোটখাট বক্তব্যও এই সার্বিক পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন,

'তাদের বিভিন্ন ফলমূল দান করো। হয়তো তারা শোকর করবে।'

'এগুলোতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

'যারা আল্লাহর নেয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার রূপ দিয়েছে তাদের কি দেখনি?'

'তোমাদের ওপর আল্লাহর যে নেয়ামত এসেছিলো তা স্মরণ করো।'

'সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি বার্ধক্যে আমাকে দিয়েছেন ইসমাঈল ও ইসহাক।'

নবীদের মানুষ হওয়ার ওপর কাফেরদের আপত্তির জবাবে নবীরা বলেছেন,

'কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের যাকে চান অনুগৃহীত করেন।'

সুতরাং সূরার সামগ্রিক পটভূমি হলো নিয়মিত শোকর ও না-শোকরী। আর উপরোক্ত জবাব এই পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরাটা সামগ্রিকভাবে দু'টো পর্বে বিভক্ত।

প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে রসূল ও রেসালাতের তাৎপর্য, রসূলের অনুসারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে দুনিয়া আখেরাতের দ্বন্দ্ব এবং পবিত্র কালেমা ও অপবিত্র কলেমার উদাহরণ। আর দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে মানুষের ওপর আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত, যারা আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরী ও অহংকার করেছে তাদের পরিণাম, যারা ঈমান এনেছে ও শোকর করেছে তাদের পুরস্কার, তাদের প্রথম ও প্রধান নমুনা হযরত ইবরাহীম, যালেম ও অকৃতজ্ঞদের ওপর কেয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি এবং এভাবে সূরার সমাপ্তি।

'এ হচ্ছে মানব জাতির উপকারার্থে প্রচার যাতে তাদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা জেনে নেয় যে, আল্লাহই একমাত্র প্রভু এবং যাতে বুদ্ধিমান লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।'

প্রথমে প্রথম পর্বের ব্যাখ্যা শুরু করা যাক, যা প্রথম আয়াত থেকে ২৭ নং আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত।

সূরা ইবরাহীম

আয়াত ৫২ রুকু ৭

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ ﴿١﴾ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٣﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আলিফ, লা-ম, রা। (এ কোরআন) এমন এক গ্রন্থ, যা আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) এমন মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে (জাহেলিয়াতের) যাবতীয় অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনতে পারো, তাঁর পথে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও যাবতীয় প্রশংসা পাবার যোগ্য! ২. সে আল্লাহর (পথে), যাঁর জন্যে আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছু (নিবেদিত), যারা (এ সত্ত্বেও আল্লাহকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি (রয়েছে)। ৩. (এ শাস্তি তাদের জন্যে) যারা পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষদের) আল্লাহর (সহজ সরল) পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, (সর্বোপরি) এ (পথ)-টাকে (নিজেদের খেয়াল খুশীমতো) বাঁকা করতে চায়, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা মারাত্মক গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে। ৪. আমি কোনো নবীই এমন পাঠাইনি, যে (নবী) তার জাতির (মাতৃ)-ভাষায় (আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছায়নি), যাতে করে সে তাদের কাছে (আমার আয়াত) পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারে; অতপর আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, আবার যাকে তিনি চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাকুশলী। ৫. আমি মূসাকে অবশ্যই আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে (তার জাতির কাছে) পাঠিয়েছি, তোমার জাতিকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে (ঈমানের)

مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ

اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ

وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝ وَاِذْ تَاَذَّنَ

رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ۝

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ

لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ

وَّثَمُوْدَ ۬ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛؕ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِىْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ

আলোতে বের করে নিয়ে এসে এবং তুমি তাদের আল্লাহর (অনুগ্রহের বিশেষ) দিনগুলোর কথা স্মরণ করাও; যারা একান্ত ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, তাদের জন্যে এ (ঘটনার) মাঝে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে। ৬. মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করো, (বিশেষ করে) যখন তিনি তোমাদের ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিলেন, যারা তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো, তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো; তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে এতে বড়ো ধরনের একটি পরীক্ষা নিহিত ছিলো।

রুকু ২

৭. (স্মরণ করো,) যখন তোমাদের মালিক ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা (আমার অনুগ্রহের) শোকর আদায় করো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে (এ অনুগ্রহ) আরো বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা (একে) অস্বীকার করো (তাহলে জেনে রেখো), আমার আযাব বড়োই কঠিন! ৮. মূসা (তার জাতিকে আরো) বলেছিলো, তোমরা এবং পৃথিবীর অন্য সব মানুষ একত্রেও যদি (আল্লাহর নেয়ামত) অস্বীকার করো (তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন যাবতীয় অভাব অভিযোগ থেকে মুক্ত, প্রশংসার দাবীদার। ৯. তোমাদের কাছে কি তোমাদের আগেকার লোকদের সংবাদ এসে পৌছয়নি– নূহ, আদ, সামূদ সম্প্রদায় ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের; যাদের (বিবরণ) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না; (সবার কাছেই) তাদের নবীরা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে এসেছিলো, অতপর তারা তাদের নিজেদের হাত তাদের

بِهٖ وَاِنَّا لَفِیْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَاۤ اِلَیْهِ مُرِیْبٍ ﴿۹﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِی اللّٰهِ

شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ یَدْعُوْكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ

وَیُؤَخِّرَكُمْ اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ قَالُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِیْدُوْنَ

اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ یَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱۰﴾ قَالَتْ لَهُمْ

رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَمُنُّ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ

عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نَّاْتِیَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَی اللّٰهِ

فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰی مَاۤ اٰذَیْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۱۲﴾

মুখে রেখে (কথা বলতে তাদের) বাধা দিতো এবং বলতো, যা (কিছু পয়গাম) নিয়ে তুমি আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছো, তা আমরা (স্পষ্টত) অস্বীকার করি, (তা ছাড়া) যে (দ্বীনের) দিকে তুমি আমাদের ডাকছো সে বিষয়েও আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি। ১০. তাদের রসূলরা (তাদের) বললো, তোমাদের কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রয়েছে– যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের (তাঁর নিজের দিকে) ডাকছেন, যেন তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিতে পারেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ (দিয়ে সংশোধনের সুযোগ) দিতে পারেন; (একথার ওপর) তারা বললো, তোমরা তো হচ্ছো আমাদের মতোই (কতিপয়) মানুষ; আমাদের বাপ-দাদারা যাদের এবাদাত করতো, তোমরা কি তা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাও? (তাহলে তোমাদের দাবীর পক্ষে) অতপর আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এসো। ১১. নবীরা তাদের বললো (এটা ঠিক), আমরা তোমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান (নবুওতের দায়িত্ব দিয়ে) তার ওপর তিনি অনুগ্রহ করেন; আর আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতিরেকে দলীল উপস্থাপনের কোনো ক্ষমতাই আমাদের নেই; আর ঈমানদারদের তো (এসব ব্যাপারে) আল্লাহর (ফয়সালার) ওপরই নির্ভর করা উচিত। ১২. (তা ছাড়া) আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করবোই না কেন? তিনিই আমাদের (জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে আলোর) পথসমূহ দেখিয়ে দিয়েছেন; (এ আলোর পথে) তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছো তাতে অবশ্যই আমরা ধৈর্য ধারণ করবো; (আর কারো ওপর) নির্ভর করতে হলে সবার আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي

مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ

مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ وَاسْتَفْتَحُوا

وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ

وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ

كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ

شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ وَمَا ذَٰلِكَ

রুকু ৩

১৩. কাফেররা তাদের রসূলদের বললো, আমাদের (ধর্মীয়) গোত্রে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাদের আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবো; অতপর (ঘটনা চরমে পৌঁছুলে) তাদের মালিক তাদের কাছে (এই বলে) ওহী পাঠালেন, আমি অবশ্যই যালেমদের বিনাশ করে দেবো, ১৪. আর তাদের (নির্মূল করে দেয়ার) পর তাদের জায়গায় আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো; (আমার) এ (পুরস্কার) এমন প্রতিটি মানুষের জন্যে, যে ব্যক্তি আমার সামনে (জবাবদিহিতার জন্যে) দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (আমার) কঠোর শাস্তিকেও ভয় করে। ১৫. (এর মোকাবেলায়) ওরা (একটা চূড়ান্ত) ফয়সালা চাইলো– আর (সে ফয়সালা মোতাবেক) প্রত্যেক দুরাচার ও স্বৈরাচারী ব্যক্তিই ধ্বংস হয়ে গেলো। ১৬. তার একটু পেছনেই রয়েছে জাহান্নাম, (সেখানে) তাকে গলিত পুঁজ (জাতীয় পানি) পান করানো হবে, ১৭. সে অতি কষ্টে তা গলাধকরণ করতে চাইবে, কিন্তু গলাধকরণ করা তার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব হবে না, (উপরন্তু) চারদিক থেকেই তার ওপর মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে কোনোমতেই মরবে না; বরং তার পেছনে থাকবে (আরো) কঠোর আযাব। ১৮. যারা তাদের মালিককে অস্বীকার করে তাদের (ভালো) কাজের (প্রতিফল পাওয়ার) উদাহরণ হচ্ছে ছাই ভস্মের (একটি স্তূপের) মতো, ঝড়ের দিন প্রচন্ড বাতাস এসে যা উড়িয়ে নিয়ে যায়; এভাবে (ভালো কাজের দ্বারা) যা কিছু এরা অর্জন করেছে তা দ্বারা তারা কিছুই করতে সক্ষম হবে না; আর সেটা হচ্ছে এক মারাত্মক গোমরাহী। ১৯. (হে মানুষ,) তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন, (তোমরা যদি এর ওপর না চলো তাহলে) তিনি ইচ্ছা করলে (এ যমীন থেকে) তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে নতুন (কোনো) সৃষ্টি (তোমাদের জায়গায়) আনয়ন করতে পারেন, ২০. আর এটা বিপুল ক্ষমতাবান আল্লাহর কাছে মোটেই

عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿٢٠﴾ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا
اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط
قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ
مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ
الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

কঠিন কিছু নয়। ২১. (মহাবিচারের দিন) তারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, অতপর যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিলো তারা (তাদের উদ্দেশ করে)– যারা অহংকার করতো, বলবে, (দুনিয়ায়) আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম, (আজ কি) তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে সামান্য কিছু হলেও আমাদের জন্যে কম করতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের (আজ নাজাতের) কোনো পথ দেখিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তোমাদেরও (তা) দেখিয়ে দিতাম, (মূলত) আজ আমরা ধৈর্য ধরি কিংবা ধৈর্যহারা হই, উভয়টাই আমাদের জন্যে সমান কথা, (আল্লাহর আযাব থেকে আজ) আমাদের কোনোই নিষ্কৃতি নেই।

রুকু ৪

২২. যখন বিচার ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান জাহান্নামীদের বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে (যে) ওয়াদা করেছেন তা (ছিলো) সত্য ওয়াদা, আমিও তোমাদের সাথে (একটি) ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদার বরখেলাপ করেছি; (আসলে) তোমাদের ওপর আমার তো কোনো আধিপত্য ছিলো না, আমি তো শুধু এটুকুই করেছি, তোমাদের (আমার দিকে) ডেকেছি, অতপর আমার ডাকে তোমরা সাড়া দিয়েছো, তাই (আজ) আমার প্রতি তোমরা (কোনো রকম) দোষারোপ করো না, বরং তোমরা তোমাদের নিজেদের ওপরই দোষারোপ করো; (আজ) আমি (যেমন) তোমাদের উদ্ধারে (কোনো রকম) সাহায্য করতে পারবো না, (তেমনি) তোমরাও আমার উদ্ধারে কোনো সাহায্য করতে পারবে না; তোমরা যে (আগে) আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছো, আমি তাও আজ অস্বীকার করছি (এমন সময় আল্লাহর ঘোষণা আসবে); অবশ্যই যালেমদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। ২৩. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে

جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِیَّتُهُمْ

فِیْهَا سَلٰمٌ ﴿۲۳﴾ اَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ

اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِی السَّمَآءِ ﴿۲۴﴾ تُؤْتِیْۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِیْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ

وَیَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۵﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیْثَةٍ

كَشَجَرَةٍ خَبِیْثَةِ ِۨ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۶﴾ یُثَبِّتُ

اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ۚ

وَیُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِیْنَ ۙ۫ وَیَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ ﴿۲۷﴾

এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে (রং বে-রংয়ের) ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে অনন্তকাল অবস্থান করবে; সেখানে (চারদিক থেকে) 'সালাম সালাম' বলে তাদের অভিবাদন হবে। ২৪. তুমি কি লক্ষ্য করোনি, আল্লাহ তায়ালা কালেমায়ে তাইয়েবার কি (সুন্দর) উপমা পেশ করেছেন, (এ কালেমা) যেন একটি উৎকৃষ্ট (জাতের) গাছ, যার মূল (যমীনে) সুদৃঢ়, যার শাখা প্রশাখা আসমানে (বিস্তৃত), ২৫. সেটি প্রতি মৌসুমে তার মালিকের আদেশে ফল দান করে; আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্যে (এভাবেই) উপমা পেশ করেন, যাতে করে তারা (এসব উপমা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ২৬. (আবার) খারাপ কালেমার তুলনা হচ্ছে একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষের (মতো), যাকে (যমীনের) উপরিভাগ থেকেই মূলোৎপাটন করে ফেলা হয়েছে, এর কোনো রকম স্থায়িত্বও নেই। ২৭. আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের তাঁর শাশ্বত কালেমা দ্বারা মযবুত রাখেন, দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালীন জীবনে, যালেমদের আল্লাহ তায়ালা (এমনি করেই) বিভ্রান্তিতে রাখেন, তিনি (যখন) যা চান তাই করেন।

তাফসীর

আয়াত ১-২৭

'আলিফ-লাম-রা .... এ কেতাব আমি তোমার কাছে নাযিল করেছি ....'

অর্থাৎ আলিফ লাম ইত্যাকার বর্ণমালা দিয়ে লেখা এ কেতাব আমিই তোমার কাছে নাযিল করেছি। তুমি এটা রচনা করোনি। নাযিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যেন 'তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে পারো।' অর্থাৎ মানব জাতিকে কুসংস্কার, ভিত্তিহীন ধ্যান ধারণা, রসম রেওয়াজ ও ঐতিহ্য, রকমারি প্রভুর দ্বারে দ্বারে ধর্না দেয়া ও রকমারি মূল্যবোধের অন্ধকার থেকে বের করে এনে যেন আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারো, যে আলো এ সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করতে পারে, যে আলো বিবেক ও চিন্তার জগতের তমসা দূর করতে পারে।

ঈমান মানুষকে আলোর সন্ধান দেয়

আল্লাহর ওপর ঈমান মানুষের হৃদয়ে উদ্ভাসিত এক জ্যোতির নাম। এ জ্যোতি দ্বারা নোংরা মাটি ও আল্লাহর পবিত্র আত্মার ফুৎকারের মিশ্রণে গঠিত মানব সত্ত্বা হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময়। এই পবিত্র ফুৎকারের দীপ্তি থেকে যখন সে বঞ্চিত হয় এবং এ দীপ্তি যখন ম্রিয়মাণ হয়, তখন তার মাটির উপাদানটুকুই শুধু অবশিষ্ট থাকে এবং সে নিছক পশুর মতো মাটির তৈরী রক্ত ও মাংসে পরিণত হয়। রক্ত ও মাংস এই দু'টোই মাটির তৈরী উপাদান। আল্লাহর রূহ থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তি যদি উদ্ভাসিত না করতো, ঈমান যদি তাকে পরিচ্ছন্ন ও পরিমার্জিত না করতো এবং ঈমান যদি তাকে স্বচ্ছ না করতো, তাহলে তার সাথে রক্ত ও মাংসে তৈরী অন্যান্য প্রাণীর কোনো পার্থক্যই থাকতো না।

আল্লাহর প্রতি ঈমান মন মগযকে আলোকিত করে। এ আলো দিয়ে সে আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ দেখতে পায়। কুসংস্কার, অমূলক ধ্যান ধারণা, লোভ লালসা ও কামনা বাসনার কুয়াশা তাকে আচ্ছন্ন করে না। সুস্পষ্টভাবে পথ দেখার পর সে নির্দ্ধিধায় নিসংশয়ে পথ চলে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান এমন এক জ্যোতি, যা সমগ্র জীবনকে উদ্ভাসিত করে। ফলে সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা হিসাবে সমান হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কই তাদের পারস্পরিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে এবং তাদের একমাত্র আল্লাহর অনুগত করে। এ কারণে মানুষ গোলাম ও প্রভু– এই দু'ভাগে বিভক্ত হয় না; বরং সবাই এক আল্লাহর গোলাম থাকে। এই ঈমান মানুষকে গোটা বিশ্ব জগতের সাথে সম্পৃক্ত করে। বিশ্বজগত কিভাবে চলে, তার অধিবাসীরা কিভাবে জীবন ধারণ করে এবং কোন নিয়ম মেনে চলে, সেটা জানার মাধ্যমেই মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে এ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে প্রকৃতি ও তার অধিবাসীদের সাথে তার পরিপূর্ণ শান্তি সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান একটা আলো বিশেষ। এ আলো সুবিচারের, ইনসাফের, স্বাধীনতার, জ্ঞানের, আল্লাহর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশিত্বজনিত সখ্যতার, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সুবিচার, দয়া ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে আস্থাশীলতার। এই আস্থাশীলতা থেকেই জন্ম নেয় বিপদে ও দুঃখে ধৈর্য, সুখে ও আনন্দে কৃতজ্ঞতা। বিপদ মসিবতে কোনো সুদূরপ্রসারী ও বৃহত্তর কল্যাণ রয়েছে,, সেটা অনুধাবনের জন্যে যে আলোর প্রয়েজন, তা আসে এই ঈমান থেকেই।

একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ ও রব মেনে নিয়ে যে ঈমান আনা হয় সেটাই মানুষকে দেয় আল্লাহ রচিত পূর্ণাংগ জীবন বিধানের সন্ধান। এই জীবন বিধান শুধু মন মগযকে বিশ্বাস ও অন্তরাত্মাকে সেই বিশ্বাসের আলো দিয়ে পরিপ্লুত করেই ক্ষান্ত থাকে না, এই পূর্ণাংগ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় এক আল্লাহর গোলামী, তাঁর প্রভুত্বের পরিপূর্ণ আনুগত্য, আল্লাহর বান্দাদের প্রভুত্ব থেকে মুক্তি এবং বান্দাদের সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের নাগপাশ থেকে মুক্তির ভিত্তিতে।

এই পূর্ণাংগ জীবন বিধানে মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির সাথে এবং সেই স্বভাব প্রকৃতির যথার্থ ও সত্যিকার প্রয়োজনের সাথে এমন সংগতি ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান, যা জীবনকে যথার্থ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও তৃপ্তি দিয়ে ভরে দেয়। এতে রয়েছে এমন অটুট স্থিতি ও স্থায়িত্ব, যা স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির প্রভুত্বের ভিত্তিতে গঠিত সমাজের ন্যায় নৈরাজ্য, বিপ্লব ও উত্থান পতন থেকে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করে। অথচ আল্লাহর পরিবর্তে আল্লাহর বান্দাদের সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহর পরিবর্তে আল্লাহর বান্দাদের রচিত জীবন বিধান রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজ, অর্থনীতি, নৈতিকতা, রসম রেওয়াজ, আদত অভ্যাস ও ঐতিহ্য সব কিছুই তছনছ করে দেয়। আর আল্লাহর রচিত পূর্ণাংগ জীবন বিধান মানবসম্পদকে মানষের প্রভুত্ব ও মানুষের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহৃত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

বস্তুত 'মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্যে এই ক্ষুদ্র বাক্যাংশটার রয়েছে এমন সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর তাৎপর্য, মন মগয ও বাস্তব জীবন উভয় জগত সম্পর্কেই এতে রয়েছে এমন বিশাল ও নিগূঢ় তথ্য, যার ধারে কাছেও কোনো উক্তি পৌঁছুতে পারে না।'

'তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।'

বস্তুত প্রচার ছাড়া তো নবী রসূলের সাধ্যে কিছু নেই এবং ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা ছাড়া তার আর কোনো দায়িত্বও নেই। মানুষকে কার্যত অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার কাজটা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়, আল্লাহর প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হতে পারে। রসূল ইচ্ছা করলেই তা সম্পন্ন করতে পারেনা। তার কাজ দূতিয়ালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

'মহাপরাক্রমশালী, চির প্রশংসিত (আল্লাহর) পথের দিকে।'

'আলোর দিকে' কথাটারই ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে 'আল্লাহর পথের ডাক' কথাটা। অর্থাৎ আলো বা নূর বলতে আল্লাহর পথকেই বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহর পথ হলো আল্লাহর তরীকা, আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম এবং আল্লাহর শরীয়তী বিধান– যা গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আলো বা নূর এই পথেরই সন্ধান দেয় অথবা একথাও বলা যায়, আলোই আল্লাহর পথ। এই শেষোক্ত কথাটাই অধিকতর বলিষ্ঠ তাৎপর্য বহন করে। কেননা যে নূর বা জ্যোতি মানুষের আত্মা, অন্তর ও বিবেককে আলোকিত করে, সেই একই নূর বা জ্যোতি সমগ্র বিশ্ব জগতকেও আলোকিত ও জ্যোতির্ময় করে। এটা আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান ও শরীয়তী বিধান। যে হৃদয় এই আলো দিয়ে পথের সন্ধান করে, সে সঠিক পথেরই সন্ধান পায়, ফলে তার উপলব্ধিতেও ভুল হয় না। ধ্যান ধারণায়ও ভুল হয় না এবং আচার আচরণেও ভুল হয় না। সে যথার্থ 'সেরাতুল মোস্তাকীম' অর্থাৎ নির্ভুল পথের ওপর বহাল থাকে যা মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, সর্ববিজয়ী ও চির প্রশংসিত সেই আল্লাহর পথ, যার প্রতি সৃষ্টি মাত্রেই চিরকৃতজ্ঞ।

এখানে 'আযীয' (মহাপরাক্রমশালী) শব্দটার মধ্য দিয়ে আল্লাহর অবাধ্য লোকদের হুমকি ও সতর্কবাণী এবং 'হামীদ' (চির প্রশংসিত) শব্দটার মধ্য দিয়ে আল্লাহর অনুগ্রহভাজনদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহর আরো পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, তিনি সেই আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক, মানব জাতির মুখাপেক্ষী নন। সমগ্র বিশ্বজগত ও তার অধিবাসীদের ওপর তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন।

দুনিয়ার মোহ মানুষকে ঈমান থেকে দূরে রাখে

যারা আল্লাহর হেদায়াতের আলো কাজে লাগিয়ে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে এবং আল্লাহর পথে চালিত হয়, তারা চালিত হোক। তাদের সম্পর্কে এখানে আর কিছু বলা হচ্ছে না। এখানে শুধু কাফের ও নাফরমানদের হুমকি দেয়া হচ্ছে কঠোর শাস্তির। সেটা তাদের আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরীর পরিণাম। আল্লাহ তার রসূলকে এমন কেতাব দিয়ে পাঠিয়ে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করার ব্যবস্থা করে যে মহাঅনুগ্রহ ও মহাউপকার করেছেন, তার না-শোকরীর পরিণাম হচ্ছে কঠোর কঠিন আযাব। এটা সবচেয়ে বড় নেয়ামত। মানুষ এ নেয়ামতের যতো শোকর করুক যথেষ্ট নয়। অথচ সে না-শোকরী করে। এটা কিভাবে সংগত হতে পারে, ভাবাই যায় না।

'কাফেরদের জন্যে কঠিন আযাবের দুঃসংবাদ।'

পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হচ্ছে, আল্লাহর রসূল আনীত এ বিরাট নেয়ামতের প্রতি কিছু মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণ কী।

'যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসে, ... তারাই লিপ্ত রয়েছে চরম গোমরাহীতে।'

কেননা আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশী ভালোবাসা ঈমানী দায়িত্বগুলো পালন করার পথে অন্তরায় এবং আল্লাহর পথে অবিচল থাকা অসম্ভব করে তোলে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতকে বেশী ভালোবাসলে এমন অবস্থা হয় না। কেননা তাতে দুনিয়ার জীবন সুন্দর সুষ্ঠু ও সুশৃংখল হয়ে যায়, দুনিয়ার ভোগবিলাস ভারসাম্যপূর্ণ হয় এবং দুনিয়ার গোটা জীবনই হয় আল্লাহর সন্তোষকামী।

যারা তাদের মনকে আখেরাতের দিকে নিবিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করে, তারা দুনিয়ার সুখ ভোগ থেকে বঞ্চিত হয় না, যেমনটি একশ্রেণীর বিকৃত চিন্তার অধিকারীরা মনে করে থাকে। বস্তুত ইসলামে আখেরাতের সুখ শান্তি দুনিয়ার সুষ্ঠু ও নির্মল জীবনের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর প্রতি ঈমান পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের ওপর নির্ভরশীল। আর পৃথিবীতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের অর্থই হলো তাকে বাসযোগ্য করা ও তার ভালো জিনিসগুলো ভোগ করা। আখেরাতের অপেক্ষায় দুনিয়ার সব কিছু অচল করে রাখা ইসলামের শিক্ষা নয়; বরং দুনিয়ার জীবনকে সত্য, ন্যায় ও সুষ্ঠুতা দিয়ে গড়ে তুলে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা ও আখেরাতের জন্যে প্রস্তুত হওয়াই হলো ইসলাম।

যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উর্ধ্বে স্থান দেয়, তারা পৃথিবীতে তাদের ভোগবিলাস, হারাম উপার্জন, মানুষকে শোষণ, নির্যাতন, প্রতারণা ও গোলাম বানানোর লক্ষ্যগুলো ততোক্ষণ অর্জন করতে সক্ষম হয় না, যতোক্ষণ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার হেদায়াতের পথে অবিচলতার পরিবেশ বিরাজ করবে। এ কারণেই তারা নিজেদের ও জনগণকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। তাতে ভারসাম্য ও শৃংখলার পরিবর্তে বক্রতা এবং গোমরাহী অন্বেষণ করে। এই গোমরাহী অন্বেষণে সফল হলেই তারা যুলুম, শোষণ, স্বৈরচার, ধোকাবাজি ও প্রতারণা চালাতে সক্ষম হয়। মানুষকে অন্যায় ও পাপে লিপ্ত হবার প্ররোচনা দিতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-সম্পদ উপভোগ, হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন, অপবিত্র ও নোংরা সম্পত্তি অর্জন, পৃথিবীতে অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন এবং মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করতেও সক্ষম হয়।

ইসলামী জীবন বিধান মানুষকে জীবনের নিরাপত্তা দেয় এবং যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, তাদের যুলুম, আগ্রাসন ও স্বার্থপরতা থেকে রক্ষা করে।

নিজ জাতির ভাষায় রসূলদের ওপর ওহী নাযিলের তাৎপর্য

'আমি যখনই কোনো রসূলকে পাঠিয়েছি, তার জাতির ভাষায়ই তাকে পাঠিয়েছি ..' (আয়াত- ৪)

বস্তুত এটাও মানব জাতির জন্যে একটা মস্ত বড় নেয়ামত।

রসূল যাতে তার জাতিকে অন্যায় অসত্য ও কুফরীর অন্ধকার থেকে সত্য ন্যায় ও ইসলামের আলোতে আনতে পারেন, সে জন্যে তাকে তার জাতির ভাষায় পাঠানো ছাড়া উপায় নেই। এতে তিনি জনগণকে যথাযথভাবে সব কিছু বুঝাতে পারবেন এবং জনগণও তার সব কথা বুঝতে পারবে। এভাবে রেসালাতের উদ্দেশ্য সফল হয়। রসূল (স.) সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হলেও তিনি তার জাতির ভাষায়ই কথা বলতেন ও দাওয়াত দিতেন। কেননা তার জাতিকেই সমগ্র মানব জাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে হবে। তাঁর নিজের আয়ুষ্কাল সীমিত। তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে প্রথমে নিজের জাতিকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে, যাতে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম ছাড়া আর কোনো বিধান অবশিষ্ট না থাকে এবং সেখান থেকে ইসলাম

প্রচারকরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। এটা মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর সূচিত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিলো যে, তাঁকে তখনই নিজের কাছে ডেকে নেয়া হবে, যখন আরব উপদ্বীপের শেষ সীমায় ইসলাম পৌঁছে যাবে। বস্তুত তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ওসামার নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরিত হয় আরবের শেষ প্রান্তে। কিন্তু রসূল (স.)-এর ওফাতের কারণে সেই বাহিনী যেতে পারেনি। রসূল (স.) নিজের জীবদ্দশায় আরব উপদ্বীপের বাইরে চিঠি ও দূত পাঠিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, যাতে তাঁর সমগ্র বিশ্বের রসূল হওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর জন্যে যে জিনিসটা বরাদ্দ করেছিলেন, সেটাই মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনের জন্যে স্বাভাবিক।

সেই জিনিসটা হলো, তিনি নিজে তাঁর জাতির কাছে তাদেরই ভাষায় দাওয়াত পৌঁছাবেন। অতপর তাঁর পরবর্তী দাওয়াতকারীরা দিকে দিকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে তাঁর রেসালাতকে পূর্ণতা দান করবে। বাস্তবেও এটাই হয়েছিলো। সুতরাং তাঁর ভাষাভাষী আরব জাতির রসূল হওয়ার সাথে তাঁর সারা বিশ্বের রসূল হওয়াতে কোনো বিরোধ নেই, আল্লাহর পরিকল্পনায়ও নেই, বাস্তব জীবনেও নেই।

'অতপর যাকে ইচ্ছা গোমরাহ ও যাকে ইচ্ছা সুপথগামী করেন।'

অর্থাৎ রসূল তাঁর দায়িত্ব পালন করার পর কে সুপথ পাবে আর কে গোমরাহ হবে, তার ওপর তাঁর কোনো হাত নেই, ব্যাপারটা তাঁর ইচ্ছা ও আগ্রহের অধীনও নয়। এটা আল্লাহর কাজ। এর জন্যে তিনি একটা নিয়ম তৈরী করে দিয়েছেন যা তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই চলে। যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে যাবে সে গোমরাহ হবে। আর যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে যাবে সে হেদায়াত লাভ করবে। উভয়টাই আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক হয়ে থাকে। তিনিই তার জীবনের নিয়ম রচনা করে দিয়েছেন।

'আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী।'

অর্থাৎ মানুষ ও জীবনকে যেভাবে ইচ্ছা চালিত করার সর্বময় ক্ষমতা রাখেন। পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞা দ্বারা সবাইকে পরিচালিত করেন। কোনো কিছুই আপনা আপনি চলে না, তাঁর পরিকল্পনা ও পরিচালনা অনুসারেই চলে।

হযরত মূসা ও একইভাবে তার জাতির ভাষায় কথা বলতেন ও দাওয়াত দিতেন।

আয়াত নং ৫ থেকে ৮ পর্যন্ত দেখুন।

শোকর ও নাশোকরীর পরিণতি

এখানে মূসা (রা.) ও মোহাম্মদ (স.)-কে প্রায় একই ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে।

রসূল (স.)-কে বলা হয়েছে,

'তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনো।'

প্রথমটা সমগ্র মানব জাতির জন্যে এবং দ্বিতীয়টা শুধু মূসার জাতির জন্যে। কিন্তু উদ্দেশ্য একই,

'আর তাদের আল্লাহর দিনগুলোর কথা স্মরণ করাও।'

আসলে তো সকল দিনই আল্লাহর, কিন্তু এখানে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, সেসব দিনের কথা যেন তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, যেসব দিনে মানুষ কোনো উল্লেখযোগ্য বা অলৌকিক ঘটনা দেখতে পায়, চাই তা শুভ হোক বা অশুভ হোক। পরবর্তীতে মূসা (আ.) কর্তৃক তার জাতিকে অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নূহ, আদ, সামুদ ও তাদের পরবর্তী জাতিগুলোর ভয়াবহ পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

'এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।'

বস্তুত ওই ঘটনাবলীতে যা কিছু শুভ খবর আছে তা শোকরকারী ও কৃতজ্ঞ লোকের জন্যে এবং যা কিছু অশুভ খবর আছে তা ধৈর্যধারণকারীর জন্যে শিক্ষণীয়। তারা এই নিদর্শনাবলীও উপলব্ধি করে এবং এর পশ্চাতে কী আছে তাও অনুধাবন করে। এতে তারা শিক্ষাও পায়, সান্ত্বনাও পায় এবং ভুলে যাওয়া জিনিস স্মরণ করার সুযোগও পায়।

মূসা (আ.) তার জাতিকে স্মরণ করালেন,

'স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদের ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করলেন ....'

এখানে তিনি স্মরণ করালেন ফেরাউনের নিকৃষ্ট নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার ন্যায় নেয়ামতকে। 'ইয়াসুমুনা' অর্থ হলো ক্রমাগতভাবে ও অব্যাহতভাবে কোনো কাজ করা। অর্থাৎ ফেরাউন অব্যাহতভাবে নির্যাতন চালাতো। পুরুষদের হত্যা করা ও নারীদের বাঁচিয়ে রাখা হলো এ নির্যাতনের একটা ধরন। এ দ্বারা ফেরাউন বনী ইসরাঈলের প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব করতে এবং তাদের অপমানিত করতে চাইতো। বস্তুত এ অবস্থা থেকে তাদের আল্লাহ যেভাবে পরিত্রাণ দান করেছেন, তা এক অবিস্মরণীয় নেয়ামত।

'এতে তোমাদের জন্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা রয়েছে।'

প্রথমত নির্যাতনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে ধৈর্য, স্থিরতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়, প্রতিরোধ ক্ষমতা, মুক্তিলাভের সংকল্প ও তার জন্যে কাজের প্রস্তুতি কতখানি আছে। মনে রাখতে হবে, নির্যাতন ও লাঞ্ছনা কেবল মুখ বুঁজে সহ্য করে যাওয়ার নাম ধৈর্য নয়। ধৈর্য হলো নির্যাতন সহ্য করার পাশাপাশি মনকে পরাজয় স্বীকার করতে না দেয়া, মনোবল না হারানো, মুক্তির সংকল্প অব্যাহত রাখা এবং নির্যাতন ও আগ্রাসন রুখে দাঁড়ানোর প্রস্তুতির নাম। যুলুম ও অপমানের কাছে আত্মসমর্পণকে ধৈর্য বলা যায় না। দ্বিতীয়ত ফেরাউনী যুলুম শোষণ ও নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার মাধ্যমেও পরীক্ষা করা হয়েছে যে, তারা কেমন শোকর করে, আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ কেমন স্বীকার করে এবং মুক্তিলাভের বিনিময়ে সত্য ও ন্যায়ের ওপর কতোখানি দৃঢ়তা দেখাতে পারে।

নির্যাতনে সবর ও মুক্তিতে শোকরের উপদেশ দেয়ার পর আল্লাহ এই দুই কাজের প্রতিফল কী স্থির করেছেন, সে সম্পর্কে হযরত মূসা ৭ নং আয়াতে বনী ইসরাঈলকে সতর্ক করেছেন।

'তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছেন, তোমরা যদি শোকর করো তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো। আর যদি নাশোকরী করো তাহলে জেনে রেখো, আমার আযাব অত্যন্ত কঠিন।' (আয়াত-৭)

এ আয়াতটাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উদঘাটন করা হয়েছে। সেটি এই যে, আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করলে নেয়ামত বাড়ে। আর তার নাশোকরী করলে কঠিন আযাব আসে। এ সত্য জানতে পেরে আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, আমরা আশ্বস্ত হই। কেননা এটা স্বয়ং আল্লাহর ওয়াদা, যা সত্য না হয়ে পারে না এবং যা সর্বাবস্থায় বাস্তবায়িত হবেই। যখন আমাদের জীবনে আমরা এর বাস্তবতার দিকে দৃকপাত করি এবং এর কারণ অনুসন্ধান করি, তখন কারণটা আমাদের সহজেই বুঝে আসে।

নেয়ামতের শোকর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শোকরকারী যে মাপকাঠি দ্বারা ন্যায় অন্যায়ের বাছবিচার করে সেই মাপকাঠি সঠিক ও নির্ভুল। ভালো কাজ ও কল্যাণমূলক কাজের জন্যে একজন অন্যজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। কেননা যার বুদ্ধি বিবেচনা ও স্বভাব প্রকৃতি

সুস্থ সঠিক আছে, তার কাছে শোকর বা কৃতজ্ঞতা হচ্ছে সৎকাজ ও কল্যাণমূলক কাজের স্বাভাবিক প্রতিদান।

এতো হলো একটা দিক। অপর দিকটা হলো, যে হৃদয় আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে ওই নেয়ামত ব্যবহার করার সময় আল্লাহর কথা স্মরণ রাখে। ফলে সে অহংকারী দাম্ভিক হয় না, অন্যদের চেয়ে নিজেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করে আত্মম্ভরী হয় না এবং আল্লাহর দেয়া ওই নেয়ামত মানুষের ক্ষতিকর কাজে, বিশৃংখলা বিপর্যয়, দুর্নীতি ও নোংরামির বিস্তারে বব্যহার করে না।

উল্লেখিত উভয় প্রকারের গুণ মানুষের আত্মশুদ্ধির সহায়ক, যা তাকে সৎকাজে উৎসাহিত করে, যে কাজ করলে ওই নেয়ামত বাড়ে সেই কাজের উদ্দীপনা যোগায়, যে কাজ করলে মানুষ খুশী হয় এবং তার ফলে তার সহায়ক ও সহযোগী হয় সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করে, সামাজিক বন্ধনকে সুষ্ঠু ও সুশৃংখল করে। ফলে সমাজে নির্বিঘ্নে ও শান্ত পরিবেশে যাবতীয় সম্পদের উৎপাদন বাড়ে। এভাবে আমাদের সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় প্রাকৃতিক উপায় উপকরণ বৃদ্ধি পায়। যদিও একমাত্র আল্লাহর ওয়াদাই মোমেনের আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট, চাই এর উপায় উপকরণ উপলব্ধি করুক বা না করুক। কেননা আল্লাহর ওয়াদা কার্যকর হওয়া অবধারিত।

আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকৃতি ও অবহেলা অকৃতজ্ঞ হওয়া দ্বারাও প্রকাশ পায়, আবার ওই নেয়ামত যে আল্লাহর দান, সে কথা অস্বীকার করা দ্বারাও তা প্রকাশ পায়। কোনো নেয়ামতকে আল্লাহর দান না ভেবে যদি কেউ বিজ্ঞানের অবদান, অভিজ্ঞতার ফল কিংবা ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনার ফসল মনে করে, তবে সে আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরী করে। যারা এ রকম মনে করে, তারা বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনা ইত্যাদিকে আল্লাহর নেয়ামতই মনে করে না। কখনো কখনো অহংকারী মানসিকতা নিয়ে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের মানসে কিংবা অন্যায় লালসা ও অনাচারের স্বার্থে নেয়ামতের অপব্যবহার করে তার না-শোকরী করা হয়ে থাকে। এ সবই আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকৃতি ও অবজ্ঞার নামান্তর।

নেয়ামতের না-শোকরী করলে আল্লাহ যে কঠিন আযাবের হুমকি দিয়েছেন, সেই আযাব কখনো নেয়ামতের বিলুপ্তির আকারেও দেখা দিয়ে থাকে। কখনো বা অনুভূতি থেকে তার প্রকৃত ছাপ বা প্রভাব বিলীন হওয়ার আকারেও ঘটতে পারে আযাবের আগমন। যেমন অনেক নেয়ামত এমনও আছে যা তার মালিকের কাছে আপদ ও দুর্ভাগ্য বলে অনুভূত হয়, তা পেয়ে সে অসুখী হয় এবং যারা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের সে ঈর্ষা করে। কখনো বা এ আযাব আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক খুবই বিলম্বে আসে। কখনো দুনিয়ায়, কখনো আখেরাতে, তবে এ আযাব অবধারিত। কেননা আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরী কখনো বিনা শাস্তিতে যেতে পারে না।

তবে কেউ আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করুক বা না-শোকরী করুক, আল্লাহর তাতে কোনোই লাভ ক্ষতি নেই। আল্লাহ সর্বদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, মানুষের শোকর তাঁর কোনো অসম্পূর্ণতার পরিপূরক নয়। আল্লাহ আপনা থেকেই প্রশংসিত– মানুষের প্রশংসায় প্রশংসিত নন। ৮ নং আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে এ কথাই বলা হয়েছে।

আসলে শোকর দ্বারা মানুষের জীবনই সুষ্ঠ ও সুশৃংখল হয়। অনুগ্রহ ও উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মানুষের মন আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত হয়, মনের ক্লেদ ও আবিলতা দূর হয় এবং মহোপকারী আল্লাহর সান্নিধ্যলাভে স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। ফলে নেয়ামতের সরবরাহ থাকে অব্যাহত ও অফুরন্ত। আল্লাহর দেয়া এ নেয়ামত থেকে কিছু দান করলে বা হারিয়ে গেলে ক্ষোভ

ও আক্ষেপ হয় না। কেননা নেয়ামত যিনি দেন তিনি তো রয়েছেন। নেয়ামতের যতই শোকর করা হবে, ততই তিনি তা বাড়িয়ে দেবেন এবং আরো উন্নত মানের নেয়ামত দেবেন।

যুগে যুগে রসূলদের সাথে জাহেলদের বিতন্ডা

৯ নং আয়াতেও হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক তাঁর জাতিকে উপদেশ দেয়া ও সতর্ক করা অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু হযরত মূসা (আ.) দৃশ্যের অন্তরালে থাকছেন, যাতে নবীদের অনুসারীদের সাথে জাহেলিয়াত ও জাহেলিয়াতের অনুসারীদের সর্বাত্মক সংঘাত অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এটা কোরআনের এক চমকপ্রদ প্রকাশভংগি। এভাবে একটা বর্ণিত কাহিনীকে এমন একটা দৃশ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যা দেখা ও শোনা যাচ্ছে, যাতে ব্যক্তিবর্গ সচল রয়েছে এবং নানারকম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে।

এবার সেই বৃহত্তম রণাংগনের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে স্থান ও কালের সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে গেছে,

'পূর্ববর্তীদের কাহিনী কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? নূহ, আদ, সামুদ ও তাদের পরে আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের পরিচয় জানে না এমন আরো বহু জাতির কাহিনী?........' (আয়াত ৯)

এ স্মৃতিচারণও হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তির আওতাভুক্ত, কিন্তু এখান থেকে যে আয়াতগুলোর শুরু, তাতে হযরত মূসা (আ.)-কে নেপথ্যে রাখা হয়েছে। নেপথ্যে থেকে তিনি সকল যুগের নবীদের জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই এবং স্থানকাল নির্বিশেষে নবীদের অমান্যকারীদের ভয়াবহ পরিণামের বিবরণ দেয়া অব্যাহত রেখেছেন। এখানে মূসা যেন একজন কাহিনী-কথক, যিনি বৃহত্তম নাটক মঞ্চস্থ করার ইংগিত দিচ্ছেন, অতপর তার নায়কদের মঞ্চে এসে কথা বলা ও অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করার অনুমতি দিচ্ছেন। কোরআনে কাহিনী বর্ণনার এটা এমন একটা পদ্ধতি, যা দ্বারা একটা কথিত কাহিনী জীবন্ত ও চলন্ত কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। এখানে আমরা রসূলদের ঈমানী কাফেলার নেতৃত্বদানরত অবস্থায় দেখি। তাঁরা জাহেলী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেখি সংগ্রামে অবতীর্ণ। এতে স্থান কাল ও প্রজন্মের ভেদাভেদ বিলীন হয়ে গেছে এবং প্রকৃত সত্য ঘটনা ফুটে ওঠেছে,

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তীদের খবর পৌঁছেনি? ......' স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে, তাদের সংখ্যা বিপুল। কোরআনে যাদের বিবরণ এসেছে, তাদের ছাড়া অন্যদের প্রসংগও এখানে এসেছে। এদের কালগত অবস্থান হলো সামুদ জাতি ও হযরত মূসার জাতির মাঝখানে। আয়াতে তাদের বিশদ বিবরণ দেয়া হয়নি। কেবল এই বিষয়টাই দেখানো হয়েছে যে, দাওয়াতে যেমন ঐক্য রয়েছে, তেমনি বিরোধিতায়ও রয়েছে ঐকতান।

'তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নিয়ে এসেছে।'

অর্থাৎ সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে তা সুস্পষ্ট।

'কিন্তু তারা নিজেদের মুখে হাত তুলেছে এবং বলেছে, তোমরা যা এনেছো, তা আমরা মানি না, তোমরা যে দাওয়াত দাও তা আমাদের ঘোরতর সন্দেহে ফেলে দেয়।'

মুখে হাত তোলা দ্বারা এমন একটা অভদ্রজনোচিত ভংগিকে বুঝানো হয়েছে, যা আওয়ায বড় করার জন্যে প্রয়োগ করা হয় অপেক্ষাকৃত দূর থেকে শোনানোর উদ্দেশ্যে। আয়াতে এই আচরণটার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ জন্যে, যেন সত্যের বিরোধিতায় তারা কত উদ্ভট, অশালীন, অরুচিকর ও কুৎসিত পন্থা অবলম্বন করতে পারে তা দেখানো যায়। এভাবে তারা তাদের কুফরীকে অপেক্ষাকৃত বিকট আওয়াযে দূরে ছড়িয়ে দিতে চায়।

যেহেতু রসূলরা আল্লাহর একক প্রভুত্বের আকীদা ও বিশ্বাসের দিকে আহ্বান জানাতেন, যাকে মানুষের সহজাত বিবেক-বুদ্ধি স্বতস্ফূর্তভাবে অনুধাবন করে, যার সত্যতা সম্পর্কে প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী সাক্ষ্য দেয় এবং যার পক্ষে আকাশ ও পৃথিবী সাক্ষী, তাই এ সত্যে সন্দেহ প্রকাশ করা খুবই ঘৃণ্য ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হয় এবং রসূলরাও এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'তাদের রসূলরা বললো, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর ব্যাপারেও সংশয়?'

অর্থাৎ সেই আল্লাহ সম্পর্কে কিভাবে সংশয় প্রকাশ করা যায়, যাঁর সম্পর্কে আকাশ ও পৃথিবী নিজেদের অস্তিত্ব দ্বারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনিই তাদের স্রষ্টা? রসূলরা এ কথাটা বলেছেন এ জন্যে যে, আকাশ ও পৃথিবী দুটো বিশালকায় নিদর্শন। তার দিকে শুধু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট এবং একজন বিপথগামী ব্যক্তি এই ইংগিতেই সুপথে ফিরে আসতে সক্ষম। এরপর রসূলরা মানুষের ওপর বর্ষিত আল্লাহর নেয়ামতের কিছু বিবরণ দিচ্ছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ঈমানের দিকে আহ্বানের ব্যবস্থা এবং আযাব থেকে বাঁচা ও চিন্তা ভাবনা করার জন্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সময়দান।

'যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করার জন্যে আহ্বান করেন।..........'

বস্তুত মূল দাওয়াতটাই হলো ঈমানের, যার ফলে ক্ষমালাভ অবধারিত, কিন্তু আয়াতে দাওয়াতকেই সরাসরি ক্ষমার সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে কোনো জাতিকে ক্ষমার জন্যে ডাকা আর সেই ডাকেই তাদের ইসলাম গ্রহণের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া খুবই চমকপ্রদ ব্যাপার মনে হবে।

'আর তোমাদের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ অবধি সময় দেবেন।'

অর্থাৎ আল্লাহ ক্ষমার দাওয়াত দাওয়াত দেয়া মাত্রই ঈমান আনার জন্যে তাড়াহুড়ো করো না, আর তিনি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা মাত্রই আযাব নাযিল করেন না। তিনি অনুগ্রহ করে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন। সে মেয়াদ এ দুনিয়ার জীবনেও শেষ হতে পারে অথবা কেয়ামতের দিন পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হতে পারে। এ মেয়াদে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।

আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও রসূলের উপদেশগুলো বিবেচনায় আনতে পারো। এই অবকাশদান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ ও মহানুভবতা এবং এটাও তাঁর নেয়ামত হিসাবে গণ্য। এমন দয়ালু ও মহানুভব আল্লাহর দাওয়াতের জবাবে তাদের উক্তি,

'তারা বললো, তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ। তোমরা আমাদেরকে আমাদের বাপ দাদার উপাস্যদের থেকে ফেরাতে চাইছো!'

মানুষের মধ্য থেকে একজনকে রসূল নিয়োগ করায় কোথায় মানব জাতি সামগ্রিকভাবে গৌরববোধ করবে, তার পরিবর্তে তারা এই নিয়োগকে প্রত্যাখ্যান করলো, একে রসূলদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের উপকরণে পরিণত করলো এবং তাদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য তাদের বাপ দাদার উপাস্যদের পরিত্যাগ করানো বলে উল্লেখ করলো। অথচ তারা নিজেদের বিবেককেও একবার জিজ্ঞেস করলো না যে, রসূল বাপ দাদার মূর্তিপূজা থেকে কেন তাদের ফেরাতে চায়? পৌত্তলিকতার স্বভাবই এই যে, তা মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে ভোঁতা ও স্থবির করে দেয়। ফলে মূর্তিগুলোর মূল্য কী ও তাৎপর্য কী, তাও তারা ভেবে দেখে না। আবার ওই বিবেকের স্থবিরতার কারণে নবাগত দাওয়াতের তাত্ত্বিক দিক বিবেচনা না করে তারা এমন অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে চায়, যা তাদের ঈমান আনতে বাধ্য করে।

'অতএব তোমরা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসো।' (আয়াত ১০)

রসূলরা সবাই এর জবাব দেন। তারা অস্বীকার করেন না যে, তারা মানুষ; বরং তা স্বীকার করেন, কিন্তু আল্লাহ যে অনুগ্রহ করে মানুষের মধ্য থেকেই রসূল নিয়োগ করেছেন এবং তাদের এই বিরাট দায়িত্ব পালনের যোগ্য জানিয়েছেন, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (আয়াত ১১)

সূরার সাধারণ আলোচ্য বিষয় 'আল্লাহর নেয়ামত।'

এই বিষয়ের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে 'অনুগ্রহের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই আয়াতে। আল্লাহ তার বান্দাদের যে কাউকে অনুগ্রহপূর্বক রসূল বানাতে পারেন। এটা শুধু রসূলদের ওপর নয়; বরং সমগ্র মানবতার ওপর এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি এতোবড় দায়িত্ব পালনের জন্যে মানুষকে নির্বাচিত করেন। দায়িত্বটা হলো মহান আল্লাহর নাযিল করা ওহী গ্রহণের। মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার উদ্দেশ্যে তার প্রকৃতির ওপর থেকে মরিচা দূর করে এই দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেন। মানুষের ওপর আল্লাহর আরো একটা বড় অনুগ্রহ হলো, মানুষকে আল্লাহর বান্দাদের দাসত্বের পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করানোর ব্যবস্থা করা এবং বান্দাদের আনুগত্যের লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে মুক্ত করে তাদের শক্তি ও সম্মানকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা। বস্তুত মানুষকে তারই মতো একজন মানুষের সামনে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করার মতো অপমান এবং তারই মতো একজন মানুষকে তার খোদা বানানোর মতো স্বৈরাচার আর কিছু হতে পারে না।

ঈমানই হচ্ছে মোমেনের শক্তির উৎস

এরপর আসে রসূলদের সুস্পষ্ট নির্দশন তথা অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর জন্যে কাফেরদের জোর দাবী। এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে তারা বলেন, এটা আল্লাহর কাজ এবং তাঁরই ক্ষমতার আওতাভুক্ত। বস্তুত নির্ভেজাল তাওহীদের দাবী এই যে, এই ক্ষেত্রে মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সাথে আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার যে কোনোই সংস্রব নেই, সে কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরা চাই। অন্যথায় এখান থেকেই তাওহীদের সাথে পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণ ঘটে যাওয়া অবধারিত। আর এখানেই খৃষ্টবাদ গ্রীক, রোমান, মিসরীয় ও ভারতীয় পৌত্তলিকতার সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এর সূচনাই ছিলো হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ যে, তিনি স্বয়ং বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং এ কারণে আল্লাহর গুণাবলীর সাথে হযরত ঈসার গুণাবলীর সাদৃশ্য সৃষ্টি করা হয়েছিলো।

'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আমরা তোমাদের কাছে কোনো নিদর্শন আনতে সক্ষম নই।' (আয়াত ১১)

অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ছাড়া আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই।

'আল্লাহর ওপরই সকল মোমেনের ভরসা করা উচিত।'

নবী রসূলরা এটাকে একটা চিরন্তন সত্য হিসাবে উল্লেখ করেন। একমাত্র আল্লাহর ওপরই মোমেনের ভরসা করা উচিত। আল্লাহ ছাড়া আর কারো দিকে তার দৃষ্টিপাতই করা উচিত নয় আর কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য কামনা করা উচিত নয়। একমাত্র আল্লাহর কাছেই মোমেনের নিরাপত্তা চাওয়া উচিত।

এরপর তারা ঈমানের শক্তি দিয়ে আগ্রাসন ও নির্যাতনের মোকাবেলা করেন। (আয়াত ১২)

'আমরা কেনইবা আল্লাহর ওপর ভরসা করবো না? অথচ তিনিই আমাদের সুপথ দেখিয়েছেন।'

একমাত্র সাহায্যকারী ও অভিভাবক আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে পরিপূর্ণ আস্থা, তৃপ্তি ও আত্মবিশ্বাসের সাথে মোমেন এরূপ কথা বলে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকে। তার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, যে আল্লাহ তাকে সত্যের দিকে হেদায়াত করেছেন, সেই আল্লাহ তাকে সত্যের ওপর টিকে থাকতে সাহায্যও করবেন। এমনকি বান্দার জন্যে যখন সত্যের পথ প্রদর্শন নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন দুনিয়ার জীবনে আদৌ সাহায্য না পেলেই বা তার ক্ষতি কী?

যার হৃদয় অনুভব করে যে, আল্লাহ তাকে সুপথ প্রদর্শন করেন, সে হৃদয় আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছে। সে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করতে কখনো ভুল করে না, সে আল্লাহর পরাক্রান্ত শক্তির কথা কখনো ভুলে না। আর এই অনুভূতি ও চেতনা যতোক্ষণ বহাল থাকে, ততক্ষণ পথ চলতে তার কোনো কষ্ট হয় না। কোনো বাধাই তার পথ আগলে রাখতে পারে না। এ কারণে রসূলদের জবাবের মধ্যে আল্লাহর হেদায়াতের প্রতি তাদের চেতনা এবং স্বৈরাচারী আগ্রাসী শক্তির রক্তচক্ষুর মোকাবেলায় আল্লাহর ওপর তাদের আস্থার এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। আর এ কারণেই সকল হুমকি উপেক্ষা করে তারা সত্যের পথে এগিয়ে যেতেন।

মোমেনের হৃদয়ে আল্লাহর হেদায়াতের চেতনা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা ও আস্থার এই সংযোগ একমাত্র সেই মোমেনদের ক্ষেত্রেই ঘটে, যারা জাহেলী তাগুতী শক্তির সাথে সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং যারা আল্লাহর সাহায্যকারী হাতের পরশ খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করে। তাদের সামনে আলোকিত রাজপথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং তারা মহান আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভ করে। এর ফলে দুনিয়ার কোনো আগ্রাসী শক্তির হুমকি ও আস্ফালন তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারে না। কোনো হুমকি বা প্রলোভনকে তারা পরোয়া করে না। দুনিয়ার সকল আগ্রাসী শক্তির সমস্ত নির্যাতন ও আগ্রাসনের হাতিয়ার তারা নির্ভয়ে পদদলিত করে চলে যায়। আল্লাহর সাথে এমন গভীর সম্পর্ক যাদের তারা ওসব বান্দাকে কেন ভয় পাবে?

'তোমরা আমাদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছো, তার ওপর আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবো।' (আয়াত ১২)

অর্থাৎ আমরা কোনো অবস্থায় তো মনকে দুর্বল করবো না, পেছনে ফিরে যাবো না, হার মানবো না, সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত হবো না এবং উদাসীন ও শিথিল হবো না।

'ভরসাকারীদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।'

যালেমদের থেকে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বাঁচান

এ পর্যায়ে এসে আগ্রাসী কাফের শক্তির মুখোশ খসে পড়ে। সে আর কোনো বাক-বিতন্ডা ও বিচার বিবেচনা করে না। কেননা সে ইসলামের সামনে নিজের পরাজয় উপলব্ধি করে। ফলে সে তার বস্তুগত শক্তির জোরে আস্ফালন করে। কেননা এ শক্তি ছাড়া আগ্রাসী শক্তির আর কোন শক্তি নেই!

'কাফেররা তাদের রসূলদের বললো, হয় তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, নচেত তোমাদের আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবোই।' (আয়াত ১৩)

এখানে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মাঝে সংঘাতের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাহেলিয়াত কখনো এটা বরদাশত করে না যে, তার আওতার বাইরে ইসলামের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব থাকুক। ইসলাম তার সাথে আপস করতে রাযি থাকলেও সে রাযি হয় না। ইসলাম একটা স্বতন্ত্র সংগ্রামমুখী ও আন্দোলনমুখী সংগঠনের আকারে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য। তার স্বতন্ত্র অভিভাবক ও স্বতন্ত্র নেতৃত্ব থাকবে। অথচ এটাই জাহেলিয়াত সহ্য করতে চায় না। এ জন্যে কাফেররা

রসূলদের তাদের দাওয়াত ও প্রচারকার্য বন্ধ করো বলেই ক্ষ্যান্ত থাকে না; বরং তাদের কুফরীতে ফিরে যাওয়ার জন্যে চাপ দেয়, তাদের জাহেলী সমাজে বিলীন হয়ে যাওয়া ও স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব না রাখার নির্দেশ দেয়। অথচ ইসলাম এটা মেনে নিতে পারে না এবং এ কারণে রসূলরাও তা মানতে পারেননি। কেননা রসূল তো দূরের কথা, কোনো মামুলী মুসলমানের পক্ষেও নিজেকে জাহেলী সমাজে বিলীন করে দেয়া অসম্ভব।

আগ্রাসী স্বৈরাচারী শক্তি কোনো দাওয়াত বা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তার রসূলদের জাহেলী শক্তির হাতে সোপর্দ করে দেন না।

জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা তার স্বভাবসুলভ প্রক্রিয়ায় কোনো মুসলিম সমাজ বা সংগঠনকে কেবল তখনই স্বতন্ত্র সত্ত্বা বজায় রাখার অনুমতি দেয়, যখন তার যাবতীয় কাজ, চেষ্টা ও শক্তি জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার সহায়ক ও শক্তিবর্ধক হবে। যারা মনে করে, জাহেলী সমাজ ও সংগঠনে গোপন অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ইসলামের জন্যে কাজ করা সম্ভব, তারা সমাজের এই সাংগঠনিক চরিত্র সম্পর্কে সচেতন নয় যে, সমাজ তার প্রতিটি সদস্যকে তার সাংগঠনিক কাঠামো, তার নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে বাধ্য করে। এ কারণেই নবী রসূলরা তাদের জাতির সামাজিক কাঠামো ও আদর্শকে বেরিয়ে আসার পর তার ভেতরে আর ফিরে যেতে রাযি হন না।

এ পর্যায়ে সর্বোচ্চ শক্তি হিসাবে আল্লাহ তায়ালা হস্তক্ষেপ করেন। তিনি সেই চরম আঘাত হানেন, যার সামনে কোনো মানবীয় শক্তি টিকে থাকতে পারে না। চাই তা যতই প্রবল শক্তি হোক না কেন। আল্লাহ বলেন,

'তাদের প্রতিপালক তাদের কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, আমি অত্যাচারীদের অবশ্যই ধ্বংস করে দেবো, ... (আয়াত ১৩-১৪)

আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, রসূলরা ও তাদের জাতির মাঝের দ্বন্দ্বের অবসানের জন্যে সর্ববৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ ঘটে তখনই, যখন রসূলরা তাদের বাতিলপন্থী জাতির কবল থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখেন, মুসলমানরা তাদের জাতির বাতিল আদর্শে ফিরে যেতে অস্বীকার করে, নিজেদের স্বতন্ত্র ইসলামী আদর্শ ও সংগঠনকে স্বতন্ত্র নেতৃত্ব সহকারে টিকিয়ে রাখতে সংকল্পবদ্ধ হয় এবং আদর্শের ভিত্তিতে যখন জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, কেবল তখনই আল্লাহ হস্তক্ষেপ করেন, মোমেনদের হুমকিদানকারী তাগুতী শক্তির ওপর চূড়ান্ত ধ্বংসকারী আঘাত হানেন, মোমেনদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করেন এবং তার রসূলদের পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করার ওয়াদা পালন করেন। মুসলমানরা যদি জাহেলী সমাজের সাথে মিশে যায়, তাদের ভেতরে থেকে কাজ করে এবং নিজেদের স্বতন্ত্র ইসলামী আদর্শ, স্বতন্ত্র ইসলামী নেতৃত্ব ও স্বতন্ত্র ইসলামী আন্দোলনকে সংরক্ষণ না করে, তাহলে কখনো আল্লাহ এ হস্তক্ষেপ করেন না।

'আমি অবশ্যই অত্যাচারীদের ধ্বংস করবোই।'

অর্থাৎ হুমকিদানকারী ও নির্যাতনকারী মোশরেক শক্তিকে ধ্বংস করবোই। কেননা তারা নিজেদের ওপর, সত্যের ওপর, রসূলদের ওপর ও জনগণের ওপর নির্যাতন চালায়।

'তাদের পরে তোমাদেরই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত করবো।'

এটা স্বজনপ্রীতির বশেও নয়, কাকতালীয়ভাবেও নয়; বরং এটা আমার বিশ্বজগত পরিচালনার ন্যায়সংগত নীতি ও বিধান।

'এটা তার জন্যে যে আমার অবস্থানকে ভয় করে এবং আমার হুশিয়ারীকে ভয় করে।'

অর্থাৎ যে আমাকে ভয় করে, অহংকার করে না, আমার বিধান মেনে চলে, পৃথিবীতে অনাচার ও অরাজকতা ছড়ায় না, যুলুম করে না, তাকেই পৃথিবীতে খলীফা বানাই ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি।

এভাবে মোমেনদের ক্ষুদ্র শক্তি অত্যাচারী স্বৈরাচারী বৃহৎ শক্তির মোকাবেলা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার পর এবং মোমেনদের কাফেরদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত করার পর রসূলের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এরপর যালেম তাগুতী শক্তি আল্লাহর শক্তির বলে বলীয়ান রসূলের শক্তির মুখোমুখি হয়। উভয় শক্তি সাহায্য ও বিজয় চায়। পরিণামে মোমেনরাই জয় লাভ করে এবং অত্যাচারীরা পরাজিত হয়। (আয়াত ১৫, ১৬ ও ১৭)

যাদের নেক আমল ছাইয়ের মতো উড়িয়ে দেয়া হবে

এখানে দৃশ্যটা বিস্ময়কর। সকল স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শক্তির পার্থিব পরাজয় এবং ব্যর্থতার দৃশ্য। এই ব্যর্থতার সামনে রয়েছে আখেরাতে আরো শোচনীয় দৃশ্য। জাহান্নামে তাকে পুঁজ খাওয়ানো হবে, তাকে জোর করে খাওয়ানো হবে, সে অনিচ্ছা সত্তেও খাবে, অথচ তিক্ত বিস্বাদ ও নোংরা হওয়ার কারণে গলাধকরণে সক্ষম হবে না। চতুর্দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে মরবে না, যাতে সে তার আযাব পুরোপুরিভাবে ভোগ করার সুযোগ পায়। এরপরও রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এ বিস্ময়কর দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ব্যর্থ, পরাজিত স্বৈরাচারী বাতিল শক্তি, যে নিজেদের বস্তুগত শক্তির জোরে সত্য, ন্যায়, কল্যাণ, সততা ও প্রত্যয়ের আহ্বায়কদের হুমকি দিতো।

এই পরিণামের পটভূমিতে কাফেরদের সম্পর্কে একটা উদাহরণ দেয়া হয়েছে এবং তাদের ধ্বংস করে সম্পূর্ণ নতুন এক সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা আল্লাহর ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে।

'যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি কুফরী করে তাদের উদাহরণ সেই ছাইয়ের মতো। .... ' (আয়াত -১৮)

সবাই জানে এবং সবাই দেখেছে যে, ঝড়ের দিনে প্রবল বাতাসের মুখে ছাই কিভাবে উড়ে যায়। এ দ্বারা আয়াতে কাফেরদের সৎকাজ বৃথা যাওয়ার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। ছাইয়ের মালিক উড়ন্ত ছাই ধরে রেখে কোনোভাবেই ঠেকাতে পারে না, আবার তা দ্বারা উপকৃতও হতে পারে না।

এ দৃশ্যটা কাফেরদের সৎকাজের ব্যাপারে একটা বিশেষ তথ্য প্রকাশ করে। যে সৎকাজের পেছনে ঈমানের ভিত্তি নেই তা ছাইয়ের মতো। তার কোনো টিকে থাকার মতো অস্তিত্ব নেই। বস্তুত কাজটাই আসল বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং কাজের পেছনে যে প্রেরণাদায়ক শক্তি রয়েছে সেটাই আসল বিবেচ্য বিষয়। কাজ একটা যান্ত্রিক তৎপরতা বিশেষ। এতে মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। প্রভেদ যদি থাকে তবে তা শুধু কাজের প্রেরণা, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।

আয়াতের শেষাংশে রয়েছে মন্তব্য।

'এ হচ্ছে সুদূরপ্রসারী বিভ্রান্তি।'

এ মন্তব্যের প্রেক্ষাপট ও ঝড়ের দিনে উত্তপ্ত ছাইয়ের প্রেক্ষাপট একই। দু'টোই সুদূরপ্রসারী।

উড়ন্ত ছাইয়ের দৃশ্যের পর পরবর্তী আয়াতে দেখানো হয়েছে অতীতের কাফেরদের সাথে কোরায়শদের একটা তুলনীয় দিক। তাদের ধ্বংস করে দিয়ে অন্য একটা জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার হুমকি দেয়া হয়েছে এ আয়াতে। যেমন অতীতের কাফেরদের ধ্বংস করে তাদের জায়গায় নতুন জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করা হতো। (আয়াত ১৯)

ঈমান ও কুফরী সংক্রান্ত বক্তব্য এবং রসূল ও জাহেলিয়াত সংক্রান্ত বক্তব্য থেকে আকাশ ও পৃথিবী সংক্রান্ত বক্তব্যে স্থানান্তর কোরআনী বাচনভংগিতে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনুরূপভাবে এটা মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি সংক্রান্ত আবেগ অনুভূতিতেও একটা স্বাভাবিক পরিবর্তন, যা কোরআনী বাচনভংগির অলৌকিকত্বেরই একটা প্রতীক।

মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে একটা বোধগম্য গোপন ভাষা রয়েছে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি বিশ্ব প্রকৃতির গোপন রহস্যের সাথে সরাসরি যুক্ত হয় নিছক তার দিকে দৃষ্টি করার এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে।

যারা বিশ্ব প্রকৃতিকে অবলোকন করে, কিন্তু তাদের স্বভাব প্রকৃতি বিশ্ব প্রকৃতির বক্তব্য শুনতে পায় না, তাদের স্বভাব প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, যেমন চোখ নিষ্ক্রিয় হয়ে অন্ধ হয়, কান নিষ্ক্রিয় হয়ে বধির হয়, জিহ্বা নিষ্ক্রিয় হয়ে বোবা হয়। এ ধরনের লোকেরা জগতের নিষ্ক্রিয় যন্ত্র এবং নেতৃত্ব, কর্তৃত্বের অযোগ্য। যারা বস্তুগত চিন্তা তথা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে, তারা এ ধরনেরই নিষ্ক্রিয় যন্ত্র। বস্তুত সাড়া দানের স্বভাবিক যন্ত্রগুলোর নিষ্ক্রিয়তা এবং বিশ্ব প্রকৃতির সাথে যোগাযোগের মানবীয় যন্ত্রগুলোর বিকৃতির সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা আসলে কোরআনে বর্ণিত 'অন্ধ'। আর মানব জীবন এমন কোনো আদর্শ, বিধান ও মতামতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যা কোনো একজন অন্ধের মনোপূত।

সত্যের ভিত্তিতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কথাটা শক্তি ও স্থিতিশীলতার দিকে ইংগিত দেয়। কেননা সত্য স্থিতিশীল। উড়ন্ত ছাই ও সুদূরপ্রসারী বিভ্রান্তি এর ঠিক বিপরীত।

আল্লাহ সত্য ও বাতিলের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে হঠকারী বাতিল শক্তিকে হুমকি দিয়েছেন যে,

'আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের ধ্বংস করতে এবং নতুন অন্য কোনো সৃষ্টিকে নিয়ে আসতে পারেন।'

বস্তুত যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তিনি পৃথিবীর বর্তমান অধিবাসীদের স্থলে অন্য এক গোষ্ঠীকে অধিষ্ঠিত করতে পারেন। একটা জাতির ধ্বংস ও ছাই হয়ে উড়ে যাওয়ার দৃশ্য অনেকটা কাছাকাছি আকৃতি বিশিষ্ট।

'এটা আল্লাহর কাছে কঠিন নয়।'

কঠিন যে নয়, তার সাক্ষী আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, পূর্ববর্তী কাফেরদের ধ্বংস এবং উড়ন্ত ছাই। এসব একই ধরনের।

কোরআনের এ বর্ণনাভংগি যথার্থই কোরআনের মোজেযা বিশেষ।

এরপর আমরা সাক্ষাৎ পাই কোরআনের আর এক মোজেয সুলভ বর্ণনার, দৃশ্য চিত্রায়ন ও সমন্বয়ের। এতোক্ষণ আমরা হঠকারী স্বৈরাচারী শক্তির বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। এসব হঠকারী স্বৈরাচারী শক্তি ব্যর্থ হয়েছে। জাহান্নামে তাদের ও শয়তানের অবস্থা কী হবে, তার একটা চমকপ্রদ বিবরণ এসেছে ২১ ও ২২ নং আয়াতে। এবার লক্ষ্য করুন আয়াত দু'টো।

'আর যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের প্রবেশ করানো হবে সেসব বাগ বাগিচায়, যার পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে ছোট ছোট কুল কুলু নাদিনী নদী। সেখানে থাকবে তারা চিরদিন, তাদের প্রতিপালকের হুকুমে। সেখানে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে সালাম সালাম বলে।'

পথভ্রষ্ট নেতা ও অনুসারীদের করুণ পরিণতি

জীবন নাটকের পট পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি দাওয়াত ও দাওয়াতদানকারীর পরিণতি, আর দেখতে পাচ্ছি উপেক্ষাকারী ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার কাজে তৎপর ব্যক্তি এবং বিদ্রোহীদের পরিণতিও, যারা জেনে বুঝে সত্যকে মূলোৎপাটিত করার জন্যে বদ্ধপরিকর..... দুনিয়ার পটভূমি থেকে তারা এখন আখেরাতের বৃহত্তর পটভূমিতে উপনীত।

'এরা সবাই বেরিয়ে আসবে এক সাথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে।'

বেরিয়ে আসবে ওই বিদ্রোহী অহংকারী ব্যক্তিরা এবং তাদের অনুসারীরা যারা ছিলো দুর্বল, অক্ষম, মজবুর, আর তাদের সাথে থাকবে সেদিন খোদ শয়তানও। এরপর আসবে ঈমানদাররা, রসূলরা ও নেককার লোকেরা ...... সবাই খোলাখুলিভাবে বেরিয়ে আসবে ...... তারা তখন আল্লাহর সামনে সার্বক্ষণিকভাবে উন্মুক্ত থাকবে, কিন্তু সেই সময়ে তারা বুঝবে এবং গভীরভাবে অনুভব করবে, সবাই খোলাখুলিভাবে এগিয়ে আসবে। তাদের কারো সামনে কোনো পর্দা থাকবে না। কোনো কিছুই তাদের আড়াল করতে পারবে না। আর সেদিন তাদের কেউ রক্ষাও করতে পারবে না। এভাবে সবাই বেরিয়ে আসতে আসতে ভরে যাবে পুরো হাশরের সুবিশাল ময়দান। থাকবে না কোনো প্রকার আচ্ছাদন, আর শুরু হয়ে যাবে বিশ্ব সম্রাটের দরবার।

'তখন এই হীনবল কৃশ ও শক্তিহীন ব্যক্তিরা শক্তিদর্পী অহংকারীদের লক্ষ্য করে বলবে আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, আজকে আল্লাহর আযাবকে কি তোমরা আমাদের জন্যে একটু হালকা করে দেবে?'

এই অক্ষম দুর্বল ও শক্তিহীন লোক বলতে তাদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা আসলে ছিলো বড়ই অসহায়, তারা সম্মানিত মানুষের পর্যায় থেকে অনেক নীচে নেমে গিয়েছিলো। যেহেতু তারা বিত্তশালী ও সমাজকর্তাদের চাপে পড়ে এবং অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে ব্যক্তিস্বাধীনতা, চিন্তা-বিশ্বাস ও পছন্দের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিলো। তারা মোশরেক ও অহংকারী ব্যক্তিদের অনুসারী হতে বাধ্য হয়েছিলো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের আনুগত্য করতে এবং তাদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাদের দেয়া নিয়ম কানুনের অধীন হয়ে গিয়েছিলো। যদিও ওইসব ব্যক্তি আল্লাহরই বান্দা, কিন্তু এই দুর্বলতাকে কোনো ওযর অজুহাত হিসাবে কবুল করা হবে না; বরং এটাও হবে এক অপরাধ। কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা চান না তাঁর বান্দারা অন্য কারো বন্দেগী করুক, কোনো সংকটে পড়ে অন্যের সামনে মাথা নত করে দিক এবং নিজেকে দুর্বল ভাবুক। কারণ তিনিই তো সকল মানুষকে তাঁর সাহায্য গ্রহণের জন্যে ডাকছেন। ডাকছেন তাঁর কাছেই সম্মান চাইতে এবং অবশ্যই মান সম্মানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা চান না তাঁর দেয়া স্বাধীনতা আংশিক অথবা সার্বিকভাবে কোনো মানুষ বিকিয়ে দিক। কারণ এই স্বাধীনতাই অন্যান্য যে কোনো প্রাণী থেকে তার পার্থক্য দেখায় এবং তাকে মর্যাদা দেয়, আর এ মর্যাদা টিকিয়ে রাখাই তার জীবনের লক্ষ্য– এ কারণেই তো সে মানুষ (ভুলে গেলে চলবে না, অন্যান্য যে কোনো মানুষের মতো তার মধ্যেও অফুরন্ত সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে)।

আল্লাহ তায়ালা চান প্রত্যেক মানুষ একমাত্র তাঁর ওপরই নির্ভর করে তার মধ্যে নিহিত ও সুপ্ত মানবতাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে সংগ্রামশীল হয়ে উঠুক। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কিছুতেই চান না, তাঁর বান্দা অন্য কারো বান্দা হয়ে যাক এবং তাঁর প্রতিনিধি তার আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে ফেলে আর কারো অসহায় গোলামে পরিণত হোক। এ জন্যে যে অন্য কারো অন্ধ আনুগত্য করবে, অন্য কারো কাছে নিজেকে যে অসহায় হিসাবে সোপর্দ করবে, সে নিজেকে অপমান করবে এবং

প্রকারান্তরে সে আল্লাহর সাহায্য করার শক্তি ক্ষমতাকে অস্বীকার করার প্রমাণ দেবে। তার শরীর মন সবই আল্লাহর; সুতরাং আল্লাহর মালিকানা থেকে নিজেকে মুক্ত করে অন্যের মালিকানায়। সোপর্দ করে সে হয়ে যায় অপরাধী। একান্ত কোনো বেকায়দায় পড়ে সে যদি কারো গোলামী করতে বাধ্য হয়, সে অবস্থাতেও তার অন্তরকে স্বাধীন রাখতে হবে। কারণ, বস্তুগত কোনো শরীরকে গোলাম বানানো যায় বটে, কিন্তু মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে যে অন্তর তাকে সর্বদা মুক্ত রাখতে হবে। এ অন্তরকে স্বেচ্ছায় কারো অধীন করে দেয়া যাবে না, তাহলে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া সম্ভব হবে না।

কে আছে এমন শক্তিশালী যে জোর করে এই সকল দুর্বল মানুষকে বিশ্বাস, চিন্তা ও ব্যবহারগতভাবে ওই সকল অহংকারীর অধীন করে দিতে পারে? কে আছে এমন যে ওইসব দুর্বল লোকদের আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের জীবন পদ্ধতি মানতে বাধ্য করতে পারে? আল্লাহ তায়ালাই তাদের সৃষ্টিকর্তা, তাদের রেযেকদাতা এবং তাদের তত্ত্বাবধায়ক। কেউ নেই জোর করে তাদের বাধ্য করার মত শক্তিশালী একমাত্র তাদের দুর্বল মন ছাড়া। ওই অহংকারী বিদ্রোহীদের তুলনায় বস্তুগত শক্তির কমতির কারণে তারা দুর্বল তা নয়। মান সম্মান, পদমর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান ওদের তুলনায় কম হওয়ার কারণে এরা দুর্বল তাও নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, এগুলো সবই বাহ্যিক বিষয়, এগুলোর কারণে দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোকে দুর্বলতার কারণও বলা যায় না। দুর্বল তখনই তারা হবে যখন নিজেদের অন্তরাত্মাকে দুর্বল করে ফেলবে, দুর্বল করে ফেলবে নিজেদের বিবেক বুদ্ধিকে এবং নিজেদের মনকে। মূলত এগুলোর কারণেই অন্যান্য জীব থেকে তারা পৃথক। একটা তীব্র ও কঠিন সত্য কথা হচ্ছে, দুর্বল অবস্থানে থাকা এই মানুষগুলোর সংখ্যাই বেশী এবং ওই বিদ্রোহী অহংকারীদের সংখ্যা অল্প, তাহলে কে আছে এমন যে মানুষের সামনে অল্পসংখ্যক, অধিক সংখ্যক মানুষের মাথা নত করতে বাধ্য করবে এবং কোন জিনিস তাদের ওই বিদ্রোহীদের সামনে নতজানু হতে বাধ্য করবে? তাদের নতিস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে তাদের আত্মার দুর্বলতা প্রকাশ করা, সাহস হারিয়ে ফেলা, আত্মমর্যাদাবোধের অভাব হয়ে যাওয়া এবং মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে সম্মান দিয়েছেন, অন্তরের মধ্যে তার অভাব বোধ করা ও নিজেকে ছোট মনে করার অনুভূতিই হচ্ছে সব কিছুর আসল কারণ।

নিশ্চয়ই এসব বিদ্রোহী অহংকারী ব্যক্তি জনগণের সহায়তাই অগণিত জনগণকে দমন করে; কৌশলে তাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে বিভিন্ন মতাবলম্বী গ্রুপগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে হাত করে নেয় এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগায়। এই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত গ্রুপগুলোকে যদি আল্লাহর বন্দেগীর শিক্ষার আলোকে এক করা যায় এবং তাদের ন্যায়নীতির পক্ষে পরিচালনা করা যায় তাহলে তারা অন্যায়কারী ও যুলুমবাজ মহলকে যে কোনো সময় দমন করতে এবং সঠিক পথে চলতে বাধ্য করতে পারে।

হীনতা তো তখনই আসে যখন অবহেলিত মানুষের অন্তরের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়। এই হীনমন্যতা অর্থাৎ নিজেকে কিছুতেই শক্তি ক্ষমতার অধিকারী ও যোগ্য মনে করতে না পারাটাই হচ্ছে আসল দৈন্য। অহংকারী ব্যক্তিরা তাদের এ হীনমন্যতা সর্বদা টিকিয়ে রাখে যাতে করে প্রয়োজনে তাদের দ্বারা খেদমত নেয়া যায়। নিজেদের স্বার্থের কারণে তাদের কিছুতেই বুঝতে দেয় না যে, তারাও কখনো বড় হতে পারে ও বড় কোনো কাজ করতে পারে।

এসব পদদলিত ব্যক্তিরাই আখেরাতের বিশাল মিলন ক্ষেত্রে দুর্বল অবস্থাতেই তাদের সেই মনিবদের সাথে ওঠে আসবে যাদের অন্ধ পায়রবী তারা করেছিলো দুনিয়ার বুকে এবং তাদের

বলবে; 'আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম। সুতরাং আমাদের থেকে আল্লাহর আযাব কিছু হালকা করে দেবে কি? অর্থাৎ আমরা তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম, যার ফলে এ কঠিন অবস্থায় আমরা আজ উপনীত হয়েছি।

অথবা হয়তো আযাবের দৃশ্য দেখে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ওই অহংকারী লোকদের দোষারোপ করতে গিয়ে তারা বলবে, তোমাদের নেতৃত্বে চলার কারণেই তো আজ আমাদের এ দুর্গতি! যালেমরা ওদের এ প্রশ্ন তাদের ফিরিয়ে দেবে। 'ওরা বলবে, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেদায়াত করতেন তাহলে আমরাও তোমাদের হেদায়াত করতাম। আজ আমরা অস্থির হই বা সবর করি, আজ আমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই, কোনো আশ্রয়ই আজ আমাদের নেই। তাদের এই জওয়াবে ওদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে, বাড়বে আরো সংকট, ওরা বলবে-

'আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেদায়াত করলে আমরা তোমাদের হেদায়াত করতাম।'

এখন, তোমরা আমাদের কোন কারণে দোষারোপ করছো? আমরা ও তোমরা একই (গোমরাহীর) পথেই তো ছিলাম, যার ফলে আমাদের পরিণতিও আজ একই হয়েছে যা তোমাদের হয়েছে, আমরা নিজেরাও হেদায়াত পাইনি এবং তোমাদেরও হেদায়াত করিনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেদায়াত করলে তোমাদেরও আমরা আমাদের সাথে সেই পথেই চালিত করতাম। হাঁ, তোমাদের ভুল পথে আমরা তখন চালিয়েছিলাম যখন আমরা নিজেরা ভুল পথে ছিলাম। আসলে সেদিন তারা হেদায়াত এবং গোমরাহী উভয় অবস্থাপ্রাপ্তির জন্যে আল্লাহকেই দায়ী মনে করবে। তারপর স্বীকার করবে যে, তাঁর ইচ্ছাতেই কেয়ামত সংঘটিত হয়েছে, যদিও পৃথিবীতে তারা কেয়ামত অস্বীকার করতো, যে সব দুর্বল লোকদের জ্ঞান ছিলো না তাদের এইভাবে ভুল পথে চালিত করতো এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখত। এইভাবে ওই হতভাগারা নিজেরা তো গোমরাহ ছিলোই, আল্লাহর পথ থেকে অপরকেও গোমরাহ করেছে। যে যাই করুক না কেন। অবশেষে সবাইকে আল্লাহর কাছেই যেতে হবে। এখন একথাও ভালো করে বুঝতে হবে, আল্লাহ তায়ালা ভুল পথে চলার নির্দেশ দেন না, যেমন তাঁর আয়াত থেকে জানা যায়- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোনো লজ্জাকর অথবা অন্যায় কাজের জন্যে হুকুম দেন না।'

এরপর তারা ওসব দুর্বল লোকদের সেদিন দোষারোপ করবে ও চোখের ইশারায় জানাবে, আজ অস্থির হয়ে কোনো লাভ নেই, যেমন নেই কোনো সুবিধা সবর করেও। আযাব এসেই গেছে। কাজেই সবর করা হোক বা অস্থিরতা প্রদর্শন করা হোক, এ মহাশাস্তি রদ হওয়ার কোনো উপায় নেই। সেই সময়টা পার হয়ে গেছে যখন অস্থিরতা দেখিয়ে না-ফরমানী পরিহার করা যেতো এবং মন্দ পথ ছেড়ে ভালো পথে আসা যেতো। সবরের প্রশ্ন ছিলো তখন যখন সৎ পথে থাকায় দুঃখ কষ্ট এসেছিলো। সে সময়ে সবর করলে আজ আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা করা যেতো। সে সময়টা শেষ হয়ে গেছে। আজ পালানোর বা বাঁচার কোনো পথই নেই। তাই আল্লাহ তায়ালা ওদের কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন,

'আমরা অস্থির হই বা সবর করি, নেই আমাদের বাঁচার কোনো উপায়।' অর্থাৎ সেদিন সব কিছুর চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে, ঝগড়া ফাসাদ ও তর্ক বিতর্কের সকল সুযোগের অবসান হয়ে যাবে এবং নীরব হয়ে থাকবে সেদিন সকল মানুষ।

হাশরের ময়দানে শয়তানের অনুশোচনা

হাশরের ময়দানে এক আজব দৃশ্য আমরা দেখবো, দেখব শয়তানকে, তার উদ্ধত ও বিভ্রান্তিকর কণ্ঠস্বর তখনো থাকবে, তখনো ভবিষ্যদ্বক্তা অথবা শয়তানের আসল কুবুদ্ধিপুর্ণ মূর্তি নিয়েই সে থাকবে, তখনো এই সব দুর্বলতায় ঘেরা জনতা এবং অহংকারী ব্যক্তিবর্গকে একইভাবে সে চটকদার কথা বলতে থাকবে, বলবে– এমন এমন বিদ্রূপাত্মক কথা যা আল্লাহর আযাব থেকেও কঠিন মনে হবে। যেমন –

'যখন সকল কিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদাই করেছিলেন যার বাস্তবায়ন তোমরা দেখতে পাচ্ছো, আর আমিও তোমাদের কাছে ওয়াদা করেছিলাম ঠিক, কিন্তু তা আমি পূরণ করলাম না, তোমাদের সাথে ওয়াদা খেলাফই করলাম। .... নিশ্চয়ই। যালেমদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।' (আয়াত ২২)

আল্লাহ হচ্ছেন আল্লাহ, শয়তান তো সত্য সত্যই শয়তান, তার জঘন্যতম আসল চেহারা ও নিকৃষ্টতম ব্যক্তিত্ব এখানেই পুরোপুরি প্রকাশিত হবে, যেমন করে সেদিন দুর্বলতায় ঘেরা ও অহংকারী মানুষদের আসল অবস্থা প্রকাশ পাবে।

নিশ্চয়ই শয়তান তো সেই ব্যক্তি যে অন্তরের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয় (নানা প্রকার খারাপ, অসুন্দর ও অযৌক্তিক কথা জাগায় এবং অহংকার করতে শেখায়), কুফরী, অন্যায় না-ফরমানীর কাজগুলো সুন্দর করে দেখায় এবং অসৎ কাজের জন্যে প্ররোচিত করে, আর বাধা দেয় মানুষকে ইসলামের দাওয়াতের দিকে কান দিতে ...... অথচ সেইই এখন তাদের এসব কথা বলছে এবং যন্ত্রণাদায়ক কথা বলে তাদের কষ্ট দিচ্ছে, কিন্তু তার কাছে ওদের ফিরিয়ে আনতেও সে আর সক্ষম হবে না। যা হবার তা হয়ে গেছে, চূড়ান্তভাবে সব কিছুর ফয়সালাও হয়ে গেছে। এখন তারা এ কথাগুলো বলছে যখন সংশোধনের সকল পথ রোধ হয়ে গেছে। তাই বলা হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে হক ওয়াদা করেছেন, আর আমিও ওয়াদা করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সে ওয়াদা আজ খেলাফ করলাম।'

এরপর শয়তান ওদের নানা কথা বলে লজ্জা দিয়ে আর একবার অপমানিত করবে, কেন ওরা তার অনুসরণ করেছিলো, সে তো ওদের ঘাড় ধরে অনুসরণ করায়নি, ওরা নিজেদের ইচ্ছামত তার অনুসরণ না করেছে, জোর করে অনুসরণ করানোর ক্ষমতা তার মোটেই ছিলো না। হ্যাঁ অবশ্যই এতোটুকু কাজ করা হয়েছে, তাদের ব্যক্তিত্বকে উজ্জীবিত করা হয়েছে, ব্যস। পূর্বে শয়তান এবং ওদের মধ্যে যে পুরাতন শত্রুতা ছিলো তখন তারা তা একেবারেই ভুলে গেছে। এরপর তারা ওই মরদূদ শয়তানের আহ্বানে সর্বপ্রকার অন্যায় কাজে সাড়া দিয়েছে আর পরিত্যাগ করেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের দাওয়াতকে। একথাটাই কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের ওপরে আমার কোনো ক্ষমতা ছিলো না, তবে, আমি তোমাদের ডেকেছি, সাথে সাথে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো।'

এরপর রোজ হাশরের সেই কঠিন মুহূর্তে শয়তান ওদের তিরস্কার করবে আর তাদের আহ্বান জানাবে যেন তারা নিজেদেরকে নিজেরাই ধিক্কার দেয়। ওর আনুগত্য করার কারণে সে ওদের তো কোনো বাহবা দেবেই না, বরং সেদিন উল্টা ধমকাবে, কেন তার কথায় তারা মাথানত করেছিলো। বলবে,

'তোমরা আমাকে দোষ দিয়ো না, বরং দোষ দাও নিজেদেরকেই।'

তারপর কাছে এগিয়ে এসে সে ওদের থেকে নিজের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা দেবে। হায়, সেইই ত সেই ব্যক্তি যে ওদের কথা দিয়েছিলো; আমাদেরও কথা দিয়েছিলো

যে, সে আমাদের সাহায্য করবে, আর তাদের বলেছিলো যে, তার ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না; কিন্তু হায়, কেয়ামত যখন সংঘটিত হবে এবং ওরা চীৎকার করে ওকে সাহায্যের জন্যে ডাকবে, তখন সে কোনো সাড়া দেবে না, যেন সে একথাটাই তখন বলবে, যখন সে সাহায্যের জন্যে চীৎকার করে ওদের ডেকেছিলো তখন ওরাও তার কথায় সাড়া দেয়নি, এজন্যে আজ সে ওদের ডাকে সাড়া দেবে না।

'না, আমি তোমাদের সাহায্যকারী নই, তোমরাও আমার কোনো সাহায্যকারী নও।'

অর্থাৎ তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক বা কোনো বন্ধুত্ব নেই! তারপর ওরা যে তাকে আল্লাহর সাথে শরীক বলতো, এটা সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে এবং বলবে যে, সে এ বিষয়ে কিছুই জানে না। এখানে তার কথাটাই তুলে ধরা হচ্ছে,

'তোমরা যে ইতিপূর্বে আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়েছিলে তা আমি আজ অস্বীকার করলাম।'

এইভাবে চির লাঞ্ছিত মরদূদ শয়তান তার বন্ধু-বান্ধবদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তার ঘৃণ্য ভাষণ শেষ করবে।

'নিশ্চয়ই, যালেমদের জন্যেই রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।'

সুতরাং, হায় মরদূদ শয়তান, আফসোস তার জন্যে, আফসোস তার অনুসারীদের জন্যে, সে আজকে দরদী সেজে তাদের উদাত্ত কণ্ঠে ডাকছে, আর ওরাও তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার দলে ভিড়ে যাচ্ছে, অথচ তাদের নবী রসূলরা বার বার ডাকছে, কিন্তু তাদের ওরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে এবং তাদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে।

আসুন, এ নাটকের যবনিকা পতনের পূর্বে (ওই দিন সংঘটিতব্য) আর একটি দলের দিকে তাকাই, তারা হচ্ছে মোমেন উম্মত, সাফল্যমন্ডিত উম্মত এবং পরিত্রাণ পাওয়া উম্মত।

'আর প্রবেশ করানো হবে (তাদের) বাগবাগিচা ভরা জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবাহমান সুশীতল পানীয়ের নির্ঝরণীসমূহ। সেখানে তাদের প্রভুর হুকুমে থাকবে তারা চিরদিন, অভিনন্দন জানানো হবে তাদের 'সালাম' সালাম শব্দ দ্বারা।'

এরপর আবার যবনিকা পতন হচ্ছে,

হায়! কী আশ্চর্য ওই মহা সমাবেশের দৃশ্য! মিথ্যা আরোপকারী ও অহংকারী বিদ্রোহীদের যে দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো এবং দাওয়াতদানকারীদের সাথে যে জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছিলো, সে কাহিনী কি চমৎকারভাবেই না তখন পেশ করা হবে!

আর এ করুণ কাহিনীর আলোকে যেসব পরিণতি দেখা দিয়েছে তার মধ্যে থেকে আজ রসূলদের উম্মত যালেম ও জাহেল লোকদের মোকাবেলা করছে।

'আর ওরা (মোমেনরা) বিজয়ের জন্যে (তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে) সাহায্য প্রার্থনা করলো, এর ফলে ব্যর্থ হয়ে গেলো প্রত্যেক দাম্ভিক ও বিদ্বেষভাবাপন্ন শাসনকর্তা .... আর তাদের পেছনে রয়েছে ভীষণ কঠিন আযাব।' (আয়াত ১৫-১৭)

এভাবেই আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি আখেরাতের এমন আশ্চর্যজনক দৃশ্য, এ দৃশ্য হচ্ছে অহংকারী দুর্বল ও শয়তানের সম্মিলিতভাবে কথোপকথনের দৃশ্য।

কালেমায়ে তাইয়্যেবার উদাহরণ

এ কাহিনীর আলোকে এবং নেককার মানুষ ও অন্যায়কারীদের পরিণতিসমূহের অবস্থাগুলো সামনে রেখে আল্লাহ রব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনে পবিত্র অপবিত্র (ভালো মন্দ) সম্পর্কিত তাঁর

নিয়ম জানাচ্ছেন। তিনি পবিত্র কথা ও অপবিত্র কথার উদাহরণ দিচ্ছেন যেন কোনো পট পরিবর্তনের পর ঘটনাবলীর পর্যায়ক্রমিক অবস্থা সহজে বোধগম্য হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি দেখনি কেমন করে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা কালেমায়ে তাইয়্যেবাও কালেমায়ে খবীসার উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছেন ...... নেই তার কোনো স্থায়িত্ব।' (আয়াত ২৪-২৬)

'আল্লাহ তায়ালা মযবুত কথা দ্বারা দুনিয়াতে ঈমানদারদের দৃঢ়তা দান করছেন এবং আখেরাতেও বানাচ্ছেন তাদের মযবুত এবং যালেমদের সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন, আর আল্লাহ তায়ালা করেন তাই যা তিনি (করতে) চান।'

পবিত্র কথাকে অপবিত্র কথার মতোই অনেকটা মনে হয়, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে, পবিত্র কথার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত থাকে এবং তার ডালপালাগুলো প্রসারিত হয়ে যায় উন্মুক্ত আকাশের দিকে। অপরদিকে বাজে কথা ও অন্যায় অসহ্য বচনের উদাহরণ দেয়া যায় সেই গাছের সাথে, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে না বরং তা ভেসে বেড়ায় মাটির ওপর দিয়ে, যার কারণে এ গাছের তেমন কোনো স্থায়িত্ব থাকে না ....

'আল্লাহ তায়ালা দৃঢ় কথা দ্বারা ঈমানদারদের দুনিয়ার বুকে এবং আখেরাতেও প্রতিষ্ঠিত করেন, আর যালেমদের সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেন এবং করেন তাই যা তিনি চান।'

আসলে পবিত্র ও ভালো কথা পবিত্র এবং ফলদায়ক গাছের মতো, যার শিকড় নিবদ্ধ থাকে মাটির গভীরে এবং শাখা প্রশাখা পরিব্যাপ্ত থাকে আকাশের উচ্চতায়, আর খারাপ ও অসত্য কথার উদাহরণ দেয়া যায় মন্দ ও অনুপকারী গাছের সাথে, যার শিকড় ভেসে বেড়ায় মাটির ওপরে; ফলে তার কোনো স্থায়িত্ব নেই। আলোচ্য প্রসংগের সাথে সামঞ্জস্য থাকার কারণে এ দৃষ্টান্তটা দেয়া হয়েছে এবং নবীকুল ও তাদের অস্বীকারকারীদের ঘটনাবলীর সাথে এ উদাহরণের মিল রয়েছে। এদের ও ওদের পরিণতি যে বিভিন্ন, তাও এ উদাহরণ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। নবীদের ইতিহাস ও হঠকারী দুনিয়া লোভী নিকৃষ্ট লোকদের জীবনেতিহাস থেকেও এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে বিশেষ করে এদের ও ওদের পরিণতির দৃশ্য সামনে নিয়ে আসার মাধ্যমে বিষয়টা বেশী পরিষ্কার হয়ে গেছে। নবুওতের গাছের যে অবস্থা এখানে পেশ করা হয়েছে তা বুঝার জন্যে ইবরাহীম (আ.)-এর অবস্থাটা খেয়াল করা যাক-তিনি ছিলেন বহু নবীর পিতা। নবীদের সেলসেলা তাঁর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকে।

তিনি ছিলেন গভীর মূলের মতো, যার শিকড় সুদূর গভীর তলদেশের সাথে সংযুক্ত। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আগত বহু নবীরূপ শাখাগুলো সর্বদাই মানব জাতিকে দুনিয়ার জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি দিয়ে এসেছে এবং অবশেষে আখেরাতের সাফল্যজনক পরিণতি রয়েছে সামনে। ঈমানের ফল কল্যাণ আকারে এসেছে এসব জাতির মধ্যে।

কিন্তু সূরাটির মধ্যে বর্ণিত ঘটনাবলীর উদাহরণ দ্বারা যেসব কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা মানব হৃদয়ের কাছে আরও গভীর, আরো ক্রিয়াশীল।

পবিত্র কথা বলতে হক কথা বুঝানো হয়েছে- এটাই হচ্ছে পবিত্র গাছ, যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে মাটির বহু গভীরে, যার শাখা ছড়িয়ে রয়েছে উর্ধ্বাকাশে এবং কল্পনার উর্ধ্বে যা সদা সর্বদা ফলদায়ক থেকেছে। যা যামানার পরিবর্তনের কারণে ফল দেয়া কখনো বন্ধ করেনি। যার ওপরে মিথ্যা কখনও বিজয়ী হতে পারে না। যা চিরদিন মানুষের মধ্যে এমন তাকওয়া গড়ে তুলেছে যার ওপরে অহংকারী বিদ্রোহীরা কিছুতেই স্থায়ীভাবে প্রভাবশালী হতে পারেনি, আর যদি মনে করা হয়, কোনো কোনো যামানায় এসব হকপন্থীরা যালেমদের মোকাবেলায় বিপদগ্রস্ত হয়ে থেমে

গেছে, অন্যায়, যুলুম ও অহংকারের রাজত্ব কায়েম হয়ে গেছে, যদি মনে হয়ে থাকে, অন্যায় অরাজকতার পরিবেশে মানুষ অসহায় হয়ে গেছে, আর এ অন্যায় ফল দিক–বিদিক ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর বীজ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ায় আরো নতুন নতুন অন্যায়ের বৃক্ষ সবখানে পয়দা হয়ে গেছে, হাঁ, অনেক সময়ে সাময়িক অবস্থা এরকম দেখা গেলেও পরিশেষে ন্যায়েরই বিজয় হয়েছে।

অপরদিকে অসত্য ও মন্দ কথার উদাহরণ হচ্ছে, এটা এমন এক গাছ, যা গজিয়ে ওঠার পর লক লক করে বেড়ে ওঠেছে এবং চতুর্দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে ফেলেছে। এ অবস্থা দেখে অনেকের কাছে মনে হয়েছে যে এটা পবিত্র গাছ থেকে বেশী মোটা ও অধিক শক্তিশালী, কিন্তু এর বৃদ্ধিটা হচ্ছে সাময়িক এবং এর শিকড়গুলো খুব গভীরে না যাওয়ায় আসলে এগুলো উপরিভাগে ভেসে থাকার মতোই দুর্বল ও অস্থায়ী, যার কারণে ঝড় তুফানের স্বল্প আঘাতে এ বৃক্ষ টিকে থাকতে পারে না।

যাই হোক, এটা ওটা দিয়ে যে উদাহরণই দেয়া হোক না কেন, এগুলোই চূড়ান্ত কথা নয়, সত্যের বিজয় মানব জীবনে আসবেই আসবে, অবশ্য এর জন্যে কিছু বিলম্ব হতে পারে। যুগের পরিবর্তনে উত্থান পতন এবং কখনো মিথ্যার দাপট খুব প্রবল মনে হবে, কিন্তু এটা কোনো স্থায়ী অবস্থা নয়।

আর সত্যের মূল মানব হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত থাকায় কোনো সময়েই এটা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। অসত্যের সাথে যতো সংঘর্ষই হোক না কেন এবং সত্যের পথ যতোই বাধাগ্রস্ত ও বিড়ম্বিত হোক না কেন। অন্যায় তখনই জেঁকে বসতে চায় যখন ন্যায়ের কোনো কোনো দিক দুর্বল হয়ে যায়, কোনো কোনো ভালো কাজের সাথে মিশে গিয়ে সত্যের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়– এসময় অন্যায় তার রাজত্ব কায়েম করবে বলে আশাবাদী হয়ে ওঠে। এখানে বুঝতে হবে, কোনো অন্যায় একান্ত আপনরূপে স্থায়ীভাবে মানুষের হৃদয়ে আসন করে নিতে পারে না; বরং অন্যায় অসত্য ও মন্দ জিনিস মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করে 'ভালো'র রূপ ধরে, কিন্তু এই ছদ্মাবরণ যখন ধরা পড়ে তখন মিথ্যা ও অন্যায়ের ঘন অন্ধকার কেটে যায়, পরিশেষে সত্যের সমুজ্জ্বল চেহারা আরও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে। এজন্যে মনে রাখতে হবে–

সত্যকে সত্য দিয়েই বুঝতে হবে আর মিথ্যাকে বুঝতে হবে মিথ্যা দিয়েই। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আর তিনি মানুষের জন্যে বিভিন্ন উদাহরণ দেন, যেন তারা (এসব থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে।'

সত্যের বিরুদ্ধে বাধা বিপত্তির এসব নযির পৃথিবীর বুকে বাস্তবে বহু দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে অনেক সময়ই মানুষ মিথ্যার এসব আক্রমণের কথা ভুলে যায়।

আবার দেখুন, দৃঢ়মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা গাছের ছায়াতলে থাকার অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে কালেমায়ে তাইয়েবা'র সাথে।' 'ঈমানদারদের আল্লাহ তায়ালা সুদৃঢ় কথা দ্বারা দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতে মযবুত করে রাখবেন..... অপর দিকে এমন অকল্যাণকর গাছের ছায়াতলে থাকা, যার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে যমীনের ওপরে, যার নেই কোনো স্থায়িত্ব বা দৃঢ়তা– এটাই হচ্ছে মানব রচিত মন্দ কথার ওপরে টিকে থাকার উদাহরণ, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।' আর আল্লাহ তায়ালা যালেমদের সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। এভাবে আলোচনা প্রসংগে অর্থ ও উদাহরণসহ ব্যাখ্যার মধ্যে পুরোপুরি মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের দুনিয়ার বুকে ও আখেরাতে সেই ঈমানের কথার ওপরে মযবুত করে রাখবেন যা প্রকৃতিগতভাবে তাদের বিবেকের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে রয়েছে, যার ফলস্বরূপ

জীবনের সকল কাজের মধ্যে দেখা যায় নিয়ম শৃংখলা ও সৌন্দর্য, আর তাদের আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা আল কোরআনের কথা ও রসূল (স.) এর হাদীস দ্বারা মযবুত করে রাখেন দুনিয়ার বুকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে, আর তাদের মনের মধ্যে দৃঢ়তা এবং আখেরাতেও সাফল্য দান করেন। এসবগুলো কথাই হচ্ছে সার্বিকভাবে মযবুত বরহক সত্য এবং অপরিবর্তনীয় কথা, যার খেলাফ কোনো দিন হবে না এবং এ পথে দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠার সাথে টিকে থাকলে বিভিন্ন মত ও পথ সামনে সুন্দর হয়ে আসবে না। যারা এইভাবে আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকবে তাদের আসবে না কোনো পেরেশানী, অস্থিরতা বা কিংকতর্ববিমূঢ় হওয়ার অবস্থা।

আল্লাহ তায়ালা যালেমদের তাদের যুলুম ও শেরেকের কারণে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেন (আল কোরআনের অধিকাংশ স্থানে আল্লাহ তায়ালা শেরেক ও ঔদ্ধত্যকে যুলুম নামে উল্লেখ করেছেন)। তারা হেদায়াতের নূর থেকে বহু বহু দূরে অবস্থান করে, আর বাজে রসম রেওয়াজ, ভুল চিন্তা ধারণা কল্পনা ও আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কুপ্রবৃত্তির তাড়নে চলে এবং মানব রচিত আইন কানুনের কাছে মাথা নত করে .... এদের আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিয়ম অনুযায়ী সত্যের আলো থেকে দূরে সরিয়ে দেন। আর তাদের প্রবৃত্তির কাছে, গোমরাহীর কাছে এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির আহ্বানের কাছে নমনীয় করে দেন।

আল্লাহ তায়ালা করেন তাই 'যা তিনি (করতে) চান।'

অর্থাৎ তিনি তাঁর স্বাধীন ইচ্ছামতো যা খুশী তাই করেন, তাঁর ইচ্ছার ওপর কেউ কোনো শর্ত আরোপ করার নেই; বরং যা তাঁর মর্জি হয় তাই তিনি করেন। এমনকি কোনো কিছু পরিবর্তন করার ইচ্ছা হলে তিনি তাও করে থাকেন, এতে তাঁকে থামানোর কেউ নেই এবং তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা কার্যকর করার পথে কেউ কোনো বাধাও সৃষ্টি করতে পারে না।

এই সমাপ্তিকর কথাগুলো দ্বারা রেসালাত ও দাওয়াত সম্পর্কিত মন্তব্য শেষ করা হচ্ছে। ইবরাহীম, যিনি বহু নবীর পিতা, সেই নামেই এই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে এবং দাওয়াত ও রেসালাত সম্পর্কিত অনেক কথা, বরং অধিকাংশ কথাই এসেছে সূরাটির প্রথম অধ্যায়ে। আরও আলোচনা এসেছে এমন এক গাছের, যা অতি উত্তম ফলে ভরপুর এবং যার ছায়া বিস্তৃত হয়ে রয়েছে বহু এলাকা নিয়ে। আর কালেমা তাইয়েবা, যা প্রত্যেক যুগে নতুন নতুনভাবে মানুষের কাছে হাযির হয়েছে, তা হচ্ছে সেই কালেমা যা সব থেকে বড় এবং তার প্রচার হচ্ছে সেই একই রেসালাতের দায়িত্ব, যা যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা পালিত হয়ে এসেছে, এ দায়িত্বের নেই কোনো পরিবর্তন। এক আল্লাহর তাওহীদের তাৎপর্য হচ্ছে, যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁর ইচ্ছাই ইচ্ছা, সে ইচ্ছায় বাধ সাধার মতো কেউ নেই। তাঁর ইচ্ছাই সকল মোমেনকে কার্যকর করতে হবে।

কোরআনে উপস্থাপিত রসূলদের ইতিহাসের তাৎপর্য

এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই এমন কিছু বিষয় নিয়ে, যা রসূলদের কাহিনীসমূহ ঘিরে বরাবর প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। এসব তাৎপর্য বয়ান করতে গিয়ে আমরা নিজেদের তৈরী কোনো কথা বলবো না, বরং যেসব তথ্য ও সূত্র আল কোরআনের মধ্যে পেয়েছি, সেই অনুসারেই আমরা আরজ করার চেষ্টা করব। আমরা আরও কিছু বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রথম যে সত্যটি আমরা এ সূরার মধ্যে দেখতে পেয়েছি তা হচ্ছে সেই মহাসত্য, যা মহাবিজ্ঞানময়, সকল বিষয়ের খবর রাখনেওয়ালা আল্লাহর বর্ণিত সত্য, আর তা হচ্ছে ঈমানের বিষয়। এ বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় থেকেই আলোচিত হয়ে এসেছে–

সত্যের ধারক বাহক সকলেই একই সারির মানুষ, যাদের আল্লাহর সম্মানিত রসূলরা পরিচালনা করেছেন, তারা সবাই মানুষকে একই সত্যের দিকে ডেকেছেন, সবাই একই সত্য প্রকাশ করেছেন এবং সবাই তারা এক পথে চলেছেন, সবাই এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং একই মালিকের বাদশাহী প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, আর তাদের কেউই এক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে (সাহায্যের জন্যে) ডাকেননি এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো প্রতি তাওয়াক্কুল করেননি বা তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেননি এবং তাঁর ওপর ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করেননি।

এরপর আসছে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাসের প্রশ্ন, তবে আধুনিককালের বৈজ্ঞানিকরা যেভাবে চিন্তা করে সেইভাবের বিশ্বাস নয়। ওরা বলতে চায়, সারাবিশ্বের ক্ষমতা অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছিলো, সেখানে দুই জনের মধ্যে ক্ষমতা চলে আসে এবং অবশেষে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় একজনের মধ্যে। প্রাচীনকালে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক জিনিসের পূজা করতো, পরে আত্মা, তারকারাজি ও গ্রহ উপগ্রহের পূজা করতে করতে অবশেষে এক আল্লাহর পূজার দিকে এগিয়ে আসে। এভাবে তাদের চিন্তার অগ্রগতি হতেই থাকবে। যতো দিন যাবে ততোই তাদের অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে মানুষ আরও উন্নতি করবে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বাড়বে, রাজনৈতিক সংগঠনের উন্নতি হতে হতে অবশেষে একজন মাত্র শাসককে মেনে নেয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠবে........... সংকীর্ণ বুদ্ধি ও দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন মানুষের লাগামহীন চিন্তার এসব ফসল মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আল্লাহর ধ্যান ধারণা এবং তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান এসেছে বিশ্ব প্রভু আল্লাহর প্রেরিত ও মনোনীত মানব প্রতিনিধি রসূলদের কাছ থেকে এবং এটা পর্যায়ক্রমিক কোনো ধারায় আসেনি, সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বাবা আদম (আ.)-এর কাছ থেকে এ বিশ্বাস অর্থাৎ মানবেতিহাসের জন্ম যখন থেকে তখন থেকেই জানা যায় সৃষ্টিকর্তা একজনই। পরবর্তীতে তিনিই এ জ্ঞান লাভ করেছেন যাঁকে মহান সৃষ্টিকর্তা মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে নিজেই বাছাই করে নিয়েছেন। এ সত্য চিরদিন একই থেকেছে এবং কোনো দিন এ সত্যের মধ্যে আসেনি পরিবর্তন, আসেনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের (রসূল) মধ্যে বা কোনো রসূলের শিক্ষায় কোনো পরিবর্তন আসেনি আসমান থেকে আগত কেতাবসমূহের মধ্যে। যেসব মৌলিক শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেগুলো লেখা রয়েছে স্থায়ীভাবে একটি কেতাবের মধ্যে। যেমন আমাদের মহা বিজ্ঞানময়, সর্ববিষয়ে খবর রাখনেওয়ালা আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন।

আর যদি ওসব বৈজ্ঞানিক বলতো, রসূলরা যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করার যোগ্যতা একজন রসূল থেকে অপর একজন রসূল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করেছে, আর জাহেলী যামানায় গড়ে ওঠা মূর্তিপূজার চেতনা ওই তাওহীদী অনুভূতিকেও প্রভাবিত করেছে, যা প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো রসূলদের লক্ষ্য এবং যাঁরা সময়ে সময়ে পৌত্তলিকতার মোকাবেলা করেছেন, অবশেষে সাধারণভাবে মানুষের কাছে তাওহীদের দাওয়াত গৃহীত হয়েছে, একের পর এক লোকদের গ্রহণ করার মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে তাওহীদের বার্তা এবং অন্যান্য আরও অনেক ব্যবহারের মাধ্যমে ওটা সম্ভবপর হয়েছে যা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে........... যদি ওই বৈজ্ঞানিকরা এ ধরনের যুক্তি দিতো তাহলে তো কিছু বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতো ... কিন্তু তারা নিছক প্রাচীন ইউরোপের গির্জার পূজারীদের অনুসরণে শুধু শত্রুতার উদ্দেশ্যেই এসব কথা বলে। যদিও বর্তমানের বৈজ্ঞানিকরা এসব কথায় তাদের সাথে একমত নয়। আসলে তাদের গোপন ইচ্ছা হচ্ছে ধর্মীয় চিন্তাধারাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, কিন্তু তাদের এ গোপন ইচ্ছা অনেক সময় প্রকাশিতও হয়ে পড়ে।

তারা সচেতন অথবা অচেতনভাবে মানুষের ধর্মীয় চিন্তা ধ্বংস করে দিতে চায়। অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সব কিছু দেখছেন শুনছেন, তিনি মানুষের জীবন পরিচালনার জন্যে স্থায়ী ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং পরকালে তাঁর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে, এই চেতনার কারণে মানুষের মধ্যে নীতি নৈতিকতা থাকবে, এটাই তারা বরদাশত করতে পারে না, এ জন্যে তারা প্রমাণ করতে চায়, কোনো দিন কোনো আসমানী কেতাব নাযিল হয়নি এবং ওহী বলতে কোনো জিনিস কখনও আসেনি। তাদের কথায় ওহী বলতে যা কিছু বলা হয় তা মানুষের চিন্তা গবেষণার ফল ছাড়া আর কিছু নয়, এ সব চিন্তা গবেষণাকেই তারা ওহী বলে চালাতে চায়; এ জন্যে অবশ্যই তাদের কথা জ্ঞান গবেষণা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ধর্মীয় চেতনার সাথে তাদের প্রাচীন শত্রুতা এবং বর্তমানে তাদের মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ করার গোপন বাসনার কারণে তারা যে অভিযান চালিয়েছে, তাকেই তারা নাম দিয়েছে বিজ্ঞান। এর ফলে বহু মানুষ আজ বিজ্ঞানের নামে এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহকে বুঝতে গিয়ে ধোঁকা খাচ্ছে!

এইভাবে যখন মানুষ বিজ্ঞানের নামে ধোঁকা খাচ্ছে সে অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষেও দ্বীন ইসলামের দেয়া জীবন ব্যবস্থার ওপরে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত তাদের মাথায় একথা ঢুকানো হচ্ছে যে, অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও অবৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরোধী এক ব্যবস্থা, এর দ্বারা মানুষের কোনো কল্যাণ হয় না।

পথভ্রষ্ট এসব বস্তুবাদীরা যতো চেষ্টাই করুক না কেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে যুগে যুগে, দেশে দেশে যে সকল নবী রসূল এসেছেন তাঁরা পথহারা মানুষকে একই তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন এবং তাঁদের চরিত্র, বাস্তব ব্যবহার ও কাজকর্ম দ্বারা তারা মানুষকে সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য জাহেলিয়াতও চুপ করে বসে থাকেনি। মিথ্যা এবং দুর্নীতির ধ্বজাধারীরাও ধর্মীয় চেতনা ধ্বংস করার জন্যে বরাবর সংগ্রাম চালিয়েছে। এ অসহনীয় পরিস্থিতিতে আল কোরআনের দাওয়াত এসেছে এবং সর্বত্র সেই একই দাওয়াতের অমিয় বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে ইসলাম দিকে দিকে তার বাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছে। আর এটাও সত্য কথা, রসূলদের দাওয়াতের মধ্যে যেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি, তেমনি জাহেলিয়াতের ধারক বাহকদের বিরোধিতাপূর্ণ তৎপরতায়ও কোনো ভাটা পড়েনি।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘাত এক ঐতিহাসিক সত্য

এ এমন একটি সত্য যার ওপর দৃষ্টি থেমে যায়। জাহেলিয়াতের অবস্থা সর্বযুগে একই প্রকার, ইতিহাসের কোনো এক অধ্যায়েই এই মূর্খতা থেমে থাকেনি; বরং এটা হচ্ছে চিন্তা ও বিশ্বাসের বিপর্যয় এবং বিপর্যস্ত চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এক বিপথগামী সমাজের ছবি।

এই জাহেলিয়াতের সূচনা হয়েছিলো তখন, যখন মানুষ মানুষের গোলামী করতে শুরু করেছিলো এবং উচ্চাভিলাষী অহংকারী মানুষদের চিন্তাপ্রসূত নিয়ম কানুনের সামনে দুর্বল ও মযলুম মানুষ মাথা নত করতে শুরু করেছিলো, অথবা তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো মানুষকে পালনকর্তা ও আইনদাতা মেনে নিয়েছিলো। আল্লাহ ছাড়া জীবন মৃত্যুর মালিক আরও কেউ আছে অথবা আরও কেউ পালনকর্তা আছে, একথা মানা বা শুধু আল্লাহকে পালনকর্তা মানা, এই উভয় অবস্থা থেকে শুরু হয়েছিলো হঠকারী যুক্তি বুদ্ধিহীন জাহেলী মনোভাব। জাহেলিয়াতের এই অবস্থাতে কখনো সর্বশক্তিমান মালিক ও জীবন মৃত্যুর মালিক মনা হয়েছে একাধিক ব্যক্তিকে, আবার কখনো সর্বশক্তিমান ও জীবন মৃত্যুর মালিক মানা হয়েছে একজনকে এবং পালনকর্তা ও আইনদাতা মানা হয়েছে একাধিক ব্যক্তিকে। অর্থাৎ যে কোনো ক্ষমতাকে একাধিক সত্ত্বার মধ্যে

যখন ভাগাভাগি করার মানসিকতা ও বিশ্বাস গড়ে ওঠেছে তখনই জাহেলিয়াত (হঠকারিতা ও যুক্তিহীনতা) গড়ে ওঠেছে।

অপরদিকে শক্তি ক্ষমতা, জীবন মৃত্যুর মালিকানা এবং আইন রচনা, প্রতিপালন ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ, এসব ক্ষমতার অধিকারী দ্বিতীয় আর কেউ নয়, এ দাবী ও শিক্ষা নিয়ে সকল নবী ও রসূলের আগমন ঘটেছে। একথার অর্থ দাঁড়ায়, এসব ক্ষমতার মেকী ও মিথ্যা দাবীদারদের অস্বীকার করা এবং নিরংকুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর– একনিষ্ঠভাবে এ কথা মেনে নেয়া আল্লাহকেই সর্বপ্রকার শক্তি-ক্ষমতার মালিক জেনে একমাত্র তাঁর ইচ্ছা ও আইন মানা এবং তাঁকেই প্রতিপালক জেনে শুধু তাঁরই কাছে নতিস্বীকার করা। এভাবে মানুষ যখন আল্লাহকেই সর্বশক্তিমান, জীবন মৃত্যুর মালিক প্রতিপালক ও বাদশাহ আইনদাতা বলে মেনে নিয়ে শুধু তাঁকেই ভয় করে, তাঁর সামনে মাথা নত করে এবং একমাত্র তাঁরই আইন অনুসারে জীবন যাপন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, তাঁরই ওপর ভরসা করে এবং বিপদ আপদে ও সংকট সমস্যায় তাঁরই কাছে সাহায্য চায়, অন্য কারো কাছে নয় এবং অন্য কারো মতের তোয়াক্কা করে না, তখনই পৃথিবীর শক্তি ক্ষমতার দাবীদারদের সাথে তার শুরু হয়ে যায় দ্বন্দ্ব সংগ্রাম, আর তখনই ঘটনাচক্রে এবং সাময়িকভাবেব যারা শক্তি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তারা ওদের বশীভূত করার জন্যে এবং তাদের আইন মানার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে, প্রকৃতপক্ষে তখন ইসলামী দাওয়াত নস্যাৎ করার জন্যে তারা ষড়যন্ত্র করে এবং তখনই মানুষের চিন্তা চেতনাকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

উপরোক্ত এ দুই ধরনের মানুষের মধ্যে যে সংঘাত তা কখনও শেষ হবার নয়, আপসও কোনো অবস্থাতে হতে পারে না, ফলে কিছুতেই কোনো স্থায়ী শান্তি এদের মাঝে স্থাপিত হতে পারে না। তাওহীদী জনতা ও আত্মবিস্মৃত অথবা বিদ্রোহী অহংকারী এবং শেরেককারী জনতা পরস্পর বিরোধী। এরা কখনো এক হতে পারে না, এক হওয়া সম্ভব নয়। কারণ জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা শক্তি ক্ষমতা ও জীবন মৃত্যুর মালিক মনে করে একাধিক ব্যক্তিকে অথবা বিভিন্নজনকে 'রব' স্বীকার করে, এ কারণেই তারা বিভিন্নজনের আইন মানা দরকার মনে করে, আর এখান থেকেই বান্দাদের গোলামী করার কাজ শুরু হয়। অপরদিকে তাওহীদবাদী বা একত্ববাদী এক আল্লাহকেই জীবন মৃত্যুর মালিক জানে ও মানে এবং একমাত্র তাঁকেই পালনকর্তা ও আইনদাতা মেনে নিয়ে তাঁর হুকুমমত জীবন যাপন করে– এ কারণেই তাদের মধ্যে দেখা দেয় এক অমীমাংসিতব্য পার্থক্য। রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগনে এই পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠলো এবং ইসলামের দাওয়াতী কাজ যখন অগ্রগতি লাভ করলো, তখন আরব বেদুইনরা জাহেলিয়াতের অবসান হয়ে যাবে বলে আতংকিত হয়ে ওঠলো। অপরদিকে ইসলামের সম্মোহনী দাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে জাহেলী সমাজের লোকজন ক্রমান্বয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকল এবং জাহেলী ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকলো, তাদের নেতৃত্বে জাহেলী ব্যবস্থার সহযোগীদেরও সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগলো। ইসলামের দাওয়াত যখন যেখানেই সঠিকভাবে দেয়া হয় সেখানেই পরিবেশ এভাবে পাল্টে যায়।

জাহেলী সমাজ ও ইসলামী সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। এদের মধ্যে কোনো অবস্থাতেই সমঝোতা বা সন্ধি হতে পারে না। যেহেতু দুই পক্ষ দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং মূলনীতি বিবেচনায় তাদের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিরোধী। জাহেলী সমাজ একাধিক মালিক ও পালনকর্তায় বিশ্বাসী, অপরদিকে ইসলাম একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, ফলে সেখানে কেউ কোনো বান্দার গোলামী করবে এটা সম্ভব নয়।

ইসলামী সমাজ যেখানেই কায়েম হয়েছে সেখানেই প্রতিদিনই জাহেলী সমাজের দেহ থেকে কেটে কেটে ইসলামের দিকে মানুষ দলে দলে চলে এসেছে। প্রথম প্রথম যখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন ছিলো, তখনও এভাবে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর, ইসলামী সমাজের কাছে জাহেলিয়াতের নেতৃত্ব সমর্পণের দাবী অনিবার্য হয়ে ওঠেছে এবং ইসলামী সমাজ সকল মানুষকেই বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীতে আবদ্ধ করতে চেয়েছে। এইভাবে যে সময়ে সাধারণভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ আল্লাহর গোলামী এখতিয়ার করে নিলো, তখনই সঠিকভাবে ইসলামের দাওয়াতী কাজ এগিয়ে চললো। অবশ্য শুরু থেকেই জাহেলী সমাজের পক্ষে ইসলামী সম্মোহনী দাওয়াতের মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। আর এ অবস্থা থেকেই আমরা বুঝতে পারি কেন সকল যামানায় জাহেলিয়াত সম্মানিত রসূলদের বিরোধিতা করেছে।.......... আসলে প্রত্যেক যামানায় নবীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রকৃত অর্থ ছিলো অন্যায়কারী, হঠকারী, যুক্তিবিরোধী এবং কুক্ষিগত স্বার্থবাজদের পক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এক ব্যর্থ প্রয়াস। আর অন্যায়ভাবে ক্ষমতা আত্মসাৎকারীদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার পেছনে ছিলো বান্দাদের ওপর তাদের আধিপত্য ও প্রভুত্ব টিকিয়ে রেখে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখার এক চূড়ান্ত অপচেষ্টা।

ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু হয়ে গেলে জাহেলিয়াতের ধারক বাহকরা প্রলাপ গুনতে শুরু করে দিলো এবং প্রতি মুহূর্তে তাদের আশংকা হতে লাগলো, তাদের কোনো জারিজুরি এবার আর টিকবে না, এজন্যে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মরণপণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো, যেহেতু এটাকে তারা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বলেই বুঝেছিলো। তারা বুঝেছিলো, ইসলাম তাদের পরিপূর্ণ উৎখাত চায়। তারা কোনো শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাযি হবে না, কোনো সন্ধি বা আপস করবে না, কোনো সহঅবস্থানেও তারা রাযি হবে না। এ জন্যে জাহেলিয়াতও এ সংঘাত চিন্তায় আসলে কোনো ধোকা খায়নি, তারা ঠিকই বুঝেছিলো। ইসলাম তাদের সম্পূর্ণভাবে মূলোৎপাটিত করে ছাড়বে, এজন্যে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে ভুল করেনি। রসূল ও মোমেনরা তাদের সাথে সংঘর্ষের অর্থ বুঝতে ভুল করেননি। তাই অবস্থার চিত্র ফুটে ওঠছে নীচের আয়াতে।

'কাফেররা তাদের রসূলদের বললো, অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের এলাকা থেকে আমরা বের করেই ছাড়বো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।'

ওপরের আয়াতটির দিকে খেয়াল করে দেখুন। ওই কাফেররা রসূলদের সাথে এবং মোমেনদের সাথে কোনো আপস করার প্রস্তাব দিচ্ছে না বা নেতৃত্বের ব্যাপারেও কোনো প্রশ্ন তুলছে না। একত্রে বাস করারও কোনো প্রস্তাব দিচ্ছে না– তাদের প্রস্তাব একটাই আর তা হচ্ছে, রসূলরা যেন ওদের ধর্মে ফিরে যায় এবং ওদের সমাজে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এতে রাযি না হলে তাদের প্রতি চূড়ান্ত কথা যে, তাদের এলাকা থেকে বের করে দেয়া হবে এবং আর কখনো ওই এলাকায় ফিরে আসতে দেয়া হবে না।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সাংঘর্ষিক রীতিনীতি

রসূলরাও তাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া অথবা, নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে তাদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া বা নিজেদের পরিচয় ভুলে যাওয়া কখনোই কবুল করেননি। তাঁরা তো ভালো করেই জানতেন, তাঁদের পরিচয় এবং জাহেলিয়াতের অনুসারীদের পরিচয় কখনোই এক নয়, জাহেলিয়াতের রীতি নীতি এবং তাঁদের রীতি নীতি সম্পূর্ণ আলাদা। অথবা ইসলামের সঠিক তাৎপর্য যারা বুঝিনি, বা ইসলামী সমাজ কোন নীতির ভিত্তিতে গড়ে

ওঠেছে সেটা যারা জানে না, তারা যেমন করে বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, ওদের সাথে মিশে গিয়েও তো আমরা ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবো এবং তাদের মধ্যে থেকেই আমরা আমাদের আকীদা-বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রচারের খেদমত আঞ্জাম দেবো' এটাও তারা বলেননি!!!

এটা স্পষ্ট হতে হবে, জাহেলী সমাজের মধ্যে মুসলমানদের অবশ্যই তাদের আকীদার কারণেই চেনা যাবে এবং ওদের থেকে পার্থক্য করা যাবে বটে। কোনো প্রকারের জাহেলী সমাজের আত্মপরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকাই তাদের কাজ নয়। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা এক ইসলামী সমাজ হিসাবে বেঁচে থাকবে, গড়ে তুলবে ইসলামী সমাজের নিয়ম পদ্ধতি এবং নেতৃত্ব কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে ইসলামের আইন কানুন জীবনের সর্বক্ষেত্রে চালু করবে।

এভাবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, আইন কানুনের মর্যাদা ও সুফল ভোগ করে মানুষ শান্তি পাবে এবং অপরকে শান্তি দেবে, যেন এসব দেখে জাহেলী সমাজের মানুষেরা প্রভাবিত হয়, কায়েমী স্বার্থবাজরা যদি প্রভাব গ্রহণ নাও করে– সাধারণ অবহেলিত, মযলুম ও বিবেকবান ব্যক্তিরা যেন ইসলামের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে, আর এভাবেই মানুষ মানুষের গোলামী থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে নিজেদের সোপর্দ করতে পারে এবং নিজেদের মেকী প্রভু প্রতিপালকের নাগপাশ ও শাসন কর্তৃত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে এবং তাদের ভুয়া আধিপত্যের দাবী থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে। মুসলমানদের আর এক দায়িত্ব হচ্ছে, ওইসব মুসলমানদেরকেও জাহেলী সমাজ থেকে বের করে নেয়া, যারা ওই সমাজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় নিজেদের রীতি নীতি, আইন কানুন, রুচি সভ্যতা, সাহিত্য কৃষ্টি, আচার ব্যবহার সব কিছু হারাতে বসেছে। আজ তারা ইসলামের খাদেম হওয়ার পরিবর্তে জাহেলিয়াতের খাদেম হতে বাধ্য হয়ে গেছে এবং যারা বহু আত্মবিস্মৃত মানুষকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারতো, তারা আজ উপরোক্ত অবস্থাকে সহনীয় মনে করে ধোঁকার মধ্যে রয়েছে।(১)

এরপর বাকি থেকে যায় তাকদীরের বিষয়টি, যা ইসলামের দাওয়াতদানকারীদের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বন্ধুদের সাহায্য ও ক্ষমতা দানের যে ওয়াদা করেছেন তা তিনি পূরণ অবশ্যই করবেন, মোমেনদের তাদের জাতি (যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে রয়েছে) থেকে পৃথক করে দেবেন। তবে ততোদিন এ অবস্থা আসবে না এবং তাদের এ মর্যাদা ততোক্ষণ পর্যন্ত দেয়া হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না তিনি দাওয়াত দানকারীদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করে নেন এবং না দেখে নেন যে, তারা আল্লাহর পথে এককেন্দ্রিক হয়ে গেছে, ঈমানের এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই তখন তিনি তাদের নিজ (জাহেল) জাতি থেকে পৃথক করে দেবেন। এ পৃথকীকরণের কাজটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতোক্ষণ না তারা জাহেলী সমাজ থেকে বের হয়ে আসবে এবং যতোদিন তারা জাহেলী সমাজে বাস করে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকবে, আনন্দের মধ্যে ও ভোগবিলাসের মধ্যে থাকবে, এবং ওই সমাজের গঠন ও সৌন্দর্য বর্ধন করতে থাকবে, তারা যতোদিন তাদের নিজ জাতির মধ্যে থেকে এভাবে ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকবে, ততোদিন আল্লাহর সাহায্য আসতে বিলম্ব হবে, ততোদিন তাদের হাতে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতাও দেবেন না। এভাবে জাহেল সমাজে তাবেদার হয়ে বসবাস করা

(১) আরও বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন মায়ালিমু ফিত্তারীক পুস্তকের 'নাশআতুল মুজতামেয়িল মুসলেমি ওয়া খাসায়েসুহু'-এর অধ্যায়ে।

তাদের শোভা পায় না, যারা নিজেদের মনে প্রাণে আল্লাহর বান্দা মনে করে এবং আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত অপরের কাছে তুলে ধরতে চায়। তাদের মনে রাখতে হবে যে, তারা সবাই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতদানকারী। ....

পরিশেষে......... ঈমানের মিছিলে কোরআনুল কারীম প্রাণ মাতানো যে সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে এখন আমরা সেই সুন্দরের সমারোহের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি। আল কোরআন তার এ অভূতপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে যুগ যুগ ধরে জাহেলিয়াতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এ হচ্ছে সত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। এ সত্য সুপ্রশস্ত বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা গভীর ও তুলনাহীন সৌন্দর্যের প্রতীক, এ সৌন্দর্য শান্ত, স্নিগ্ধ, অম্লান ও অতুলনীয়।

'তাদের রসূলরা তাদের বললো, হায়, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ! আহা, তিনি তো তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে তোমাদের ডাকছেন। আর করুণাময় সে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সময় দিয়ে চলেছেন সুনির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত, অথচ তাঁর সম্পর্কেই তোমরা সন্দেহ করছ?

দেখুন, আল কোরআন সীমা লংঘনকারী ও হতভাগা মানব শ্রেণীকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে রসূল (স.)-এর যবানীতে কী মহব্বতের সাথে, কী আবেগভরা কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে। (আয়াত-১০)

...... তাদের রসূলরা তাদের (ডেকে) বলছে; দেখো, আমরা অবশ্যই তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু নই ....

আর ভরসাকারীগণকে আল্লাহর ওপরেই ভরসা করা উচিত।' (আয়াত-১১-১২)

এ চমৎকার সৌন্দর্য ফুটে ওঠেছে তখন, যখন আল্লাহর একত্বের বিরোধী জাহেলী শক্তির মোকাবেলায় উপর্যুপরি রসূল এসে যে বাকযুদ্ধ করেছেন, যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত দৃশ্যাবলীর দিকে অংগুলি সংকেতের মাধ্যমে যে আবেদন রেখেছেন, তার মধ্যে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর প্রতীকগুলো তুলে ধরে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করায় কোনো যামানার কোনো অবাধ্য জনপদ তা অগ্রাহ্য করার কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি, তবুও ওই হঠকারীর দল শিক্ষা নেয়নি।

এরপর চির সুন্দর মহান আল্লাহর সৌন্দর্য ফুটে ওঠেছে আল কোরআনের মধুর বাণীতে, ফুটে ওঠেছে আল্লাহর রসূলদের উপস্থাপিত সত্যের মধ্যে এবং ফুটে ওঠেছে সৃষ্টির বুকে লুকিয়ে থাকা পরম সত্যের মধ্যে!

'রসূলরা বললো; হায়, আল্লাহর ব্যাপারেই কি সন্দেহ? যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা?'

'কী হলো আমাদের যে, আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করছি না। অথচ তিনি আমাদের জীবনে সফল হওয়ার বহু পথ দেখিয়েছেন।'

তুমি কি দেখছো না যে আল্লাহ তায়ালা সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে। তিনি চাইলে অচিরেই তোমাদের তুলে নিয়ে যেতে পারেন এবং নতুন এক সৃষ্টিকে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারেন, এটা আল্লাহর কাছে কোনো কঠিন কাজ নয়।'

এভাবে এ দাওয়াতের মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে এবং সৃষ্টির মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে, তা ভাস্বর হয়ে ওঠছে এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠছে সত্য বলতে যেখানে যা কিছু আছে। এ সব কিছু মিলে একথাই জানাচ্ছে যে, সকল কিছু মিলে একই সত্য সর্বত্র বিরাজ করছে এবং সকল কিছুর

সম্পর্ক অবিচ্ছেদ? সম্পর্ক হচ্ছে এক আল্লাহর সাথে। এ সত্য চিরস্থায়ী ও মযবুত, যার শিকড় বহু বহু গভীরে! যেমন একটি পবিত্র গাছ, যার মূল দৃঢ়ভাবে স্থাপিত গভীর মাটির নীচে এবং তার শাখাগুলো বিস্তারিত সুউচ্চ আকাশে ... এ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে সবই বাতিল এবং ধ্বংসশীল। যেমন মন্দ গাছ, যার শিকড় ওপরে ভেসে বেড়ায়, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

এভাবে রসূলদের চেতনায়, তাদের প্রতিপালক আল্লাহর যে সত্যতা তারই সুন্দর রূপ বিধৃত হয়েছে আল কোরআনে। এ সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সত্যতার মধ্যে, যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ওইসব নেক বান্দাদের অন্তরের মধ্যে।

'আর আমাদের কী হলো যে, আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করছি না, অথচ তিনি তো আমাদের বহু পথ দেখিয়েছেন, আর তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিয়েছো তার ওপর আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবো। আর তাওয়াক্কুল যারা করে তাদের আল্লাহর ওপরেই তাওয়াক্কুল করা দরকার।'

আর এসবগুলোই হচ্ছে ওই চমৎকার সৌন্দর্যের দৃশ্য, যার ব্যাখ্যা দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কিছু ইংগিত দেয়া যায় মাত্র, যেমন দূর আকাশের তারকারাজির প্রতি ইংগিতই করা যায়, এ ইংগিত দ্বারা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না; বরং শুধুমাত্র এতোটুকু বলা যায়, চোখ তার কিছু আলোক ছটা দেখতে পেয়েছে। ....

'তুমি কি দেখোনি ওইসব ব্যক্তির দিকে যারা আল্লাহর নেয়ামতকে বদলে দিয়েছে কুফরী দ্বারা (অর্থাৎ নেয়ামতের শোকরগোযারী না করে কুফরী করেছে)? আর তাদের জাতির জন্যে ধ্বংসাত্মক বাসস্থানকে হালাল করে নিয়েছে...............

.... এটা মানবমন্ডলীর জন্যে এক স্থায়ী পয়গাম। আর এ জরুরী বার্তা পাঠিয়ে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন তাদের (সময় থাকতেই) সতর্ক করে দিতে এবং আরও চেয়েছেন যেন ওরা জেনে যায় যে, 'জাননেওয়ালা কিন্তু একমাত্র তিনিই, তিনিই জীবন মৃত্যুর মালিক সর্বশক্তিমান (ইলাহ), তিনি আরও চেয়েছেন, বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিরা যেন (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে।' (আয়াত ২৮-৫২)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاۤئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

রুকু ৫

২৮. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করোনি যারা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত অস্বীকার করার মাধ্যমে (তাকে) বদলে দিয়েছে, পরিণামে তারা নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের (এক চরম) স্তরে নামিয়ে এনেছে। ২৯. জাহান্নামে (-র অতলে, যেখানে) তারা সবাই প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট (সেই) বাসস্থান! ৩০. এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে তাঁর কিছু সমকক্ষ উদ্ভাবন করে নিয়েছে, যাতে করে তারা (সাধারণ মানুষদের) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে; (হে নবী, এদের) তুমি বলো, (সামান্য কিছুদিনের জন্যে) তোমরা ভোগ করে নাও, অতপর (অচিরেই জাহান্নামের) আগুনের দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। ৩১. (হে নবী,) আমার যে বান্দা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বলো, তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে যেন তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, (কেয়ামতের) সে দিনটি আসার আগে, যেদিন (মুক্তির জন্যে) কোনো রকম (সম্পদের) বেচাকেনা চলবে না– না (এ জন্যে কারো) কোনো রকমের বন্ধুত্ব (কাজে লাগবে)। ৩২. (তিনিই) মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তা দিয়ে আবার যমীন থেকে তোমাদের জীবিকার জন্যে নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করেছেন, তিনি যাবতীয় জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যেন তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী তা সমুদ্রে বিচরণ করে বেড়ায় এবং (এ কাজের জন্যে) তিনি নদীনালাকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, ৩৩. তিনি চন্দ্র সূর্যকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এর উভয়টা (একই নিয়মের অধীনে) চলে আসছে, আবার তোমাদের (সুবিধার) জন্যে রাতদিনকেও তিনি তোমাদের অধীন করেছেন।

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۭ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۭ اِنَّ
الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا
وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ
النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَآ
اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا
لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ
الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ وَمَا
يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾

৩৪. তোমরা তাঁর কাছ থেকে (প্রয়োজনের) যতো কিছুই চেয়েছো তার সবই তিনি (তোমাদের সামনে) এনে হাযির করেছেন এবং তোমরা যদি (সত্য সত্যই) তাঁর সব নেয়ামত গণনা করতে চাও, তাহলে কখনোই তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না; মানুষ (আসলেই) অতিমাত্রায় সীমালঘংনকারী ও (নেয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞ বটে।

রুকু ৬

৩৫. (স্মরণ করো), যখন ইবরাহীম (আল্লাহর কাছে) দোয়া করলো, হে আমার মালিক, এ (মক্কা) শহরকে (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহরে পরিণত করো এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিদের মূর্তিপূজা করা থেকে দূরে রেখো। ৩৬. হে আমার মালিক, নিসন্দেহে এ (মূর্তি)-গুলো বহু মানুষকেই গোমরাহ করেছে, অতপর যে আমার আনুগত্য করবে সে আমার দলভুক্ত হবে, আর যে ব্যক্তি আমার না-ফরমানী করবে (তার দায়িত্ব তোমার ওপর নয়), নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৩৭. হে আমাদের মালিক, আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে একটি অনুর্বর উপত্যকায় এনে আবাদ করলাম, যাতে করে– হে আমাদের মালিক, এরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তুমি (তোমার দয়ায়) এমন ব্যবস্থা করো যেন মানুষদের অন্তর এদের দিকে অনুরাগী হয়, তুমি ফলমূল দিয়ে তাদের রেযেকের ব্যবস্থা করো, যাতে ওরা তোমার (নেয়ামতের) শোকর আদায় করতে পারে। ৩৮. হে আমাদের মালিক, আমরা যা কিছু গোপন করি এবং যা কিছু প্রকাশ করি, নিশ্চয়ই তুমি তা সব জানো; আসমানসমূহে কিংবা যমীনের (যেখানে যা কিছু ঘটে এর) কোনোটাই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। ৩৯. সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাকে আমার (এ) বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (তুল্য দুটো নেক সন্তান) দান করেছেন; অবশ্যই আমার মালিক (তাঁর বান্দাদের) দোয়া শোনেন।

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا

اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ

اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ

الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْئِدَتُهُمْ

هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ اَوَلَمْ

تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَّسَكَنْتُمْ فِىْ مَسٰكِنِ

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ

৪০. হে আমার মালিক, তুমি আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আমার সন্তানদের মাঝ থেকেও (নামাযী বান্দা বানাও), হে আমাদের মালিক, আমার দোয়া তুমি কবুল করো। ৪১. হে আমাদের মালিক, যেদিন (চূড়ান্ত) হিসাব কিতাব হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সকল ঈমানদার মানুষদের (তোমার অনুগ্রহ দ্বারা) ক্ষমা করে দিয়ো।

রুকু ৭

৪২. (হে নবী,) তুমি কখনো মনে করো না, এ যালেমরা যা কিছু করে যাচ্ছে তা থেকে আল্লাহ তায়ালা গাফেল রয়েছেন; (আসলে) তিনি তাদের সেদিন আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখছেন যেদিন (তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ৪৩. তারা আকাশের দিকে চেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় (দৌড়াতে) থাকবে, তাদের নিজেদের প্রতিই নিজেদের কোনো দৃষ্টি থাকবে না, (ভয়ে) তাদের অন্তর বিকল হয়ে যাবে। ৪৪. (হে নবী,) তুমি মানুষদের একটি (ভয়াবহ) দিনের আযাব (আসা) থেকে সাবধান করে দাও (এমন দিন সত্যিই যখন এসে হাযির হবে), তখন এ যালেম লোকেরা বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের তুমি কিছুটা সময়ের জন্যে অবকাশ দাও; এবার আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং আমরা (তোমার) রসূলদের অনুসরণ করবো (জবাবে বলা হবে); তোমরা কি (সেসব লোক)– যারা ইতিপূর্বে শপথ করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে, তোমাদের (এ জীবনের) কোনোই ক্ষয় নেই! ৪৫. অথচ তোমরা তাদের (পরিত্যক্ত) বাসভূমিতেই বাস করতে, যারা (তোমাদের আগে) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করেছিলো এবং (এ কারণে) আমি তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করেছিলাম তাও তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিলো, তোমাদের জন্যে আমি তাদের

الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছিলাম, ৪৬. (সোজা পথে) এরা (বিভিন্ন) চক্রান্তের পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের সেসব চক্রান্ত লিপিবদ্ধ আছে; যদিও তাদের সে চক্রান্ত (দেখে মনে হচ্ছিলো তা বুঝি) পাহাড় টলিয়ে দিতে পারবে! ৪৭. (হে নবী,) তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর নবীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগকারী মনে করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী; ৪৮. (প্রতিশোধ হবে সেদিন) যেদিন এ পৃথিবী ভিন্ন (আরেক) পৃথিবী দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, (একইভাবে) আসমানসমূহও (ভিন্ন আসমানসমূহ দ্বারা বদলে যাবে) এবং মানুষরা সব (হিসাবের জন্যে) এক মহাক্ষমতাধর মালিকের সামনে গিয়ে হাযির হবে। ৪৯. সেদিন তুমি অপরাধীদের সবাইকে শৃংখলিত অবস্থায় দেখতে পাবে, ৫০. ওদের পোশাক হবে আলকাতরার (মতো বীভৎস), তাদের মুখমন্ডল আগুন আচ্ছাদিত করে রাখবে। ৫১. (এটা এ কারণে,) আল্লাহ তায়ালা যেন প্রতিটি অপরাধী ব্যক্তিকেই তার কর্মের প্রতিফল দিতে পারেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ৫২. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে এক (মহা) পয়গাম, যাতে করে এ (গ্রন্থ) দিয়ে (পরকালীন আযাবের ব্যাপারে) তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা যেন (এর মাধ্যমে) এও জানতে পারে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, (সর্বোপরি) বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

তাফসীর
আয়াত ২৮-৫২

এ দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় পাশাপাশি এসেছে। দেখা যায়, এখানে প্রথম অধ্যায়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর রেসালাতের এর কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর দায়িত্ব ছিলো মানুষকে তাদের রবের হুকুমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসা এবং আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে যে আযাবের দিনগুলোর উল্লেখ আছে সেই দিনগুলো সম্পর্কে তাদের উপদেশ দান করা। এরপর তাদেরকে বলা যেন তারা আল্লাহ তায়ালা নেয়ামতের শোকরগোযারী করে। এরপর মূসা (আ.)-এর কথাও জানানো হয়েছে যে, তাঁকেও তাঁর দায়িত্ব স্মরণ করাতে গিয়ে বলা হয়েছিলো যেন তিনিও তাঁর জাতিকে আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করান।

তাঁকে বলা হয়েছিলো যেন তিনি তাঁর জাতিকে সঠিকভাবে উপদেশ দেন এবং আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে তাদের একমাত্র তাঁরই ফরমাঁবর্দারী করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। আর আল্লাহর ঘোষণা তাদের জানিয়ে দেন, 'যদি তোমরা শোকরগোযারী করো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেবো। আর যদি আমার নেয়ামত লাভ করার পর না-শোকরী করো এবং এর হক আদায় করতে গিয়ে তাঁর হুকুমমতো জীবন যাপন না করো, তাহলে জেনে রেখো, অবশ্যই আমার আযাব বড়ই কঠিন।'...... এরপর তাদের সামনে নবী রসূলদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় নিয়োজিত লোকদের পরিণতি পেশ করে সতর্ক করা হয়েছে। এসব কাহিনী বলা শুরু করে প্রসংগ পরিবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য এর পরবর্তীতে বিভিন্ন উপলক্ষে এবং বিভিন্ন আংগিকে এসব ঘটনা তাদের জানানো হয়েছে, কিন্তু কাফেররা তাঁর কথায় কান না দিয়ে শয়তানের কথাটাই শুনেছে মন প্রাণ দিয়ে। আর শয়তানও ভালো শাগরেদের দল পেয়ে আচ্ছামতো তাদের ওয়ায শুনিয়েছে। যদিও সে ওয়ায না দুনিয়ায় তাদের কোনো কাজে লেগেছে, না আখেরাতের কঠিন দিনে তাদের সেই ভীষণ আযাব থেকে রেহাই দেবে।

আল্লাহর নেয়ামতের সাথে কুফরীর পরিণতি

এখন আলোচনার প্রসংগ মোড় নিচ্ছে মোহাম্মদ (স.)-এর যামানার দিকে। ইংগিত করা হচ্ছে, তাঁর যামানার হঠকারী, মিথ্যার কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী ও সত্য অস্বীকারকারীদের অবস্থার দিকে। তাদের সামনেও সেসব জনপদের দীর্ঘ বিবরণ পেশ করা হয়েছে যাদের আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসংখ্য নেয়ামত দান করেছিলেন, ওরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেয়ামতের ভান্ডার থেকে অসংখ্য নেয়ামত দিয়েছেন। ওইসব নেয়ামতের মধ্যে একটি বড় নেয়ামত হলো, তিনি তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের এক ব্যক্তিকে রসূল বানিয়ে পাঠালেন, যেন তাদের অন্ধকার থেকে তিনি আলোর জগতে নিয়ে আসেন এবং আহ্বান জানান আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হতে, যাতে করে মহান রব্বুল আলামীন তাদের অতীতের সকল গুনাহখাতা মাফ করে দেন। কিন্তু হায়, ওরা এসব নেয়ামতের না-শোকরী করলো এবং তাদের নবীকে উপেক্ষা করে তাঁর কথাগুলো রদ করে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হলো। আর ঈমানদার হওয়ার পরিবর্তে তারা কুফরীকে পছন্দ করে নিল! শুধু তাই নয়, উল্টা রসূলকে প্রভাবিত করে ঈমানের দাওয়াতদান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে লাগলো।

আর এ পর্যায়ে এসে ওইসব ব্যক্তির কর্মধারার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করে আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করা হচ্ছে, যারা আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে কুফরী দ্বারা বদলে দিচ্ছিলো এবং তাদের জাতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো চরম ধংসের দিকে, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের জাতিকে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো। রসূলরা ও কাফেরদের ভূমিকার ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে এসব ঘটনা জানা যায়।

এরপর দৃষ্টি ফেরানো হচ্ছে সারাবিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দিকে, যেগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর অযাচিত নেয়ামত হিসাবে তাঁর বান্দার খেদমতে লাগিয়ে

রেখেছেন এবং আল্লাহর নেয়ামতের শোকর কিভাবে আদায় করতে হয় তা বুঝাতে গিয়ে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর উদাহরণ তুলে ধরেছেন। অবশ্য এর আগে অন্যান্য যেসব উপায়ে আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগোযারের করা যায় তা জানাতে গিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব কাজ অবশ্য সময় থাকতেই করতে হবে, সেই কঠিন দিন আসার আগেই করতে হবে যখন কারো কোনো সম্পদ কোনো কাজে আসবে না। যেদিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না, থাকবে না কারো সাথে কোনো বন্ধুত্ব।

বেখেয়ালীতে কেউ কুফরী করেছে, অথবা অজান্তে সত্যকে অবহেলা করেছে– এ অজুহাতে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না, হাঁ দুনিয়াতে তাদেরকে তাদের অন্যায় ও দুর্ব্যবহারের কারণে সংগে সংগে শাস্তি দেয়া হবে– তাও নয়; বরং সেই দিন পর্যন্ত তাদের শোধরানোর সময় দেয়া হবে যে দিন মৃত্যু যন্ত্রণায় তাদের চোখ পাথরের মতো ওপরের দিকে ওঠে স্থির হয়ে যাবে .... অপরদিকে কাফেররা যতো ষড়যন্ত্রই করুক না কেন, রসূলদের সাথে আল্লাহ তায়ালা (তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার) যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূরণ করবেন, যদিও ওই কঠিন পাহাড়কে স্থানচ্যুত করার মতোই কঠিন হয়ে যায় তাদের ষড়যন্ত্র। এভাবেই দেখা যাচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের সাথে দ্বিতীয় অধ্যায়ের এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি দেখোনি ওইসব ব্যক্তিকে যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা বদলে দিয়েছে (অর্থাৎ নেয়ামতের হক আদায় করার পরিবর্তে কুফরী করেছে) এবং তাদের জাতির জন্যে ধ্বংসের ঘরকে হালাল করে নিয়েছে (অর্থাৎ এমন সব জঘন্য ব্যবহার করেছে যার কারণে তাদের জাতির ধ্বংসাত্মক জাহান্নাম পাওয়াটা অনিবার্য হয়ে গেছে), আর সে ধ্বংসাত্মক বাসস্থান হবে জাহান্নামের মধ্যে, আর অতি নিকৃষ্ট হবে সে বাসস্থান!'

'অনেককে তারা আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে, যাতে করে তাঁর পথ থেকে তারা (মানুষকে) ভুল পথে চালিত করতে পারে। বলে দাও, মজা করে নাও (যতো খুশী দুনিয়ার বুকে), কিন্তু তোমাদের ফিরে যাওয়ার জায়গা হচ্ছে জাহান্নাম।'

তুমি কি ওই বিস্ময়কর অবস্থার দিকে একবার তাকিয়ে দেখোনি, দেখোনি ওইসব লোকের দিকে যাদের আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত দেয়া হয়েছিলো? তাদের মধ্যে রসূলকে পাঠানো, তাদের ঈমানের দাওয়াতদান, আল্লাহর ক্ষমার দিকে তাদের এগিয়ে নেয়া এবং সর্বশেষ জান্নাতকে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল বানিয়ে দেয়া, এগুলো কি তাদের জন্যে আল্লাহর অপার নেয়ামত নয়? কিন্তু দেখো, এসব নেয়ামতের সাথে তারা কি ব্যবহার করছে। তারা এসব পরিত্যাগ করে এসবের বদলে কুফরীকে গ্রহণ করছে, এরা একেবারে সাধারণ লোক নয়, এরা আমার জাতির নেতৃবৃন্দ ও মুরুব্বী শ্রেণীর লোক। অন্যান্য সকল জাতির অবস্থাও একই রকম। তারা ওইসব নেয়ামতের বদলে কি গ্রহণ করেছে, তারা জান্নাতের বদলে জাহান্নামকেই নিজেদের শেষ আবাসস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছে এবং তাদের জাতিকেও তারা সেই দিকে পরিচালিত করেছে। অতীতের জাতিগুলোর মধ্যেও নেতৃবৃন্দের একই ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু অদৃষ্টের কী পরিহাস! এরা নিকৃষ্ট জায়গাকেই নিজেদের বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছে।

তুমি কি দেখোনি এহেন জাতির আশ্চর্যজনক ব্যবহার, এরা অতীত জাতিসমূহ এবং তাদের হৃদয়বিদারক পরিণতি দেখেছে, তাদের অবস্থা জানতে পেরেছে, তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা সত্ত্বেও তার থেকে এরা শিক্ষা নেয়াটা দরকার মনে করেনি। তাদের সামনে আল কোরআন অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস এমনভাবে তুলে ধরেছে যাতে অতীতের ঘটনাবলী তাদের সামনে বাস্তবে

মূর্ত হয়ে ফুটে ওঠেছে এবং ওইসব ঘটনার বিবরণ এ সূরার প্রথম অধ্যায়ে এসে গেছে। এদের পরিণতির বর্ণনাও এমন ভাষা ও ভংগিতে এসেছে যে, তাদের কাছে মনে হয়েছে যেন ওই করুণ অবস্থা যেন তারা বাস্তব চোখে দেখছে। তাদের বুঝানোর জন্যে এর থেকে অধিক প্রভাবপূর্ণ পন্থা আর কি অবলম্বন করা যেতে পারতো!

কিন্তু এসব নেয়ামতকে তারা কুফরী দ্বারা বদলে দিলো। তাদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সারাবিশ্বের একমাত্র মালিক, সৃষ্টিকর্তা ও আইনদাতা আল্লাহকে রব বলে মেনে নিতে এবং তাঁর হুকুমমতোই জীবন যাপন করতে– এই তাওহিদী দাওয়াত তারা প্রত্যাখ্যান করলো,

'আর তারা আল্লাহর সাথে অনেক শরীক (ক্ষমতায় অংশীদার) বানালো যেন মানুষকে ভুল পথে এগিয়ে দেয়া যায়।'

তারা আল্লাহর সাহায্যকারী হিসাবে তাঁর কিছু সাথী বানিয়ে ফেললো, যাদের আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে তারা পূজা করা শুরু করে দিলো এবং এমনভাবে তাদের কাছে আবেদন নিবেদন শুরু করে দিলো যেমনভাবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই করা যায়। তাদের ক্ষমতার কাছে তারা তেমনি করে মাথা নত করে দিলো যেমন করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে মাথা নত করা হয় এবং জীবন মৃত্যুর একমাত্র মালিকের যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, ওদের জন্যেও তারা ওইসব বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করতে শুরু করলো। মানুষকে আল্লাহর দেয়া একমাত্র সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে অলীক কিছু ব্যক্তি বা বস্তুকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেললো। অথচ সঠিক পথ তো একটাই, বিভিন্ন পথ সঠিক হতে পারে না।

স্বার্থবাদীতাই জাহেলী নেতৃত্বের প্রধান চরিত্র

কোরআনের আয়াত ইংগিতে একথা জানাচ্ছে যে, জাতির নেতৃশ্রেণীর লোকেরা এইসব দেব দেবী ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ বা তাঁর ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার কথা বলে মানুষের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলো এবং তাদের আল্লাহর চিরসত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করেছিলো। সকল যামানাতেই আল্লাহদ্রোহী ও অহংকারী এ যালেমরা তাওহীদের আহ্বানে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে বলে বুঝেছিলো এবং তাদের নিজেদের জন্যে ধ্বংস সংকেত অনুভব করেছিলো।

এইসব তাগুতী শক্তি নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে শুধু প্রথম জাহেলিয়াতের সময়েই এভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে তা নয়; বরং সকল জাহেলিয়াতের আমলেই নিজেদের স্বার্থের খাতিরে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এবং আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব মানা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছে। অতপর তারা তাদের নেতৃত্ব সোপর্দ করেছে তাদের মুরুব্বীদের হাতে এবং তাদের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব ওইসব কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের কাছে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছে, কখনো তারা ঢলে পড়েছে ভাবাবেগের কাছে এবং কখনো চালিত হয়েছে কুপ্রবৃত্তির তাড়নে, আর তাদের জীবন বিধান তারা আল্লাহর অবধারিত ওহী থেকে নেয়নি; বরং নিয়েছে তাদের স্বাধীন প্রবৃত্তির কাছ থেকে, ঠিক এ ক্রান্তিকালে যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহকে এক অদ্বিতীয় মনিব মালিক, পালনকর্তা, আইনদাতা ও শাসনকর্তা বলে দাওয়াত দান করা হলে, তখন ওসব কায়েমী স্বার্থবাদী সমাজপতিদের কাছে এ দাওয়াত অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে হলো। তখন এ দাওয়াত গ্রহণ করা তো দূরের কথা, এর থেকে দূরে থাকার জন্যে এবং অপরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্যে তারা সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করলো। আর এ জন্যে

প্রাচীন জাহেলিয়াতে অনুসরণে বিভিন্ন দেবদেবীকে জীবন মৃত্যুর অন্যতম মালিক স্বীকার করে তাদের তারা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে রেখেছে। আর তাদের অনুসৃত রীতিনীতি থেকেই আজকে তারা মানুষকে আইনদাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে। যারা ওদের এমন এমন হুকুম দিচ্ছে যা আল্লাহ তায়ালাও দেননি, আর নিষেধ করছে এমন কিছু কাজ করতে যা আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে করতে মানা করেননি। এর ফলে আল্লাহর সাথে সরাসরি শরীক করার পরিবর্তে এমন কিছু তারা গড়ে তুলেছে যা তাদের বাস্তবে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে!

অতএব, হে রসূল, 'বলো তোমার জাতিকে, খাও, পান করো, মজা করো, এভাবে, দুনিয়ার এ যিন্দেগীতে কিছু ফায়দা লুটে নাও, আনন্দ ফুর্তি করো ততোদিন পর্যন্ত যতোদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সময় দিয়ে রেখেছেন। অবশেষে তোমাদের তো ফিরে যেতে হবে জাহান্নামের ভয়ানক আগুনের কাছে, আর ওদের ছেড়ে দাও এবং ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাও 'আমার সেই সব বান্দাদের দিকে, যারা ঈমান এনেছে।' তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন এক উপদেশ বাণী গ্রহণ কর যা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের উপকারে আসবে বলে তোমরা বুঝবে এবং যা আল্লাহর নেয়ামত কবুল করার ব্যাপারে তোমাদের উৎসাহিত করবে, যে উপদেশ তোমাদের সত্য থেকে ফিরিয়ে দেবে না এবং ওইসব নেয়ামতের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করার দিকে এগিয়ে দেবে না। ওদের এবাদাত, আনুগত্য এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথে নেক ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগোযারী করা শেখাও।

ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহর কিছু নির্দেশনা

'বলো আমার ঈমানদার বান্দাদের, যেন তারা নামায কায়েম করে এবং খরচ করে আমার ওই সকল নেয়ামত থেকে, যা গোপনে প্রকাশ্যে আমি মহান আল্লাহ তাদের দান করেছি। তারা যেন সকল প্রকার কর্তব্য পালন করে সেদিন ঘনিয়ে আসার আগে যেদিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং থাকবে না কারো সাথে কোনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক।'

অর্থাৎ, আমার ঈমানদার বান্দাদের নামায কায়েমের মাধ্যমে শোকরগোযারী করতে বলো, কারণ নামাযই আল্লাহর শোকরগোযারীর সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আর তার সাথে সাথে আমার দেয়া নেয়ামতসমূহ থেকে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করে। গোপনে এজন্যে যে, এর ফলে দান গ্রহণকারীরা লজ্জিত হবে না এবং তাদের আত্মসম্মানে কোনো আঘাত লাগবে না। অপরদিকে দানকারীদের মনে লোক দেখানো কাজের মনোবৃত্তি গড়ে ওঠবে না এবং এহসান প্রদর্শন করার মানসিকতা জন্ম নেয়ার সুযোগও হবে না। আবার (মাঝে মাঝে) প্রকাশ্যেও দান করবে এ জন্যে যে, এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর হুকুম পালন করছো একথা জানাজানি হবে, এর ফলে অন্যরাও আল্লাহর এই হুকুম পালন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এ উভয় প্রকার দানের মাধ্যমে একাধারে মোমেনদের বিবেককে চাংগা রাখা যাবে এবং সমাজে আল্লাহর আনুগত্য ও দান করার মনোবৃত্তি গড়ে তোলা সহজ হবে। এখানে বুঝা যায়, ঐচ্ছিক দানগুলো গোপনে এবং ফরয দান (যাকাত) প্রকাশ্যে করা দরকার।

তাদের বলো, তারা যেন জমা করে রাখা সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহর বান্দাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সেদিন আসার পূর্বেই খরচ করে, যেদিন বেচাকেনার মাধ্যমে লাভবান হওয়া বা লেনদেনের মাধ্যমে কারো সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার কোনো সুযোগ থাকবে না।

'হাঁ, সেদিন আসার আগে যেদিন থাকবে না কোনো বেচাকেনা বা বন্ধুত্ব স্থাপনের কোনো সুযোগ।'

এ বর্ণনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সৃষ্টি রহস্যের পাতা যেন আমাদের সামনে খুলে গেছে, আর বিশ্ব সৃষ্টির সব কিছু যেন আমাদের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে। সবাই যেন আমাদের আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলছে, তোমরা সময় থাকতেই আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগোযারী করো। সারা বিশ্বের সব কিছু তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত করে মহান আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে দয়া করে চলেছেন, শারীরিক এবাদাত নামায দ্বারা তার শোকরগোযারী করো এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ তাঁর বান্দাদের জন্যে খরচ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের ত্যাগের পরিচয় দাও গোপন ও প্রকাশ্য খরচ দ্বারা। তাকিয়ে দেখো আসমান যমীনের দিকে, সূর্য ও চাঁদের দিকে, রাত ও দিনের দিকে, আকাশ থেকে বর্ষিত পানির দিকে এবং এই পানি দ্বারা রং বেরংয়ের খাদ্য খাবার ও নানা বর্ণের নানা স্বাদ ও গন্ধের ফলমূলের দিকে, চিন্তা করে দেখো, কে এসব নেয়ামত দান করেছে এবং কার জন্যে দান করেছে, কেন বিশ্বব্যাপী এসব সৌন্দর্যের সমারোহ, কার জন্যে এসব কিছুর আয়োজন! এ যে মহাসাগর, যার উত্তাল তরংগ কেটে কেটে চলে অসংখ্য পানির বহর, আর ছোট বড় নদ নদী যা বয়ে চলেছে দিবারাত্র মানুষের জন্যে পণ্যদ্রব্য নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে, এ সব কার জন্যে! ...... আবার তাকিয়ে দেখো এ ভূপৃষ্ঠের পাতাগুলোর দিকে, যার মায়াময় সৌন্দর্য দৃষ্টিসমূহে জাগাচ্ছে নিত্য নতুন স্বপ্ন, কিন্তু জাহেলিয়াতের অন্ধকারের মধ্যে যারা পড়ে রয়েছে তারা এসব কিছুই দেখে না- দেখতে পারে না, সৃষ্টির পাতা থেকে তারা কিছু পড়তে চায় না, তারা কোনো চিন্তাও করে না আর কোনো শোকরগোযারীও করে না। হায়, মানুষ বড়ই যালেম, বড়ই না-শোকর। তারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা বদলে দিচ্ছে এবং আল্লাহর জন্যে একাধিক সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে, অথচ একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রেযেকদাতা এবং তিনিই গোটা সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন।

'আল্লাহ তায়ালা সেই মহান সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে...... অবশ্য বড়ই যালেম বড়ই না-শোকর (অকৃতজ্ঞ) এই মানুষ।' (আয়াত ৩২-৩৪)

শয়তান মানুষের খোলাখুলি দুশমন। সে সদা সর্বদাই বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের ওপর হামলা করে। সে মানুষের জন্যে যেন এক সাক্ষাত চাবুক, সে মানুষকে অপমান করার চেষ্টায় সদা সর্বদা তৎপর থাকে।

মানুষের ওপর হামলা করার জন্যে সে সদা সর্বদা আসমান যমীন জুড়ে তার ভয়ানক থাবা বিস্তার করে রেখেছে এবং মানুষকে আঘাত করার জন্যে সে চাঁদ, সূর্য, রাত দিন, সাগর নদী, বৃষ্টি, ফলমূল সব কিছুকে তার হাতিয়ার বানিয়ে রেখেছে। যালেম ও অকৃতজ্ঞ মানুষকে আঘাত করার জন্যে সে বহু বাস্তব কাজ, শব্দের ঝংকার ও অনেক কষ্টদায়ক আচরণ গ্রহণ করেছে!

সৃষ্টিজগতে ছড়িয়ে থাকা ঈমানের নিদর্শন

এ মহাগ্রন্থ আল কোরআনের যেসব অলৌকিক ক্ষমতা (মোজেযা) আছে তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হচ্ছে গোটা সৃষ্টির দৃশ্যাবলী এবং মানুষের আবেগ অনুভূতিকে এক তাওহীদের রশিতে বেঁধে দেয়া। আবার এটাও এক মহাসত্য যে, প্রতি মুহূর্তে এই ধরণীর বুকে যেসব ঘটনা ঘটছে, নিশিদিন যেসব পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে এবং সারাক্ষণ মানুষের অন্তরের মধ্যে যেসব পরিবর্তন আসছে, এসব কিছু মানুষের কাছে আল্লাহ সম্পর্কে এমন এক জোরদার দলীল পেশ করছে, যা তাকে ভীষণভাবে উজ্জীবিত করে তোলে, আর এভাবে গোটা বিশ্ব তার সকল অধিবাসীসহ নিত্যদিন এমন সব পরিবর্তন দেখছে যা আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট করে

তুলেছে। এসব কিছুর মধ্যে মানুষ 'কুদরতের হাত' (সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতা) অনুভব করছে এবং প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই সে দেখছে তাঁর অস্তিত্বের লক্ষণাদি, দেখছে প্রতিটি চেহারায় এবং প্রতিটি ছবি অথবা ছায়ার মধ্যে ....।

মনিব ও গোলামের বিষয়টি কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা, আধুনিক কোনো জ্ঞান গবেষণার বস্তু অথবা সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত কোনো দর্শন নয়। এসব মৃত্যুসম জড় পর্যায়ের বিষয় বা বস্তুর আলোচনা দ্বারা অন্তরের কোনো পিপাসা মেটে না, বিদগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে কোনো দাগ কাটে না বা অজানা অচেনা রহস্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না; বরং মানুষ যখন সৃষ্টি রহস্যের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায়, বিশ্বের সব কিছু কিভাবে একই নিয়মে বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছে এবং চিন্তা করে কার ইশারায় এবং কোনো উদ্দেশ্যে এসব কিছুর সুসামঞ্জস্য পরিক্রমা, তখন এসবের মধ্যে এক মহাশক্তির সর্ববিজয়ী ক্ষমতার অস্তিত্ব অনুভব করে মুগ্ধ হয়ে যায়, বিস্মিত স্তম্ভিত হয় এ সবের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দেখে।

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা মহা বিস্ময়কর এসব সুন্দরের মেলা আমাদের অবচেতন মনে এসবের মহান সৃষ্টিকর্তার কথা জাগিয়ে দেয়, স্মরণ করায় তাঁর নেয়ামতসমূহের কথা। এ রহস্যরাজির যে চিত্র আল কোরআনের প্রতি ছাত্রে অংকিত হয়েছে, সীমাবদ্ধ কোনো মানুষের সসীম কলমে তা বিধৃত হতে পারে না। এক এক করে মানুষ যখন চিন্তা করে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নেয়ামতের কথা, চিন্তা করে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চলার গতি প্রকৃতির মধ্যে মায়াময় মোহময় এক অদৃশ্য সামঞ্জস্যের কথা, যখন চিন্তা করে আকাশ থেকে বৃষ্টি ও তার ফলে উদগত ফসলাদি, শাকসব্জি ও ফলমূলের এ বিশাল সমারোহের কথা, যখন ভাবে মহাসগরের বুক চিরে পণ্যদ্রব্য বোঝাই জাহাজসমূহের মাসের পর মাসব্যাপী সফরের কথা, হাজার হাজার মাইলব্যাপী ছড়িয়ে থাকা নদ নদীর উত্তাল তরংগের মধ্য দিয়ে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে দুর দুরান্তে অভিযাত্রার কথা, তখন তার বিস্ময়ের আর কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না। অপর দিকে আবার যখন সে তাকায় সূর্য ও চাঁদের সংলগ্ন হয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠের গতি ও ঋতু পরিবর্তনের দিকে, দেখে এর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির দিকে, আর সর্বোপরি যখন সে খেয়াল করে যে, এসব কিছু অদৃশ্য এক মহাশক্তি এমন কোনো বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালনা করে যাচ্ছে, যা রোধ করার বা যার বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা কারো নেই, তখন যে কোনো অবাধ্য মানব মন পরম আনন্দের সাথে নুয়ে পড়ে সেই মহাশক্তির সামনে, তখন তার সকল প্রশ্নের নিরসন হয়, দূর হয়ে যায় তার সকল অস্থিরতা এবং তখন তার হৃদয়ে জাগে পরম প্রশান্তি। এ কথাগুলোর দিকেই ইংগিত দিচ্ছে নীচের আয়াতাংশটি।

'আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন সেই সকল জিনিস থেকে কিছু কিছু যা তোমরা চেয়েছো (অর্থাৎ দিয়েছেন ততোটুকুই যতোটুকু দেয়া তোমাদের জন্যে তিনি ভালো মনে করেছেন)। এখন যদি তোমরা (তোমাদের দেয়া) আল্লাহর নেয়ামতগুলো গুনতে শুরু করে দাও তো (সারা যিন্দেগী ভরে) গুনে গুনেও শেষ করতে পারবে না।'

আল্লাহর এসব বিস্ময়কর অবদান সবখানে ছড়ানো রয়েছে। আকাশে বাতাসে, ভূধরে সাগরে, দৃশ্য অদৃশ্য সকল বস্তুতে, আলোতে আঁধারে সৃষ্টিকুলের জানা অজানা সকল রহস্যে আর তোমাদের ভোগ বিলাসের সকল প্রকার দ্রব্যাদির মধ্যেই এই অবদান দেখা যায়।

এ সব কিছুই কি মানুষের ওপর জোর করে চেপে বসে আছে, মানুষ কি এসব কিছুর কাছে একেবারেই মজবুর? মহবিশ্বের এ মহা বিস্ময়ভরা সৃষ্টি সবাই মিলে কি ক্ষুদ্র এ সৃষ্টি মানুষকে

একেবারেই অসহায় বানিয়ে রেখেছে? এ প্রশ্নগুলো মনে রাখুন আর তার পাশাপাশি দেখুন ওই আকাশমন্ডলীর দিকে, কেমন করে সেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, কেমন করে গ্রহণ করছে ওই বৃষ্টিধারাকে আমাদের এ যমীন, কেমন করে আকাশ পৃথিবীর সম্মিলিত কাজ দ্বারা উৎপন্ন হচ্ছে ফসল ও ফলসমূহ। আবার দেখুন ওই মহাসাগরের দিকে, কেমন করে আল্লাহর হুকুমে নিয়ন্ত্রিত এর উত্তাল তরংগ কেটে কেটে চলেছে দেশ দেশান্তরে, কেমন করে নদ নদীগুলো মানুষের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার পণ্যদ্রব্য বহন করে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে ঘরে ঘরে। আবার তাকিয়ে দেখুন সুদূর আকাশপানে, কেমন করে এর মধ্যে গ্রহ উপগ্রহগুলো সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মানুষের অবিরাম খেদমত করে যাচ্ছে। এদের নেই কোনো ক্লান্তি, সেই কোনো বিরতি; আবার দেখুন দিবা-রাত্রির আনাগোনার দিকে, একের পর এক অবিরতভাবে আসছেই আসছে, এসব কিছুই কি মানুষের জন্যে? অবশ্যই সব কিছু মানুষের জন্যে! এর পরও হতভাগা এ মানুষ শোকরগোযারী করবে না, স্মরণ করবে না এসব নেয়ামতের কথা?

'নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই যালেম, বড়ই অকৃতজ্ঞ।'

'আল্লাহ সেই সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে।'

এরপরও (অর্থাৎ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা জানা ও মানা সত্তেও) ওরা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানায় আরও অনেককে। সুতরাং ওদের তকদীরের মধ্যে যুলুম করার কথা লেখা রয়েছে– এটা কেমন করে ওরা বলবে? অথচ বাস্তবে ওরা সৃষ্টির এবাদাত করে নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করছে, যা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্ট জীব হিসাবে পরিচিতি!

'আর তিনি পাঠিয়েছেন আকাশ থেকে পানি, তারপর ফলমূল থেকে তোমাদের জীবন ধারণযোগ্য আহার্য যুগিয়েছেন।'

রেযেক বলতে জীবন ধারণযোগ্য যাবতীয় সামগ্রী হলেও বেঁচে থাকার জন্যে যেসব খাদ্য খাবার দরকার তার প্রথমটা কৃষিজাত দ্রব্য থেকে আসে এবং এটাই প্রকাশ্য নেয়ামতের উৎস। বৃষ্টি ও সব্জি উভয়টাই আল্লাহর সেই নিয়ম অনুসরণ করছে যার ওপর এই বিশ্বকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং মেনে চলছে সেই আইন যার অধীনে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে কৃষিজাত দ্রব্য এবং ফলমূল দেয়া হয়েছে। আর এসব কিছুই দেয়া হয়েছে মানুষের উপযোগী করে। আর যে কোনো একটি বীজ অংকুরিত হতে গেলে সেই শক্তির সাহায্য লাগে যিনি গোটা সৃষ্টির ওপর নেগাহবানী (তদারকি) করছেন এবং যিনি দৃশ্য অদৃশ্যভাবে এ দানাকে অংকুরিত ও গাছে পরিণত করার জন্যে সৃষ্টির সকল শক্তি কাজে লাগাচ্ছেন, কাজে লাগাচ্ছেন সব কিছুকে জীবনের উপযোগী কারার জন্যে এবং এসব কিছুকে জীবন দান করার জন্যে মাটি, পানি, তাপ ও বাতাস (আব আতশ খাক বাদ)-কে কাজে লাগাচ্ছেন। আর মানুষ যখন রেযেক কথাটা শোনে তখন তার মন মস্তিষ্কের মধ্যে অর্থ উপার্জন ছাড়া আর কোনো কথা আসে না; কিন্তু রেযেক বলতে আরও অনেক ব্যাপক এবং আরও গভীর অর্থ বুঝায়। দুনিয়ার জীবনে মানুষ সব থেকে কম যে রেযেক ভোগ করে তার জন্যে বিশ্বলোকের মধ্যে যতো গ্রহ নক্ষত্র আছে সবাই কাজে লেগে যায় এবং সেগুলোকেও আবার হাজারো বস্তুর সহযোগিতা নিতে হয়। আরও প্রকাশ থাকে যে, ওইসব বস্তুর পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া গোটা সৃষ্টির অস্তিত্বই টিকে থাকতো না এবং এটাও সত্য যে, সৃষ্টির সব কিছু মিলে এক সৃষ্টি! এসব কিছুর প্রত্যেকটা প্রত্যেকের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীন সারা বিশ্বের সব কিছু এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুর মধ্যে পারস্পরিক এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান, যে একটার সহযোগিতা ছাড়া অন্যটার কোনো অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না এবং এসব কিছুর চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আর সামুদ্রিক জাহাজগুলোকে তিনি তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, যাতে করে সেগুলো তাঁর হুকুমে সমুদ্রের বুকে চলাচল করতে পারে।'

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুর মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, তারই কারণে গভীর সমুদ্রের বুকে জাহাজ চলতে পারে, আর মানুষকে দিয়েছেন এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যার কারণে সে বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতি বুঝতে পারে এবং আল্লাহর হুকুমেই সবকিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে গেছে।

'আর তিনি নদ নদীকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন।'

এসব স্রোতস্বিনী নদী সদা সর্বদা চলছে, আর এদের সাথে জীবনও এগিয়ে চলেছে। এসব নদ নদী যা কল্যাণ দেয়ার তা তো দিয়ে যাচ্ছে, অতপর যে কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী, সে তা ঠিকই পাচ্ছে। এসব নদ নদী, তাদের পেটের মধ্যে মাছ, বিভিন্ন ওষুধি এবং আরও কল্যাণকর বহু বস্তু বহন করে চলেছে। সব কিছুই মানুষের জন্যে, আবার মানুষ পাখী এবং জীব জানোয়ার থেকেও বহু খেদমত নিচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন সূর্য ও চাঁদকে। পানি, ফলমূল, ফসলাদি, সাগর, জাহাজ, নদী এসব। যেমন আল্লাহ তায়ালা সরাসরি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে দিয়েছেন, চাঁদ সূর্যকে ওইভাবে সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন না করলেও তাদের প্রভাবে মানুষ যে প্রভূত উপকার পাচ্ছে তা অবশ্যই বুঝতে পারে। এ চাঁদ সূর্য থেকে মানুষ তাপ, সজীবতা, স্নিগ্ধতা এবং জীবনে শক্তি সামর্থ লাভের উপাদানসমূহ পায়। সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান আল্লাহর আইনের অধীনেই এরা মানুষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মানুষের জীবন জীবিকায়, বরং সত্যি বলতে কি, তার শরীরের প্রতিটি কোষ গঠন প্রক্রিয়ায় এদের সীমাহীন অবদান রয়েছে এবং সূর্যের কিরণ ও চাঁদের স্নিগ্ধতা মানুষের জীবনে অকল্পনীয় সুষমা ও এক অভিনব নতুনত্ব আনে।

'আর তিনি তোমাদের জন্যে রাত ও দিনকে নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন।'

তিনি এদের মধ্য থেকে মানুষের প্রয়োজনমাফিক আলো তাপ ও স্নিগ্ধতা দিয়েছেন এবং জোয়ার ভাটার ওপর এদের প্রভাবসহ আরও যেসব অসংখ্য ফায়দা এদের থেকে মানুষ পায় তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। মানুষের সজীবতা, যোগ্যতা ও আরাম আয়েশের অনেক কিছুই মানুষ এ থেকে হাসিল করে। চিন্তা করে দেখুন, যদি সদা সর্বদা দিবাভাগ থাকতো বা যদি রাত থাকতো সর্বদা, তাহলে প্রকৃতির মধ্যে বিপর্যয় যাইই ঘটুক না কেন, খোদ মানুষের যে অপূরণীয় ক্ষতি হতো তা চিন্তা করে শেষ করা যায় না, তাদের জীবন ও যোগ্যতা এবং জীবনের শুভ পরিণতি কোনোটাই সম্ভব হত না।

আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া যে সীমাহীন নেয়ামত আমরা নিশিদিন ভোগ করে চলেছি তার বিবরণ এতোটুকুতেই শেষ হয়ে যায় না। এ বিষয়ে যতো কথাই বলা হোক না কেন প্রত্যেক বিষয়ে যতো কথা আসবে, ততোই এর এতো দিক ফুটে ওঠবে যা গুনে কোনো দিন শেষ করা যাবে না। এ জন্যে আল্লাহর অবদান প্রকাশ করার উপযোগী ভাষা তিনি নিজেই শিখিয়ে দিচ্ছেন।

'আর দিয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সব কিছু থেকে এমন বহু জিনিস যা তোমরা চেয়েছো।'

অর্থাৎ, দিয়েছেন তোমাদের ধন সম্পদ, সন্তানাদি, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য এবং আরাম আয়েশের দ্রব্যাদি ....।

'এভাবেই এক এক করে যদি তাঁর নেয়ামতসমূহ তোমরা গুনতে শুরু করে দাও তাহলে তোমরা কিছুতেই তাঁর সকল নেয়ামত গুনে শেষ করতে পারবে না।'

যে কোনো জনপদ, সংখ্যায় তারা যতো অধিকই হোক না কেন, যদি তারা গুনতে বা পরিমাণ করতে শুরু করে তাহলে যতো পরিমাপই তারা করুক এবং যতো সংখ্যা দিয়ে তারা গুনতে থাকুক না কেন, সকল পরিমাপ ও সংখ্যা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁর নেয়ামতের সংখ্যা শেষ অথবা পরিমাণ শেষ হয়ে যাবে না। অর্থাৎ, মানুষ যতো আন্দাজই করুক না কেন তার থেকে তিনি– তাঁর নেয়ামতসমূহ আরও বড়, আরও উর্ধ্বে। ওরা মানুষ, ওরা যামানার অতীত ও ভবিষ্যৎ– এ দুই সীমার মধ্যে বাঁধা, আর আল্লাহর নেয়ামতসমূহ সীমাহীন সংখ্যাহীন, অর্থাৎ তাঁর নেয়ামতসমূহে সীমা বা সংখ্যার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বান্দাদের যেমন শুরু আছে ও শেষ আছে, তাদের সব কিছুরও শুরু আছে এবং শেষ আছে; কিন্তু আল্লাহ রব্বুল ইযযতের নিজের এবং তাঁর নেয়ামতের না আছে শুরু, না আছে শেষ; কাজেই সসীম এই মানুষ অসীম সত্তাকে, তাঁর নেয়ামতের কিভাবে সীমা সংখ্যার গন্ডির মধ্যে ধরে রাখবে! যতো, যতো বেশী ধারণাই মানুষ করুক তার আধিক্য মানুষের পক্ষে আন্দাজ করা কোনো দিন সম্ভব নয়। এসব আন্দাজ করতে গিয়ে দার্শনিকরা পাগল হয়ে যায়। সে জন্যেই বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই মানুষেরা বড় যালেম, বড়ই অকৃতজ্ঞ।'

এভাবে যখন মানুষের বিবেক জেগে ওঠে এবং তার চতুর্দিকে অবস্থিত অসংখ্য নেয়ামত তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে, তখন সে অভিভূত হয়ে যায় এবং নিজের অজান্তেই মহান আল্লাহর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে বসে কখনো সরাসরি, আর কখনো তার হুকুম আহকাম ও নিয়ম কানুন অনুযায়ী জীবনের সকল কাজ ও ব্যবহার পরিচালনার মাধ্যমে। আর তখনই সে দেখতে পায় তার চতুর্দিকের সব কিছুই যেন আল্লাহর রহমতে তার বন্ধু হয়ে গেছে। আর তাঁরই কুদরত ও ক্ষমতার কারণে সব কিছুই এগিয়ে এসেছে তার সাহায্যকারী হিসাবে এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিয়ন্ত্রণের কারণে সব কিছু তার বশীভূত হয়ে গেছে। .... মানুষের বিবেক যখন জেগে ওঠে তখন সে দেখতে পায়, সে চিন্তা করতে পারে এবং তখন সে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে আর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মহান আল্লাহর দরবারে তখন তার সকল সত্ত্বা নুয়ে পড়ে। সে সেজদাবনত হয়ে যায় তার শোকরগোযারীতে, তখন সকল দিকেই সে দেখতে থাকে শুধু আল্লাহর নেয়ামতই নেয়ামত, তখন যেন সে দেখতে পায় মহান সেই নেয়ামতদাতাকে। তখন তার শত কঠোরতা, সংকট সমস্যা সবই সহজ সুন্দর ও সাবলীল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন তার জীবন আনন্দের জোয়ারে ভরপুর হয়ে যায়, তার সকল গ্লানি দূরীভূত হয়, সে মহান আল্লাহর প্রতি আবেগ আপ্লুতভাবে তাকিয়ে থাকে, গোটা সৃষ্টির প্রতি তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে।

আদর্শপুরুষ ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া

আল্লাহর স্মরণে ও কৃতজ্ঞতায় চির নিমগ্ন একজন মানুষের পূর্ণাংগ রূপ যদি কেউ দেখতে চায় তাহলে সে নবীকুল পিতা হযরত ইবরাহীম (স.)-এর মাঝে তা পেতে পারে, দেখতে পারে। এই গোটা সূরা জুড়ে তাঁরই বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। আরো উল্লেখ রয়েছে তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা, তাঁর বিনয় ও খোদা ভক্তির কথা, তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উদ্ভূত ভক্তি মাখা দোয়া, কাকুতি মিনতি ও আরযির কথা, যে আরযির ভাষা ও ছন্দ তরংগায়িত হয়ে আকাশের দিকে উত্থিত হয়েছিলো, ওই আরযির ভাষা ছিলো নিম্নরূপ– (আয়াত ৩৫ ও ৪১)

সূরায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে ইবরাহীম (আ.)-কে বায়তুল্লাহর পাশে দেখানো হয়েছে। তিনি কোরায়শ অধ্যুষিত নগরে আল্লাহর পবিত্র ঘরের ভিত্তি স্থাপন এবং এর নির্মাণ কাজ সমাধা করেন, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, ওই নগরের আদি বাসিন্দা কোরায়শ বংশীয় লোকেরা আল্লাহকে অস্বীকার

করে বসলো, তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। যে ঘরটি তিনি কেবল আল্লাহর এবাদাতের জন্যে নির্মাণ করেছিলেন, ওই ঘরের আশেপাশেই তারা এসব কুফুর ও শেরেক চালিয়ে যেতে লাগলো। ঠিক এই নাযুক ও করুণ মুহূর্তটিতে তাকে দেখানো হয়েছে ভয় ও ভক্তিগদগদ একজন বান্দা হিসাবে, চিরমগ্ন একজন বান্দা হিসাবে, যিনি অবাধ্যকে বাধ্য করছেন, অকৃতজ্ঞকে কৃতজ্ঞ করছেন, খোদাবিমুখ লোকদের খোদামুখী করছেন, তাঁর বিপথগামী সন্তানদের তাঁদের পিতার আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করছেন যেন তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে, তাঁর সত্য আদর্শের অনুসারী হতে পারে।

ইবরাহীম (আ.) তাঁর দোয়া ও মোনাজাতে বললেন,

'হে প্রভু, তুমি এই নগরকে নিরাপদ রাখো। কারণ, শান্তি ও নিরাপত্তা হচ্ছে মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ও চাহিদা। এই প্রয়োজন সে প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুভব করে। তার নিজের জীবনের জন্যেও সে এই নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই, মক্কা নগরীতে তৎকালীন যুগে যারা বসবাস করতো তারা আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর শোকর আদায় করতো না। তাঁদের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বদৌলতে তারা শান্তি ও নিরাপত্তার মতো আল্লাহর বড় নেয়ামত ভোগ করছিলো, কিন্তু এই নেয়ামতের শোকর আদায় করা তো দূরে থাক, তারা বরং তাদের পিতার দেখানো পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলতে থাকে। তারা আল্লাহর সাথে বিভিন্ন দেব দেবীকে শরীক বানিয়ে নেয়। ফলে তারা আল্লাহর সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কা নগরীর নিরাপত্তার আরযির সাথে সাথে আল্লাহর নিকট আর একটি আরযি পেশ করেছিলেন। সেটি হলো,

'আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন'। এই আরযির মাধ্যমে ইবরাহীম (আ.) নিজেকে পরিপূর্ণরূপে তাঁর প্রতিপালকের নিকট সঁপে দিচ্ছেন। তিনি হৃদয়ের গভীর অনুভূতিটুকু তাঁর প্রতিপালকের সামনে পেশ করছেন। কাতর স্বরে আবেদন জানাচ্ছেন যেন আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজার মতো জঘন্য অপরাধ থেকে রক্ষা করেন। তিনি সাথে সাথে আল্লাহর কাছে হেদায়াত কামনা করছেন, সঠিক দিকনির্দেশনা চাচ্ছেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন, শেরেক থেকে বেঁচে থাকাও আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। বড় নেয়ামত এই জন্যে যে, এর ফলে একজন মানুষ শেরেক ও কুফরীর অন্ধকার থেকে রক্ষা পায়। আর ঈমান ও হেদায়াতের আলো লাভ করার পর মানুষ গোমরাহী, আদর্শহীনতা, লক্ষ্যহীনতা ও পথভ্রষ্টতার কবল থেকে রক্ষা পায় এবং তার হৃদয়ে তখন সে জ্ঞান, প্রশান্তি, স্বস্তি ও স্থিরতা অনুভব করতে পারে। তখন সে অগণিত প্রভুর দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে একমাত্র প্রভু আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের মাঝে নিজেকে সঁপে দেয়। এটা নিসন্দেহে একটা বড় নেয়ামত, সে জন্যেই হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রভুর কাছে এই নেয়ামতের জন্যে সকাতর আবেদন জানিয়েছেন যেন তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানরা সবাই মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন।

মূর্তিপূজার কুফল সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) অবগত ছিলেন বলেই এই জঘন্য পাপাচার থেকে মুক্তি কামনা করে আল্লাহর দরবারে আরযি পেশ করেছেন। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এই মূর্তিপূজার কারণে অতীতে ও তার যুগের অসংখ্য মানুষ আল্লাহর দ্বীনকে হারিয়েছে, সঠিক পথ হারিয়েছে। তাই তিনি নিজের প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করে যাচ্ছেন,

'হে আমার প্রভু! এ সকল দেব দেবী অসংখ্য মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে।'

এরপর তিনি ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন, যারা আমার দেখানো পথ অনুসরণ করে চলবে এবং এ সকল দেব দেবীর ফেতনায় লিপ্ত হবে না, তারাই হবে সত্যিকার অর্থে আমার বংশধর, আমার আদর্শের অনুসারী, আমার আকীদা বিশ্বাসের অংশীদার। এ মহান আদর্শ ও আকীদার বন্ধনেই তারা আমার সাথে আবদ্ধ। আর যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে, আমার আদর্শের বিপরীত আদর্শের অনুসারী হবে, তাদের বিচারের ভার আমি পরম করুনাময় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিচ্ছি,

'যদি কেউ আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে (হে প্রভু) তুমি তো ক্ষমাশীল দয়ালু।'

হযরত ইবরাহীম (আ.) যে কতো দয়ালু, স্নেহপরায়ণ, উদার ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তা এই দোয়ার মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদী ও আদর্শচ্যুত সন্তানদের ধ্বংস কামনা করেননি, এমনকি তাদের দ্রুত শাস্তিও কামনা করেননি; বরং এখানে তিনি শাস্তির বিষয়টিই উল্লেখ করেননি। তার পরিবর্তে তিনি তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার বিশাল ছায়ায় খোদাদ্রোহিতা ও না-ফরমানী ঢাকা পড়ে যায়। উদার ও দয়াল নবী হযরত ইবরাহীম (আ.) ওই নাফরমানীজনিত শাস্তির বিষয়টি তাই উল্লেখই করেননি।

এরপর তিনি আল্লাহর কাছে আরো একটি আরযি পেশ করেন। আর সেটা হচ্ছে, পবিত্র কাবা গৃহের আশেপাশের এই অনুর্বর ও শুষ্ক ভূমিতে তাঁর কিছু সন্তানদের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া। এর পেছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তার প্রতি ইংগিত করে তিনি বলেন,

'তারা সালাত কায়েম করবে।' আর এই মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরে তারা এই বৈরী পরিবেশের সব ধরনের কষ্ট ও যাতনা স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে।

তাঁর সন্তানরা যাতে এই অনুর্বর ও শুষ্ক মরুভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে সে জন্যে তিনি তাঁর পরম করুণাময় প্রভুর নিকট আরো একটি আরযি পেশ করে বলেন,

'হে আমাদের মালিক, আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে একটি অনুর্বর উপত্যকায় এনে আবাদ করলাম, যাতে করে হে আমাদের মালিক, এরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে, (এখন) তুমি (তোমার দয়ায়) এমন করো, যেন মানুষদের অন্তর এদের দিকে অনুরাগী হয়, তুমি ফলমূল দিয়ে তাদের রেযেকের ব্যবস্থা করো, যাতে ওরা তোমার নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারে।' (আয়াত ৩৭)

অর্থাৎ এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে ভাষা ও ভংগি ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত কোমল ও হৃদয়গ্রাহী। হৃদয়ের এই শিশিরসিক্ত কোমলতা যেন মরুভূমির রুক্ষতার মাঝে এনে দেয় শিশিরের নরম স্পর্শ।

পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে যারা এই পবিত্র গৃহটির উদ্দেশ্যে মক্কায় আসবে তারা বিভিন্ন ফলমূল বয়ে নিয়ে আসবে। আর এই ফলমূলই হবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানদের মূল জীবিকা। আর এই জীবিকা লাভ করে তারা আল্লাহর পরম শোকর আদায় করবে। কাবা গৃহের নিকটে বসবাস করার উদ্দেশ্যে কেবল খানাপিনা ও আরাম আয়েশ নয়; বরং তারা সালাত আদায় করবে, আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করবে এবং তাঁর প্রতিটি নেয়ামতের শোকর আদায় করবে। আর এর মাধ্যমেই কাবা গৃহের দুই শ্রেণীর প্রতিবেশীর মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে। এ দুটো শ্রেণীর একটি হচ্ছে কোরায়শ বংশীয় লোকেরা। এরা সালাত আদায় করে না, যেসব নেয়ামত ভোগ করে তার শোকর আদায় করে না।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়, সেটি হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম (আ.) তাঁর মনের কাকুতি মিনতির গোটা বিষয়টি আল্লাহর কাছে গোপনে পেশ করছেন এবং বলছেন, তুমি অন্তর্যামী, মনের গভীরে কি লুকায়িত আছে তা তুমি জান। আসমান ও যমীনের মধ্যকার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব বিষয়ই তোমার জানা। লোক দেখানো দোয়া ও আহাজারি আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমার মনের গভীরে লুকায়িত উদ্দেশ্য ও আরযিটুকুই তোমাকে জানাতে চাই। তিনি বলেন,

'হে আমাদের মালিক, আমরা যা কিছু গোপন করি এবং যা কিছু প্রকাশ করি, নিশ্চয়ই তুমি তা জানো (সত্যি কথা হচ্ছে), আসমানসমূহে কিংবা যমীনের (যেখানে যা কিছু ঘটে এর) কোনোটাই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।' (আয়াত ৩৮)

এই পবিত্রময় মুহূর্তে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর অন্যান্য অনুগ্রহ ও কৃপার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। (আয়াত ৩৯)

বার্ধক্যকালে সন্তান সন্ততিলাভ আল্লাহর একটা বিশেষ দান। তাই এর দ্বারা মানুষের মনে এক বিরাট প্রভাব সৃষ্টি হয়। কারণ, মানুষের মাঝে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে আর তা হলো বংশ বিস্তার। আর এই বংশ বিস্তার যদি তখন ঘটে যখন মানুষের জীবনের বিদায়ের ঘন্টা বেজে ওঠে, তখন এটা নিসন্দেহে আল্লাহর একটা বড় নেয়ামত হিসাবেই গণ্য হয়। আর এ জাতীয় একটা বড় নেয়ামত লাভ করে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রভুর দরবারে শোকর আদায় করছেন এবং সাথে সাথে কামনা করছেন যেন চিরকাল তিনি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। তাঁর এবাদাত বন্দেগীতেই যেন সদা মশ্গুল থাকতে পারেন। কোনো বাধা বিপত্তিই যেন তাঁকে এই শোকর ও এবাদাত বন্দেগী থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারে। তাঁর এই চরম চাওয়া ও আকংখা যেন বাস্তবায়িত হয় সে জন্যে আবার মহান প্রভুর দরবারে মিনতি জানাচ্ছেন।

'হে আমার মালিক, তুমি আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আমার সন্তানদের মাঝ থেকেও (এমন সব লোক তৈরী করো যারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে), হে আমাদের মালিক, (আমার এই) দোয়া তুমি কবুল করো।' (আয়াত ৪০)

এই দোয়ার মাঝে কাবা গৃহের সেই দুই শ্রেণীর প্রতিবেশীর মধ্যকায় পার্থক্য আবার স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। মোমেন শ্রেণী তথা ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর এবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকার জন্যে তাঁর সাহায্য কামনা করছেন, তাঁর তাওফীক কামনা করছেন। অপরদিকে কোরায়শ বংশীয় প্রতিবেশীরা আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী থেকে দূরে সরে দাঁড়াচ্ছে, আল্লাহর পথ এড়িয়ে চলছে। সাথে সাথে সেই সকল নবী রসূলকেও অস্বীকার করছে যাদের প্রেরণের জন্যে ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে দোয়া জানিয়েছেন।

সব শেষে ইবরাহীম (আ.) তাঁর হৃদয় নিংড়ানো দোয়া এই বলে শেষ করছেন।

'হে আমাদের মালিক, যেদিন (মানব সন্তানের চূড়ান্ত) হিসাব কেতাব হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সমস্ত ঈমানদার মানুষদের (তোমার অনুগ্রহ দ্বারা) ক্ষমা করে দিয়ো।' (আয়াত ৪১)

নিজের জন্যে, নিজের পিতা মাতার জন্যে এবং সকল মোমেন মুসলমানের মাগফেরাতের দোয়া জানাচ্ছেন। কারণ, পরকালে এবং হাশরের ময়দানে নিজের আমল ব্যতীত অন্য কিছুই মানুষের উপকারে আসবে না। কাজেই এই আমলের মাঝে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকলে তার জন্যে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তাই এই মাগফেরাতের দোয়া।

আর এভাবেই একজন খোদাভক্ত ও অনুরক্ত বান্দার মিনতিভরা দোয়ার দীর্ঘ দৃশ্যটি শেষ হলো। তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)– যাঁর গোটা চরিত্রের মাঝে মিশে আছে আল্লাহর আনুগত্য, দাসত্ব ও পরম কৃতজ্ঞতায় অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ। তিনি নিসন্দেহে একজন আদর্শ মানব। তাঁর আদর্শেই অনুপ্রাণিত হতে হবে সকল বান্দাকে। বিশেষ করে দোয়ার শুরুতে তিনি যাদের লক্ষ্য করে বক্তব্য রেখেছেন।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মিনতিভরা দোয়ায় রাব্বনা অথবা রাববে এই শব্দ দুটো বার বার উল্লেখ করেছেন। তিনি আল্লাহকে 'ইলাহ' বা মাবুদ নামে ডাকেননি; বরং মালিক বা প্রভু নামে ডেকেছেন। কারণ মাবুদ বা উপাস্য শব্দটি অধিকাংশ জাহেলী সমাজে বিশেষ করে আরবীয় জাহেলী সমাজে খুব একটা বিতর্কের বিষয় ছিলো না। কিন্তু যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সব সময়ই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সেটা হলো, জাগতিক জীবনে কার আনুগত্য চলবে? কার প্রভুত্ব চলবে? এটা মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী একটা বিরাট প্রশ্ন, যার সম্পর্ক ছিলো বাস্তবতার সাথে, ব্যবহারিক জীবনের সাথে। এটাকে কেন্দ্র করেই ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়েছে। এর মাধ্যমেই তাওহীদ ও শেরেকের পার্থক্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যারা সকল বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে, আল্লাহই হচ্ছেন তাদের প্রভু, মালিক বা 'রব'। অপরদিকে যারা 'গায়রুল্লাহ'র আনুগত্য করে সেই 'গায়রুল্লাহ'ই হচ্ছে তাদের প্রভু বা 'রব'। তাওহীদ ও শেরেক এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য বাস্তব জীবনে এ রূপই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এই পার্থক্যটুকু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার মাধ্যমে তাঁর সন্তান তথা আরববাসীদের জানিয়ে দিয়েছেন। সাথে সাথে তাঁদের আদি পিতার দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত সেই চরম সত্যটির ব্যাপারে তাদের অনীহা, অস্বীকার এবং তাচ্ছিল্যের প্রতিও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এরপর আলোচনায় আসছে একটি বিশেষ শ্রেণী, যাদের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

'(হে নবী, তুমি কি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করোনি যারা আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নেয়ামত অস্বীকার করার মাধ্যমে তা বদলে দিলো। পরিণামে তারা নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের (এক চরম) স্তরে নামিয়ে আনলো।' (আয়াত ২৮)

এই শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন প্রকার অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত থাকা সত্তেও তাদের ওপর আল্লাহর আযাব ও গযব নেমে আসেনি। এদের উদ্দেশ্য করে রসূল (স.)-কে বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

অর্থাৎ যতো পারো ভোগ করো। কারণ, তোমাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। কাজেই এদের নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আল্লাহর অনুগত মোমেন বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্যে রসূলকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। তাই তিনি তাদের সালাত কায়েম করার জন্যে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্যে উপদেশ দিয়ে বলছেন–

(হে নবী,) আমার যেসব বান্দা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বলো .... । (আয়াত ৩১)

যালেমদের করুণ পরিণতি

পরবর্তী দুইটি আয়াতে আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারকারী কাফেরদের জন্যে কি ভয়াবহ আযাব অপেক্ষা করছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর কেয়ামতের ভয়াবহ চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। যে চিত্র দেখে মানুষের মনে কম্পনের সৃষ্টি হবে, যা দেখে হাত পা কাঁপতে থাকবে। এরশাদ হচ্ছে,

'(হে নবী,) তুমি কখনো একথা মনে করো না যে, এই যালেমরা যা কিছু কর্মকান্ড করে যাচ্ছে তা থেকে আল্লাহ তায়ালা গাফেল রয়েছেন, (আসলে) তিনি তাদের সেদিন আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখছেন যেদিন (কর্মফলের কারণে ভীতবিহ্বল হয়ে তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা আকাশের দিকে চেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দৌড়াতে থাকবে, তাদের নিজেদের প্রতিই নিজেদের কোনো দৃষ্টি থাকবে না, (ভয়ে) তাদের অন্তর বিকল হয়ে যাবে (কিছুই তাদের বুঝে আসবে না)।' (আয়াত ৪২-৪৩)

অত্যাচারী ও যুলুমবাজদের কার্যকলাপের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স.) কখনও আল্লাহকে গাফেল উদাসীন ভাবতে পারেন না, কিন্তু বাহ্যিকভাবে যখন মানুষ দেখে, এসকল অত্যাচারী বেশ সুখে শান্তিতে আরাম আয়েশের মাঝেই দিন গুজরান করছে, আল্লাহর কোনো আযাব গযব এই জাগতিক জীবনে তাদের ওপর নেমে আসছে না। তখন তাদের মনে হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা হয়তো এদের ব্যাপারে উদাসীন রয়েছেন, কিন্তু ব্যাপার তা নয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে মোটেও গাফেল উদাসীন নন; বরং তাদের জন্যে ঠিকই আযাব ও শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছেন। সেই আযাব ও শাস্তির একটা চূড়ান্ত সময়ও নির্ধারণ করে রেখেছেন। এই চূড়ান্ত সময়ের ব্যাপারে কোনোরূপ হেরফে হবে না। এই সময়ের পরে তাদের আর কোনো সুযোগও দেয়া হবে না। যখন এই চূড়ান্ত মুহূর্ত আসবে তখন তারা বিস্ফারিত নয়নে দেখতে পাবে সেই ভয়াবহ কঠিন শাস্তির রূপ। তখন তারা আতংকিত হয়ে পড়বে, বিহ্বল হয়ে পড়বে, নিথর নিস্তব্ধ হয়ে পড়বে। এই ভয়ংকর মুহূর্তে প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকবে। কোনো কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটু নড়াচড়া করার মত ক্ষমতাও তখন তাদের থাকবে না। নিথর নিস্তব্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেয়ামতের সেই ভয়াল দৃশ্যের দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে। ভয়ে আতঙ্কে তখন তাদের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যাবে। কোনো কিছুই তখন তাদের মনে আসবে না।

এই চরম মুহূর্তটি পর্যন্তই আল্লাহ তাদের শাস্তি ঝুলিয়ে রেখেছেন। এই মুহূর্ত যেদিন ঘনিয়ে আসবে তখন আর তাদের এক পলকের জন্যেও সময় দেয়া হবে না, সুযোগ দেয়া হবে না। যেদিন এই মুহূর্ত আসবে সেদিন তাদের অবস্থা হবে বড়ই করুণ, বড়ই মর্মান্তিক ও ভয়াবহ। হিংস্র ঈগলের পাঞ্জায় আবদ্ধ, দুর্বল ও ছোট একটি পাখির অবস্থা যা দাঁড়ায়, তাদের অবস্থাও সে রকমই হবে। (আয়াত ৪২-৪৩)

তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এই দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে।

মুহূর্তটি এতো দ্রুত ও আকস্মিকভাবে উপস্থিত হবে যে, তখন তাদের কোনো কিছু চিন্তা করারও সুযোগ থাকবে না। ভয়ে ও আতংকে তখন তারা সব কিছুই ভুলে যাবে। ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়, আতঙ্কে বিস্ফারিত নয়ন– এসব কিছুই ওই চরম মুহূর্তটির ভয়াবহতার সাক্ষ্য বহন করে।

এই চরম মুহূর্তটির ব্যাপারে সকল মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এখানে এরশাদ করছেন,

'(হে নবী,) মানুষদের তুমি (সময় থাকতেই) একটি (ভয়াবহ) দিনের আযাব (আসা) থেকে সাবধান করে দাও। ...... আমি তাদের দৃষ্টান্তও (তোমাদের সামনে বার বার) উপস্থাপন করেছিলাম।' (আয়াত ৪৪-৪৫)

যে মুহূর্তটির চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো তা ঘনিয়ে আসার পূর্বেই মানুষদের আপনি সতর্ক করে দিন। তখন যেন তারা আমার কাছে ফরিয়াদ না জানায়। (আয়াত ৪৪)

কারণ তখন এই ধরনের কোনো ফরিয়াদই কাজে আসবে না। তাদের যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা করেনি; বরং কুফর ও নাফরমানীতে ডুবে ছিলো। আল্লাহর সাথে অসংখ্য দেব-দেবীকে শরীক বানিয়ে রেখেছিলো।

ওপরের আয়াতে বর্ণনাভংগি পাল্টে গেছে। পরোক্ষ নয়, যেন প্রত্যক্ষভাবে এবং সরাসরি কথোপকথন হচ্ছে। যেন জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। এখন আমরা সকলে কেয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ভয়াবহ পরিস্থিতি। সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত। এক বিরাট জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে কাফের মোশরেক ও যালেম অত্যাচারীরা কান্নাকাটি করে, আহাজারি করে আল্লাহর সামনে সরাসরি ফরিয়াদ জানিয়ে নিজেদের ভুল ত্রুটির কথা স্বীকার করছে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছে,

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই আয়াাতে তাদের ফরিয়াদের উত্তরে জানিয়ে দিচ্ছেন- (আয়াত ৪৪)

এখন তোমরা কি বুঝতে পারছো? কি দেখতে পারছো? তোমরা যে বলেছিলে, তোমাদের কোনো ধ্বংস নেই, কোনো লয় নেই, কৈ তোমাদের সেই দাবী? তোমরা ধ্বংস হয়েছো না হওনি? অতীতের অসংখ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি গোষ্ঠীর নিদর্শন তোমাদের চোখের সামনে থাকা সত্তেও তোমরা এসব কথা বলাবলি করতে। যালেম অত্যাচারীদের ভয়াবহ এবং অমোঘ পরিণতির ঘটনা জানা সত্তেও তোমরা এ জাতীয় অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করতে। (আয়াত ৪৫)

কি অদ্ভুত ব্যাপার! ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর নিদর্শন তোমরা স্বচক্ষে দেখছো, তাদের শূন্য ভিটে মাটিতেই ঘর বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করছো, তারপরও কসম খেয়ে বলছো তোমাদের কোনো ধ্বংস নেই!

তাদের এই কান্নাকাটি ও আহাজারির দৃশ্য এখানেই শেষ। এরপর তাদের পরিণতি কি হবে তা আমাদের সকলেরই জানা আছে। কারণ, আমরা জানি, সেই চরম মুহূর্তে তাদের এ জাতীয় অর্থহীন কান্নাকাটি ও আহাজারি কোনোই কাজে আসবে না।

অতীত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা না নেয়ার দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীর বুকে প্রতি মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করে থাকি। এমন অনেক স্বৈরাচারী যুলুমবাজ আছে যারা তাদের পূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া যুলুমবাজদের পরিত্যক্ত অট্টালিকায় বাস করছে। হয়তো তাদের হাতেই ওরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এরপরও তারা সেই যুলুমবাজদেরই পথ অনুসরণ করে চলে। তাদের মতোই যুলুম অত্যাচার ও জিঘাংসার নীতি অনুসরণ করে চলে। ধ্বংসের যে চিহ্নগুলো তাদের সামনে বিদ্যমান যা অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীদের করুণ ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে, তা থেকে তারা আদৌ শিক্ষা গ্রহণ করে না; বরং তাদের পথ ও নীতিই অনুসরণ করে। ফলে তাদের ভাগ্যেও অনুরূপ পরিণতিই ঘটে। খুব কম সময়ের ব্যবধানেই পৃথিবী থেকে তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

অতীত ঘটনাবলী উল্লেখ করার পর এখন ওদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। ওরা নবী রসূলদের সাথে, মোমেন মুসলমানদের সাথে কি সব চক্রান্ত করে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ওরা মোমেনদের সাথে কি অসৎ ব্যবহার করে এ সম্পর্কে এখন আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে,

'(সঠিক কিছু বোঝার বদলে) এরা (বড়ো বড়ো) কৌশলের পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের সেসব কৌশল লিপিবদ্ধ আছে, যদিও তাদের সে কৌশল (দুনিয়ার দিক থেকে মনে হয় বুঝি) পাহাড়কে টলিয়ে দিতে পারতো (তারপরও আল্লাহ তায়ালা তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন)।' (আয়াত ৪৬)

ওদের চক্রান্ত, ওদের ষড়যন্ত্র যতোই গভীর হোক না কেন, যতোই কঠিন হোক না কেন, পাহাড়কে টলিয়ে দেয়ার মতো শক্তিশালী হোক না কেন, আল্লাহর শক্তির সামনে তা কখনোই টিকতে পারে না। আল্লাহ ওদের সকল চক্রান্ত, ওদের সকল কারসাজি সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল আছেন। তাঁর অপার কুদরত ও ক্ষমতার উর্ধ্বে নয় ওদের চক্রান্ত। কাজেই তিনি সে সকল চক্রান্ত বানচাল করে দিতে সক্ষম। (আয়াত ৪৭)

ওদের চক্রান্তে কিছুই হবে না। বিজয় রসূলদেরই হবে। কারণ, এই বিজয়ের ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই করেছেন। কাজেই এই বিজয়ের পথে চক্রান্তকারীদের কোনো চক্রান্তই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না; বরং মহাশক্তিধর ও ক্ষমতাধর আল্লাহই তাদের মোকাবেলা করবেন এবং তাদের উচিৎ শিক্ষা দেবেন। এ কথাই ওপরের আয়াতে বলা হয়েছে। (আয়াত ৪৭)

কোনো যালেমেরই শেষ রক্ষা হবে না। কোনো কুচক্রীই শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না। এখানে এনতেকাম অর্থাৎ প্রতিশোধ শব্দটি যুলুম ও চক্রান্ত শব্দ দুটোর বিপরীতে অত্যন্ত অর্থবহ। কারণ, প্রতিশোধ নেয়া হয় অত্যাচারী, যুলুমবাজ ও চক্রান্তকারীদেরই। তবে আল্লাহর ক্ষেত্রে এখানে শব্দটির অর্থ 'শাস্তি প্রদান' হবে।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের যুলুম অত্যাচার ও চক্রান্তের শাস্তি প্রদান করবেন। সেদিন অবশ্যই আসবে এবং সে অবস্থা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সে কথাই নিচের আয়াতে বলা হয়েছে,

'(এই প্রতিশোধ তিনি সেদিন নেবেন) যেদিন এই পৃথিবী, ভিন্ন (আরেক) পৃথিবী দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, (একইভাবে) আসমানসমূহও (ভিন্ন আসমানসমূহ দ্বারা বদলে যাবে) এবং মানুষরা সব (হিসাবের পাওনা বুঝে নেয়ার জন্যে) এক মহাক্ষমতার মালিকের সামনে গিয়ে হাযির হবে।' (আয়াত ৪৮)

এটা কি ভাবে হবে তা আমাদের জানা নেই। পৃথিবী ও আকাশের প্রকৃতি তখন কি রূপ দাঁড়াবে, তাও আমাদের জানা নেই। এটা কোথায় ঘটবে এবং কখন ঘটবে, তাও আমাদের জানা নেই। তবে আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর অসীম কুদরত ও ক্ষমতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এই কুদরত ও ক্ষমতার বলেই তিনি পৃথিবী এবং আকাশকে ভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবেন। তাঁর এই অপার কুদরত ও ক্ষমতার তুলনায় কাফেরদের চক্রান্ত খুবই তুচ্ছ, খুবই নগণ্য এবং চরম ব্যর্থ, তা যতোই কঠিন বলে মনে হোক না কেন।

হঠাৎ করে এবং আকস্মিকভাবে সেই দিনটির যখন আগমন ঘটবে তখন যুলুমবাজ ও কাফেরদের অবস্থা কি দাঁড়াবে তা ওপরের আয়াতে বলা হয়েছে। (আয়াত ৪৮)

অর্থাৎ সেদিন তারা সরাসরি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, আল্লাহ ও তাদের মাঝে কোনো আড়াল বা পর্দা থাকবে না। তখন তাদের রক্ষা করতেও কেউ থাকবে না। তখন তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতেও থাকবে না, এমনকি কবরেও থাকবে না। উন্মুক্ত ময়দানে তারা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। এখানে 'আল কাহহার' বা মহাপরাক্রমশালী শব্দটির প্রয়োগ যথার্থরূপেই এসেছে। এর দ্বারা এই সত্যটির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার বুকে যে যতোই শক্তিধর হোক না কেন, যতোই দাপট ও ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, আল্লাহর শক্তির সামনে তাদের দাপট ও প্রতাপ কিছুই না। তাদের কূটচাল ও চক্রান্ত আল্লাহর অপার ক্ষমতার সামনে কখনও টিকতে পারে না।

এর পর আমাদের সামনে আসছে যুলুমবাজদের জন্যে নির্ধারিত ভয়ানক, কঠিন, মর্মান্তিক ও অপমানজনক শাস্তির চিত্রটি। নিচের আয়াতটিতে সেই চিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেদিন তুমি

অপরাধীদের সবাইকে শৃংখলিত অবস্থায় দেখতে পাবে। ওদের পোশাক হবে আলকাতরার (মতো বীভৎস) কালো, তাদের মুখমন্ডল আগুন আচ্ছাদিত করে রাখবে। (আয়াত ৪৯ ও ৫০)

এই দৃশ্যটিতে আমরা দেখতে পাই, অপরাধীরা দলের পর দল এগুচ্ছে। অত্যন্ত অপমানজনক সে দৃশ্য। এই দৃশ্যে আল্লাহর অপার কুদরত এবং ক্ষমতারও প্রকাশ ঘটছে। এই অপরাধীদের যে পোশাক হবে তা হবে অত্যন্ত নোংরা ও কালো আলকাতরার ন্যায় দাহ্য। তাতে খুব সহজেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়বে। জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডলীর কাছে যাওয়া মাত্র সেই লেলিহান শিখা তাদের গ্রাস করে ফেলবে। এই দৃশ্যের প্রতিই ইংগিত করে বলা হয়েছে–

'জাহান্নামের আগুন তাদের চেহারা ঢেকে ফেলবে।'

এই কঠিন, ভয়াবহ ও অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের চক্রান্ত, কূটকৌশল ও অহঙ্কারের ফল স্বরূপ। (আয়াত ৫১)

দুনিয়ার বুকে তারা চক্রান্ত করেছে, অন্যায় অবিচার করেছে। কাজেই পরকালে তাদের শাস্তি অপমানজনক হবে, ভয়াবহ হবে, সেটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর হিসাব অত্যন্ত ত্বড়িৎ গতিতে হবে। ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে ওরা যেহেতু অপরকে পরাস্ত করতে এবং নিজেদেরকে গোপনে রক্ষা করতে চেয়েছিলো, তাই ওদের জন্যে এই ত্বরিত হিসাবের ব্যবস্থা করা হবে যেন নিজেদের কৃতকর্মের ফল তাৎক্ষণিকভাবেই পেয়ে যায়।

আলোচ্য সূরার সমাপ্তি ঘটছে একটি ঘোষণার দ্বারা। ঘোষণাটি দেয়া হয়েছে সবাইকে উদ্দেশ্য করে। অত্যন্ত সুস্পষ্ট, জোরালো ভাষায় ও উচ্চ কণ্ঠে দেয়া হয়েছে, যেন সকল যুগের ও সকল প্রান্তের লোকদের নিকট তা পৌঁছতে পারে। ঘোষণাটি নিম্নরূপ,

'(সর্বশেষে) এই (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে এক (মহা-) পয়গাম (এটা এ জন্যেই নাযিল করা হয়েছে), যাতে করে এ (গ্রন্থ) দিয়ে পরকালীন আযাবের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়। তারা যেন (এর মাধ্যমে) এও জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, (সর্বোপরি) বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' (আয়াত ৫২)

মুসলমান দাবীদাররাও নানাভাবে মূর্তির পূজা করছে

এই ঘোষণাটির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীর সকল মানুষকে জানিয়ে দেয়া, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই, নেই কোনো উপাস্য। তিনি একক ও অভিন্ন সত্ত্বার অধিকারী। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদ, যার ওপর ইসলামী জীবন বিধানের গোটা ইমারত দাঁড়িয়ে আছে।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই– কেবল এ সত্যটুকু জানিয়ে দেয়াই এই ঘোষণার উদ্দেশ্য নয়; বরং এই ঘোষণার উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানুষ এই সত্যটুকু জানার সাথে সাথে তার গোটা জীবন সেই অনুযায়ী পরিচালিত করবে। তার গোটা আনুগত্য ও দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত থাকবে। কারণ যিনি মাবুদ বা উপাস্য, তিনিই রব বা প্রতিপালক হওয়ার যোগ্য। আর যিনি 'রব' হওয়ার উপযুক্ত, একমাত্র তিনিই হবেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, মনিব, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী, আইনদাতা ও বিধানদাতা। যাদের গোটা জীবন এই ভিত্তির ওপর, এই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের জীবন সেসব লোকের জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বতন্ত্র, যারা মানুষের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, যারা মখলুকের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, এই উভয় শ্রেণীর লোকদের চিন্তা চেতনা, আকীদা বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও স্বভাব চরিত্রের মাঝেও উক্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। এই পার্থক্য উভয় শ্রেণীর আদর্শ ও মূল্যবোধ, তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক তথা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে।

একক ও অভিন্ন সত্ত্বার প্রভুত্বে বিশ্বাস হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানের ভিত্তি স্বরূপ। এটা কেবল মানুষের বিবেকে লুকায়িত একটা বিশ্বাসই নয়; বরং এই বিশ্বাসের সীমারেখা আরো সুবিস্তৃত। এর পরিধি নিছক বিবেকনির্ভর বিশ্বাসের তুলনায় আরো ব্যাপক। কারণ, এর আওতার মধ্যে পড়ে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের প্রতিটি শাখা প্রশাখা এই আকীদা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। এমনিভাবে গোটা নৈতিকতার বিষয়টিও এই আকীদা-বিশ্বাসেরই একটি অঙ্গ। কাজেই আকীদা বিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত হয় জীবন বিধান, যার আওতায় পড়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। তেমনিভাবে এর আওতায় পড়ে আইন ও বিধানসহ জীবনের অন্য দিকগুলো।

ইসলাম ধর্মে এই আকীদা বিশ্বাসের সীমারেখা কি? কালেমা শাহাদাতে এর মর্মবাণী কি? এবাদাত বন্দেগী কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে এর অর্থ কি? এসব বিষয় যদি আমরা সঠিক ও যথার্থভাবে জানতে বুঝতে না পারি, তাহলে এই পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না এবং এই সত্যটুকুও উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না যে, আল্লাহর দাসত্ব আনুগত্য কেবল নামায রোযা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা জীবনের প্রতিটি দিক ও বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত!

দেব দেবীর পূজা অর্চনা থেকে নিজের সন্তানদের মুক্ত রাখার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে যে আরযি পেশ করেছিলেন, সেখানে দেব দেবী বলতে কেবল সেই জাহেলী যুগের আরবদের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির দেব দেবীকেই বুঝানো হয়নি। এই দোয়ায় তৎকালীন যুগের প্রচলিত প্রস্তমূর্তি, গাছরূপী মূর্তি, জীব জন্তু বা পশু পাখিরূপী মূর্তি, গ্রহ নক্ষত্র বা অগ্নিরূপী মূর্তি, অথবা ভূত প্রেত জাতীয় ইত্যাদি নানা প্রকারের দেব দেবীর কথাই বলা হয়নি। কারণ আল্লাহর সাথে শেরেক করা বলতে কেবল এই বাহ্যিক সাদামাটা পূজা অর্চনাকেই বুঝায় না। শেরেক বলতে কেবল এই সাদামাটা কাজগুলোই যখন আমরা বুঝতে থাকি, তখন অন্য আরো অসংখ্য শেরেকের প্রকার ও রূপগুলো আমাদের দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকে। ফলে নব্য জাহেলিয়াতের যুগে গোটা মানব জীবনকে যে অসংখ্য শেরেক গ্রাস করে ফেলছে সেই বাস্তবতাটুকু উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলছি।

কাজেই শেরেকের প্রকৃতি কি এবং এর সাথে মূর্তির কি সম্পর্ক, সে ব্যাপারে আমাদেরকে গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে এ বিষয়টিও তলিয়ে দেখতে হবে যে, মূর্তি বলতে কি বুঝায় এবং নব্য জাহেলিয়াতের যুগে এর বিভিন্ন রূপ ও প্রকার কি কি।

আল্লাহর সাথে শেরেক করার অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বিপরীত কাজ করা। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর সাথে শেরেক করা। জীবনের বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করা আর বাকী অন্যান্য ক্ষেত্রে 'গায়রুল্লাহর' দাসত্ব স্বীকার করা দ্বারাও মানুষ শেরেকে লিপ্ত হয়। কারণ এটাও এক প্রকার শেরেক। দেব দেবীর পূজা অর্চনা হচ্ছে শেরেকের অসংখ্য রূপের অন্যতম একটি রূপ। এর আরো বাস্তব রূপ দেখতে হলে বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার দিকে তাকালেই যথেষ্ট। বর্তমান যুগে আমরা দেখতে পাই, একজন মানুষ আল্লাহকে একমাত্র মাবুদ বলে স্বীকার করছে, সে অযু গোসল, নামায রোযা ও হজ্জ যাকাতসহ অন্যান্য সকল ধর্মীয় বিধি বিধানের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য দাসত্বই মেনে নিচ্ছে। অথচ সেই একই ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক জীবনে, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে এবং সামাজিক জীবনে গায়রুল্লাহ বা মানব রচিত বিধি

বিধান মেনে চলছে। একই সাথে সে তার সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর ব্যাখ্যা ও চিন্তাধারা বিনা বাক্যে মেনে নিচ্ছে। শুধু তাই নয়; বরং সে তার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, এমনকি পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী ও খোদাদ্রোহী নিয়ম নীতি মেনে চলছে। এই ধরনের ব্যক্তির সম্পর্কে বলা যায়, সে সবচেয়ে গুরুতর শেরেকে এবং যথার্থ অর্থেই সে কালেমার চেতনা বিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে অনেকেই বিষয়টিকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করছে এবং তাদের ধারণা, এটি সেই শেরেকের পর্যায়ে পড়ে না যা বিভিন্ন যুগে ও দেশে মোশরেকরা করে আসছে।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মূর্তির আকৃতি প্রকৃতি আদিম যুগের মূর্তির ন্যায়ই হবে, এমনটি জরুরী নয়; বরং এখানে মূর্তি শব্দটি গায়রুল্লাহ বা তাগুতের প্রতীক রূপেই এসেছে। কারণ এই প্রতীকের আড়ালেই সে মানব জাতিকে দাসে পরিণত করে, এর মাধ্যমে তাদের আনুগত্য ও দাসত্ব লাভ করে।

পাথরের মূর্তি কথাও বলে না, শুনেও না এবং দেখেও না, কিন্তু একে হাতিয়ার বানিয়ে আসল ফায়দা যারা লুটছে তারা কারা? তারা হচ্ছে ওই প্রস্তর মূর্তির আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা পূজারী, পুরোহিত অথবা শাসক। তারা ওই মূর্তির মুখপাত্র হয়ে কথা বলে, জপতপ করে, ঝাড় ফুঁক করে। এরপর ওই মূর্তির নামেই নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে, মানুষদের নিজেদের দাসে রূপান্তরিত করে।

যদি কোনো দেশে এবং কোনো যুগে বিশেষ কোনো শ্লোগান উত্থাপন করা হয় আর সেই শ্লোগানের মুখপাত্র হয়ে শাসকগোষ্ঠী বা পুরোহিতগোষ্ঠী বক্তব্য রাখে এবং সেই শ্লোগানের আড়ালে এমন কিছু বিধি বিধান, আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং আচার আচরণের প্রবর্তন করতে থাকে, যা সম্পূর্ণরূপে খোদাদ্রোহী ও শরীয়ত বিরোধী– তখন এসব কিছুই বিবেচিত হবে মূর্তি বলে। কারণ, প্রকৃতি, স্বভাব ও প্রভাবের ক্ষেত্রে এগুলো এবং প্রস্তর মূর্তির মাঝে আদৌ কোনো তফাৎ থাকে না।

যদি 'জাতীয়তাবাদ' অথবা 'মাতৃভূমি' অথবা 'জনতা' অথবা 'শ্রেণী' ইত্যাদির নামে শ্লোগান উত্থাপন করা হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে এগুলোরই বন্দনার জন্যে মানুষদের আহ্বান করা হয়, এগুলোর খাতিরে তাদের জান মাল ও ইযযত আবরু বিসর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহর বিধানের সাথে এগুলোর সংঘর্ষ ঘটলে বা আল্লাহর নির্দেশ এগুলোর বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হলে তখন শরীয়তের বিধান, আল্লাহর নির্দেশ ও শিক্ষা ত্যাগ করে ওই শ্লোগানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই যখন বাস্তবায়িত হবে, তখনই এগুলো মূর্তির স্থান দখল করে নেবে। আর একটু পরিস্কার ও সঠিক ভাষায় বলতে গেলে বলতে পারি, আল্লাহর পরিবর্তে উক্ত শ্লোগানগুলোর আড়ালে লুকায়িত খোদাদ্রোহী ও বাতিল শক্তির ইচ্ছা আকাংখার বাস্তবায়নই হচ্ছে মূর্তিপূজার নামান্তর। মূর্তি কেবলই পাথরের হবে অথবা কাঠের হবে এমনটি জরুরী নয়; বরং বিশেষ কোনো মতবাদ, বিশেষ কোনো আদর্শ বা বিশেষ কোনো দর্শনও মূর্তিরূপে বিবেচিত হতে পারে, যদি তা ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী হয়।

আল্লাহর দাসত্ব ও গায়রুল্লাহর দাসত্বের তারতম্য

ইসলামের আগমন কেবল প্রস্তর মূর্তি বা কাষ্ঠমূর্তির বিনাশ সাধনের জন্যেই ঘটেনি। নবী রসূলদের সেই অব্যাহত চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ তিতিক্ষার উদ্দেশ্যও সেটা ছিলো না। কেবল পাথর বা কাঠের মূর্তি ভাঙার জন্যেই তারা সেই অবর্ণনীয় কষ্ট ও যাতনা স্বীকার করেননি।

কেবল আল্লাহর দাসত্ব ও সব আকৃতি প্রকৃতির গায়রুল্লাহর দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্যটুকু সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্যেই ইসলামের আগমন ঘটেছে। গায়রুল্লাহর এই বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি অনুধাবন করতে হলে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নিয়ম নীতি ও জীবন ব্যবস্থার প্রতি। এর মাধ্যমেই বুঝা যাবে, সেসব জীবন ব্যবস্থা তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না শেরেকের ওপর প্রতিষ্ঠিত? সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ পায়, না মূর্তিরূপী বিভিন্ন খোদাদ্রোহী বাতিল শক্তির প্রতি আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ পায়?

অনেকেই নিজেকে ইসলাম অনুসারী মনে করে। কারণ তারা কালেমা পাঠ করেছে, পাক পবিত্রতা, এবাদাত-বন্দেগী, বিয়ে শাদী ও মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বা শরীয়তের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে মেনে চলে। পক্ষান্তরে তারা এই সীমিত গন্ডির বাইরে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে 'গায়রুল্লাহর' অনুশাসন এবং খোদাদ্রোহী আইন-কানুন ও বিধি বিধান মেনে চলে। অথচ সেগুলো সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত বিরোধী। শুধু তাই নয়, ওই সকল লোক ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক নিজেদের জান মাল ও ইযযত আবরু নতুন নতুন মূর্তির চাহিদা পূরণের জন্যে উৎসর্গ করে থাকে। যখন ধর্ম বা নৈতিকতা বা মান ইযযত এই চাহিদা পূরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা অপসারণ করে ওই মূর্তিগুলোর চাহিদাই পূরণ করা হয়। এমনকি এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশও অমান্য করা হয়।

যারা নিজেদের 'মুসলমান' বলে দাবী করে এবং ইসলামের অনুসারী বলে মনে করে, তাদের অনেকের অবস্থা হচ্ছে এই। তারা যে মারাত্মক শেরেকের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাদের চেষ্টা করা উচিত। এ ব্যাপারে তাদের সচেতন হওয়া জরুরী।

আল্লাহর এ দ্বীন এতো তুচ্ছ নয় যেমনটা গোটা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক লোক মনে করে; বরং এই দ্বীন হচ্ছে একটা পূর্ণাংগ জীবন বিধানের নাম, যার আওতায় মানব জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো তো পড়েই, এমন কি খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও পড়ে। এটার নামই আল্লাহ মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলাম। এ দ্বীন ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

মোট কথা, শেরেক বলতে কেবল আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ বা মাবুদের বিশ্বাসই বুঝায় না; বরং এর শুরুই হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রভুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়ার মধ্য দিয়ে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে।

তদ্রূপ মূর্তিপূজা বলতে কেবল পাথর বা কাঠ নির্মিত মূর্তিপূজাই বুঝায় না; বরং এর আওতায় অন্যান্য রীতিনীতি এবং প্রথা পার্বণও বুঝায়, যেগুলো ওই মূর্তির ন্যায়ই পূজিত এবং সমাদৃত হয়।

প্রত্যেক দেশের মানুষকে আজ তলিয়ে দেখা উচিত, তাদের জীবনে সর্বোচ্চ স্থান কার? কার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা হয়? কার কথায় মানুষ ওঠে বসে? যদি উত্তরে বলা হয়, এসব বিষয়ে আল্লাহর স্থানই উর্ধ্বে, আল্লাহর অনুশাসনই জীবনের সর্বক্ষেত্রে পালিত হয়, তাহলে বলা যায়, তারা সত্যিকার অর্থেই ইসলামের অনুসারী। আর যদি উত্তরে বলা হয়, এসব বিষয়ে গায়রুল্লাহ বা খোদাদ্রোহী শক্তি অথবা মূর্তিরূপী অন্য কোনো বাতিল শক্তিরই প্রাধান্য রয়েছে, তাহলে বলতে হবে, তারাও এক ধরনের মূর্তিপূজারী এবং তাগুত বা গায়রুল্লাহর অনুসারী। এই অবস্থা থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।

পরিশেষে আলোচ্য সূরার সর্বশেষ আয়াতটির প্রতি আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। (আয়াত ৫২)

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্র
সূরা আন নাহ্ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড

সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ
সূরা আল হুজুরাত
সূরা ক্বাফ
সূরা আয যারিয়াত
সূরা আত তূর
সূরা আন নাজম
সূরা আল ক্বামার

২০তম খন্ড

সূরা আর রাহমান
সূরা আল ওয়াক্বেয়া
সূরা আল হাদীদ
সূরা আল মোজাদালাহ
সূরা আল হাশর
সূরা আল মোমতাহেনা
সূরা আস সাফ
সূরা আল জুমুয়া
সূরা আল মোনাফেকুন
সূরা আত তাগাবুন
সূরা আত তালাক্ব
সূরা আত তাহ্‌রীম

২১তম খন্ড

সূরা আল মুলক
সূরা আল ক্বালাম
সূরা আল হাক্বাহ
সূরা আল মায়ারেজ
সূরা নূহ
সূরা আল জ্বিন
সূরা আল মোযযাম্মেল
সূরা আল মোদ্দাসসের
সূরা আল ক্বেয়ামাহ
সূরা আদ দাহর
সূরা আল মো'রসালাত

২২তম খন্ড

সূরা আন নাবা
সূরা আন নাযেয়াত
সূরা আত তাকওয়ীর
সূরা আল এনফেতার
সূরা আল এনশেক্বাক
সূরা আল বুরুজ
সূরা আত তারেক
সূরা আল আ'লা
সূরা আল গাশিয়া
সূরা আল ফজর
সূরা আল বালাদ
সূরা আশ শামস
সূরা আল লায়ল
সূরা আল এনশেরাহ
সূরা আত তীন
সূরা আল আলাক্ব
সূরা আল ক্বদর
সূরা আল বাইয়্যেনাহ
সূরা আয যেলযাল
সূরা আল আদিয়াত
সূরা আল ক্বারিয়াহ
সূরা আত তাকাসুর
সূরা আল আসর
সূরা আল হুমাযাহ
সূরা আল ফীল
সূরা কোরায়শ
সূরা আল মাউন
সূরা আল কাওসার
সূরা আল কাফেরূন
সূরা আন নাসর
সূরা লাহাব
সূরা আল এখলাস
সূরা আল ফালাক্ব
সূরা আন নাস

سيّد قطب
في ظلال القرآن
باللغة البنغالية
المجلد الثاني
ترجمة القرآن
حافظ مُنير الدّين أحمد
AL-QURAN ACADEMY LONDON
إكاديمية القرآن لندن